কালো ভ্রমর

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬

KALO BHRAMAR

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭০

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সাহিত্যালোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০৬
থেকে প্রকাশিত ও বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৬ হতে মুদ্রিত

কালো ভ্রমর

প্রথম পর্ব

অপূর্ব গঠন-কৌশল!

কালো কুচকুচে মারবেল পাথরের ওপরে কুঁদে তোলা একটি ড্রাগনের প্রতিমূর্তি!

ড্রাগনের মূর্তির দুটি চোখে দুটি বড় বড় চুনি-পাথব বসানো, লাল রক্তের মত। ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো সেই রক্তের মত লাল চুনি-পাথর দুটির ওপরে পড়ে মনে হয় যেন কি এক প্রতিহিংসা ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়লে বুকের ভিতরটা যেন কি এক আশঙ্কায় সিরসির করে ওঠে।

ড্রাগনটার গলায় ঝুলছে ফাঁস-বাঁধা একটি লাল রিবন।

রহস্যভেদী কিরীটী রায় তার টালিগঞ্জের বাসায় নিজের মিউজিয়াম ঘরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই মিউজিয়াম ঘরটি কিরীটীর অত্যন্ত প্রিয়।

রহস্যের সন্ধানে এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে কিরীটী যত সব আশ্চর্য জিনিস কিউরিও পেয়েছে, সব এই ঘরটির মধ্যে সংগ্রহ করে সাজিয়ে রেখেছে। কত প্রকারের আশ্চর্য জিনিসই যে কিরীটীর ঐ মিউজিয়াম ঘরে স্থান পেয়েছে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা শ্বেত মেহগনি টিপয়ের ওপর কালো পাথরের তৈরী ড্রাগনটি বসানো।

কয়েক দিন হল কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। তাঁদেরই কাছ হতেই কিরীটী রায় ঐ ড্রাগনটি চেয়ে নিয়েছে। মূর্তিটির অপূর্ব গঠন-কৌশল কিরীটীকে সত্যই মুগ্ধ করেছে।

কিন্তু তার চাইতেও বিস্মিত হয়েছে, ঐ ভয়ঙ্কর কুৎসিত কালো পাথরের ড্রাগনটির সঙ্গে যে বিস্ময়কর ঘটনা জড়িয়ে আছে, সেই কাহিনী শুনে।

ডাকাত কালো ভ্রমর, দস্যু কালো ভ্রমরকে চেনে না—এমন কেউ কি আর আজ আছে? তার নাম শুনলেও বুঝি আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। কিরীটী নিজেও বোধ হয় কোন দিন ভুলতে পারবে না সেই দুর্ধর্ষ মানুষটার কথা। বর্তমান সভ্যজগতে এক চরম বিস্ময়, কি বুকের পাটা লোকটার! কিরীটীর ইচ্ছা করে সেই কূট-কৌশল ভয়ঙ্কর দস্যু কালো ভ্রমরের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামতে।

সে বলেছে, আবার সে আসবে। তার প্রতিহিংসার দাবানলে সে ছটফট করছে। পরিত্রাণ নেই তার নিষ্ঠুর কবল হতে। সে যে আবার ফিরে আসবে, তারও কোন ভুল নেই।

কত রাত্রে ঘুমের মধ্যে কিরীটী শুনেছে তার চাপা সতর্ক পায়ের শব্দ। কালো একটা দীর্ঘ ছায়ার মত সে যেন এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে তার চোখ দুটো ঠিক ড্রাগনটার চুনির চোখের মত ধক্‌ধক করছে, যেন দুটো আগুনের ফুলকি, সাপের চোখের দৃষ্টির মতই তার সম্মোহনী শক্তি।

কিরীটীর ঘুম ভেঙে গেছে।...

খোলা জানালা-পথে, বাইরের অন্ধকারে, রাস্তার ধারের বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছটা,

কেমন অদ্ভুত অশরীরী ছায়ার মত মনে হয়, ভয়াবহ এক ইশারায় যেন কেবলই ডাকে —আয়! আয়! আয়!

অন্ধকারে সাগর গর্জন করছে।

বড় বড় ঢেউগুলো সাদা ফেন-কিরীটী মাথায়, তার বুকে ফসফরাসের আগুনের চুমকি। ক্ষুধিত একটা জন্তুর মত যেন দাঁত বের করে গর্জন করছে অবিরাম!

ওপরে দিক হতে দিগন্ত বিস্তৃত খোলা আকাশ। অন্ধকারে তারাগুলো পিট্‌পিট্‌ করে।

সেই তারার আলোয় ভরা আকাশের তল দিয়ে অকূল পারাপার-হীন গর্জন-মুখর সাগর পেরিয়ে, সাগরের বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় যেন কোথায়।

রহস্যময় সেই বর্মীদের দেশ! কালো ভ্রমরের দেশ!

রাতের চোরা বাতাস ফিস্‌ফিস্‌ করে কানাকানি করে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার থমথম করে।

এখনই হয়তো কার চাপা নিঃশব্দ পায়ের ধ্বনি শোনা যাবে, অন্ধকার যবনিকার সকল রহস্য ভেদ করে চোখের ওপরে ভেসে উঠবে একটা মুখোশ-ঢাকা মুখ। ভয়ঙ্কর কুৎসিত!

কালো ভ্রমর! কালো ভ্রমর!

॥ ১ ॥
সম্পত্তি প্রাপ্তি

সে এক শীতের রবিবারের সকাল।

হোস্টেলের প্রায় সব ছেলেই যে যার সুকোমল শয্যায় তখনও ঘুমিয়ে। শুধু সুব্রতর ঘরে সে একাই ঘুম থেকে উঠে ভারী বারবেলটা নিয়ে ব্যায়াম করছিল।

কি শীত কি গ্রীষ্ম খুব ভোরে উঠে ব্যায়াম করাটা সুব্রতর নিয়মিত কার্য-তালিকার মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। সে জানত শরীরকে শক্ত ও সবল না রাখতে পারলে, শরীরটা তো অথর্ব হয়ে পড়েই, সেই সঙ্গে মনটাও যেন অকালে বুড়িয়ে যায়। অল্পবয়সেই মানুষ কেমন যেন অকেজো দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে।

হোস্টেলের চাকর সুদন এসে বললে, সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব এখনই একবার তাঁর কামরায় যেতে বললেন।

হাতের সুগোল মাংসপেশীগুলো টিপতে টিপতে সুব্রত জবাব দিল, যা তুই, আমি যাচ্ছি।

সৌরেন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল, সুব্রতকে সেদিকে আসতে দেখে মৃদু হেসে বললে, এই যে ভীমসেন, এত সকালে এদিকে কোথায় চললে?

সুব্রত জবাব দিল, সাহেবের ঘরে।

সত্যি ভীমসেনই বটে! বাঙালীর মধ্যে সচরাচর এমন চমৎকার দেহসৌষ্ঠব বড় একটা দেখাই যায় না। উঁচু, লম্বায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুটেরও উপর সুব্রত।

পেশল উন্নত শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী নিয়মিত ব্যায়ামে যেন সজাগ ও সুস্পষ্ট। কালো দেহের রং, দেখলে মনে হয় এ কোন সুদক্ষ কারুশিল্পীর কুঁদে তোলা চমৎকার একখানি পাথরের মূর্তি! এক মাথা লম্বা লম্বা চুল। সুব্রত রায়কে ভয় করত না বাঁকুড়া শহরে এমন একটি লোক ছিল কিনা সন্দেহ। অথচ ভয় কাকে বলে সুব্রত তা জানত না।

সংসারে সুব্রতর আপনার বলতে কেউ ছিল না। ও শুনেছিল কোথাকার কে নাকি এক দূর-সম্পর্কীয় মামা, কলকাতার কোন এক ব্যাঙ্কে ওর নামে অনেক টাকা রেখে দিয়েছিলেন। তা থেকেই এতাবৎ সকল খরচ চলে আসছে। কলেজে ঢোকার আগে সে মানুষ হয়েছে এক মিশনারী বোর্ডিংয়ে। গ্রীষ্মে কিংবা পূজার ছুটিতে যখন বোর্ডিংয়ের সব মেম্বাররাই যে যার মা-বাবার কাছে চলে যেত, তখন সুব্রত এত বড় হোস্টেলটায় সম্পূর্ণ ছুটিটা একাই কাটিয়ে দিত পড়াশুনা আর ব্যায়াম নিয়ে। সে যাবে কোথায়? যাওয়ার জায়গা তো তার ছিল না।

সুব্রত ঘরে ঢুকতেই সুপারিনটেন্‌ডেন্ট বললেন, এই অ্যাটর্নীর চিঠিটা অনেক ঘুরে ফিরে তোমার নামে কাল বিকালে এখানে এসে পৌঁচেছে।

সুব্রত আশ্চর্য হয়ে বহু ডাকঘরে চিহ্নিত খাম হতে চিঠিখানা টেনে খুললে। চিঠিটা বর্মামুলুকের কোন এক বসু অ্যান্ড চৌধুরীর অ্যাটর্নী-অফিস থেকে আসছে। অ্যাটর্নীর

চিঠির সারমর্ম হচ্ছে : সুবিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী নীরদ চৌধুরী মরবার সময় তাঁর বর্মার প্রায় তিন লক্ষ টাকার কাঠের ব্যবসা তাঁর মৃতা কনিষ্ঠ ভগিনী মমতা দেবীর একমাত্র পুত্র সুব্রত রায়কে একটিমাত্র শর্তে দিয়ে গেলেন। সেই শর্তটি এই : সে অর্থাৎ সুব্রত যদি আগামী '৩৫ সনের তেসরা ফেব্রুয়ারী বেলা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উক্ত অ্যাটর্নী অফিসে উপস্থিত হয়ে এই সম্পত্তির দাবি না করতে পারে, তা হলে এই সম্পত্তির সমস্ত দাবি-দাওয়া গিয়ে বর্তাবে তাঁর বড় বোনের ছেলে, বর্তমানে তাঁরই ব্যবসার সহকারী ম্যানেজার শ্রীমান সনৎ রায়ে, এবং সে অবস্থায় শ্রীমান্ সুব্রত দু শত টাকা করে প্রতি মাসে নিয়মিত স্টেট হতে মাসোহারা পাবে মাত্র।

তারপর অ্যাটর্নী আরও লিখেছেন : আমরা আপনার ঠিকানা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও জানতে পারিনি ; কেননা উইলের মালিক আমাদের জানিয়েছিলেন, আপনার ঠিকানা নাকি তাঁর অফিস-ঘরের বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের বাঁ দিকটার নীচের ড্রয়ারে তাঁর ডায়েরীতে লেখা আছে। কিন্তু তাঁর মরবার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল, কিন্তু সেই ডায়েরীটির কোন সন্ধানই পাওয়া যায়নি।

তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর কাছে একদিন কথায় কথায় শুনেছিলাম, আপনি নাকি বাংলা দেশের কোথায় উইলিয়াম মিশন নামে এক বোর্ডিংয়ে থেকে মানুষ হচ্ছেন। আপনার মামা মিস্টার চৌধুরী সংসার করেননি। সংসারে তাঁর আপনার বলতে বড় বোনের একটি ছেলে ও ছোট বোনের একটি ছেলে। তাঁর বড় বোন—ছেলের যখন এগারো বছর বয়স তখন হঠাৎ মারা যান এবং বোনের স্বামী তার বছরখানেক আগেই নাকি মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি বড় বোনের পিতৃমাতৃহারা সন্তান ঐ সনৎকে এনে নিজের কাছে বর্মায় রাখেন এবং সেই থেকে সে তার মামা, মিস্টার চৌধুরীর কাছে থেকেই মানুষ হতে থাকে।

উপরিউক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন হঠাৎ তিনি খবর পেলেন, তাঁর ছোট বোনটি ও তাঁর স্বামী হঠাৎ দৈব-দুর্ঘটনায় বছর পাঁচেকের একটি শিশুপুত্র রেখে নাকি মারা গিয়েছেন। এধারে কোন বিশেষ কারণবশত নাকি মিস্টার চৌধুরী তাঁর এ ভাগ্নেটিকে কাছে আর আনালেন না। ভাগ্নেকে বাংলা দেশের এক মিশনারী বোর্ডিংয়ে রেখে, কলকাতার এক বিখ্যাত ব্যাঙ্কের মারফতে মাসে মাসে ওই ভাগ্নের প্রতিপালনের জন্য টাকা পাঠাবার পাকাপাকি একটা সুব্যবস্থা করে দিলেন—যাতে করে ভাগ্নেটির কোন অর্থকষ্ট না হয়, অথচ লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারে। ভাগ্নের কাছ থেকে নিজের নামধাম সব কিছুই তিনি অতি সন্তর্পণে কোন এক বিশেষ কারণবশতই গোপন রাখেন।

সহসা ঐ কথাগুলো আমার মনে পড়ায় আমি কলকাতায় আমার এক বন্ধুকে বাংলা দেশের কোথায় ঐ মিশনটি আছে খোঁজ নিতে বলি ; কিন্তু সে ঐ মিশনটির কোন খোঁজ দিতে পারে না। এদিকে সময়ও বয়ে যায়। কি করি? আমাকে তিনি বলেছিলেন এক সময় কথাপ্রসঙ্গে যে, তিনি অর্থাৎ মিস্টার চৌধুরী নাকি কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ঐভাবে উইলটাকে অদ্ভুত একটা নির্দিষ্ট সময়ের সীমার মধ্যে ফেলে সমস্ত ব্যাপারটা জটিল করে গিয়েছেন।

মৃত্যুকালে এর আসল রহস্যটা নাকি তিনি তাঁর ম্যানেজারের কাছে উদঘাটনও করে

গিয়েছেন। সে যাই হোক, এখন যদি আপনি সত্যই ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে সম্পত্তির দাবি জানাতে পারেন, তখন আপনা হতেই সব আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই শেষ পর্যন্ত আর অন্য কোন উপায় না দেখে C/o উইলিয়াম মিশন, বেঙ্গল, এই ঠিকানায় চিঠি দিলাম।

যদি আপনি আমার চিঠিখানা পান, তবে চিঠি পাওয়া মাত্রই আপনি যেখানে যেমন ভাবেই থাকুন না কেন, অবশ্যই রওনা হবেন এবং রওনা হওয়ার আগে আমাদের জানাবেন জরুরী তারযোগে সংবাদটা।

আর একটি কথা, এখানে আসবার সময় আপনার ছোটবেলার একটি ফটোর পিছনে আপনার মামার হাতের লেখা আপনার পরিচয়পত্রটিও সঙ্গে করে আনতে যেন ভুলবেন না। কেননা ওটাই আপনার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পরিচয়। মিস্টার চৌধুরীর উইলেও ওই ফটোর কথা উল্লেখ আছে। ইতি—ভবদীয়

বসু অ্যান্ড চৌধুরী

চিঠিটা পড়ে সুব্রত দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটার দিকে চোখ তুলে তাকাল এবং মনে মনে হিসাব করে দেখলে, চিঠির নির্দিষ্ট তেসরা ফেব্রুয়ারী হতে এখনও ঠিক কুড়ি দিন বাকি আছে। তার মানে হাতে এখনও কুড়িটা দিন সময় আছে তার। সুব্রত ভাবতে লাগল, এখন সে কি করবে? অর্থের প্রতি তার কোন দিনই এতটুকু লোভ নেই ; কিন্তু এই সম্পত্তি লাভের ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই অদ্ভুত একটা বৈচিত্র্যে ভরা। তরুণ মন স্বভাবতই অ্যাডভেনচার ভালবাসে ; তাছাড়া এর মধ্যে রোমাঞ্চও যথেষ্ট আছে। এই একঘেয়ে রুটিনবাঁধা কলেজী জীবনের মধ্যে যেন হঠাৎ একটা দোলা এনে দিয়েছে ঐ চিঠিখানা। সুব্রত আবার চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে—চঞ্চল হয়ে ওঠে ওর মন।

কিন্তু ফটো ও তার আসল পরিচয়-পত্রটি তো তার কাছে নেই।

চিঠিটা হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট আগেই পড়েছিলেন। সুব্রতর চিঠিটা পড়া হতে তিনি এবারে বললেন, পড়লে চিঠি?

হ্যাঁ স্যার।

আশা করি তুমি নিশ্চয়ই যাবে?

ভাবছি স্যার।

ভাবাভাবি নেই, নিশ্চয়ই তুমি যাবে। এই চিঠিতে যে ফটোর কথা আছে সেটা ফাদার উইলিয়াম আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা আমার কাছেই আছে। যাবার আগে সেটা নিয়ে যেও।

সুব্রত যতই এ বিষয়ে চিন্তা করে, ততই যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে সামনের দিকে ঠেলতে থাকে।

হোস্টেলে সুব্রতর সহপাঠী ও অন্যান্য সকলে যখন সুব্রতর হঠাৎ এই প্রভূত অর্থ পাওয়ার খবরটা পেলে, তখন সবাই তাকে ঘিরে ধরে সোল্লাসে চিৎকার করে ওঠে, থ্রি চিয়ার্স ফর উড-বি মিলিয়নিয়ার সুব্রত রায়! হিপ হিপ হুররে!

মণি অকারণ বিস্ময়ে চোখ দুটোকে বড় বড় করে বললে, উঃ, একেই বলে বাবা বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া! নইলে আমাদের এমন পাথর-চাপা কপাল যে লাখপতি মামা তো দূরে থাক, একটা ফুটো পয়সাওয়ালা মামা পর্যন্ত মেলে না! এবার মরবার

সময় কায়মনে ভগবানকে এই প্রার্থনাই জানিয়ে যাব—হে বাবা ভগবান দোহাই তোমার, আর কিছু দাও আর না-ই দাও নিদেনপক্ষে একটা মামা দিও প্রভু!

নীতীশ সুব্রতর পরম বন্ধু, বললে, আই কংগ্রাচুলেট ইউ অন্ ইওর ফরচুন!

বলতে বলতে সুব্রতর হাত দুটো ধরে নীতীশ একটা দোলা দিয়ে দিল। দু বন্ধুতে বসল তখন পরামর্শ-সভা। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল, পরের দিনই রাত্রে পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারে রওনা হতে হবে, কারণ সময় মাত্র কুড়িটি দিন হাতে। বিদেশ যাত্রার পক্ষে ঐ সামান্য কটা দিন কিছুই নয়। অতএব যত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায় ততই ভাল।

ঠিক হল নীতীশও যাবে ওর সঙ্গে। অচেনা অজানা দেশ মগের মুলুক। অন্তত একজন বন্ধু সঙ্গে থাকা ভাল এবং তাতে করে সুব্রতর তো সুবিধা হবেই, নীতীশের ঐ সঙ্গে একটা নূতন দেশ এই সুযোগে দেখা হয়ে যাবে।

সব স্থির হয়েও আলোচনার যেন শেষ হয় না। গতকাল চিঠি পাওয়ার পর থেকে ঘুরে ফিরে কেবল ঐ একই আলোচনা দুজনের মধ্যে চলেছে। পরের দিনও দ্বিপ্রহরে সুব্রতর ঘরে তার সীটে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে, সুব্রত আর নীতীশ যখন ওদের সুদূর বর্মা-যাত্রা সম্পর্কেই নানা আলোচনায় একেবারে মশগুল হয়ে উঠেছে, এমন সময় মেসের ভৃত্য শ্রীমান্ সুদন এসে ঘরে ঢুকল, দাদাবাবু, চিঠি!

সুদনের হাতে একটা পুরু হলুদ রংয়ের তুলোট কাগজের লেফাফা। চিঠিটার উপরে সুব্রতরই নাম ইংরাজীতে টাইপ করা। সুব্রত কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, কে তাকে চিঠি লিখতে পারে! কেননা গতকালের ঐ এ্যাটর্নীর চিঠিটা এবং আজ দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে দু-তিনখানা বন্ধু-বান্ধবের চিঠি ছাড়া ও কোন দিনই কারও চিঠি পায়নি। সংসারে আপনার জন কেই বা আছে তার যে তাকে চিঠি দেবে। ঐ একমাত্র মামাও যে তার আপন মামা সে সংবাদটুকুও তো সে মাত্র সর্বপ্রথম গতকালই এ্যাটর্নীর চিঠি পড়ে জানতে পেরেছে।

তাছাড়া বন্ধু-বান্ধব, কিন্তু তারা তো কখনও উপরের ঠিকানা ও নাম টাইপ করে দেয় না। তবে তাকে কে এই চিঠি লিখলে? বেশ একটু আশ্চর্য হয়েই সুব্রত চিঠিখানা খুলে ফেললে। কিন্তু ভিতরের চিঠিটা হাতেই লেখা। চিঠিখানা পড়ে সুব্রত তার একটা কথাও বুঝতে পারলে না। সে নীরবে শুধু খোলা চিঠিখানা নীতীশের হাতে তুলে দিল।

কার চিঠি রে? নীতীশ শুধায়।

পড়েই দেখ না। সুব্রত বলে।

একটা হলুদ রংয়ের চারকোণা ছোট্ট কাগজ। কাগজের এক কোণে একটা ভ্রমর আঁকা এবং সেই ভ্রমরের পাখাতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি বিদ্ধ। তার তলায় কয়েকটা কথা মাত্র লেখা —

প্রিয় সুব্রতবাবু, আপনি হয়তো হঠাৎ আমার এই চিঠিখানা পেয়ে বিস্মিত হবেন। সেই জন্যই সর্বাগ্রে আমার একটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করছি। আমাকে পৃথিবীর সবাই 'কালো ভ্রমর' বলেই জানে। এবং আপনাকেও হয়তো তাদের মধ্যে একজন অনায়াসেই ধরে নিতে পারি। যা হোক, শুনলাম, অ্যাটর্নী বসু অ্যান্ড চৌধুরী আপনাকে মিস্টার চৌধুরীর উইল সম্পর্কে একখানা চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু আমার কথা যদি আপনি

শোনেন, তাহলে আপনি সম্পত্তির দাবি করতে আসবেন না এবং আপনি যদি আমার কথামত কাজ করেন, অর্থাৎ আপনার মামা মিস্টার নীরদ চৌধুরীর সম্পত্তির প্রতি লোভ না করেন, তাহলে আপনাকে নগদ বিশ হাজার টাকা দেওয়া হবে এবং ঐ নির্দিষ্ট তারিখ ৩রা ফেব্রুয়ারী উত্তীর্ণ হবার দশ দিনের মধ্যেই ঐ বিশ হাজার টাকা আপনার হাতে পৌঁছুবে।

আর প্রলোভনে পড়ে যদি আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করেন, তাহলে বিপদে পড়বেন, এমন কি সেক্ষেত্রে আমরা আপনার প্রাণ নিতেও ইতস্তত করব না জানবেন।

অতএব প্রাণের ভয় থাকে তো এ কাজে এগোবেন না। ইতি—

'কালো ভ্রমর'

॥ ২ ॥
চলন্ত ট্রেনে আগন্তুক

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে সুব্রত সত্যই অবাক হয়ে গিয়েছিল। এতবড় বিস্ময় সুব্রতর জীবনে খুব কমই ঘটেছে। আবার সুব্রত চিঠিখানা পড়ে। প্রথমটায় সে যেন ভাল করে বুঝে উঠতেই পারে না। ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে মাত্র আগের দিন ডাকে পাওয়া অ্যাটর্নীর চিঠি ও উইল সংক্রান্ত সব কথা ওর মনে পড়ে যায়। এতক্ষণে যেন ও অন্ধকারে কতকটা আলো দেখতে পায়ও। কিন্তু কে এই চিঠির লেখক কালো ভ্রমর!

কে এই কালো ভ্রমর? আর কেনই বা সে এমন অদ্ভুত চিঠি সুব্রতকে লেখে? আশ্চর্য ব্যাপার! নীতীশও ততক্ষণে চিঠিখানা পড়ে ফেলেছে।

সুব্রত বা নীতীশ তো ভেবেই পায় না, চিঠির অর্থই বা কি এবং কেন এই ধরনের চিঠি কালো ভ্রমর লিখেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভাববার পর নীতীশ বললে, দেখ সুব্রত, এই চিঠিটা পড়ে মনে হচ্ছে, তোর সম্পত্তিপ্রাপ্তির ব্যাপারটা বেশ যেন একটু জটিল। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও বেশ একটা ষড়যন্ত্রও আছে।

ষড়যন্ত্র! তার মানে? কি তুমি বলতে চাও নীতীশ?

বুঝতে পারছ না বোধ হয় আমার কথা, না? বসু অ্যান্ড চৌধুরীর গতকালের চিঠিটার মধ্যে মনে আছে বোধ হয় লেখা আছে, তোমার এই সম্পত্তির আরও একজন দাবিদার আছেন। কেমন তো? এবং তুমি সময়মত পৌঁছতে না পারলে এই সুবিপুল সম্পত্তি সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিই পাবে, তুমি তখন শুধু একটা মাসোহারা ছাড়া অন্য কিছুই পাবে না। এবং ওইখানেই উইলের যত গোলমাল বা জটিলতা।

হ্যাঁ, সে-কথা লেখা আছে বৈকি! কিন্তু—

নীতীশ এবারে যেন একটু অধৈর্যের সঙ্গেই জবাব দেয়, তাই যদি হয়, তাহলে এখন এ কথাটা অনায়াসেই তো আমরা ভাবতে পারি যে, ঐ রকম স্বার্থের ক্ষেত্রে তোমাকে যদি উইলের অপর পক্ষ কোনমতে ঐ তারিখে রেঙ্গুনের অ্যাটর্নী অফিসে না পৌঁছুতে দেয় বা যেমন করেই হোক তোমায় বাধা দিতে পারে, তাহলে সম্পত্তির সমস্ত দাবিই তাকে বর্তাবে। এখন বুঝে দেখ। অবিশ্যি এটা আমার নিছক একটা ধারণা মাত্র। হয়তো সেই পক্ষ কোন উপায়ে তুমি সেখানে ঠিক সময়ে যাতে না পৌঁছতে পার, তার

জন্য কোন সাহায্য বা পথ নিয়েছে। এই 'কালো ভ্রমর' হয়তো তারই জন্য নিযুক্ত একটা উপায় বা পন্থা।

নীতীশের কথার যুক্তিটা বিবেচনা করে সুব্রত বেশ একটু যেন চিন্তিত হয়ে ওঠে। সত্যিই তো! নীতীশ হয়তো ঠিকই বলেছে। তারপর হঠাৎ সুব্রতর কি একটা কথা মনে পড়ায় ও বলে ওঠে, কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই, কালো ভ্রমর! কালো ভ্রমর! দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করো নীতীশ।—বলতে বলতে সুব্রত শয্যা হতে উঠে পড়ে ঘরের এক কোণে রক্ষিত তার সুটকেসটা তুলে তার নীচে স্তূপ করে রাখা অনেকদিনের পুরাতন খবরের কাগজের তাড়াটা বের করে ওলটপালট করতে লাগল ক্ষিপ্রহস্তে। এবং খুঁজতে খুঁজতে এক সময় হঠাৎ সে একটা পুরাতন ইংরাজী কাগজ তাড়ার মধ্যে থেকে টেনে নিয়ে, তারই এক জায়গার উপর ঝুঁকে পড়ল। নীতীশও এগিয়ে এল, ব্যাপার কি সুব্রত?

এই দেখ! বলে একটা নিউজ কলমের প্রতি সুব্রত বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সংবাদটার বাংলা তর্জমা করলে এইরকম দাঁড়ায় :

আবার সেই কালো ভ্রমর!

এই দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল এই বিংশ শতাব্দীতে আইন-কানুনের এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও সমগ্র শহরের উপর যে বিস্ময়কর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে তা সত্যই ভীতিপ্রদ। শোনা যাচ্ছে, এদের দল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নাকি ছড়িয়ে আছে। কেমন করে কি উপায়ে শত শত সুদক্ষ পুলিস কর্মচারীর চোখে ধূলি দিয়ে যে এরা কাজ হাসিল করে তা সত্যিই বিস্ময়কর। এবারে তারা লক্ষপতি মা ফিনের একমাত্র পুত্রকে আটকে রেখে, অতি আশ্চর্য উপায়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা মা ফিনের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে! পুলিস আজও তদন্ত করে কিছুই করতে পারেনি। বর্মার গভর্নমেন্টের এ ব্যাপারে আরও সজাগ ও তৎপর হওয়া কর্তব্য বলেই আমরা মনে করি।

সুব্রত বললে, আমার মনে হয় এ নিশ্চয়ই সেই কালো ভ্রমর। নীতীশ, তোর কি মনে হয়?

কি জানি ভাই! কিছুই যেন আমি ভাল করে বুঝে উঠতে পারছি না। সবই যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে! তবে—

এর মধ্যে আর কোন 'তবে' নেই নীতীশ। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে যতদূর মনে হয়, আমাদের পত্রপ্রেরক আর কেউ নয়, এ সেই দুর্ধর্ষ 'কালো ভ্রমর'ই। এবং তাই যদি হয় তো এ অবস্থায় আমাদের রীতিমত সাবধানই হতে হবে গোড়া থেকে।

সেই রাত্রে সাড়ে-এগারোটায় ডাউন পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারের প্রতীক্ষায় সুব্রত নীতীশের সঙ্গে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে গত একটা দিনের কথাই ভাবছিল। যাত্রার প্রারম্ভেই এই বিপৎপাতে সুব্রতকে যেন বেশ একটু চিন্তিতই করে ফেলেছে তা মুখে যা বলুক না কেন সে!

'ইউনিভার্সিটি-সার্টিফিকেট', এখানকার সুপারিনটেনডেন্টের দেওয়া পরিচয়পত্র, সেই ছোটবেলাকার লেখা পরিচয়-পত্রসমেত সেই ফটো প্রভৃতি যে যে জিনিস সেখানকার অ্যাটর্নী অফিসে সম্পত্তি দাবি করবার সময় দরকার হবে, সেসব একটা সুটকেসে বেশ ভাল করেই গুছিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নীতীশই বলেছিল, এই সব কাগজগুলোই এখন সব চাইতে আমাদের বেশী প্রয়োজনীয়। কেননা, সেখানে তো চাক্ষুষ কেউ আমাদের চেনে না ; এই সব নিদর্শন দিয়েই আমাদের সেখানে পরিচয় দিয়ে সম্পত্তির দাবি জানাতে হবে।

অতএব জিনিসগুলো সুব্রত সাবধানে গুছিয়ে নিয়েছিল।

সুব্রতকে যখন মিশনে রেখে যাওয়া হয়, সেই সময় ফটো তুলে ফটোর পিছনে তার মামা, তার পিতৃ ও মাতৃ-পরিচয় নিজ হাতে লিখে মিশনের কর্তাকে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং বলে গিয়েছিলেন, তার মামার পরিচয়টুকু বাদে (যেটা উনি সময়মত নিজেই তাঁর ভাগ্নেকে দেবেন বলেছিলেন) ওই ফটোটা তাকে দিতে। সুব্রত ভাবছিল, এতকাল পরে ফটো ও পরিচয়পত্র থেকে নিজের সত্যিকারের পরিচযটা জানতে পেরেছে সে। কিন্তু একটা ব্যাপার সে বুঝতে পারছিল না, তার মামার ব্যাপারটা জানবার পর থেকে তার মামা তার সঙ্গে এরকম বিচিত্র ব্যবহার করলেন কেন? কেনই বা অমন বিচিত্র উইল করে গেলেন? যা হোক, যথাসময়ে সে-রাত্রে ট্রেন এসে দাঁড়াল স্টেশনে।

একটা বেশ খালি কামরা বেছে নিয়ে উঠে পড়ল ওরা দুজনে।

নিষুতি রাত্রি।

ট্রেন তখন মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে হু-হু করে চলেছে। কুয়াশার আবরণ ভেদ করে অস্বচ্ছ পাণ্ডুর চাঁদের আলো চলন্ত ট্রেনের দুপাশের প্রান্তরে যেন অলসভাবে গা এলিয়ে পড়ে আছে।

ঘুমন্ত ক্লান্ত পৃথিবী। মানুষের সঙ্গে যেন এই পৃথিবীর কোন পরিচয় নেই। সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা। এর মাটিতে বন্ধন নেই। একাকী এখানে ঘর বাঁধা চলে না। রিক্ত বৈরাগী।...

হাওড়ায় ট্রেন পৌঁছবে সেই ভোর ছটায়। অতএব দীর্ঘ টানা একটা নিদ্রা দেবার মত প্রচুর সময় হাতে।

পাশাপাশি দুটো বেঞ্চে দুটো বেডিং বিছিয়ে ভারী কম্বলে গলা পর্যন্ত ঢেকে সুব্রত আর নীতীশ শুয়ে পড়ল।

গাড়ির আলোটার চারপাশে কয়েকটা পোকা পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছিল, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সুব্রত ভাবছিল, তাদের এই অদ্ভুত অভিযানের কথাই। এই বিস্ময়কর নিরুদ্দেশ যাত্রার রোমাঞ্চ যেন তার সমগ্র মনে অদ্ভুত উত্তেজনা এনেছে। একটা উগ্র নেশার মতই তার দেহ ও মনকে যেন কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে নেশাটা।

কোথায় এই বাংলা দেশ! আর কোথায়ই বা সেই মগের দেশ—বর্মা মুলুক? চলমান গাড়ির দোলায় আর রেল লাইনের গায়ে ভারী লোহার চাকার অবিশ্রাম ঘর্ষণে একঘেয়ে একটানা ক্লান্তিকর ঘটাং ঘটাং শব্দে, কখন এক সময় সুব্রতর দু-চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসে।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিল তাও জানে না, হঠাৎ গলার উপর একটা অস্বস্তিকর চাপ অনুভব করে ঘুমের মাঝেই যেন ওর নিঃশ্বাসটা আটকে আসতে চায়। উঃ, যেন লোহার একটা সাঁড়াশি নিয়ে ওর গলাকে প্রাণপণে কেউ চেপে ধরেছে। কোনমতে ও যন্ত্রণায়

অতিকষ্টে চোখ দুটো সামান্য একটু মেলে চাইতেই দেখলে একটা কালো মুখোশ-আঁটা মুখ ওর দেহের উপর ঝুঁকে পড়েছে। আক্রমণকারীর হাত দুটো ওর গলার ওপরে চেপে বসেছে সজোরে। এবং তাইতেই ওর এই অবস্থা—এই শ্বাসকষ্ট।

একটা গরম নিঃশ্বাসের হল্‌কা যেন ওর নাকে, চোখে, মুখে এসে আগুন ছড়াচ্ছে। ঘুমের ঘোরে এমনি অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে সুব্রত প্রথমটায় সত্যই অত্যন্ত হক্‌চকিয়ে গিয়েছিল এবং বিব্রতও হয়েছিল যথেষ্ট। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি সুব্রতর চিরকালই খুব প্রখর। তাই বিব্রত হলেও, সে খুব অল্পক্ষণের জন্যই। পরমুহূর্তেই সহসা বাঁ পা দিয়ে আক্রমণকারীর তলপেটে প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি বসিয়ে দিল। গ্যাঁক্ করে একটা শব্দ করে আক্রমণকারী ছিট্‌কে গিয়ে ওপাশের ল্যাট্রিনের দরজাটার ওপর পড়ল আছড়ে।

এদিকে ট্রেনের গতিটা তখন ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসছে। বোধ হয় গাড়ি কোন স্টেশনে এল।

সুব্রত যখন নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে উঠতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে মুখোশধারী আততায়ী চক্ষের নিমেষে গাড়ির দরজাটা টান দিয়ে খুলে ফেলে, এক লাফে বাইরে পড়ে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুব্রত ছুটে খোলা দরজার কাছে এগিয়ে পাদানিতে পা দিল, কিন্তু গাঢ় আঁধারে দৃষ্টি চলে না। সামনের বন-জঙ্গল হতে ঝিঁঝির একঘেয়ে ঝিঁ ঝিঁ শব্দটা শুধু রাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতাকে যেন বিষণ্ণ করে তুলেছে। সুব্রত নামতে গেল, কিন্তু ঠিক সেই সময় হুইসল্ বাজিয়ে গাড়িটা আবার চলতে আরম্ভ করল।

অনন্যোপায় সুব্রত আবার গাড়িতে উঠে গাড়ির দরজা ভাল করে ভিতর হতে 'লক্' করে দিল। মাথাটার মধ্যে তখনও কেমন ঝিমঝিম করছে।

।। ৩ ।।
কালো ভ্রমরের দু নম্বর চিঠি

লাইন ক্লিয়ার না পাওয়ার জন্যই বোধ হয় গাড়িটা মাঝপথে কোথাও থেমেছিল, কোন স্টেশন নয়। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুব্রত দেখলে, রাত্রি তখন প্রায় আড়াইটে।

নীতীশ কিন্তু এতখানি যে ব্যাপার ঘটে গেল এসবের কিছুই টের পায়নি। কম্বলে আপাদমস্তক ঢেকে দিব্যি আরামে সে ঘুমোচ্ছে তখনও।

সুব্রত এগিয়ে এসে নীতীশের গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগল, নীতীশ, এই নীতীশ!

অ্যাঁ! বলে নীতীশ ধড়মড় করে উঠে বসল।

উঃ, কি ঘুম তোর রে বাবা! একেবারে কুম্ভকর্ণের সেকেন্ড এডিশন!

ঘুম-জড়িত চোখের দৃষ্টি কোনমতে খুলে নীতীশ বললে, কী, ব্যাপার কি? ডাকাত পড়েছে নাকি? না ভূমিকম্প?

সহসা অনেকদিন আগেকার নীতীশের একটা কথা মনে পড়ায় ঐ সময় সুব্রত হেসে ফেলল।

অনেকদিন আগেকার কথা। স্কুলে পড়বার সময় একবার গভীর রাত্রে হঠাৎ ভূমিকম্প আরম্ভ হওয়ায় কে একজন নীতীশকে ঠেলে তুলেছিল এবং আর একবার

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর, পাড়ায় কোন এক বাড়িতে ডাকাত পড়ায়, নীতীশের মা ছেলেকে বহু কষ্টে ঠেলেঠুলে জাগান। সেই থেকেই নীতীশকে ঘুম থেকে কেউ ঠেলে তুললেই ঐ 'ডাকাত' ও 'ভূমিকম্প' কথা দুটি সর্বাগ্রে তার মনে পড়ে।

হ্যাঁ, ডাকাত। সুব্রত স্মিতভাবে বলে।

অ্যাঁ, কই? কোথায়? নীতীশের ঘুমের ঘোরটা তখনও ভাল করে কাটেনি।

এই গাড়ির কামরায়। বলে সুব্রত হেসে ফেললে।

কই?

কে একজন এসে আমার গলা টিপে ধরেছিল। সুব্রত বললে।

কে? নীতীশের ঘুমের ঘোরটা এতক্ষণে কেটেছে।

তা তো জানি না; লোকটার মুখে একটা মুখোশ ছিল।

মুখোশ পরা ছিল! বলিস কি?

হ্যাঁ।

কিন্তু লোকটা গেল কোথায়?

গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পালিয়েছে। লাইন না ক্লিয়ার পাওয়ার জন্য বোধ হয় গাড়ি একটু থেমেছিল, সেই ফাঁকে লোকটা তার মামার বাড়িতে পগারপার দিয়েছে! মৃদু হেসে সুব্রত বলে।

ধরতে পারলি না?

না।

একটু চিন্তা করে নীতীশ বললে, ব্যাপারটা যেন ক্রমেই কেমন জটিল হয়ে উঠছে, না! সত্যি ভাই, আমার মোটেই এসব ভাল ঠেকছে না যেন।

কেন বল তো? সুব্রত প্রশ্ন করে।

তুই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবি না, কিন্তু আমার মনে হয় এ নিশ্চয়ই কালো ভ্রমরেরই কাজ।

চমকে ওঠে যেন সুব্রত, কি বললি, কালো ভ্রমর?

হ্যাঁ—

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখলেই বোঝা যায়।

আচ্ছা. এক কাজ করলে হয় না?

কি?

সুব্রত বললে, পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে গার্ডকে ইনফরম করলে কি রকম হয়?

পাগল! গার্ড কি করবে? লোকটার মুখে মুখোশ ছিল বললি! কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কি জানিস?

কি?

আততায়ী যেই হোক, এটা ঠিকই যে শীঘ্রই আবার হয়তো তার দেখা আমরা পাব, কিন্তু এবার যাতে সে আমাদের চোখে আর ধুলো দিয়ে পালাতে না পারে, তার জন্য আগে হতেই বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে—আমাদের শত্রুপক্ষ যখন সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে!

তাহলে তুই স্থিরনিশ্চিত যে এ কালো ভ্রমরেরই লোক?

নিশ্চয়ই।

এর পর দুজনের আর কারও চোখেই ঘুম এল না, সম্ভব-অসম্ভব নানা আলোচনায় ট্রেনে বাকী রাতটুকু দুই বন্ধুতে বসে বসেই কাটিয়ে দিল। এবং পরের দিন প্রত্যুষে হাওড়া স্টেশনে গাড়ি থামতেই সুব্রত ও নীতীশ একখানা ট্যাক্সি করে নীতীশের পূর্ব পরামর্শমত হোটেল প্যালেসের দিকেই রওনা হল।

হোটেল প্যালেস চিত্তরঞ্জন এভেন্যু কলুটোলার মোড়ে। আগে হতেই ওরা স্থির করে রেখেছিল, ঐ হোটেলেই ওরা উঠবে। কেননা ইতিপূর্বে আরও দু-চারবার কলকাতায় এসে নীতীশ ঐ হোটেলেই উঠেছিল। এখানকার ব্যবস্থাপত্রও নাকি বেশ ভালই। ম্যানেজার ক্ষিতীশবাবুও অত্যন্ত অমায়িক লোক ; বয়স খুব বেশী নয় এবং বেশ শিক্ষিত। হোটেলের চার্জও মডারেট।

ট্যাক্সি হাওড়া ব্রীজের ওপরে এসে উঠল। অত ভোরে পথিকের আনাগোনা বা যানবাহনের ভিড় তত নেই। উন্মুক্ত গঙ্গা-বক্ষ হতে সুশীতল প্রভাতী হাওয়া জাগরণক্লান্ত চোখেমুখে যেন একটা স্নিগ্ধ জলকরসিক্ত প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল। গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে পুণ্যলোভাতুর স্নানার্থীদের ভিড় এর মধ্যেই বেশ দেখা যায়। হোটেলের সামনে এসে ওদের ট্যাক্সি থামল। ক্ষিতীশবাবু নীচে অফিসঘরেই ছিলেন। ওদের সাদর আহ্বান জানালেন, আসুন! আসুন!

হোটেলের চারতলায়, রাস্তার দিকেই বেশ একটা ছোট ডবল-সীটের ঘর খালি পাওয়া গেল। এবং সেই ঘরেই ওদের থাকবার ব্যবস্থা হল। সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, স্নান ও প্রাতঃরাশ সেরে, উভয় বন্ধু তখুনি পরবর্তী জাহাজে যাতে সীট পাওয়া যায়, তার জন্য বুকিং অফিসের দিকে বেরিয়ে পড়ল। বুকিং অফিসে গিয়ে জানল— আগামী বৃহস্পতিবার দিন জাহাজ একটা ছাড়বে। তখন যদিও সব সীটই প্রায় রিজার্ভ হয়ে গেছে, অতিকষ্টে বলা-কওয়া ও বেশ মোটারকম কিছু দক্ষিণা দেওয়ার পর সেকেন্ড ক্লাসে দুটো বার্থ পাওয়া গেল।

বার্থ রিজার্ভ করে ওরা বুকিং অফিস হতে যখন বের হয়ে এল সন্ধ্যার তখন অল্পই বাকী। পৃথিবীর আলো নিভু-নিভু।

কর্মমুখর কলকাতা শহরের বুকে এখানে ওখানে দু-একটা করে আলো সবে জ্বলতে শুরু হয়েছে। হোটেলের সিঁড়িতেই ম্যানেজার ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে দেখা, তিনি বললেন, এই যে, আপনারা এই ফিরছেন বুঝি? আপনারা বেরুবার অল্প পরেই একটি ছোকরা সুব্রতবাবুর নামে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। বললে, বিশেষ নাকি প্রয়োজনীয়।

কই দেখি চিঠিটা! বিস্মিত সুব্রত ম্যানেজার ক্ষিতীশবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

এই যে আমার পকেটেই রয়েছে। নিন। বলে পকেট থেকে একটা খাম বের করে ক্ষিতীশবাবু সুব্রতর হাতে দিলেন।

আশ্চর্য! ডাকে না পাঠিয়ে হাতে আবার কে চিঠি পাঠালে? চেনাশুনা লোক কে এখানে তার আছে? এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা সিঁড়ির আলোর নীচে গিয়ে খুলে ধরতেই—ওর চোখের মণি দুটো যেন সহসা স্থির হয়ে গেল।

চিঠিটা লিখেছে সেই কালো ভ্রমর। আর তার এটা দু নম্বর চিঠি।

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠিটা, কিন্তু প্রতি ছত্রে যেন ফুটে উঠেছে একটা অসাধারণ আত্মম্ভরিতা। কালো ভ্রমর লোকটা যেই হোক, সে যে দুর্জয় সাহসী এবং ছায়ার মতই তাদের সে অনুসরণ করে ফিরছে, সে বিষয়েও আর সন্দেহের কিছুমাত্র নেই। কোথায় কখন তারা যাচ্ছে, তাদের প্রতিটি কাজ ও গতিবিধির ওপরে তার শ্যেনদৃষ্টি সর্বদা রয়েছে। এবং সহজে যে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে তাও নয়। প্রথম হতেই যেভাবে সে ওদের পিছনে লেগেছে, তাতে করে প্রতি মুহূর্তেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা। এবং তার জন্য তাদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। সুব্রত বেশ চিন্তিতই হয়ে ওঠে।

॥ ৪ ॥
গভীর নিশীথে

চিন্তান্বিত সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে নীতীশ বলল, ব্যাপার কি রে সুব্রত? কার চিঠি রে?

নীতীশের কথার উত্তরে সুব্রত একটিও কথা না বলে নিঃশব্দে শুধু খোলা চিঠিটা নীতীশের দিকে এগিয়ে দিল। চিঠিটা হাতে নিয়ে নীতীশ আলোর সামনে সেটা মেলে ধরতেই চমকে ওঠে, এও সেই রকম হলুদ রংয়ের একখানি কাগজ, কাগজের একপাশে একটা ভ্রমর আঁকা এবং সেই ভ্রমরের একটা পাখায় তীক্ষ্ণ ছোরা বিদ্ধ। পত্রে লেখা রয়েছে—

সুব্রতবাবু, বার বার বলছি, এখনও সাবধান হও। এখনও ভাল চাও তো সম্পত্তির দুরাশা ত্যাগ কর। হিংস্র কেউটে সাপের গর্তের দিকে তুমি এগিয়ে চলেছ। ...কেন বেঘোরে প্রাণ দেবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

'কালো ভ্রমর'

চিঠিটা পড়া শেষ হলে সেটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে নীতীশ সুব্রতকে বললে, চল ওপরে যাওয়া যাক।

সুব্রত আনমনে খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। নীতীশের ডাকে হঠাৎ চমকে উঠে বললে, চল্।

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় নিজেদের নির্দিষ্ট ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দুই বন্ধু দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

ঘরের আলোটা জ্বালা হয়নি। খোলা জানালাটা দিয়ে ফুর-ফুর করে শীতের হাওয়া এসে জানালার পর্দাটাকে দোলাচ্ছে। নীচের কর্মমুখর শহরের রকমারি শব্দ এসে কানে বাজে। এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

কে?

চা এনেছি।

দরজার পাশ হতে কে যেন উত্তর দিলে। বোধ হয় হোটেলের কোন ভৃত্য। দরজা না খুলেই নীতীশ জবাব দিল, নিয়ে এস।

সুব্রত চেয়ার হতে উঠে নীতীশকে বললে, তুই বোস্। আমি স্নানটা সেরে আসি।

বেয়ারা এসে চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলে স্নান করার পর, শরীরটা বেশ ঝরঝরে মনে হতে

লাগল। চা-পান করতে করতে সুব্রত বললে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে নীতীশ, বসু অ্যান্ড চৌধুরী কোম্পানীকে এখনও তার করে দেওয়া হয়নি যে আমরা তাদের চিঠি পেয়েছি। কাল ভোরে উঠেই সর্বাগ্রে তাদের একটা তার করে দিতে হবে যে, আমি তাদের চিঠি পেয়েছি এবং পরের মেলেই রওনা হচ্ছি, জাহাজঘাটে যেন লোক থাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের থাকবার জন্যও যেন কোন একটা ভাল হোটেলে দুটো সীট্ওয়ালা একটা ঘর ঠিক করে রাখে।

নীতীশও তাতে সায় দিল।

যা হোক, সে রাত্রে দরজা বেশ ভালভাবে এঁটে রাস্তার ধারের ব্যাল্কনির দিকের জানালাটা শুধু খুলে রেখে দু বন্ধুতে আহারাদির পর শুয়ে পড়ল। সুব্রতর অনেক কথাই মনে পড়ে। গল্পে-উপন্যাসে এ ধরনের সম্পত্তি-প্রাপ্তির কথা সুব্রত অনেক পড়েছে। কিন্তু সেই সব গল্প-উপন্যাস যে তার জীবনে কোনদিন এমনি করে সত্য হয়ে ধরা দেবে, তা স্বপ্নেও কোনদিন সে ভাবেনি। কি বিচিত্র এই মানুষের জীবন! উপন্যাসের গল্পকেও মাঝে মাঝে হার মানায়। আশ্চর্য!

শীতের রাত্রি ক্রমে ক্রমে গভীর হয়ে নিঝুম হয়ে আসছে। কর্মব্যস্ত শহরের গোলমালও ক্রমশ মৃদু হয়ে এল। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা টুকরো টুকরো আওয়াজ শোনা যায়। শীতার্ত রজনীর চোখে যেন ঘুমের ঢুলুনি নেমে আসছে ধীরে ধীরে। পৃথিবী এবারে ঘুমোবে। কিন্তু সুব্রতর চোখে যেন কিছুতেই ঘুম আসছে না।

সহসা কিসের যেন একটা মৃদু খসখস্ আওয়াজে সুব্রত চমকে ওঠে। চোখ মেলে অন্ধকার ঘরটার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। মনে হয় কোথায় যেন রাত্রির আঁধারে কিসের একটা চাপা আশঙ্কা ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছে। ও আরও ভাল করে দু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে নিঃশব্দে চেয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল। শ্রবণেন্দ্রিয় প্রখর ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

ঘরের স্বল্প আলো-আঁধারি চোখে ততক্ষণে বেশ সয়ে এসেছে।

সহসা আবছা আলোয় ওদিককার ঝোলানো বারান্দাটার দিকে খোলা দরজাটার ওপর নজর পড়তেই সুব্রতর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল।

একটা লোমশ মোটা হাত নিঃশব্দে ঘরের সাদা দেওয়ালের গায়ে গায়ে, ক্লেদাক্ত কৃষ্ণবর্ণ একটা সাপের মতই যেন লতিয়ে লতিয়ে এগিয়ে আসছে।

মুহূর্তের মধ্যে সুব্রতর সকল বোধশক্তি যেন সজাগ হয়ে ওঠে। নিঃশ্বাস রোধ করে ও সেই দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাত্রির আঁধারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুব্রত একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখছে না তো? কলকাতা শহরে, উঁচু চারতলা হোটেলের বন্ধ ঘরে তারা নিশ্চিত আরামে শুয়ে রয়েছে, তার মধ্যে এসব কি? সুব্রত ভাবলে, নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখছে! না, এতে কোন ভুলই নেই। সুব্রত দুই হাতের চেটো দিয়ে বেশ ভাল করে চোখ দুটো রগড়ে নিল। না, স্বপ্ন তো নয়! এই তো সেই সুব্রত রায়—দিব্যি চোখ চেয়ে—তবে?

ও দেখতে লাগল—ধীরে ধীরে সেই ভীষণ-দর্শন কুৎসিত ক্লেদাক্ত হাতখানি সর্পিল গতিতে আরও এগিয়ে এসেছে। তারপর হাত শেষ হয়ে এল। একটা মুখোশ-আঁটা ভয়ঙ্কর

কুৎসিত মুখ। মুখের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড এক ছায়ামূর্তি। অন্ধকারের বুকে এ বুঝি কোন প্রেতলোকবাসীর বুভুক্ষিত আত্মার ছায়া-বিভীষিকা জাগিয়ে তুলতে চায়! ছায়ামূর্তি সেই ঘরের মৃদু আলোছায়ায় নিঃশব্দে যেন দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে কাছে—আরও কাছে! দানবের মতই ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত—আর বুঝি রক্ষা নেই!

সুব্রত এতক্ষণ যেন কতকটা মোহাচ্ছন্নের মতই অবশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু অতি শিশুকাল হতেই 'জুজুবুড়ি' বা ভূতের ভয় কোনদিনই তাকে বিচলিত করতে পারেনি। শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী নিয়মিত ব্যায়ামের দ্বারা যেমন অমিতশক্তিশালী করে তুলেছিল, তেমনি ওর মন ছিল সতেজ ও ভয়শূন্য। ভয় পেয়ে ভীত-চকিত পদে না পিছিয়ে সেই ভয়ের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে ভয়ের আসল সত্যটুকু জানতে চেষ্টা করত চিরকাল। ছোটবেলা হতেই বরাবর সে কল্পিত ভয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়কে চিরদিনের জন্য জয় করেছে। তাই সে চক্ষের নিমেষেই শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে এক লাফ দিয়ে তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইজনে হুড়মুড় করে অন্ধকার ঘরের এক কোণে গিয়ে ছিটকে পড়ল। ছায়ামূর্তিটা প্রথমে একটুখানি সময়ের জন্য সত্যই হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই লোকটা অতি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দু হাত তলপেটের দিকে টেনে জুজুৎসুর প্যাঁচে সাপের মত পিছলিয়ে গিয়ে সুব্রতর দৃঢ় সবল বন্ধনী হতে আপনাকে মুক্ত করে নিল এবং চক্ষের নিমেষেই সুব্রতকে প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছিটকে ফেলে ঝুলানো বারান্দার দিকে ছুটে একটা দুঃস্বপ্নের মতই যেন চকিতে মিলিয়ে গেল। ঘটনার ক্ষিপ্রতায় সুব্রতও কম হকচকিয়ে যায়নি। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে অন্ধকারে সামনে হাত বাড়িয়ে শক্তমত কি একটা জিনিস, যেটা হাতের কাছে পেল, নিমেষে ক্ষিপ্রগতিতে সেটা তুলে নিয়ে দ্রুত পলায়মান ছায়ামূর্তিটার দিকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করল। সেই ভারী জিনিসটা ছিল একখানা হালকা ধরনের ছোট কাঠের টুল। দরজার কাঁচের শার্সির উপর গিয়ে কাঠের টুলটা আছড়ে পড়তেই জমাটবাঁধা আঁধার ও নিঃশব্দতাটাকে আলোড়িত করে একটা প্রবল কাঁচভাঙার আওয়াজ ঝনঝন করে চারিদিক প্রকম্পিত করে তুলল। একটা প্রচণ্ড শব্দের ঢেউ যেন প্রবল গর্জনে ঘরের চতুষ্পার্শ্বস্থ কঠিন দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে একটা শব্দভীতি জাগিয়ে তুললে। সমগ্র ঘটনাটি ঘটে গেল চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই—যেমন আকস্মিক, তেমনি দ্রুতলয়ে। আর সেই ক্রমবিলীয়মান শব্দতরঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে হতভম্ব হয়ে স্থাণুর মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সুব্রত।

॥ ৫ ॥
মৃত্যু-কবলে

এদিকে সেই কাঁচের দরজা ভাঙার প্রবল শব্দে নীতীশ ধড়মড় করে ততক্ষণে শয্যার উপর উঠে বসেছে।

অ্যাঁ! ভূমিকম্প হল নাকি?

ওদিকে ততক্ষণে ছায়ামূর্তির অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রত ছুটে এসে ঝুলানো বারান্দায় দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার ঢের আগেই সেই নিশীথ রাতের অচেনা আগন্তুক

অন্ধকারে ছায়ার মতই যেন মিলিয়ে গেছে। কর্মক্লান্ত পৃথিবী শীতের আবছা কুয়াশার তলে মড়ার মতই নেতিয়ে পড়ে আছে। আশেপাশে যতদূর দৃষ্টি চলে—কোথাও একটু আগে যে ভীষণ ছায়ামূর্তি ওদের ঘরে এসে হানা দিয়েছিল, তার এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সবটা যেন রাত্রির আঁধারে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন—হাওয়ার মতই মুহূর্তের জন্য জেগে উঠে আবার হাওয়ার বুকেই মিলিয়ে গেছে নিমেষে।

সুব্রত দেখল, পাশের ঘরের ঝুলানো বারান্দাটা সুব্রতদের ঝুলানো বারান্দা থেকে মাত্র হাত দুয়েকের তফাৎ—অনায়াসেই এ বারান্দা থেকে অন্যটায় লাফিয়ে যাওয়া যায়।

সুব্রতকে ঝুলানো বারান্দাটার দিকে ছুটে যেতে দেখে নীতীশ তাড়াতাড়ি শয্যা হতে উঠে সুব্রতর পাশে এসে দাঁড়াল, ব্যাপার কি রে সুব্রত?

নীতীশের দিকে না তাকিয়েই চাপা উত্তেজিত স্বরে সুব্রত কেবল বললে, এবারেও আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাল নীতীশ!...ধরেও ধরতে পারলাম না! সামান্যর জন্য ফসকে গেল, উঃ!

পালাল! কে পালাল? বিস্মিত কণ্ঠে নীতীশ সুব্রতকে প্রশ্ন করে। ব্যাপারটা তখনও সে কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি।

নিষ্ফল আক্রোশে হাতের বদ্ধ মুষ্টিটা ঠক-ঠক করে বারান্দার লোহার রেলিং-এর উপর ঠুকতে ঠুকতে সুব্রত বললে, জানি না, তবে যতদূর মনে হচ্ছে, সেদিন ট্রেনে যে মহাত্মা অজান্তে এসে আমার গলা টিপে ধরেছিল, বোধহয় সেই মহাপ্রভুই।

অ্যাঁ! বলে নীতীশ রীতিমত আঁতকে উঠল।

হ্যাঁ। এবার সে এই ঝুলানো বারান্দা থেকে লাফিয়ে উধাও হয়েছে। উঃ, বড্ড ফসকে গেল! না হলে—, সত্যি সুব্রতর এই আফসোস যেন মিটবার নয়!

নীতীশ বোকার মতই বলে, ঐ বারান্দা থেকে লাফিয়ে? কি বলছিস মাথামুণ্ডু! আর তাই যদি হয়, কিন্তু ওখান দিয়ে কোথায় পালাবে? ওখান দিয়ে যেতে হলে তো একমাত্র এই বারান্দার সংলগ্ন আমাদের পাশের ঘরেই যেতে হয়। চল না হয়, একবার পাশের ঘরটা খোঁজ করে দেখি। পালাবে কোথায় বাছাধন! এ তো ট্রেন নয়!

ঠিক বলেছিস, চল। সুব্রত বলে ওঠে।

এদিকে ততক্ষণে কাঁচভাঙার প্রবল আওয়াজে হোটেলের চারতলায় সুব্রতদের ঘরের আশেপাশের ঘরেরও দু-চারজনের ঘুম ভেঙে গেছে। তারা যার যার ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, কি ব্যাপার কি মশাই? এত রাত্রে কিসের গোলমাল?

ম্যানেজার ক্ষিতীশবাবুও চারতলার কোণার দিকের একটা ঘরে থাকেন। গোলমাল শুনে তাঁর ঘুমও ভেঙে গেছে ততক্ষণে। তিনিও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্যান্য কৌতূহলীর সঙ্গে কেবলমাত্র সুব্রত লক্ষ্য করে দেখলে তার পাশের ঘরের দরজাটি তখনও বন্ধ।

আপাতত কৌতূহলীদের সামান্যমাত্র কৌতূহল মিটানোর জন্য সুব্রত সবটুকু খুলে না বলে, কিছু কিছু ম্যানেজারবাবুকে বললে। এবং লোকটা যে খুব সম্ভব পাশের ঘরেই আত্মগোপন করা ছাড়াও আর কোথাও যেতে পারে না, তাও বললে।

ম্যানেজার সকল কথা শুনে অত্যন্ত চিন্তিতভাবে বললেন, তাই তো! কিন্তু তা কি

করে সম্ভব হতে পারে সুব্রতবাবু? আপনার যাওয়ার ঠিক ঘণ্টাচারেক বাদেই একজন বৃদ্ধ পেনসনপ্রাপ্ত ভদ্রলোক এসে আপনাদের ঐ পাশের ঘরটি ভাড়া নিয়েছেন--সাত দিনের জন্য।

নীতীশ বললে, ব্যাপারটার মধ্যে মিথ্যা বা তৈরী করা কিছুই নেই মিস্টার ঘোষ। আর তাছাড়া ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে পড়ে একমাত্র পাশের ঘরে আত্মগোপন করা ছাড়া আর কোথায়ই বা এই হোটেলের চারতলার উপর থেকে লোকটা পালাতে পারে বলুন? নিশ্চয়ই চারতলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়েনি! কথাটা আপনিও একবার ভাল করে ভেবে দেখুন না!

কি জানি মশাই! চারতলার উপরে এক ব্যালকনি থেকে অন্য ব্যালকনিতে লাফিয়ে যাওয়াও তো কম দুঃসাহসের ব্যাপার নয়! ভেবে দেখুন একবার, কোনক্রমে পা ফসকালে পড়তে হবে গিয়ে একেবারে নীচে—ফুটপাতের সানের উপরে চারতলা থেকে! তবে আপনারা যখন বলছেনই, চলুন, পাশের ঘরের ভদ্রলোকটিকে একটিবার ডেকেই না হয় জিজ্ঞাসা করা যাক, যদি তিনি কিছু জানেন!

জনতার মধ্যে একজন বললেন, এত কাণ্ড, অথচ পাশের ঘরের ভদ্রলোকটি জাগেননি দেখছি, কুম্ভকর্ণের ঘুম নাকি রে বাবা!

নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিস্টার ঘোষ পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আরও দু-একবার একটু জোরে ধাক্কা দিতেই, ভিতর থেকে ঘুমজড়িত ভারী গলায় প্রশ্ন হল, কে?

দয়া করে দরজাটা একবার খুলবেন কি মশাই?

দাঁড়ান খুলছি। ভিতর থেকে জবাব এল এবং তার একটু পরেই ঘরের মধ্যে খট করে সুইচ টেপার শব্দ এল ও পরমুহূর্তেই বন্ধ দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। সৌম্য প্রশান্ত তাঁর চেহারা, একমুখ সাদা ধবধবে দাড়ি। এতগুলো লোককে এত রাত্রে তাঁর দরজার কাছে দেখে তিনি যেন প্রথমটা বেশ চমকেই গেলেন, তারপর বললেন, কি ব্যাপার মশাই? এত রাতে এত লোকের ভিড় কেন? কোন বিপদ-আপদ?

ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাবে কেউ কোন কথা বললেন না, ম্যানেজার ক্ষিতীশবাবুই তখন এগিয়ে এসে যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বৃদ্ধের গোচরীভূত করলেন।

ম্যানেজারবাবুর মুখে সব কথা শুনে ভদ্রলোক যেন কৌতুকভরে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। কি প্রাণখোলা শিশুর মত নির্মল প্রশান্ত হাসিটুকু!

স্নিগ্ধ-স্বরে ভদ্রলোক সুব্রত ও নীতীশের দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, ছেলেমানুষ তোমরা, নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে কিছু স্বপ্ন-টপ্ন দেখে থাকবে। নইলে এত রাত্রে চারতলা হোটেলের উপর চোর!...যাও বাবা, বেশ করে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করো গে!

সত্যই সুব্রত ও নীতীশ ঐ কথা শুনে লজ্জায় যেন একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর তিনি যখন এক ব্যালকনি থেকে আর এক ব্যালকনিতে লাফিয়ে পালাবার কথা শুনলেন, তখন বললেন, কার এমন বুকের পাটা আছে বাবা, যে এ সব দুঃসাহসিক কাজ করবে? প্রাণের ভয় কি তার নেই? তবে তো আমাকেই তোমাদের সেই লোক

সাজতে হয়।...আর যদি তোমাদের বিশ্বাস না-ই হয়, তোমরাও না হয় ভাল করে আমার ঘরের ভিতরটা একবার খুঁজে দেখে যাও। কথাগুলো বলে ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

এর পর আর কোন যুক্তি-তর্কই চলে না। কিন্তু তবু যেন সুব্রতর মনের খট্‌কাটা গেল না। অগত্যা তখন দুই বন্ধু ঘরে এসে ঢুকল।

ঘরে ঢুকে নীতীশ বললে, তোর কোন ভুল হয়নি তো সুব্রত?

ভুল যে আমার হয়নি, তার প্রমাণ ঐ দেখ্। বলে সে মেঝেতে কি যেন আঙুল তুলে দেখালে বন্ধু নীতীশকে।

ঘরের সুতীব্র বৈদ্যুতিক আলোয়, সুব্রতর নির্দেশমত মেঝের দিকে তাকিয়ে নীতীশ চমকে উঠল। মেঝেতে পড়ে আছে একটা মুখোশ।

নীতীশ বললে, তাই তো, এ যে একটা মুখোশ দেখছি রে! এটা আবার এল কোথা থেকে এ ঘরে?

এখন বুঝলে তো, মাথাও আমার গরম হয়নি এবং স্বপ্নও আমি দেখিনি! কিন্তু যাই বল নীতীশ, একটা লোক এতগুলো লোককে দিব্যি বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিলে!...হুঁ, লোকটার বাহাদুরি আছে বটে!

তুই কার কথা বলছিস সুব্রত?

কারও কথাই নয়। রাত অনেক হয়েছে, চল শোয়া যাক। কাল আবার অনেক কাজ আছে।

ভারী কম্বলটা গায়ের উপর চাপা দিতে দিতে সুব্রত বললে, হুঁ, লোকটার দুর্জয় সাহস আছে বলতেই হবে, দিব্যি পাশে পাশে থেকেও আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে যাচ্ছে!

সুব্রতর এ ধরনের কথায় নীতীশ যথেষ্টই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ঘুমে তখন তার চোখ দুটো বুজে আসছে। সে আর বেশী বাক্যব্যয় না করে আপাদমস্তক কম্বলটায় ঢেকে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল এবং শীঘ্রই পরমানন্দে নাকডাকতে শুরু করলে। সুব্রতর কিন্তু চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না।

রাত আর তখন বেশী নেই। সুব্রতর সবে একটু তন্দ্রামত এসেছে, হঠাৎ দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ!

কে? ভিতর থেকে সুব্রত প্রশ্ন করলে।

বাবুজি, হামি দারোয়ান আছে। আপ্‌কো একঠো জরুরী তার হ্যায়। ঘরের ওপাশ হতে জবাব এল ভারী মোটা গলায়।

এত রাত্রে তার? কি জানি কোথা থেকে আবার এল! দেখি।— ভাবতে ভাবতে বেশ একটু আশ্চর্য হয়েই শয্যা হতে উঠে গিয়ে সুব্রত দরজাটা খুলতে কি যেন একটা ভারী বস্তু ওকে চক্ষের নিমেষে চারিদিক থেকে অকস্মাৎ ঢেকে ফেলল।

তারপরই অতি মিষ্টি অথচ উগ্র একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটুকু এতই আকস্মিক এবং এত সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে, সুব্রত সামান্য একটু প্রতিবাদ করবারও সময় পেলে না। আজও ওর স্পষ্ট মনে পড়ে, সে সময়ও সে গলা ছেড়ে নীতীশকে ডাকবার কত চেষ্টাই করলে, কিন্তু গলার সমস্ত স্বরই বুঝি

চিরতরে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে! কত চেষ্টা করলে ও হাত তুলে বাধা দিতে, কিন্তু হাত শিথিল—সব শিথিল।

অমিত শক্তিশালী সুব্রত রায় আজ যেন একমাসের শিশুর চাইতেও দুর্বল অসহায়। চোখ ফেটে ওর জল আসতে চায়। সহসা ওর সমগ্র শরীরটা দুলতে দুলতে শূন্যের দিকে ঠেলে উঠতে লাগল। কম্বলের তলাতেই ও চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে ফেললে—ভয়ে নয় ক্লান্তিতে।

সেই ঘরের মধ্যে শুয়ে থেকেও নীতীশ কিন্তু এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতে পারলে না। যেমন নিশ্চিন্ত আরামে কম্বলের তলে আপাদমস্তক ঢেকে ঘুমিয়ে ছিল, তেমনি ঘুমিয়েই রইল।

তারপর নীতীশের ঘুম যখন ভাঙল, বেলা তখন প্রায় ছটা বেজে গেছে। ওপাশের ব্যালকনির বন্ধ শার্সির ফাঁকে প্রথম ভোরের আলো ঘরের মাঝে এসে উঁকি দিচ্ছে। হঠাৎ এমন সময় পাশে সুব্রতর শয্যার দিকে নজর পড়তেই ও চমকে উঠল।

পাশের শয্যা খালি—ঘরের দরজাটাও খোলা। তা দেখে ধড়ফড় করে নীতীশ শয্যার উপর উঠে বসে। ব্যাপার কি বুঝতে পারে না ও। ঘরের দরজা খোলা—শয্যা খালি! সুব্রত ঘরে নেই—কোথায় গেল ও? বাথরুমে যায়নি তো? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে এবং প্রথমেই এগিয়ে গিয়ে বাথরুমের দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। বাথরুম খালি, সেখানে কেউ নেই।

নীতীশ যেন অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে—ভারি আশ্চর্য তো, কোথায় গেল সুব্রত! কোথায়ও বেড়াতে যায়নি তো! কিন্তু তাই যদি গিয়ে থাকবে, তাকে না বলেই যাবে কেন? আবার মনে হয় কাগজ আনতে নীচে যায়নি তো?

এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে নীতীশ নীচে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ মেঝের ওপর নীতীশের চোখ পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ও থমকে দাঁড়াল। দেখলে মেঝের ওপর পড়ে আছে ভাঁজকরা একটা চিঠি, চিঠিটার উপরে পেনসিলে ওরই নাম লেখা। তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলতেই ও চমকে উঠল।...এ যে আবার সেই ভোমরা-আঁকা চিঠি! এক নিঃশ্বাসে নীতীশ চিঠিটা তখনই পড়ে ফেলে। পূর্বের মতই সংক্ষিপ্ত চিঠি এবং তাতে লেখা আছে :

ঘরের ছেলে ঘরে যাও। আমাদের কাজ হয়ে গেছে। বন্ধুর জন্য কোন ভয় বা ভাবনা নেই। ঠিক সময়মতই তাকে ছেড়ে দেব। একটা মাস শুধু তাকে আটকে রাখব, তারপরই ছুটি।...

কালো ভ্রমর

চিঠিটা পড়া হয়ে গেলেও সেটা দুই হাতের মাঝে খুলে ধরে নীতীশ অনেকক্ষণ সেখানে একইভাবে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল—বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহস সবই যেন ওর কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছুই আর ও ভাবতে পারে না। তাই তো! এখন তবে উপায়?

কি এখন করা যেতে পারে? কে ওকে এ বিপদে পথ দেখাবে, আর এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কেই বা এমন ওর বন্ধু বা সহায় আছে যে ওকে সাহস দেবে, বুদ্ধি দেবে? কিন্তু যাই হোক, সুব্রতকে যে কালো ভ্রমরের দলের লোকই ওর অজ্ঞাতে ধরে নিয়ে

গেছে, সেটা সম্পর্কে অন্তত নিশ্চিত হওয়া গেল। অথচ কাল সকালের জাহাজে ওদের সীট রিজার্ভ হয়ে গেছে এবং যেমন করেই হোক সেই জাহাজে রওনা হতে না পারলে তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। না না, তা ও কিছুতেই হতে দেবে না। সুব্রতকে কাল জাহাজ ছাড়ার আগে খুঁজে বের করতেই হবে। তা সে যেমন করে, যে ভাবেই হোক—নইলে যে সব পণ্ড হয়ে যাবে। অবিশ্যি সুব্রতকে ওরা প্রাণে মারবে না সেকথা ওরা নিজেরাই জানিয়ে দিয়েছে চিঠিতে। নীতীশ ওর নিজের কথা ভাবলে—আচ্ছা আমি নিজেই বা কেমন! পাশের বিছানা থেকে একটা জলজ্যান্ত ষণ্ডামার্কা ছেলেকে দিব্যি বেমালুম চুরি করে নিয়ে গেল, আর আমি ঘুণাক্ষরেও টের পেলাম না? ছিঃ ছিঃ! কি জঘন্য ঘুম আমার!—নীতীশের নিজের উপরেই নিজের ধিক্কার আসতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা বটে! ঘর তো ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, যারা ওকে চুরি করে নিয়ে গেল, তারা এলই বা কোন্ পথে? সত্যিই ব্যাপারটা যেন আগাগোড়াই ভৌতিক, অবিশ্বাস্য।

নীতীশের একবার মনে হল, আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না—এখনই থানায় গিয়ে একটা খবর দিলে কেমন হয়? কিন্তু আবার মনে হল—তারা তো হেসেই উড়িয়ে দেবে। বলবে, মশাই, নেশা-ভাঙ করেন নাকি? যান যান!—বাড়ি যান!

সত্যিই তো, একথা আবার কেউ বিশ্বাস করে নাকি? বন্ধ ঘরে চারতলার উপর থেকে একটা জলজ্যান্ত মানুষ চুরি? কিন্তু এই চিঠি? এও কি কেউ বিশ্বাস করবে? বলবে, বিংশ শতাব্দীতে এ আবার হয় নাকি? নীতীশের সত্যিই কান্না পেতে লাগল। শেষটায় ও সত্য-সত্যই ছেলেমানুষের মত ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললে।

অনেকক্ষণ ধরে প্রাণভরে কেঁদে কেঁদে নীতীশের মনটা যেন অনেকটা হালকা হল। সে আবার আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা ভাল করে ভাবতে লাগল। উপায় একটা যেমন করে হোক তাকে বের করতেই হবে সুব্রতকে খুঁজে বের করবার জন্য। এখন কথা হচ্ছে, সে উপায়টা কি?...এই এত বড় কলকাতা শহরে কেমন করেই বা একটা লোককে খুঁজে বের করবে? এ তো আর ওদের ছোট বাঁকুড়া শহর নয়!

কিন্তু বৃথাই। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ভেবে নীতীশ ভাবনার কোন কূলকিনারাই দেখতে পেলে না। নাঃ, সত্যি আর ভাবতে পারে না ও। এর পর আরও ভাবলে ও হয়তো পাগল হয়েই যাবে। নীতীশ একান্ত অস্থির-পদে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। কি করবে ও? কোথায় যাবে? কে বলে দেবে সুব্রত কোথায়? কোথায় এই এত বড় কলকাতা শহরে কোন অন্ধকারে অন্ধকূপে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে?

আর ওদিকে সুব্রত!

অনেকক্ষণ পরে সুব্রতর যখন জ্ঞান ফিরে এল, সমস্ত শরীর জুড়ে ওর তখনও একটা অস্বাভাবিক ঘুম-ঘুম ভাব। মাথার সমগ্র শিরা-উপশিরাগুলো যেন শিথিল হয়ে গেছে। দেহের প্রত্যেকটি মাংসপেশীই যেন কেমন শ্লথ হয়ে গেছে। না পারে ও কিছু ভাবতে, না পারে সুস্থ মানুষের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করতে। সমস্ত স্মৃতিজুড়ে যেন একটা বিশ্রী জড়তা। নিদ্রার আবেশে চোখের পাতা দুটি ভারী। সুব্রত আবার চোখ বুজল। এবং কিছুক্ষণ সেই ভাবেই তন্দ্রার ঘোরে পড়ে রইল। প্রায় মিনিট ২০।২৫ বাদে আবার যখন সুব্রত চোখ খুললে, আগের চাইতে তখন যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। চোখের দৃষ্টিটুকু যতখানি সম্ভব প্রখর ও সন্ধানী করে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

কোন পুরাতন বাড়ির ছোট্ট একটি অপরিসর ঘর। ঘরের দেওয়ালের চুনবালি খসে খসে পড়ছে। মেঝের সিমেন্টও ক্ষয়ে ইঁট বের হয়ে আছে অনেক জায়গায়। কতদিনের পুরাতন বাড়ি কে জানে!

ঘরের ভিতর আলো ভাল করে আসতে পারে না। মেঝে থেকে খানিকটা উপরে ছোট্ট একটিমাত্র জানালা, তাতে গোটাচারেক মোটা (লোহারই হবে হয়তো) শিক বসানো। সেখান দিয়েই ঘরে যেটুকু আলো প্রবেশ করছে।

সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে সুব্রত ধীরে ধীরে উঠে বসল। মাথার ধারেই ছোট্ট একটা কাঠের টুলের উপর ময়লা কাঁচের গেলাসে দুধ ও একটা ডিসে কিছু খাবার ঢাকা। সুব্রতর ক্ষিদেটা খুবই পেয়েছিল। তার মধ্যে আবার শরীরের উপর দিয়ে ধকলও তো কম যায়নি! কোনরূপ চিন্তামাত্র না করে হাত বাড়িয়ে দুধের গ্লাসটা টেনে নিয়ে সুব্রত প্রথমেই ঢক্ ঢক করে গেলাসের সবটুকু দুধ খেয়ে নিল। পেটে কিছু পড়বার পর দেহটা যেন বেশ একটু সুস্থ বোধ হতে লাগল।...খাবারগুলো ও ছুঁলও না।

শরীরটা একটু সুস্থ হলে ও উঠে ঘরের দরজাটা ঠেলে দেখলে। এবং দরজাটা ঠেলতেই বুঝলে, সেটা বাইরে থেকে বন্ধ। ঘরের একটি মাত্র দরজা—তাও বন্ধ। চারিদিকে ও ভাল করে চেয়ে দেখলে, ভিতর থেকে সেটা খোলবার উপায় নেই। দু-একটা চাপ দিয়ে ও দরজাটা পরীক্ষা করে দেখলে। না, লোহার পাতের মত শক্ত। সুব্রত খাটের উপর গিয়ে বসল, ভাবতে লাগল কি করা যায় এখন? এই বন্ধ ঘর থেকে কেমন করে ও মুক্তি পাবে?

বাইরে কাদের পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না? সুব্রত তাড়াতাড়ি বিছানার উপর বসে পড়ে। হ্যাঁ, পায়ের শব্দই তো! সুব্রত উৎকর্ণ হয়ে শুনল—দরজার তালা খোলার শব্দ হচ্ছে। কারা যেন তালা খুলছে চাবি লাগিয়ে। দরজাটা খুলে গেল এবং খোলা দরজা-পথে দুজন জোয়ান লোক ঘরে এসে প্রবেশ করল। দুজনের কোমরেই গোঁজা এক-একটা তীক্ষ্ণ ভোজালি, মুখে মুখোশ আঁটা। আগন্তুকদের মধ্যে একজন একটু এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় বললে, যেমন আছ ঠিক তেমনি থাক। পালাবার চেষ্টা করেছ কি এখানেই প্রাণটি রেখে যেতে হবে মনে থাকে যেন!

অন্য লোকটি বললে, আর কেনই বা ছেলেমানুষি করছ? ভেবে দেখ এতে তোমার লাভ ছাড়া লোকসান এতটুকুও নেই। কুড়ি হাজার টাকা তো তোমায় দেওয়া হবেই। আর তা ছাড়া মাসোহারাও পাবে। তবে মিছে কেন বিপদ টেনে আনবে? একটা মাস লক্ষ্মী ছেলেটির মতো এখানে চুপচাপ কাটিয়ে দাও। যখন যা চাও তাই পাবে,—শুধু এখান হতে বেরুনো ছাড়া, খাওয়াদাওয়া কিছুরই অসুবিধা হবে না। কি বল, রাজী আছ?

সুব্রত তীব্রস্বরে বললে, আমার ভালমন্দ তোমাদের চাইতে আমি ঢের ভাল বুঝি। আমায় বিরক্ত করো না, বেরিয়ে যাও।

সুব্রতবাবু, কেন অনিশ্চিত অর্থের লোভে পড়ে অকালে প্রাণটা দেবে! আমরা এখন যাচ্ছি, ভাল করে আবার ভেবে দেখ যা বলে গেলাম। সন্ধ্যের পর আসব আবার, জবাবটা তখন দিলেও হবে। বলে লোক দুটো চলে যেতে উদ্যত হয়ে আবার ফিরে বলল, কালো ভ্রমরকে সত্যি যদি জানতে তাহলে এরকম পাগলামি করবার প্রবৃত্তি নিশ্চয় তোমার হত না! চাই কি, আমাদের কর্তাকে ধরে কুড়ি হাজার ত্রিশ হাজারও দাঁড়াতে পারে!

বলে লোক দুটো নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। বাইরে তালা লাগানোর শব্দ পাওয়া গেল আবার।

আরো কিছুক্ষণ পরে সুব্রত উঠে দাঁড়াল। বেলা কটা হয়েছে তাও তো জানবার উপায় নেই। কত কি চিন্তা মাথার মধ্যে পাক খেয়ে ফিরছে। সুব্রত ভাবতে লাগল : কাল সকালে ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়বে। আর সে জাহাজ যদি ধরা না যায় তবে সময়মত পৌঁছতেও পারা যাবে না। ফলে এত যত্ন, এত চেষ্টা সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু উপায়ই বা কি? একটি মাত্র জানালা, সেটাও তো দাঁড়িয়ে হাতে নাগাল পাওয়ার উপায় দেখা যাচ্ছে না কিছু!

কিন্তু আন্দাজ করে বুঝল, হয়ত লাফিয়ে কোনমতে জানালাটার নাগাল পেলেও পাওয়া যেতে পারে। বার দুই চেষ্টার পর তৃতীয়বারে সুব্রত লাফিয়ে জানালার শিক ধরল, তারপর হাতের উপর ভর দিয়ে শরীরটাকে জানালার কাছে অনায়াসেই ঠেলে তুলল। বাইরে দিনের আলো অনেকটা নরম হয়ে এসেছে, বেলা আর নেই। নীচের দিকে নজর করে দেখল, নীচে একটা বস্তি—সারি সারি খোলার ঘর। মনে হল, ও যে-ঘরে বন্ধ আছে, দোতলার উপর তো হবেই, তেতলাও হতে পারে। শিক ধরে শূন্যে ঝুলে বেশিক্ষণ থাকা গেল না, সুব্রত আবার নেমে এল। আবার ঘরের চারপাশ ও বেশ ভাল করে দেখতে লাগল, যদি কিছু একটা উপায় হয়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি ওর মাথায় আসে। হ্যাঁ ঠিক, এমন একটা কিছু উঁচু জিনিস যদি পাওয়া যায়--যার ওপরে দাঁড়িয়ে অন্তত জানালার শিকগুলো ও হাতে ধরতে পারে। এবং একবার জানালার শিক ধরতে পারলে একটা না একটা ব্যবস্থা হয়তো বা করতে পারবেও। ঘরের চারিদিকে দেখতে দেখতে, হঠাৎ ওর চোখ পড়ল সেই খাবার রাখার ছোট টুলটার ওপরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধিও খেলে গেল। টুলটা টেনে ও জানালার নীচে নিয়ে এল। এবারে জানালাটা বেশ নাগালের মধ্যে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু এর মধ্যে যদি কেউ বাইরে হতে দরজা খুলে এসে পড়ে! ভেবে ভেবে সুব্রত বেশ একটা চমৎকার উপায় ঠাওরালে—খাটটা বেশ ভারী--লোহার তৈরী। সেটাকে টেনে এনে, দরজার গায়ে লাগিয়ে দিল—এতেই যদি ল্যাঠা চুকে যায়!

এখন যদি কেউ বাইরে থেকে দরজা খুলে ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করেও, তবু কিছুটা সময় তার লাগবে দরজার গায়ে ঠেসানো লোহার খাটটা ঠেলে ঘরে ঢুকতে এবং সেই ফাঁকে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে পালাবার। আর বিলম্ব না করে সুব্রত প্ল্যান-মত টুলটা জানালার নীচে রেখে, তার ওপরে পা দিয়ে দাঁড়াতেই জানালার শিক দুটো ধরে ফেলল।

দুই শিকের ফাঁক দিয়ে হাত চালিয়ে দিয়ে সুব্রত বেশ জোরে জোরে ভিতর থেকে শিকের গায়ে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু পুরাতন মরচে-পড়া শিক হলেও তা বেশ শক্ত। ক্রমে ক্রমে দেহের সমগ্র শক্তি দিয়েই সে চাপ দিতে লাগল ওপরে। অমন শীতের দিনেও সারা শরীর ওর ঘামে ভিজে ওঠে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে কপাল থেকে ঘামটা মুছে ফেলে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ও জোরে জোরে শিকের উপর চাপ দিতে লাগল।

চাপের চোটে দুটো শিকের মধ্যবর্তী ফাঁকটা ক্রমেই বড় হয়ে আসছে। মাথাটা এখন সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে অনায়াসেই গলে যায়। গরাদের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বাইরে মাথাটা বের করে এবার সুব্রত বেশ ভাল করেই চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে

লাগল। ঠিক হাতখানেক দূর দিয়েই বরাবর দেওয়ালের গায়ে জল পড়ার লোহার নল বসানো। সেটা উপরের ছাদ থেকে দেওয়ালের গায়ে গায়ে নীচে চলে গেছে। যে কোন উপায়ে যদি জলের ঐ পাইপটা ধরা যায়, তবে এখান থেকে উদ্ধারের হয়তো বা একটা উপায় হলেও হতে পারে। কিন্তু এই জানালা হতে হাত বাড়িয়ে সেই দেওয়ালের গায়ে জলের নল ধরবার চেষ্টাও অত্যন্ত শক্ত ও বিপজ্জনক কাজ। এবং যদিও বা কোনমতে হাত বাড়িয়ে ওখান হতে নলটা ধরাও যায়, দেহের ভার এক হাতের উপর রাখা যাবে না। কিন্তু সে তো পরের কথা—আগে তো ফাঁকটা দিয়ে সমস্ত দেহ বাইরে যেতে পারে এমনি বড় হোক!

দুই হাতে দুটো শিক ধরে দেহের সমগ্র শক্তি একত্রিত করে সুব্রত পুনরায় প্রাণপণে চাপ দিতে লাগল। ধীরে ধীরে একটু একটু করে দুই গরাদের মধ্যবর্তী ফাঁক প্রশস্ত হয়ে গেল। ও এবার দেহটা অতি কষ্টে ঠেলেঠুলে বাইরে বের করে আনলে।

কিন্তু ঘরের বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে—নিশ্চয়ই এদিকে কেউ আসছে! সুব্রত দম বন্ধ করে কান পেতে শব্দটা ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। হ্যাঁ, পায়ের শব্দই বটে—নিশ্চয়ই আবার কেউ এ-ঘরে আসছে! ও তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে কোনক্রমে দুর্জয় সাহসে ভর করে পাশের নলটা ধরে ঝুলে পড়ল।

পায়ের শব্দ কাছে—আরও কাছে, ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর মনে হচ্ছে। দিনের আলো নিভে গেছে, সন্ধ্যার ধূসর ছায়া গুটি গুটি ধরিত্রীর বুকে নেমে আসছে। হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ, তারপরই গোলমাল আর চিৎকার—পালিয়েছে, পালিয়েছে!

সুব্রত তখন তাড়াতাড়ি জলের নল বেয়ে নামতে লাগল, তাড়াতাড়ি যত দ্রুত সম্ভব। এমন সময় সহসা নীচের দিকে অনেকগুলো মিলিত কণ্ঠের বিচিত্র গোলমাল শোনা গেল। তবে কি ওরা টের পেলে—কোন পথে সুব্রত পালিয়েছে!

নিশ্চয়ই তাই। সুব্রতর মাথার মধ্যে যেন হঠাৎ কেমন ঝিমঝিম করতে থাকে। সব কিছু যেন অস্পষ্ট ও গুলিয়ে যেতে চায়। হাতের দৃঢ় মুষ্টি কেমন শিথিল হয়ে আসছে, আর বুঝি ও জলের পাইপটা ধরে রাখতে পারে না! এখনই বুঝি দেহের ভাবে হাতের মুঠি খুলে যাবে! আর যদি খুলে যায়, তবে ছিট্‌কে একদম গিয়ে পড়বে নীচে, কঠিন মাটিতে। এবং তারপর?—না, আর ও ভাবতে পারে না। হাত ক্রমেই শিথিল আলগা হয়ে আসছে। উঃ, হাত ওর এত দুর্বল, এত অক্ষম হয়ে গেছে! হাতের মুঠি খুলে গেল।

একবার মাত্র শেষ চেষ্টা করলে সুব্রত—তারপরই বিদ্যুৎবেগে মাধ্যাকর্ষণের টানে সুব্রতর সমস্ত দেহটা নীচের মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল। আর রক্ষা নেই। সভয়ে ও চোখ বুজল।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় সব কিছু নিমেষে অবলুপ্ত হয়ে গেল তখন।

॥ ৬ ॥

কালো ভ্রমর

বিচিত্র এই কলকাতা শহর!

পিচঢালা পাকা সড়কের দুধারে এর কোথাও বড় বড় প্রাসাদতুল্য ইমারত বৈদ্যুতিক আলোয় ঝলকিত কলহাসি-আনন্দ-মুখরিত—লক্ষপতি ধনিক সম্প্রদায়ের বিজয়-গৌরব ঘোষণা করছে। কোথাও আবার পচা এঁদো সরু গলি, খোলার ঘর, দীন-দরিদ্র মজুরদের দৈনন্দিন অশ্রু-ঝরা ব্যথা ও বেদনার মধ্যেও বেঁচে থাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কেরোসিনের ধূম্রাচ্ছন্ন আলোর জঘন্য ভয়ঙ্কর শ্বাসরোধকারী পাথুরেঘাটার এমনি একটি গলির এক প্রান্তে একদল চোর, গাঁটকাটা, শয়তানদের দলপতি রাজুর আড্ডা। এদের দলের লোক শহরের পথে, ঘাটে, ট্রামে, বাসে, স্টেশনে, গঙ্গার ঘাটে, বাজারে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ছোটখাটো পকেট কাটা, হাতসাফাই থেকে বড় চুরি বাটপাড়ি পর্যন্ত এরা অনায়াসেই করে।

এদের সর্দার রাজুর ভাল নাম হয়তো কোন দিন একটা কিছু ছিল, কিন্তু এখন শহরের লোক তাকে নূতন নামেই ডাকে—রাজু গুণ্ডা।

পুলিসের খাতায়ও তার ঐ নাম।

ভীমের মত শক্তি তার গায়ে, পেশল লম্বা-চওড়া চেহারা, শৃগালের মতই ধূর্ত ও ক্ষিপ্রগতি সে। আজ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও পুলিসের কর্তৃপক্ষ ওকে ধরতে বা ছুঁতে পারেনি। যদিও চেষ্টায় তাদের এতটুকু ত্রুটি নেই।

রাজু তার নিজের আড্ডায় অন্ধকার একটা ঘরের মধ্যে বসে অন্যমনস্ক ভাবে একটা সিগারেট টানছিল। আজ সকালে একজন অপরিচিত লোককে নিয়ে তাদের দলের বলটু মিঞা এসেছিল তার কাছে।

লোকটা বর্মার বিখ্যাত দস্যু কালো ভ্রমরের একজন অনুচর। কোন একটা বিশেষ কাজে কালো ভ্রমর তার সঙ্গে নাকি একটিবার দেখা করতে চায়।

সে এইখানেই আসবে। সেই বিখ্যাত দলপতি, দস্যু-সর্দার কালো ভ্রমর আসছে তার গৃহে—যার নামে আজ লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

কি একটা গভীর উত্তেজনা রাজু অনুভব করে। সে আসছে! এখনই হয়তো সে এসে উপস্থিত হবে! হঠাৎ ভেজানো দরজার গায়ে টুক-টুক করে একটা শব্দ শোনা যায়।

কে? রাজু চমকে উঠে বলে।

নিঃশব্দ পায়ে অস্পষ্ট একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল। ঘরের অন্ধকারে স্পষ্টভাবে কিছুই বোঝবার উপায় নেই, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রাজু নিঃশব্দে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাজেনবাবু!

আপনি...তুমি...

ভদ্রভাবে কথা বলুন। হ্যাঁ, আমিই কালো ভ্রমর। মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করবেন না। ধনী, দরিদ্র, ভিক্ষুক, কুলি, মজুর সবাই মানুষ, তাদের মানুষ হিসাবে প্রাপ্য শ্রদ্ধাটা দিতে অন্তত চেষ্টা করবেন। কিন্তু যাক সে-সব কথা, আমি এখানে আসব, তা আপনি জানতেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন, তা হয়তো বুঝতে পারেননি?

না।

আপনার পরিশ্রমের সাহায্য-প্রার্থী হয়েই আজ আমি আপনার এখানে এসেছি। এবং সে পরিশ্রমের বাবদ আমি আপনাকে দেব পাঁচ হাজার টাকা। আমার দলের লোক কোন একটি ভদ্রলোককে বিশেষ কারণে আটক করে গুম করে রেখেছে, তাদের আপনি সাহায্য করবেন। লোকটি যেন না পালাতে পারে। এক মাস লোকটিকে গুম করে রাখতে হবে আপনাকে—ছলে, বলে, কৌশলে, যে উপায়েই হোক। এই কাজের জন্য আজই আপনাকে আমি অগ্রিম পাঁচশ টাকা দিচ্ছি। এক মাস পরে আর বাকি সাড়ে চার হাজার টাকা দেব। যাকে গুম করে রাখতে হবে, আপনাকে বলেছি সে ভদ্রসন্তান। দেখবেন তার যেন কোনপ্রকার কষ্ট না হয়। একমাত্র বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া তাকে যেন আর কোন রকম অসুবিধাই না ভোগ করতে হয়। আমি কালই আবার রেঙ্গুন ফিরে যাচ্ছি। শেষ কোন একটি কাজের তাগিদেই এত তাড়াতাড়ি আমায় রেঙ্গুনে ফিরে যেতে হচ্ছে। আমার লোকেরা এই শহরে নতুন। তারা এই শহরের সব কিছু জানে না। অথচ এই শহরে আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। তাই আমি আপনার সাহায্য চাই। আমি ঠিকানা দিয়ে যাব, সেই ঠিকানায় এখনই আপনাকে সেখানে যেতে হবে। সেখানে গেলেই তাদের কাছে সব কথা জানতে পারবেন আপনি। এখন বলুন আমার প্রস্তাবে আপনি রাজী আছেন কিনা?—একটানা আগন্তুক কথাগুলো বলে গেল।

এতে আবার রাজী থাকা না-থাকার কি প্রশ্ন আছে? পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা—আর এ তো সামান্য একটা কাজ—একজন লোককে শুধু গুম করে রাখতে হবে। এত সহজে ইতিপূর্বে রাজু কি কোন দিন এত টাকা উপায় করেছে?

রাজু নিম্নস্বরে বলে, রাজী।

বেশ, তবে এই নিন টাকা। পাঁচশ টাকার নোট—সবই দশ টাকার নোটে।

ছায়ামূর্তি নোটগুলো রাজুর দিকে এগিয়ে ধরল। রাজু হাত বাড়িয়ে নোটের গোছাটা তুলে নেয়।

আর একটা কথা রাজেনবাবু! কোনক্রমে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তবে কুকুরের মত আপনাকে আমি গুলি করে মারতে এতটুকুও ইতস্তত করব না জানবেন। এ পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই—আপনাকে তখন বাঁচাবে।

যে ভদ্রলোকটিকে আমায় বন্দী করে রাখতে হবে, সে কি এখন আপনাদেরই হাতে?

হ্যাঁ, আমাদেরই হাতেই তিনি এখন বন্দী।

তাকে আপনি কলকাতাতেই বন্দী বা গুম করে রাখতে চান?

প্রয়োজন হলে অন্য ব্যবস্থাও হতে পারে, তবে বর্তমানে তাকে যেখানে রাখা হয়েছে সে স্থানও আমার মতে খুবই নিরাপদ। আচ্ছা, আমি তাহলে এখন চললাম। নমস্কার।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারেই কালো ভ্রমর অন্ধকারে বাইরে মিলিয়ে গেল। রাজু তখনও হতভম্বের মত ঘরের অন্ধকারে বসে। হাতের মুঠোর মধ্যে তার নোটের গোছাটা তখনও ধরা।

সামান্য কয়েক মিনিটের পরিচয় মাত্র। নিষ্ঠুর, শয়তান রাজুর মনে যেন কালো ভ্রমর সহসা একটা প্রবল দোলা দিয়ে গেছে। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে যেন সহসা একটা

আলোর রশ্মি এসে পড়েছে। শান্ত দীঘির জলে একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলে যেমন তাতে ঢেউ জাগে এবং ক্রমে সেই ঢেউগুলোও গিয়ে সেই তটভূমিতে আঘাত করে, কালো ভ্রমরের কথাগুলোও যেন তেমনি রাজুর মনের তটভূমিতেও বারংবার ছলছলাৎ করে আঘাত হেনে যাচ্ছে।

মানুষ অভ্যাসের দাস। রাজু ভুলে গেছে সব। অতীতকে তার মনে করে আজ আর কোন লাভই নেই। তবু—তবু সেই ভুলে-যাওয়া অতীত কেন বার বার অস্পষ্ট স্বপ্নের মত তার মনের দরজায় আঘাত হেনে যাচ্ছে!

এ কি তবে দুর্বলতা?...ক্ষীণ একটা হাসির আভাস যেন রাজুর ঠোঁটের ওপরে জেগে উঠেই মিলিয়ে যায়। না, ভুলবে না সে, ভুলতে পারে না সে সেসব দিনের কথা।

মানুষের বুকের দেবতা আজ নির্বাসিত। পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছেন।

লোকটার কি অপূর্ব নিষ্ঠা!...দস্যু-দলপতি! লোকে ভয় করে, ঘৃণা করে। তবু লোকটার যেন কি একটা সম্মোহন আছে। অদ্ভুত ভাবেই নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

দূর ছাই! এসব কি মাথা-মুণ্ডু রাজু ভাবছে! তাকে ভূতে পেল নাকি? অন্ধকারেই রাজু পাগলের মত হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই যেন নিজের হাসির শব্দে নিজেই চমকে ওঠে।

রাজুর মা এসে ঘরে ঢোকে; বলে, ও কি, অমন করে হাসছিলি কেন রে?

ও কিছু না মা। তুমি যাও, আমায় এখনই একবার বেরুতে হবে জরুরী একটা কাজে।

রাজু তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। পথে নেমে দ্রুতপায়ে রাজু পথ চলতে শুরু করে।

কিন্তু সেই চিন্তাটা ওকে ছাড়ে না, যেন গলাকাটা রাহুর ভূতের মতই ওকে তাড়া করে চলে।

॥ ৭ ॥
গিঁটে গিঁটে পাক

ওদিকে তখন।

চোখ-বোজা অবস্থাতেই সুব্রত সোঁ-সোঁ করে নীচে কি একটা কঠিন বস্তুর উপর এসে ছিটকে পড়তেই মড়মড় করে শব্দ হল এবং তার পর সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে আরও নীচে গিয়ে পড়ল ঝুপ করে। অসহ্য বেদনায় ওর শরীর যেন ঝিন-ঝিন করে উঠল। হাড়গোড় তো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছেই, এতক্ষণ হয়তো মরেও গেছে। সুব্রতর জ্ঞানও ততক্ষণে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

কতক্ষণ ও যে ছিল অমনিভাবে অজ্ঞান অবস্থায় মড়ার মতই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ওর মনে নেই। একটু একটু করে প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার সুব্রতর জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল। ওর যেন সে এক আধো-জাগা আধো-ঘুমন্ত অবস্থা। নিষ্ক্রিয় অস্পষ্ট চেতনার মধ্যে যেন অনেক দূর থেকে ভাসা ভাসা একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট গোলমালের টুকরো-টুকরো আওয়াজ ওর কানে এসে বাজছে। অনেকগুলো এলোমেলো কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট ভাসা ভাসা

শুনতে পায়। কারা যেন ওর চারিপাশ ঘিরে ফিস ফিস করে কি সব কথা বলছে। ভাল করে কিছুই মনে পড়ে না। স্বপ্নের মতই আবার এক সময় সব কিছুই অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে যায়। ক্রমে কিছু আর মনে পড়ে না।

ভাল করে বোঝবার মত জ্ঞান আরো কিছুক্ষণ পরে ওর ফিরে এল। নরম একটা কিসের ওপর ও শুয়ে। একটু যেমন পাশ ফিরতে যাবে—সমস্ত শরীরটা যেন অসহ্য বেদনায় টনটন্ করে ওঠে। দেহের হাড়গোড়গুলো যেন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে চোখ খুললে সুব্রত।

ভাল করে ও সব আবার মনে করতে চেষ্টা করে। এ কোথায় এল ও! ক্লান্ত চোখের পাতা খুলে পিট্পিট করে সুব্রত চারিদিকে একবার তাকাবার চেষ্টা করে। ঘরের কোথায় মিট্মিট্ করে বোধ হয় একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। তারই অস্পষ্ট আলোয় ঘরের মধ্যে স্বল্প আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। ও দেখলে, দু'তিনটে অস্পষ্ট মুখ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে, সবাই অপরিচিত—কাউকেই ও চেনে না। কারা এরা? কোথা থেকেই বা এল এরা? আবার ভাল করে ও আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করে। কোথায় ও? আর এরাই বা কারা? কেমন করেই বা সে এখানে এল? না—কিছুই মনে পড়ছে না। সব অস্পষ্ট, ধোঁয়া।

ক্রমে আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে সব কথা মনের পাতায় ভেসে ওঠে...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জানালার গরাদ ফাঁক করে, ঘরের বাইরে ছাতের জল নিঃসরণের নলটি ধরে পালাবার চেষ্টা! তারপর—সহসা হাত ফসকে...

বাবুজি!

কার একটি মৃদু অথচ স্নেহকোমল কণ্ঠস্বর ওর কানে এসে বাজল। অন্য পাশ থেকে কে আর একজন প্রশ্ন করলে, কেইসা হ্যায় বাবুজি?

জবাবে অতি ক্ষীণকণ্ঠে কোনমতে ও বলে কেবল, একটু জল!

আরে এ সুখন ভেইয়া! লোটাভর পানি লাও রে! বাবুজি কো থোড়িসে পানি পিলাও।

একটু পরে কে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল।

বাবুজি, পানি পি লিজিয়ে—পানি...

লোকটা একটু একটু করে সুব্রতর গলায় জল ঢেলে দিতে লাগল। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। আঃ, শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল!...সুব্রত আবার চোখ বোজে। কিন্তু শরীরে কি অসহ্য বেদনা!...

লোকগুলো বিহারী কুলী হবে বোধ হয়। হাতফসকে সুব্রত ওদেরই বস্তির খোলার চালের উপর প্রথমে এসে পড়ে এবং সেখান থেকে আবার গড়িয়ে পড়ে নীচের মাটিতে কতকগুলো জড়ো করা বিচালির ওপরে। ভাগ্যে খোলার ছাতটা—যেখান হতে সুব্রত পড়েছে, সেখান থেকে খুব বেশী নীচে ছিল না, তাই এ-যাত্রা রক্ষা। নইলে যে কি হত কে জানে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেওয়ার পর, ওদেরই দেওয়া এক বাটি গরম দুধ খেয়ে সুব্রত যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করলে। আর দেরি নয়, এবারে তাকে যেতে হবে। কোনমতে অতি কষ্টে সুব্রত উঠে বসে কুলীদের মধ্যে সর্দার গোছের লোকটাকে একটা

ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে এনে দিতে বলে। সর্দারের আদেশে কুলীদের মধ্যে তখনই একজন গিয়ে সুব্রতর কথামত একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে এল। সুব্রত কুলীদের অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে ওদেরই সাহায্যে কোনমতে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল সুব্রতর নির্দেশমত।

রাত্রি তখন আটটা বেজে গেছে।

দীপমালায় আলোকিত বিশাল নগরী যেন একটি ছোট্ট শিশুর মতই হাসছে খুশীর আনন্দে। লোক-জন, গাড়ি-ঘোড়া, ট্রাম, বাস, রিকশা রাজপথের এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। নগর কর্ম-চঞ্চল, শব্দ-মুখরিত। দোকানে দোকানে লোকের ভীড়—ফিরিওয়ালার চিৎকার। বিচিত্র এ কলকাতা শহর!

চলমান গাড়ির নরম গদিতে ক্লান্তভাবে হেলান দিয়ে সুব্রত খোলা জানালাপথে অন্যমনস্কের মত পথের দিকে অলসভাবে তাকিয়ে দেখছিল। জীবনে ও কলকাতায় খুব কমই এসেছে। এখানকার পথ-ঘাট কিছুই ওর তেমন জানাশুনো নেই। গাড়ি একটার পর একটা রাস্তা পার হয়ে চলেছে তো চলেছেই। গাড়ির চাকার একঘেয়ে বিশ্রী ঘর-র ঘর-র শব্দটা যেন ক্লান্ত অবসন্ন চোখের পাতায় কেমন একটা তন্দ্রার আমেজ আনে।

সুব্রত একসময় বসে বসেই ঢুলতে আরম্ভ করলে। সমস্ত শরীর ও মন বড়ই শ্রান্ত। বিশ্রাম—একটু বিশ্রাম এখন সর্বাগ্রে ওর প্রয়োজন।

কতক্ষণ যে গাড়ি এমনি ঘর-র ঘর-র শব্দ করে চলেছে তা ওর ভাল মনে নেই, হঠাৎ এক সময় ও লক্ষ্য করলে—একটা অপেক্ষাকৃত অপরিসর স্বল্পালোকিত পথ দিয়ে গাড়িটা এগুচ্ছে। সুব্রত কেমন যেন সহসা চমকে ওঠে। একটা অহেতুক আশঙ্কায় যেন মনটা ছমছম করে ওঠে, এ কি! কোথায় চলেছে ও? তাড়াতাড়ি ও ব্যস্ত হয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করে শুধালে, এই গাড়োয়ান, এ কোথায় এলি? এই—এই গাড়োয়ান?

গাড়োয়ান কিন্তু সুব্রতর ডাকে সাড়া-শব্দ করলে না, শুধু আগের মতই গাড়ি যেমন চালাচ্ছিল, তেমনই মন্থর গতিতে চালাতে লাগল আপনমনে। এবার বেশ একটু চড়া গলাতেই ডাকল, গাড়োয়ান!

এবারে উপর হতে ভারী কর্কশ গলায় জবাব এল, আরে চিল্লাতে হ্যায় কাহে? চুপচাপ বৈইঠা রহো!

অ্যাঁ—এ বলে কি! সুব্রত চমকে উঠল। মুহূর্তে শতসহস্র আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা যেন ছায়াবাজির মতই ওর দুই চোখের সবটুকু জুড়ে স্পষ্ট সজীব হয়ে ওঠে। এ আবার এক নূতন বিপদ!

কিন্তু ও মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই আর তিলমাত্রও কালবিলম্ব না করে যেই সে গাড়ির দরজাটা খুলতে যাবে, সহসা যেন চোখের পলকে সেই স্বল্পান্ধকারের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ ধারালো ছোরা গাড়ির খোলা জানালা-পথে শহরের অস্পষ্ট আলোয় ঝক-ঝক করে মৃত্যু-বিভীষিকায় জেগে উঠল ঠিক তার চোখের ওপরে, একেবারে বুকের কাছটিতে। তারপরেই ভীষণ আকারের সেই মুখোশ-আঁটা একখানি কুৎসিত মুখ।

আবার সেই মুখোশ!

ঘটনার আকস্মিকতায় ও আতঙ্কে কিসের একটা ভয়ের স্রোত সুব্রতর মেরুদণ্ড

দিয়ে যেন সিরসির্ করে নীচে নেমে এল। এবং ঠিক তার পরমুহূর্তেই গাড়ির দুপাশের দরজা দুটো খুলে গিয়ে কার যেন লোহার মতই শক্ত দুটো অদৃশ্য হাতের সুকঠিন আলিঙ্গনের মাঝে ওকে সবলে টেনে নিলে।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ও আকস্মিক ঘটে গেল যে সুব্রত এতটুকু সুযোগও পেলে না নিজেকে সেই লৌহ-কঠিন আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করবার। আপনা হতেই ক্লান্ত চোখের পাতা আবার যেন বুজে এল তার।

॥ ৮ ॥
এদিক ও ওদিক

ওদিকে সুব্রতর আকস্মিক ও রহস্যময় অন্তর্ধানে নীতীশ যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কি করবে, কোন পথে যাবে, কি করলে আবার সুব্রতকে খুঁজে পাওয়া যাবে, ভেবে ভেবে যেন ও কিছুই ঠিক করে উঠতে পারে না। একটা জলজ্যান্ত মানুষ এমনি করে হোটেলের চারতলার উপর থেকে লোপাট হয়ে গেল? এতবড় শহরে কি কোন আইন-কানুনও নেই? এ কী বীভৎস ব্যাপার! গ্রামের স্কুল থেকে পাস করে ছোট শহরের কলেজে পড়েছিল নীতীশ, কেমন করেই বা ও জানবে, কলকাতার শহরে দিনেরাতে খুন, জখম, ডাকাতি কত কিই-না অবাধে নিয়মিত চলেছে। প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার সবচাইতে বেশী।

যাহোক, নীতীশ কোনমতে এক কাপ চা ও কিছু জলখাবার খেয়ে রাস্তায় নেমে যেদিকে দুচোখ যায় অনির্দিষ্টভাবে সেদিকেই হাঁটতে আরম্ভ করলে। মাথার উপর রৌদ্র ক্রমেই চড়চড়ে হয়ে উঠছে। আশেপাশে দূরে কত লোকজন নানান কাজে এদিক-ওদিক যাওয়া-আসা করছে। কর্মব্যস্ত শহর। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিস পাহারা দিচ্ছে। সবকিছুই যেন চলছে ধরা-বাঁধা নিয়মে।

নীতীশ সকলের মুখের দিকেই কেমন যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে চেয়ে চেয়ে দেখে, একখানি চেনা মুখের আদল বুঝি সকল লোকের মুখের মধ্যে খুঁজে খুঁজে ফেরে। কিন্তু কোথায় সুব্রত? এই প্রবহমান জনসমুদ্রের মধ্যে সুব্রত একটি বুদবুদ বৈ তো নয়।— মিলিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে।

চলমান গাড়িগুলোর দিকে নীতীশ ব্যগ্র হয়ে দেখবার চেষ্টা করে, যদি কোন গাড়িতে সুব্রতকে দেখা যায়! রাস্তার দুধারে ছোট-বড় গাড়িগুলোতে চেয়ে চেয়ে ও খোঁজে। কিন্তু কোথায় সুব্রত? বৃথাই নীতীশের ব্যাকুল খরসন্ধানী দৃষ্টি এক হতে অন্য দিকে ঘুরেফিরে মরে। সত্যিই কি তবে সুব্রতকে আর পাওয়া যাবে না? সত্যিই কি সে একেবারে হারিয়ে গেল? পাগলের মত দিশেহারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথে পথে নীতীশ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষটায় একসময় পরিশ্রান্ত হয়ে একহাঁটু ধুলো নিয়ে নীতীশ আবার ফিরে এল হোটেলে। সিঁড়ির ঠিক বাঁকেই পূর্বরাত্রির সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। নীতীশ কতকটা যেন ইচ্ছে করেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল, কিন্তু কিছুটা যেন গায়ে-পড়া হয়েই ভদ্রলোক মৃদু হেসে দু'হাত তুলে নীতীশকে নমস্কার জানিয়ে বললেন, এই যে—বেড়াতে গিয়েছিলেন বুঝি? তা বন্ধুটি কই? তাকে দেখছি না?

বৃদ্ধের প্রশ্নে নীতীশ যেন একটু বিরক্তই হল, মৃদুস্বরে জবাব দিলে, আজ্ঞে না। এই—হ্যাঁ, সে একটা জরুরী কাজে সকালে বেরিয়েছে। বলে নীতীশ সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল।

ওঃ! তা বেশ। রাত্রে আর কেউ ঘরে যায়নি তো? বলে ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

নীতীশ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিলে, না।

তারপর আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাড়াতাড়ি উপরের দিকে উঠে গেল। নীতীশের তখন আর দাঁড়িয়ে কথা বলতে এতটুকুও ভাল লাগছিল না; বিশেষ করে ঐ বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধটাকে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না।

ঘরে ঢুকে শ্রান্ত দেহভার কোনমতে একটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে নীতীশ একটা গভীর নিঃশ্বাস ছাড়লে। তারপর চোখ বুজে ও আর একবার ভাল করে সমগ্র ব্যাপারটাই আগাগোড়া ভাবতে চেষ্টা করল: সুব্রত—তার প্রাণের বন্ধু সুব্রত এখন কোথায়? আশ্চর্য, ভোজবাজির মত সত্য-সত্যই সে উধাও হয়ে গেল নাকি তবে?

নীতীশের দুই চোখের কোল জ্বালা করে জল নেমে এল। কোথায় সেই নিষ্ঠুর কালো ভ্রমরের কবলে তার প্রিয় বন্ধু নির্যাতিত হচ্ছে কে জানে! কোথায় তাকে লুকিয়ে রাখলে? কোন অদৃশ্য আঁধার গৃহকোণে? সে এখন কি করছে?—একটার পর একটা চিন্তা নীতীশের মনকে যেন তোলপাড় করতে থাকে। মনে হয়, যদি কোনমতে সে জানতে পারত কোথায় সেই দস্যু কালো ভ্রমরের আস্তানা! যেমন করে হোক তাহলে তাকে ও উদ্ধার করে আনতই, শত বিপদেও ও পশ্চাৎপদ হত না।

ক্লান্তিতে, চিন্তায়, ভাবনায় একসময় বসে থাকতে থাকতেই নীতীশের চোখের পাতা দুটো বুঝি বুজে এল।—খাবার ডাক এসেছিল, ও ভুলে গিয়েছিল। হোটেলের ভৃত্য এসে দু'তিনবার ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঘরেই টেবিলের ওপরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে চলে গেল।

সহসা একসময় কার ডাকাডাকিতে নীতীশের ঘুম ভেঙে গেল।

নীতীশবাবু! ও নীতীশবাবু, শুনছেন?

নীতীশ চেয়ে দেখে সামনে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি।

আহার করেননি বুঝি? সব ঢাকা-দেওয়া অবস্থাতেই পড়ে আছে দেখছি!

না, খিদে নেই।

নীতীশ যেন সহজ ভদ্রতাটুকুও ভুলে গেছে, বৃদ্ধকে বসতে পর্যন্ত বললে না একবার

বন্ধুটি কই, তাকে দেখছি না? এখনও ফেরেননি বুঝি?

নীতীশ একবার ভাবলে কোন জবাবই দেবে না বৃদ্ধের প্রশ্নের। সুব্রত সম্পর্কে ভদ্রলোকের হঠাৎ এত কৌতূহলই বা কেন? আবার ভাবলে, বলবে নাকি, শয়তান, তুমি সে সংবাদ আমার চাইতে ভালই জান! আবার ন্যাকামি করছ কেন? কিন্তু মনের আক্রোশ ও মনেই চেপে রেখে মৃদু অনিচ্ছাকৃত কণ্ঠে বললে, না, এখনও ফেরেনি।

বন্ধুটি কলকাতা শহরে পথ-ঘাটে হারিয়ে গেলেন না তো? ভাল করে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন না।

বৃদ্ধের গায়ে-পড়া আলাপে নীতীশ আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলে না, বেশ

একটু চড়া গলায়ই জবাব দিল, আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। আমি এখন সিনেমায় যাব। বলতে বলতে নীতীশ উঠে দাঁড়ায়।

এদিকে গাড়ির মধ্যে যে লোকটা অকস্মাৎ সুব্রতকে পিছন থেকে জাপ্‌টে ধরেছিল, সে চোখের নিমেষে তাকে অক্লেশে পিঠের উপর তুলে নিয়ে অন্ধকারে একটা সরু গলিপথ ধরে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল। সুব্রত শিশুর মতই একান্ত অসহায়ভাবে নিজেকে আততায়ীর হাতে সঁপে দিয়ে চুপটি করে পড়ে রইল। পরিশ্রান্ত দেহ্ আর যেন বইতে সত্যিই সে পারছিল না। শরীরের প্রত্যেকটি গ্রন্থি যেন তার অবশ শিথিল হয়ে গিয়েছে। এতটুকু শক্তিও যেন ওর শরীরে অবশিষ্ট আর নেই। গলিপথের প্রায় শেষপ্রান্তে অন্ধকারে একটা ভাঙা দোতলা বাড়ির সামনে এসে লোকটা দাঁড়াল। বাইরে থেকে কড়া নাড়তেই কে একজন মেয়েলী মিষ্টিস্বরে প্রশ্ন করলে, কে রে?

দরজাটা খোল মা।

একটু পরেই ভিতর থেকে দরজাটা খুলে গেল। একটা ধূম্রাচ্ছন্ন কেরোসিনের কুপী হাতে মলিনবসনা একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে দরজার ঠিক উপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

আলোটা ধর। উপরের চিলেঘরে চল। লোকটি বললে।

একটা সরু অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার সিঁড়ি।

স্ত্রীলোকটি আগে আগে আলো হাতে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল। লোকটি সুব্রতকে নিয়ে অনুসরণ করতে লাগল। সিঁড়ি ভেঙে তিনতলার ওপরে একটা ছোট ঘরে এসে তারা প্রবেশ করল। ঘরের ভিতর একটা ছিন্ন খাটিয়া পাতা। লোকটা ধপাস্ করে সুব্রতকে সেই খাটিয়ার উপর ফেলে দিল।

এবারে লক্ষ্মী ছেলের মত চুপচাপ হয়ে থাক যাদু, আর মনে রেখো চেঁচিয়ে গলা ভাঙলেও এখান থেকে কারও কানে সে শব্দ পৌঁছুবে না। খিদে পেয়েছে নাকি?

সুব্রত মৃদুস্বরে জবাব দিল, না।

বেশ, তবে ঘুমোও বলে বাইরে হতে দরজায় শিকল এঁটে লোকটা চলে গেল।

কিছুক্ষণ সুব্রত চোখ বুজেই পড়ে রইল। গত কদিন আগাগোড়া একটার পর একটা ঘটনা যেন সিনেমার মতই ঘটে যাচ্ছে। অসহ্য ক্লান্তিতে একসময় সুব্রতর চোখের পাতা বুজে আসে এবং ক্রমে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। আর না ঘুমিয়েই বা বেচারী কি করে? এক রাত্রি ও এক দিনের মধ্যে কম ধকল তো শরীরের ওপর দিয়ে যায়নি!

দীর্ঘ একটানা নিদ্রা দেবার পর একসময় যখন সুব্রতর ঘুমটা ভাঙল, ও চেয়ে দেখলে ওপাশের একটা ভাঙা খিলানের ফাঁকে খানিকটা চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে লুটিয়ে পড়েছে। অসহ্য পিপাসায় সুব্রতর গলাটা তখন শুকিয়ে উঠেছে। তখনও সমস্ত শরীর অসহ্য ক্লান্তিতে ভরা। ও আবারও দুই চোখ বুজল—ঘুমিয়ে পড়ল।

খুব ভোরে কার মৃদু ডাকে সুব্রতর ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ মেলে চাইল ও। ভোরের আলোয় ছোট্ট ঘরখানি ভরে গেছে। বেশ শীত-শীত করছে বলে সুব্রত গায়ের কাপড়টা ভাল করে একটু টেনেটুনে পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করতেই শুনতে পেলে কে যেন বলছে, চা খাবে?

আবার সেই কণ্ঠস্বর! ক্লান্ত সুব্রত আবার চোখ মেলে চাইল। চেয়ে দেখলে পূর্বরাত্রের সেই স্ত্রীলোকটিই প্রশ্ন করছে, চা খাবে?

চা—তা দিন!

স্ত্রীলোকটি ঘর হতে বেরিয়ে গেল এবং অল্পক্ষণ বাদেই ফিরে এল একটা কাপে করে ধূমায়িত চা নিয়ে।

সুব্রত খাটিয়ার ওপর উঠে বসে হাত বাড়িয়ে স্ত্রীলোকটির হাত থেকে গ্লাসটা নিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুব্রত একবার ভাল করে স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চাইল।

স্ত্রীলোকটির বয়স চল্লিশের ওপরেই হবে। এবং তাঁর সমস্ত মুখখানি জুড়ে যেন একটা মৃদু স্নেহকোমল ভাব।

সুব্রত সসঙ্কোচে বললে, তুমি—আপনি কে?

স্ত্রীলোকটি সুব্রতর ভাব দেখে হেসে বললে, আমি?

হ্যাঁ। সুব্রত কোনমতে ঢোক গিলে জবাব দিল।

আমি—আমি রাজু—রাজেনের মা।

রাজু! রাজু কে?

রাজু? রাজু আমার ছেলে।

শেষের দিকে স্ত্রীলোকটির চোখের কোলদুটি সহসা কেমন যেন অশ্রুময় হয়ে উঠল। বুঝিবা দু'ফোঁটা জলও গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

সে কে? তাকে তো কই দেখছি না?

কাল যে তোমায় নিয়ে এল এই ঘরে, সে-ই তো আমার ছেলে রাজু। সকালে বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি।

ও! সে-ই বুঝি আপনার ছেলে রাজু?

হ্যাঁ বাবা। সে-ই আমার ছেলে রাজেন। আজ সে ডাকাত, লোকে তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু চিরদিন সে এমন ছিল না। তোমাদের মতই সে ছিল ভাল। লোকে তাকে কত ভালবাসত। আর আজ—? বলে স্ত্রীলোকটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

সুব্রতর সমগ্র প্রাণটা সহসা কেমন যেন স্নেহাতুর হয়ে উঠল। চা আর তার খাওয়া হল না, খাটিয়া হতে উঠে পড়ে স্ত্রীলোকটির সামনে এসে স্নেহবিগলিত স্বরে ও বললে, আপনি কাঁদবেন না। আপনার ছেলের কথা বলুন।

স্ত্রীলোকটি তখন দু-হাত দিয়ে সুব্রতর একখানি হাত ধরে অশ্রুঝরা সুরে বললে, তুমি তাকে বাঁচাও বাবা। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে ভগবান যেন তোমাকে আজ সহসা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার রাজুকেই বাঁচাতে। সে আমার ছেলে, আমি জানি তার ভিতরে ভাল জিনিসটা আজও নষ্ট হয়ে যায় নি। এখনও যদি সে সুযোগ বা সুবিধা পায়—আবার সে ভাল হতে পারবে। আবার লোকে তাকে ভালবাসবে। মা হয়ে আমি চোখে তার এ অধঃপতন আর দেখতে পারছি না। নিরন্তর চোখের জল ফেলি আর ভগবানকে ডাকি, ভগবান, রাজুর আমার সুমতি দাও; এ পাপের পথ থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে আমার বুকে তুলে দাও। পথে পথে ছেলের হাত ধরে আমি ভিক্ষা করে জীবনধারণ করব।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে স্ত্রীলোকটি যেন হাঁপাতে লাগল।

সুব্রত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, আপনি স্থির হোন মা। চুপ করুন। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবান নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনবেন।

বাবা, তুমি আমার পেটের ছেলের মত। আমার ঐ একটি মাত্রই ছেলে, ওকে তুমি বাঁচাও।

এমন সময় বাইরে একটা কর্কশ গলার আহ্বান শোনা গেল—ওমা, মা!

ওই বোধ হয় আপনার ছেলে রাজেন ফিরে এল মা। যান, তাকে এই ঘরেই ডেকে নিয়ে আসুন। আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

কিন্তু রাজেনকে আর ডাকতে হল না, সে-ই এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল নিজে থেকে।

সুব্রত রাজুর দিকে চোখ তুলে চাইল।

॥ ৯ ॥
সংশয়

এই রাজেন! রাজু!

গতরাত্রে অন্ধকারে ও ভাল করে কিছু দেখতে পায়নি এবং দেখবার মত দেহ বা মনের অবস্থাও ছিল না। আজ দিনের আলোয় ভাল করে চেয়ে দেখলে।

রাজু সুব্রতর চাইতে বয়সে পাঁচ-ছয় বৎসরের বড়ই হবে বলে মনে হয়। নিজে চিরদিন ব্যায়াম করে এসে ব্যায়ামপুষ্ট কারও চেহারা দেখলে সুব্রতর খুবই আনন্দ হয়। সত্যি, রাজুর দিকে তাকালে যেন চোখ ফেরানো যায় না। বলিষ্ঠ, উন্নত, লম্বা চেহারা, দেহের প্রতিটি মাংসপেশী সজাগ, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। একটি মলিন খদ্দরের গান্ধীক্যাপ মাথার ওপরে বসানো। গায়ে একটি হাত-কাটা পিরান, দুখানা চওড়া পাথরের মত বুকের পেশী যেন উদ্ধতভাবে ঠেলে উঠেছে। হাতের গুলি তো নয়, যেন শালগাছের গুঁড়ি। সমগ্র দেহ যেন ওর বিপুল শক্তির পরিচয় দেয়।

হ্যাঁ, পুরুষ-সিংহ বটে।

পরিধানে মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা। পায়ে চপ্পল।

রাজু আড়চোখে একবার সুব্রতর দিকে তাকায়।

সুব্রতও মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে থাকে।

মনে হচ্ছে ছেলেটা যেন ঠোঁট টিপে হাসছে। সত্যিই ও হাসছে নাকি? হ্যাঁ তাই তো, হাসছেই তো! ওর দিকে চেয়েই হাসছে বোধ হয়।

কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করে রাজু।

কিন্তু না, রাজু মনকে শক্ত করে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল, বললে, এই যে, বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছ দেখছি। চা খেয়েছ? মা, ওকে চা দিয়েছ?

হ্যাঁ।—মা মৃদুস্বরে জবাব দেন।

একটা কথা মনে রেখো হে, যা চাও সব পাবে। তবে এখান হতে পালাবার চেষ্টা করেছ কি মরেছ!

সুব্রত হেসে ফেলে, পালাব কেন? যতদিন না ছেড়ে দেন, এখানেই থাকব।

অ্যাঁ, লোকটা বলে কি! সুব্রতর কথাগুলো রাজু যেন বিশ্বাস করতে পারে না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে সুব্রতর মুখের দিকে।

বিশ্বাস করতে পারছেন না আমার কথা, না?—সুব্রত আবার প্রশ্ন করে।

রাজু ওর কথার কোন জবাব দেয় না। আগের মতই সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ একসময় সুব্রত বলে, বসুন রাজেনবাবু।

রাজু চমকে ফিরে তাকায়, চকিতে দুই দিন মাত্র আগে শোনা কালো ভ্রমরের কথাগুলো ওর মনের পাতায় ছায়া-ছবির মত ফুটে ওঠে।

সে দুঃস্বপ্ন এখনও ওর কাটেনি। আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে যে সংসর্গে ও মিশে আসছে, সেখানে কেউ এ ভাষায় কথা বলে না, ইতর ভাষাতেই সাধারণত সেখানে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা চলে।

অতীত—সে আজ অতীতের গর্ভেই নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে। কলেজের ছাত্রজীবনের সেসব দিনগুলো—বি. এ. পাস করবার পর যখন সামান্য একটা ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরির জন্য সে দরখাস্ত হাতে এত বড় কলকাতা শহরের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে ফেলেছে, তখন কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায়নি—কেউ না!

অবজ্ঞা—অবহেলা—কঠোর দারিদ্র্য। মায়ের অসুখে একটি পয়সা নেই হাতে ঔষধ কেনবার মত। সেই সব দিনের কথা সে ভোলেনি।

সুব্রত আবার বলে, কই, বসুন রাজেনবাবু!

আবার—আবার সেই ভুলে যাওয়া ডাক! বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে যেন আসছে ক্ষীণ এতটুকু আলোর শিখা। ভীরু, কম্পমান।

রাজু দ্রুত অস্থির পদে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এবং বাড়ি হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বড় রাস্তার ওপরে পড়ে হন্‌ হন করে ও ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলে অনির্দিষ্টের মত —লক্ষ্যহারা।

পিছন থেকে কে যেন অশ্রুত স্বরে ক্রমাগত চিৎকার করে ডাকছে তখনও, রাজেনবাবু, রাজেনবাবু, রাজেনবাবু!

না—না, ও শুনবে না। কিছুতেই ও শুনবে না।

কে আবার বলছে যেন, ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবেন রাজেনবাবু!

ও কে? মা না, হ্যাঁ, ঐ তো শীর্ণ মলিন তার মা-ই! দু চোখে কি গভীর আকুতি —বাবা! এ পথ সুখের নয়। এ পথ ছেড়ে দে। পরের অভিশাপ কুড়িয়ে স্বর্গ রচনা করা চলে না বাবা। বালির প্রাসাদের মতই এ একদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।... কে ও? কাল্লু সর্দার? কি কুৎসিত ওর মুখখানা! একটা চোখ কানা!— এ দুনিয়ামে সব শালা ডাকু। আরে বাবা, রূপেয়া হোনেসে সব মিলতা হায়। এ দুনিয়ামে সব সে বড় বাৎ হায় রূপেয়া! আঃ, কেয়া মিঠি মিঠি বোল! উদভ্রান্তের মতই সারাটা দিন রাজু শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

অনেক রাত্রে ফিরে এল যখন বাড়িটা নিঝুম হয়ে গিয়েছে, কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। ক্লান্ত রাজু সোজা তিনতলার ছাদের ওপর চলে এল। ঘরে ভাত ঢাকা দিয়ে

মা নিশ্চয়ই তার পাশে আঁচল পেতে ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু মাকে গিয়ে আজ জাগাতেও মন চাইছে না, থাকুক মা ঘুমিয়েই।

মৃদু জ্যোৎস্নায় চারিদিক যেন স্বপ্নময়। ছাদের আলিসার ধারে গিয়ে রাজু দাঁড়াল।

হঠাৎ এক সময় অন্যমনস্ক রাজুর নজরে পড়ে তিনতলার ছোট ঘরটায় আলো জ্বলছে। কৌতূহলভরে রাজু ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। ছোট একটা ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে সুব্রত ঐদিনকার একটা সংবাদপত্র পড়ছে।

একান্ত নির্লিপ্ত, কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। লোকটা আশ্চর্য তো। দিব্যি নিশ্চিন্ত আছে!

রাজু সরে যাবার চেষ্টা করতেই জানালার নীচে একটা খালি সিগারেটের টিনে পা লেগে শব্দ হল।

সুব্রত মুখ তুলে তাকাল, কে? কে ওখানে?

সুব্রত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। রাজু ততক্ষণে জানালার এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে।

কে? জবাব দিচ্ছ না কেন? কে?

আমি। রাজু।

কে, রাজেনবাবু? এত রাত্রে! হঠাৎ সুব্রত হেসে ফেলে, বুঝতে পেরেছি, পালিয়েছি কিনা দেখতে এসেছিলেন বুঝি? তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন না তালা খুলে ভিতরে!

তালা খোলার শব্দ শোনা গেল ; রাজু ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

কোথায় সারাদিন ছিলেন বলুন তো রাজেনবাবু?

রাজু কোন জবাব দিল না।

বসুন রাজেনবাবু...বসুন। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন!

সারাটা দিন হেঁটে হেঁটে রাজু অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করছিল, টুলটায় বসে পড়ল।

রাজেনবাবু, সত্যি বলছি আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি পালাব না। Word of honour দিচ্ছি। কিন্তু যাক সে, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল। হয়তো আমার কথাগুলো শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। কিন্তু আজ সারাটা দিন কেবল আপনার কথাই ভেবেছি—আর আপনার মায়ের কথা ভেবেছি।

রাজু কোন জবাব দেয় না।

সুব্রত আবার বলতে শুরু করে, কেন ভেবেছি জানেন? যে পথে আজ আপনি চলেছেন ও আজ যে কাজ আপনি করছেন, এ তো আপনার কাজ নয়। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, শিক্ষিত। এই কি আপনার পথ?

এতক্ষণে মৃদুস্বরে রাজু জবাব দেয়, থাক থাক, হিতোপদেশ আর আমার ভাল লাগে না, ওতে পেটও ভরে না। পেটে ভাত থাকলে ওসব শোনাও যায়। বলাও যায় আর ভালও লাগে, বুঝলেন মশাই! এ-পথ আমি সহজে ধরিনি। একদিন নয়, দুদিন নয় —দিনের পর দিন, মাসের পর মাস দারুণ ক্ষুধায় আঁজলাভরে শুধু কলের জল খেয়ে ক্ষুধার উপশম করেছি। কেউ একটিবার ফিরেও চায়নি। একমুঠো ভাত দিে .কউ উপকার করেনি। রাত্রিতে একটু শোয়ার ঠাঁই মেলেনি, রাস্তায় ফুটপাতে রাতের পর রাত কেটে গেছে। দিচ্ছেন তো খুব হিতোপদেশ, কিন্তু ভাবতে পারেন এসব? জানেন সে কি কষ্ট? চোর-ডাকাত আমি নিজে হইনি, চোর-খুনে আমি চিরদিন ছিলাম না। চেয়ে

ভদ্রভাবে যখন কিছুই মিলল না, তখনই শুধু বাধ্য হয়ে এই পথ আমায় বেছে নিতে হয়েছে। তাই প্রতিজ্ঞা করেছি—যারা আমার আজকের এই দশার জন্য দায়ী, যারা আমায় আজ মানুষ থেকে ভূত গড়ে তুলেছে, যারা আমার ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল মাথার আচ্ছাদন কেড়ে নিলে—তাদের বুকে ছুরি মেরে এর প্রতিশোধ নেব। রাজুর দুই চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল।

সুব্রত উঠে এসে রাজুর প্রশস্ত পেশীবহুল দুই কাঁধের উপর হাত রেখে স্নিগ্ধ স্বরে বললে—কুকুরে কামড়েছে বলে কি আপনিও কুকুরকে ফিরে কামড়াবেন রাজেনবাবু? তবে আপনার সঙ্গে আর একটা বনের পশুর কি তফাত রইল! মানুষ হিসেবে আপনার সংযম, আপনার ক্ষমা, আপনার স্নেহ, আপনার ভালবাসা এসব ভুলে কোথায় ছুটে চলেছেন আপনি কোন্ ধ্বংসের পথে, একটিবারও সেকথা ভেবে দেখেছেন কি আপনি? একবারও ভেবে দেখেছেন কি আপনি আপনার মায়ের কথা? একে প্রতিশোধ নেওয়া বলে না রাজেনবাবু। এর নাম কি প্রতিশোধ? নিজের ঘরে আগুন দিয়ে কার ক্ষতি আপনি করছেন? পুড়ে মরবেন আপনিই—সমাজ নয়, দেশের লোকও নয়। সর্বদা সংশয়, সর্বদা পীড়া—এর নাম কি শান্তি? এর নাম কি স্বস্তি? না-না, চুপ করে থাকলে চলবে না, জবাব দিন।

ভাল লাগে না। আর এসব শুনতে ভাল লাগে না।— থামুন। Sermon on the mount অনেক শুনেছি।

না-না, তা বললে চলবে না। আপনাকে মানতেই হবে এ ভুল, এ অন্যায়। শুনুন রাজেনবাবু, অর্থের অভাব আমার নেই। অথচ সংসারে আমি একা। আমার যদি দু-মুঠো আহার জোটে, তাহলে সেই সঙ্গে আপনারও জুটবে। শৈশবে মাকে হারিয়ে মা কেমন তা জানিনি। আপনার মাকে আমি মা বলে ডেকেছি। অনেক কথা তাঁর সঙ্গে আমার হয়েছে, এ পথ আপনাকে ছাড়তেই হবে। আপনাকে আমি ভাই বলে শপথ গ্রহণ করেছি।

রাজু এবারে হো হো করে হেসে ওঠে, মতলবখানা নেহাত মন্দ ঠাওরাওনি হে! কিন্তু ওতে ভবী ভোলবার নয়। রাজুর চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। রাজু দস্যু হতে পারে, কথার খেলাপ করেনি আজ পর্যন্ত। মরদকা বাত হাতিকা দাঁত।

ছি ছি, শেষটায় তুমি আমায় এই ভাবলে ভাই! আমি তোমায় ঠকাতে চাই? তোমার চোখে ধুলো দেব? হয়তো দিতাম বা অন্তত দেবার চেষ্টাও করতাম, কিন্তু এই আমি তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি, সে ইচ্ছা আর আমার এখন এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। তুমি আমায় বিশ্বাস কর—অন্তত আমায় ভুল বুঝো না ভাই। বলতে বলতে সুব্রতর দুই চোখের কোণে জল দেখা দিল।

এবার কিন্তু রাজু আগের মত ততটা জোরে সুব্রতর কথায় প্রতিবাদ করতে পারলে না।

তাই তো! লোকটা বলে কি? পাগল নাকি? এমন লোকও জগতে আছে নাকি যে নিজের টাকা খরচ করে অন্য একজন অজানা অচেনা লোককে খাওয়াতে চায়? না না—লোকটা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে চালাকি খেলছে! মনে মনে ওর একটা মতলব আছে নিশ্চয়ই!

ভ্রূদুটো কুঁচকে রাজু সুব্রতকে শুধালে, মন্দ কথা নয়, তুমি আমায় টাকা দেবে, তুমি আমায় খেতে দেবে, কিন্তু কেন বল তো? আমার প্রতি তোমার হঠাৎ এ দয়ার কারণটা কি? আমি তোমার কে?

তুমি? তুমি আমার ভাই।

আমি তোমার ভাই? বলে রাজু চমকে উঠল। এর চাইতে তাকে যদি কেউ বলত —সে রাতারাতি হঠাৎ একজন কোটিপতি হয়ে গেছে—তবুও হয়তো সে এতটা আশ্চর্য হত কিনা সন্দেহ।

আমার কথাটা তাহলে তোমাকে স্পষ্ট করে খুলেই বলি রাজু। হ্যাঁ, আজ থেকে সত্যিই তুমি আমার ভাই। শোন, আপনার বলতে আমার সংসারে কেউ নেই, আমি একা। আজ থেকে তুমি আর আমি দুটি ভাই। এস ভাই, আমরা আমাদের মায়ের পায়ে প্রণাম করি। বলতে বলতে সুব্রত এগিয়ে এসে বিস্মিত হতবাক্ রাজুর একখানি হাত ধরে টানতে টানতে রাজুর মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে কখন যে এক সময় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রাজুর মা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, রাজু না টের পেলেও সুব্রত লক্ষ্য করেছিল।

মাগো, আজ থেকে তুমি একা রাজুর মা নও, রাজু যেমন তোমার একটি ছেলে, সুব্রতও তোমার তেমনি আর একটি ছেলে। বলতে বলতে সুব্রত নীচু হয়ে মায়ের পায়ের তলায় মাথাটা নোয়ালে।

সাপ যেমন নিজের একান্ত অজ্ঞাতেই বাঁশির ইঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে যায়, রাজুও ঠিক তেমনি যেন এগিয়ে এসে নোয়ালে তার মাথা মায়ের পায়ে।

আর মা? মায়ের দুই চোখের কোল বেয়ে চলেছে তখন অশ্রু-হাসির লুকোচুরি।

সুব্রত তখন একে একে তার সকল কথাই খুলে বলল রাজুকে। আর সেই ছোটবেলায় মিশনে মানুষ হওয়া থেকে আরম্ভ করে সম্পত্তি পাওয়া ও কলকাতায় পা দেওয়া অবধি উপর্যুপরি একটার পর একটা বিপদে পড়া—কিছুই সে বাদ দিলে না। সব কিছুই সে খুলে বললে রাজুকে।... আমার সব কথাই তো শুনলে রাজু, এবার এস, তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও। দেখি কে আমাদের কি করতে পারে! বলে সুব্রত সস্নেহে তার দুই হাত রাজুর দুই কাঁধের উপর রাখলে।

মা বললে, রাজু তোমার এ বিপদে সাহায্য করবে না তো কে করবে বল? যে স্নেহ, যে ভালবাসা ওকে তুমি একটু আগে দিলে, সে তো এ জীবনে তা ভুলতে পারবে না বাবা!

রাজু মাথা নীচু করে গভীর স্বরে বললে, তুমি আমায় মহাপাপ থেকে বাঁচিয়েছ। বোঝবার ভুলে এতদিন অন্ধের মতন আমি অন্ধকারে ছুটছিলাম, তুমি আমায় আলোর সন্ধান দিলে। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত একথা আমার মনে থাকবে সুব্রত। শুধু এ কাজেই কেন, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি কাজেই আমি ছায়ার মত পিছু পিছু চলবো। শুধু তুমি আমায় ভুলো না ভাই।

প্রথম ভোরের সোনালী আলো যেন বিধাতার আশীর্বাদের মত ঘরের মধ্যে এসে লুটিয়ে পড়ল।

ঠিক হল, কিছু খেয়ে নিয়ে তখনই দুজনে বের হবে। হাতে অনেক কাজ।

তাড়াতাড়ি সব শেষ করে নিতে হবে। আটচল্লিশ ঘন্টার ওপর প্রায় সে হোটেল-ছাড়া, নীতীশ হয়তো কতই না ভাবছে!

মা গরম-গরম লুচি হালুয়া করে নিয়ে এল। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সুব্রত আর রাজু পাশাপাশি বসে তাই খেলে। সে দৃশ্য দেখে মায়ের দুচোখে অশ্রু বুঝি আর ধরে না।

সুব্রত বললে, আঃ, কে জানত মা, এমনি করে বসে খেতে এত আনন্দ! কোথায় শত্রু-কবলে পড়ে ভেবেছিলাম বুঝিবা প্রাণটা নিয়েই টানাটানি পড়বে, তা না, দিব্যি পেলাম এক স্নেহময়ী মা, আর এমন একটি ভাই। একেই বলে কপালজোর! উঃ, আমি কিন্তু ভাবছি রাজু ঐ বেটাদের কথা—যারা তোমায় নিয়োগ করেছিল টাকা দিয়ে আমায় আটকাতে! হায় হায়, বুক চাপড়েই কেঁদে মরবে তারা!

রাজু কিন্তু লজ্জায় মাথা নীচু করলে। খেতে খেতেই ঠিক হল রাজুও সুব্রতর সঙ্গে বর্মা যাবে। সুব্রত মাকে শুধালে, তোমার কোন আপত্তি নেই তো মা?

এতে আর কি আপত্তি থাকতে পারে বাবা! ভাই যাবে ভাইয়ের সঙ্গে!

হ্যাঁ, তারপর সেখানকার সব সম্পত্তির একটা বন্দোবস্ত করে আবার দুই ভাইয়ে যখন ফিরে আসব মা বাংলাদেশে, তখন এই বাংলার এক ছায়া-ভরা নির্জন পল্লীতে গিয়ে বাঁধব একখানা নিরালা কুটির এবং কাটিয়ে দেব এ জীবনের বাকী কটা দিন—মা ও দুই ছেলেতে মিলে হেসে খেলে গান গেয়ে, কি বল মা?

মা আর কি-ই বা বলবে! অশ্রুভরা আঁখি দুটি নিয়ে নীরবে শুধু মৃদু হাসলে। এমন সময় হঠাৎ বাইরের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হল।

মা ও রাজু একসঙ্গে চমকে উঠল। মা বললে, ঐ বুঝি তারা এল!

হ্যাঁ, তারাই এসেছে ; তোমরা একটু দাঁড়াও। বলে রাজু ঘরের মধ্যে গিয়ে কালো ভ্রমরের দেওয়া নোটের গোছাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাজুকে একা সদর দরজার দিকে যেতে দেখে সুব্রত তার একখানি হাত চেপে ধরে বললে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে!

রাজু মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে শুধু বললে, দরকার নেই—আমি একাই যথেষ্ট।

কিন্তু—

ভয় নেই।

রাজু একান্ত নির্লিপ্ত ভাবেই গিয়ে দরজার খিলটার ওপর হাত দিল।

বাইরে হতে তখনও মুহুর্মুহু কড়ানাড়ার শব্দ আসছে—খটা-খটা—খট-খট্!

॥ ১০ ॥
যাত্রা

এক মুহূর্ত রাজু কি যেন ভাবলে। মনের সংশয় কেটেও বুঝি কাটে না। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অভ্যাস, প্রলোভনের একটা তীব্র আকর্ষণ পিছন থেকে বুঝি কেবলই টেনে ধরতে চায়। কিন্তু না, প্রলোভনকে তাকে জয় করতেই হবে। দস্যু রাজুর মৃত্যু ঘটেছে। সে মরুক। সকল দ্বিধা সবলে ঠেলে ফেলে মুহূর্তে রাজু খিলটা খুলে ফেলল, তারপর একটি কথাও বললে না, শুধু নোটের গোছাটা হাতে করে এগিয়ে ধরল লোক দুটির সামনে।

বাইরে ঠিক দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে দুজন লোক। তারা সহসা রাজুকে এমনিভাবে নোটের গোছাটা এগিয়ে ধরতে দেখে একান্ত বিস্মিত হয়েই বললে, এর মানে কি রাজু?

তোমরা টাকা ফেরত নাও, তোমাদের কাজ আমি করতে পারলাম না। আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।

এসবের মানে কি রাজু? তোমার কথা তো আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না, কিসের এ টাকা?

এর মধ্যে বোঝাবুঝির কিছু নেই। তোমাদের টাকা ফেরৎ দিচ্ছি—ধর। আমার দ্বারা তোমাদের কোন সাহায্যই হবে না, আমি দুঃখিত।

ওদের একজন তার সঙ্গীকে চোখ টিপে কি যেন ইশারা করে বললে, ওহে মদন, ওকে আরও কিছু দাও! তা রাজু, এ কথাটা আগে খুলে বললেই তো ল্যাঠা চুকে যেত! বেশ পুরোপুরি সাত হাজারই পাবে। নাও, এখন লোকটার খবর কি বল? লোকটা আর কোন গোলমাল করেনি তো?

সাত হাজার কেন, দশ হাজারেও হবে না। আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।

বেশ, আট হাজারই না হয় দেবো।

বললাম তো, দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজারেও নয়।

রাজুর শেষের কথা ও তার বলার ভঙ্গিতে লোকটি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং তীক্ষ্ণ গভীর স্বরে বললে, তা হলে পারবে না? তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না?

না।

পারবে না?

না—না—না। এই নাও তোমাদের টাকা। বলে টাকাগুলো ওদের হাতে গুঁজে দিয়ে দড়াম করে রাজু দরজাটা এঁটে দিল।

ওই লোকদুটি বোধ হয় এরপর আর সেখানে অপেক্ষা করা নিরর্থক ভেবেই একান্ত হতাশ চিত্তেই ফিরে গেল। ব্যাপারটা যে হঠাৎ অন্যরকম কেন হল, বোধ হয় সেই কথাটিই ভাবতে ভাবতে তারা এগুতে থাকে বড় রাস্তার দিকে।

ওদিকে রাজু এসে ঘরে ঢুকতেই সুব্রত রাজুর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, বিদায় করতে পারলে লোকগুলোকে?

আপাতত।

তা আমিও জানি। এখন তবে চল—বেরুনো যাক।

চল।

সুব্রত আর রাজু মাকে দরজা বন্ধ করতে বলে এসে রাস্তায় নামল।

বেলা নেহাৎ কম হয়নি। পথের মোড় থেকে একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে ওরা দুজনে হোটেল প্যালেসের দিকেই রওনা হল।

হোটেলে পৌছে সুব্রত একটু যেন চিন্তিতই হয়ে পড়ে। ওদের ঘর তালাবন্ধ, নীতীশ বোধ হয় কোথাও বেরিয়েছে! খবর পেয়ে ম্যানেজারবাবু তখনই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন এবং ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি সুব্রতবাবু, দুদিন কোথায় উধাও

হয়েছিলেন বলুন তো? এদিকে আপনার বন্ধুটি যে হেঁটে হেঁটে পায়ের চামড়া তুলে ফেলার জোগাড়! একটা খবর পাঠালেও তো পারতেন!

একটা বিশেষ কাজে বেরুতে হয়েছিল। তা নীতীশ কই?

বোধ হয় আপনার খোঁজেই আবার বের হয়েছেন। কিন্তু আজকের মেলেই না আপনাদের রেঙ্গুনের দিকে রওনা হওয়ার কথা ছিল?

ছিল তো, কিন্তু যাওয়া আর হল কোথায়? এর পরের জাহাজটা ধরতে পারা যায় কিনা দেখি!

সুব্রত আর রাজু হোটেলে অপেক্ষা করতে লাগল। নীতীশ যদি ইতিমধ্যে এসে পড়ে, ওদের না দেখে হয়তো আবার বের হয়ে যেতে পারে।

অনেকক্ষণ পরে ফিরে এল নীতীশ। তার চেহারা হয়ে গেছে রুক্ষ, বিপর্যস্ত। চোখ দুটো লাল। সারা দেহে ক্লান্তির ছাপ।

ঘরে ঢুকতেই সুব্রতকে দেখে নীতীশ আনন্দে চিৎকার করে উঠল—সুব্রত! কখন এলি? কোথায় ছিলি এ দুদিন?

ফিরে এলাম যমের দুয়ার হতে। বলে সুব্রত হেসে উঠল।

যাক, আমি তো ভেবেছিলাম, আর বুঝি তোমাকে ফিরে পাব না কোন দিন। বলতে বলতে নীতীশের দুই চোখের কোলে দু ফোঁটা জল টল-টল করতে লাগল।

সত্যই হয়তো আর ফিরতে পারতাম না—যদি এই রাজু না থাকতো! বলতে বলতে সুব্রত হাত তুলে অদূরে আর একটি চেয়ারে উপবিষ্ট রাজুকে দেখালে।

সুব্রতকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে ও কথার মাঝে নীতীশের এতক্ষণ রাজুর দিকে একদম নজরই পড়েনি, সুব্রতর কথায় সে রাজুর দিকে চোখ তুলে চাইল। বিস্মিতভাবে সুব্রতর দিকে চেয়ে বলল, এঁকে তো চিনতে পারলাম না সুব্রত!

রাজু—আমার এক ভাই। তারপর রাজুর দিকে চেয়ে বলল, এর কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি রাজু—এরই নাম নীতীশ। আমার প্রিয় বন্ধু। ভাইয়ের চাইতেও বেশি আমায় ভালবাসে আর স্নেহ করে। আমার সহপাঠীও। এও আমাদের সঙ্গে বর্মা চলেছে।

তখন সুব্রত একে একে হোটেল থেকে অদৃশ্য হওয়ার পর আজ পর্যন্ত দুদিনের প্রতিটি ঘটনা নীতীশকে খুলে বলে গেল—কিছুই গোপন করলে না বা বাদ দিলে না। পরে সে নীতীশকে প্রশ্ন করলে, সব তো শুনলে, এখন তোমার খবর কি বল?

আমার আর খবর কি! এই এত বড় কলকাতা শহরে কোথায় তোমায় খুঁজে পাব, আর কোন দিন তোমায় পাব কিনা—খালি এই কথাই ভেবেছি এ দুটো দিন, আর সারাটাক্ষণ পথে পথে তোমায় খুঁজেছি ও শেষে না পেয়ে ফিরে এসে ঘরে বসে বসে কেঁদেছি। হ্যাঁ ভাল কথা, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে মনে আছে? তিনি কিন্তু খুব উৎসুক হয়ে তোমার খোঁজখবর নিয়েছেন সর্বদা দেখা হলেই!

বলিস কি?

হ্যাঁ।

যাহোক, এর পর তিন বন্ধুতে আরও যে কত গল্প—কত কথা হল! এই দুই দিনের গুমোট নিরানন্দ ভাবটা আবার হাসি-গল্পে-কথায় কেটে গিয়ে আগেকার সহজ ও আনন্দঘন ভাবটা ফিরে এল। ওদের কথা যেন আজ ফুরোতেই চায় না।

তারপর সেদিন হোটেলেই ওরা দ্বিপ্রহরের আহারাদি সেরে নিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বারোটা নাগাদ বুকিং অফিসে গিয়ে, টিকিটের একটা বন্দোবস্ত করে আগামী জাহাজে রওনা হওয়ার সকল ব্যবস্থা করে ফেললে। তারপর বাজার ঘুরে ঘুরে আসন্ন সুদূর বর্মা-যাত্রার আবশ্যকীয় খুঁটিনাটি কতকগুলো জিনিসপত্র কিনে তিনজনে বিকেলের দিকে পাথুরেঘাটায় রাজুদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে ওরা সব জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল একটা ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে।

কড়ানাড়ার শব্দে রাজুর মা এসে দরজা খুলে দিলেন।

মুটের মাথায় অত জিনিসপত্র দেখে রাজুর মা জিজ্ঞাসা করলেন, এত সব জিনিসপত্র—কি ব্যাপার!

সব হোটেল থেকে নিয়ে এলাম, আজকের দিনটা এখানেই থাকব মা। সুব্রতই বললে।

মার আনন্দ বুঝি আর ধরে না।

সুব্রত বুঝতে পেরেছিল তা রাজুর মার মুখের দিকে চেয়েই, তাই বললে, এই দেখ মা, তোমার আর একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছি। বলে সুব্রত মার কাছে নীতীশের পরিচয়টা দিয়ে দিল। প্রণাম কর নীতীশ, আমাদের মা।

আনন্দে চোখের জল চাপতে চাপতে রাজুর মা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে রান্নাঘরে জলখাবারের আয়োজন করতে চলে গেলেন।

আর তিন বন্ধু দোতলার ছাদের উপর একখানি পাটি বিছিয়ে বসে গেল গল্প করতে।

অল্প অল্প চাঁদের আলোয় পৃথিবীকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। সারাদিন অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরি করবার পর মৃদু মৃদু হাওয়ায় তাদের শরীর যেন জুড়িয়ে গেল।

মা গরম চা ও জলখাবার নিয়ে এলেন। তিন বন্ধু হাসি-গল্পের মধ্যে জলখাবার শেষ করলে।

ঠিক হল সুব্রতরা না ফিরে আসা পর্যন্ত মা এই বাড়িতেই থাকবেন। একটি ভাল ঝি রেখে যাওয়া হবে, আর কিছু টাকা দিয়ে যাওয়া হবে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ বাবদ।

অনেক রাত্রে আহারাদির পর তিনজন শয্যায় এসে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। এবং একটু বাদেই সুব্রত ও নীতীশ ঘুমিয়ে পড়লেও রাজুর চোখে কিন্তু ঘুম ছিল না একেবারেই। মাত্র বারো-চোদ্দ ঘণ্টার মধ্যে রাজুর জীবনের উপর দিয়ে যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। সেই ঝড়ের দোলা এখনও ও অনুভব করছে। নিকষ কালো অন্ধকারের বুকে প্রথম সূর্যের সোনালী আলো। রাত্রির সূর্য-তপস্যা বুঝি শেষ হল।

পরের দিন প্রত্যুষে।

যথাসময়ে মার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ওরা তিনজনে ট্যাক্সিতে মালপত্র চাপিয়ে আউট্রাম ঘাটে এসে হাজির হল।

ভোরের আলোয় গঙ্গার গৈরিক জলরাশি তরঙ্গ-ভঙ্গে ঝিলমিল করছে। গঙ্গাবক্ষ হতে প্রবাহিত ঝিরঝির প্রভাতী হাওয়ায় দেহ ও মন যেন জুড়িয়ে যায়। শুচিস্নানে স্নিগ্ধ প্রকৃতি।

আসন্ন জলযাত্রার জন্য প্রকাণ্ড রেঙ্গুনগামী জাহাজটা জেটিতে নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে।

জাহাজ-ঘাটে তখন যাত্রী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের অসম্ভব ভিড়। নানাজাতীয় লোকজনের বিভিন্ন কল-কাকলীতে সমগ্র জাহাজ-ঘাটটি মুখরিত।

কুলীর মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে তিন বন্ধু—সুব্রত, রাজেন ও নীতীশ ভিড়ের মধ্যে জাহাজের দিকেই এগুচ্ছিল। সুব্রত ছিল সকলের পিছনে। সহসা পিছন থেকে একটা আচমকা ধাক্কা খেতেই, পাশেই যে লোকটার উপরে ও পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল, তার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই সুব্রত যেন চমকে ওঠে। সে সবিস্ময়ে দেখলে, ভদ্রলোকটি আর কেউ নয়—সেদিনকার রাত্রে হোটেলে দেখা ওদের পাশের ঘরের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি।

সন্দেহের একটা কালো ছায়া যেন মুহূর্তে মনটাকে ভারী করে তোলে। ওদিকে তখন পিছন থেকে অগ্রগামী যাত্রীদের দল ক্রমাগত সামনের দিকে ঠেলছে। দাঁড়াবার উপায় নেই। সুব্রত এগিয়ে চলল।

দু-একবার সামনের দিকে চলতে চলতে সুব্রত আশেপাশে ও পশ্চাতের দিকে তাকাল, কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে আর দেখতে পেল না।

জাহাজের সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে জাহাজের একজন লোক কেবিন-যাত্রীদের কেবিনের নম্বর বলে দিচ্ছিল, সুব্রতর হাত থেকে টিকিটগুলো নিয়ে তার উপর লিখে দিল ১৬নং কেবিন— ১, ২ ও ৩নং বার্থ। চলে যান সোজা সেলুন ডেকে।

ওরা উঠে গেল।

॥ ১১ ॥
দূরের পাড়ি

জলযাত্রা ওদের জীবনে এই প্রথম। তাছাড়া সমুদ্র, এই গঙ্গা পার হলেই আসবে সেই সমুদ্র। বিরাট জলধির সেই রূপ কতবার সুব্রত মনে মনে কল্পনাই করেছে শুধু। সেই সীমাহীন জলরাশি—বইতেও পড়েছে। দেখেও তার সাধ মেটে না—সে এক অপূর্ব বিস্ময়!

কেবিন-বয়ের সাহায্যে রাজু ও নীতীশ কেবিনের মধ্যে মালপত্রগুলো কোনমতে গুছাতে ব্যস্ত, সুব্রত এসে সেলুন ডেকের সামনে ভর দিয়ে রেলিংয়ে দাঁড়াল। এখনও যাত্রীদের আনাগোনা চলছে। সুব্রত ভিড়ের মধ্যে দেখছিল, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে আর দেখা যায় কিনা। জেটিতে ভিড়ের মধ্যে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখা অবধি সে বেশ একটু চিন্তিত হয়েই পড়েছিল।

সূর্যের আলোয় গঙ্গাবক্ষ তখন ঝলমল করছে। ছোট-বড় ঢেউগুলো একটার গায়ে একটা ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে। ছোট-বড় যাত্রীবাহী পান্‌সী ও মহাজনী নৌকাগুলো দাঁড় দিয়ে জল কেটে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। নৌকোর মাথায় বিচিত্র বর্ণের সব পাল —হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা স্টীমার সিটি দিয়ে যাতায়াত করছে এদিক ওদিক। সুব্রত অন্যমনস্ক ভাবে সে সব দেখছিল। বড় ভাল লাগছিল ঐ খণ্ড খণ্ড দৃশ্য।

এমন সময় কে যেন পিছন থেকে এসে সুব্রতর কাঁধে হাত দিল এবং আস্তে আস্তে বলল, কি এত ভাবছ সুব্রত?

কে—নীতীশ? রাজু কোথায়?

কেবিনে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখছে।

হুঁ। শত্রু কিন্তু আমাদের পাশে পাশে চলেছে নীতীশ, সাবধান!

সুব্রতর কথায় নীতীশ চমকে উঠল, বলল, শত্রু! বল কি সুব্রত? কি করে জানলে?

যেমন করেই হোক আমি তা জেনেছি। এ পর্যন্তই এখন জেনে রাখ।

জাহাজ তখন গঙ্গার গৈরিক জলরাশি কেটে ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে দূর সাগরের দিকে।

জাহাজ ধীরে ধীরে বজবজ, উলুবেড়ে প্রভৃতি ছাড়িয়ে যতই সাগরের দিকে এগুচ্ছে তার গতিবেগও একটু একটু করে তেমনই বেড়ে চলেছে।

রোদ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেকে বেশ গরম বোধ হতে লাগল। সকলে কেবিনে গিয়ে ঢুকল। সারা দুপুর কেউই আর কেবিনের বাইরে এল না।

বিকেলের দিকে রোদ যখন পড়ে গেছে, তিন বন্ধু বাইরে ডেকে এসে দাঁড়াল। বাঃ বাঃ! কি সুন্দর দৃশ্য! ঐ অদূরে জলের কোল ঘেঁষে দিনের শেষ রাঙা রবি পাটে বসেছে!

চারিদিকে জল জল আর জল। অথৈ—অনন্ত—পারাপারহীন নীল জলরাশি। জলের বুকে ঢেউগুলো ভেঙে গিয়ে অজস্র বুদবুদের সৃষ্টি করে জাহাজের দুপাশে।

উপরের নীল আকাশের নীলিমা নীচেকার সমুদ্রের নীলিমায় নীল হয়ে গেছে যেন। এ বুঝি এক বৃহৎ সুদূরপ্রসারী অনন্ত নীল পটরেখা। কোথায় মাটি! পাড় নেই—সীমা নেই! সেই সীমাহীন কূলপ্লাবী অসীম নীলিমার বুকে ভেসে চলেছে তাদের দ্রুতচলমান সুবৃহৎ বাষ্পীয় পোত কোন্ সুদূরের পথে কে জানে!

ডেকের উপর দু-একজন ইউরোপীয় যাত্রী চেয়ার পেতে বসেছিলেন। সুব্রতরা তিনজনে এসে সামনে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

নীতীশ বললে, মনে পড়ে সুব্রত, রবি ঠাকুরের "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতাটা? বলেই মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে থাকে সে—

বুঝিতে না পারি, কি জানি কি আছে তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল-সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে
কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের অন্বেষণে?

রাজু শেষের দিকে সুর করে বললে, সুব্রতর সোনার খনির সন্ধানে!

তিনজনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

দিনের আলো একটু একটু করে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কালো জলের বুকে ধূসরবর্ণের একখানি পর্দা কে যেন বিছিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রবক্ষ হতে এক-একটা হাওয়ার ঝাপটা চোখে-মুখে এসে লাগে।

ডেকে ঘণ্টা বেজে উঠল,—সংকেত ধ্বনি। বিকেলের চা ও খাবার দেওয়া হয়েছে। ওরা তিনজনে চা ও খাবার খেতে ডাইনিং রুমের দিকে গেল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পরে ওরা তিনজনে যখন ডেকের ওপর ফিরে এল তখন

চারিদিক ঘন কালো আঁধারে আলো হয়ে উঠেছে—জাহাজের বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। কালো আকাশের বুকে অনেকগুলো তারা মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে।

সমুদ্রের জল এখন আর তত ভাল করে দেখা যায় না—শুধু একটা অস্পষ্ট চকচকে দিগন্তপ্রসারী প্রকাণ্ড কালো পাতের মতই মনে হয়। আকাশের তারার আলো সমুদ্রের ঢেউয়ের বুকে ছোট্ট ছোট্ট আলোর বিন্দুর মতই চিকচিক করে কাঁপে। সমুদ্রবক্ষ হতে একটা চাপা গমগম শব্দ কানে এসে বাজে। ডেকটা তখন প্রায় শূন্য—কেবল দু-একজন যাত্রী দাঁড়িয়ে কিংবা বসে গল্প করছে বা সিগারেট পান করছে এদিক-ওদিক।

গায়ে গরম জামা চাপিয়ে ওরা তিনজনে আবার বাইরে এসে দাঁড়াল—সমুদ্রে নৈশ সৌন্দর্য উপভোগের আশায়। সমুদ্রবক্ষ হতে শীতের কনকনে হাওয়া নাকে মুখে চোখে এসে হু-হু করে লাগে। ঠাণ্ডা হলেও বেশ আরামদায়ক।

সেরাত্রে চাঁদের উদয় একটু বিলম্বেই হল ; আকাশের চাঁদ দেখা দিল খাওয়া-দাওয়া সেরে তাদের ডেকে আসবার পর।

নীতীশ বললে, তার শরীরটা যেন কেমন করছে—কেমন একটা ঘিনঘিনে ভাব। পেটের ভিতরের বস্তুগুলো কেমন যেন পাক দিয়ে গলার দিকে ঠেলে উঠে আসতে চায়—মুখ দিয়ে জল সরে ; মাথাটাও কেমন ভার-ভার ঝিমঝিম করে।

সুব্রত বললে, ও আর কিছু নয়—সামুদ্রিক পীড়া। যাও, বিছানায় শুয়ে পড়ে একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর গে, কতকটা ভাল লাগতে পারে। লিমন স্কোয়াশ আছে, একটু খেয়ো।

নীতীশ শুতে চলে গেল।

শীতের রাত হলেও আকাশে কুয়াশা নেই।

চাঁদের রূপালী আলোয় চারিদিক তখন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় অসংখ্য বুদবুদের গায়ে গায়ে চাঁদের আলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেন অজস্র সোনার কুচির মতই মনে হয়। আজকের এই মধু-রাতে কি কারও চোখে ঘুম আছে!

একসময় সুব্রত রাজুকে বললে, ডি. এল. রায়ের সেই গানটা জান রাজু?

নীল আকাশের অসীম ছেয়ে
ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো..

রাজু বললে, আহা কি সুন্দর রাত্রি! কি চমৎকার চাঁদের আলো! দেখে মনপ্রাণ শীতল হয়।

অনেক রাত্রে ওরা দুজনে কেবিনের দিকে যখন ফিরল, জনশূন্য ডেকটা তখন খাঁ-খাঁ করছে। প্রকাণ্ড ডেকটা পার হয়ে সিঁড়ির নীচে নামলেই একটা সরু রাস্তা, তারই একদিকে সারি সারি কেবিন। সেই রাস্তাটায় যদিও আলোর বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু সে আলো তেমন সতেজ বা প্রচুর নয়।

রাস্তাটার মাঝামাঝি জায়গায় ওদের কেবিনটা, আর সেই রাস্তার মাথায় ব্র্যাকেটের গায়ে সব লাইফ-বেল্ট ও ফায়ার-টব ঝোলানো। সেই জন্যেই আলো থাকা সত্ত্বেও স্থানটি অপেক্ষাকৃত আঁধার।

ওদের কেবিনের সামনে এসে পৌছতেই হঠাৎ দড়াম করে ওদের দরজাটা খুলে গেল এবং চক্ষের পলক ফেলতে-না-ফেলতে কালো কাপড়ে আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া

একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎগতিতে ওদের পাশ দিয়ে সামনের আলো-আঁধারের মধ্যে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরক্ষণেই স্থানটির জমাট নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করে অদূরে একটা তীক্ষ্ণ শিস শোনা গেল। শব্দটা যেন কাঁপতে কাঁপতে মুহূর্তে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সুব্রত স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ব্যাপার কি?

দুজনেই একবার পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলে।

সামনেই ওদের কেবিনের দরজাটা হা-হা করছে খোলা। কেবিনের ভিতরটা অন্ধকার। ঠিক এই সময় আবার পূর্বের মত আর একটা শিস শোনা গেল।

ততক্ষণে সুব্রত নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে এবং আর কালবিলম্ব না করে দুজনেই একসঙ্গে গিয়ে অন্ধকারে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করল।

॥ ১২ ॥
ছায়ামূর্তি কে?

কেবিনের মধ্যে অন্ধকার।

অন্ধকারে প্রথমটা ওরা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না।

সুইচটা টিপে আলোটা জ্বালাও তো রাজু!

সুব্রত বলবার আগেই রাজু অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে সুইচটা খুঁজছিল।

খুট করে সুইচ টেপার শব্দ হল ও সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় প্রথমেই যা ওদের নজরে পড়ল সে হচ্ছে—ওদের সমস্ত কেবিনময় ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ওদের জিনিসপত্রগুলো ছত্রাকার হয়ে আছে। দেখলেই মনে হয় একটু আগে কেউ-না-কেউ এসে যেন কেবিনের জিনিসপত্রগুলো এলোমেলো করে গেছে। উপরের বার্থের দিকে চেয়ে দেখলে, নীতীশ কম্বল মুড়ি দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একে তো ও ঘুমকাতুরে, তার ওপর আবার শরীর খারাপ, বেচারী হয়তো কিছুই টের পায়নি! যে-ই ওদের অনুপস্থিতে কেবিনে এসে থাকুক, সে ওদের বাক্স বা সুটকেস কিছুই খুলতে পারেনি, খোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র। একটা বেতের বাক্স ছিল, তাতে কাপড় জামা, খানকতক বই ও দু-চারটে এই যাত্রাপথের একান্ত আবশ্যকীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র ছিল, সেটায় তালাচাবি দেওয়া ছিল। সেই বাক্সটা খোলা, তার ভিতরকার যাবতীয় জিনিসপত্র তছনছ হয়ে অর্ধেক বাক্সের মধ্যে, অর্ধেক বাইরে কেবিনের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো।

সুব্রত রাজুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, কিছু নিতে পারেনি। নিশ্চয়ই চোরটোর হবে। যাই হোক রাজু, তুমি অপেক্ষা কর। আমি একবার ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি। এ তো ভাল কথা নয়। জাহাজের কেবিনে চোরের উপদ্রব! এর এখনই একটা বিহিত করা প্রয়োজন!

সুব্রত যেমন ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছে, রাজু পিছন থেকে তার জামার এক প্রান্ত টেনে ধরে বললে, শোন সুব্রত. দাঁড়াও।

কী? বলে সুব্রত খুব আশ্চর্য হয়েই রাজুর দিকে ফিরে তাকালে।

রাজু বললে, এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে কোন লাভ হবে বলে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না।

কেন? সুব্রত একান্ত বিস্মিত হয়েই রাজুর মুখের দিকে তাকায়, কেন, একথা তুমি বলছ কেন রাজু?

কেন বলছি? কারণ তুমি যা ভাবছ ব্যাপারটা তা নয়। রাজু জবাব দেয়।

কি তুমি বলতে চাও রাজু, খুলেই বল না?

তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না? মাত্র কিছুক্ষণ আগে যে এ-ঘরে এসেছিল, সে সামান্য চোর নয়? সে তোমার টাকা-কড়ির লোভে এ-ঘরে আসেনি!

হেঁয়ালী রেখে সোজা ভাষায় বল রাজু। অত ঘোরপ্যাঁচ আমি বুঝতে পারি না।

আমার কি মনে হয় জানো, এ সেই কালো ভ্রমরেরই দলের লোক। এ তাদেরই কারও কাজ।

অ্যাঁ, বল কি! কালো ভ্রমর! তবে? সুব্রত চমকে ওঠে, এদিকটা সুব্রতর তো একবারও মনে হয়নি! মনে পড়ল এতক্ষণে, শত্রু-পরিবেষ্টিত হয়েই তো তারা চলেছে ছায়ার মত পাশে-পাশেই তো শত্রু চলেছে তাদের।

কিন্তু কালো ভ্রমরের লোকই যদি হবে, কেন সে হঠাৎ চোরের মত কেবিনে এসে ঢুকেছিল! অবিশ্যি এ তাদেরই অসাবধানতার ফল। আগে থেকে তাদেরই তো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কখন কোন্ পথে যে অতর্কিতে শত্রু-আক্রমণ এসে পড়ে তাদের ওপরে, এবং তার জন্য সর্বদা তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে এ তো জানা কথাই।

সত্যি রাজু, এ কথাটা কিন্তু এতক্ষণ একবারও আমার মনে হয়নি। সত্যি ব্যাপারটা যেন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে।

সুব্রত বিশেষ চিন্তিত হয়ে ওঠে।

ভাল করে একবার বাক্স ও সুটকেসগুলো সব পরীক্ষা করে দেখ সুব্রত। দেখ আগে কোন দরকারী অথবা মূল্যবান বস্তু চুরি গেছে কিনা।

ঠিক বলেছ। বলে সুব্রত তখনই সমস্ত বাক্স-সুটকেস খুলে জিনিসপত্র ওলট-পালট করে দেখতে লাগল। টাকা-পয়সা, টিকিট, পাসপোর্ট, ফটো ও পরিচয়পত্র সবই ঠিক আছে। যতদূর মনে হয় কিছু চুরি যায়নি।

কি, দেখলে সব?

হ্যাঁ। কিছু চুরি গেছে বলে মনে হচ্ছে না তো।

দুই বন্ধুতে তখন আবার সমস্ত জিনিসপত্র গোছগাছ করে কেবিনের দরজা বন্ধ করে বার্থের ওপরে শুয়ে পড়ল।

রাজু হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে কেবিনের আলোটা নিভিয়ে দিল। কেবিনটা অন্ধকারে ভরে গেল।

বার্থের ওপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে সুব্রতর চোখে কিন্তু ঘুম আসে না। নানা এলোমেলো চিন্তা একটার পর একটা মনের কোণে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাজু যা বললে, সত্যিই কি তাই? সত্যিই কী লোকটা কালো ভ্রমরের দলের কেউ? হয়তো বা রাজুর কথাই ঠিক, কিন্তু লোকটা যে কিসের খোঁজে ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র তছনছ

করে গেল, তাই বা কে জানে! লোকটা যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ওদের কেবিনে এসে চোরের মত প্রবেশ করেছিল, সে বিষয়েও কোন ভুল নেই।

ঢেউয়ের দোলায় জাহাজটা দুলছে। নিশীথের অন্ধকারে একটানা সমুদ্রকল্লোল ভেসে আসে।

পোর্টহোলের কাচের শার্সিটা সুব্রত খুলে দিল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া সমুদ্রের বুক থেকে এসে ওর চোখ-মুখে ঝাপটা দিয়ে গেল।

মামাকে সুব্রত জীবনে কোন দিনও দেখেনি। এই যে বিশাল সম্পত্তিপ্রাপ্তি, এও যেন রূপকথার কাহিনীর মতই মনে হয়। তারপর কালো ভ্রমরের আবির্ভাব। শান্ত আকাশের কোণে যেন একটা ধূমকেতুর মতই ওর জীবনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই চিঠি পাওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আগাগোড়া সব ঘটনাগুলো ওর বোজা দু চোখের পাতার ওপর যেন ছায়াছবির মতই একটার পর একটা জেগে উঠছে। আগাগোড়া সমগ্র ঘটনাগুলো শুধু আশ্চর্যই নয়, আকস্মিক! এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় সুব্রত ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ এক সময় খুট করে একটা অস্পষ্ট শব্দে ওর ঘুমটা ভেঙে গেল। অন্ধকারে যদিও ভাল করে দৃষ্টি চলে না, তথাপি ওর যেন মনে হল তরল অন্ধকারের মধ্যে সঞ্চরণশীল একটা ছায়ামূর্তি। মূর্তিটা যেন অত্যন্ত লঘুপদে নিঃশব্দে চুপিচুপি ছায়ার মত কেবিনের দরজাটা খুলে বাইরে চলে গেল। সুব্রত কিছুটা সময় নিঃশ্বাস চেপে রেখে, অতি ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠে বসল ; তারপর গায়ের ভারী কম্বলটা তুলে নিয়ে বেশ করে সেটাকে গায়ে ঢেকে নিয়ে পা টিপে টিপে বার্থ থেকে নেমে কেবিনের ঈষৎ উন্মুক্ত দরজার দিকে অগ্রসর হল।

দরজা দিয়ে বাইরের গলিপথে এসে দাঁড়াতেই সহসা একঝলক ইঞ্জিনের উত্তপ্ত হাওয়া নাকে-মুখে এসে যেন একটা তাপ ছড়িয়ে গেল।

কেবিনের বাইরে সরু অপরিসর নির্জন গলিপথটা অস্বচ্ছ আলো-ছায়ায় ভাল করে চোখে ঠাওর হয় না, তবু সুব্রত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেশ ভাল করে চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কিন্তু কই, কিছুই তো তেমন চোখে পড়ে না! কি এখন করা উচিত—তাই ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে অন্যমনস্কের মত, এমন সময় হঠাৎ ও দেখলে ওদিককার অন্ধকার হতে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে এদিকেই এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে।

সুব্রত সচকিত হয়ে উঠল।

ছায়ামূর্তিটা ক্রমে এগিয়ে কাছে—আরও কাছে এসে পড়েছে। গলিপথের ওপরেই একটা ক্ষীণ জালে ঢাকা আলোর রশ্মি মূর্তিটার ওপর পড়তেই সুব্রত সবিস্ময়ে দেখলে, ছায়ামূর্তি আর কেউই নয়, রাজু!

এ কি? এত রাত্রে রাজু চুপি চুপি কেবিন থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল! আর কেনই বা গিয়েছিল?—কিন্তু ততক্ষণে রাজু একেবারে কেবিনের দরজার গায়ে এসে পড়েছে। সুব্রত চট্ করে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু আড়াল করে দাঁড়াল। রাজুর কিন্তু কোনদিকেই তেমন দৃষ্টি নেই।

সে সোজা কেবিনের মধ্যে ঢুকে যেমন দরজা বন্ধ করতে যাবে, সুব্রত হাত বাড়িয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আলোর সুইচটা টিপে দিল। খুট্ করে একটা শব্দ হল এবং মুহূর্তে কেবিনের সব আঁধার কেটে গিয়ে উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক ঝলমল করে উঠল। হঠাৎ

আচমকা এমনি ভাবে আলো জ্বলে উঠতেই রাজু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে—ঠিক সামনেই সুব্রত তারই মুখের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজু হেসে ফেলল। কিন্তু ও কি! সুব্রতর মুখটা অত গম্ভীর কেন? চকিতে সুব্রতর গম্ভীর মুখখানা যেন রাজুর আনন্দদীপ্ত মুখখানার ওপরে একটা চাবুক বসিয়ে দিল। রাজুর মুখের হাসি দপ্ করে নিভে গেল—হাওয়ার ঝাপটা লেগে প্রদীপ-শিখার মত।

॥ ১৩ ॥
হেরফের

রাজু আর চুপ করে থাকতে পারলে না, সুব্রত কিছু বলবার আগেই সে মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে ডাকল, সুব্রত!

সুব্রত কোন জবাব দিল না। ধীরপদে নিজের বার্থের দিকে গিয়ে জুতো ছেড়ে বার্থের ওপরে উঠে শুয়ে পড়ল।

শোন সুব্রত, অমনি করে আমার ডাক এড়িয়ে তোমাকে আমি যেতে দেব না। না, তা কিছুতেই হতে দেব না। রাজু সুব্রতর বার্থের সামনে এসে দাঁড়াল।

সুব্রত চুপ।

সুব্রত! ডাকে আবার রাজু।

কি?

তোমার মনে কিসের সংশয় উপস্থিত হয়েছে, তুমি মুখে না বললেও তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কেন? তুমি তো অনায়াসেই আমাকে প্রশ্ন করতে পারতে! জিজ্ঞাসা করতেও তো পারতে, এত রাত্রে হঠাৎ কেবিন থেকে বের হয়ে কোথায় আমি গিয়েছিলাম? আমারও বলবার হয়তো কিছু থাকতে পারে। কেন তোমার এ কথাটা মনে হল না?

তার আর প্রয়োজন কি? এতক্ষণে সুব্রত প্রথম কথা বললে।

প্রয়োজন আছে নিশ্চয় এবং সে প্রয়োজন আমার নয় তোমার।

আমার! বিস্মিতভাবে সুব্রত পাল্টা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, তোমার সুব্রত। কথায় বলে 'মন না মতি'! সন্দেহের শেষ রাখতে নেই। জানো, আমি এত রাত্রে কেবিন থেকে বের হয়ে কোথায় গিয়েছিলাম?

ও-কথা থাক। সুব্রত বাধা দেয়।

না। এখন আর তা সম্ভব নয়। আমাকে সব খুলে বলতেই হবে। আজ আমাকে নিয়ে তোমার মনে যে সন্দেহ জেগেছে, এর জন্য তোমাকে তত আমি দোষ দিই না। এই তো আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের শিক্ষা। সত্যি হাসি পায়, যখন এই সমাজই আবার সংস্কারের বুলি আওড়ায়! যাক, এই সমাজেরই মানুষ তুমি, একে ডিঙিয়ে চলবে, তোমার সাধ্য কি? ব্যাপারটা আশ্চর্যও নয়, অসম্ভবও নয়।

বড় দুঃখেই রাজুর ওষ্ঠপুটে ক্ষীণ একটা হাসির রেখা জেগে ওঠে। হয়তো বা চোখের কোল দুটোও জ্বালা করে ওঠে। রাজু আবার বলতে থাকে, কেমন করে তুমি ভুলবে যে, মাত্র কয়েকদিন আগেও তোমার শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমি তোমারই

অনিষ্টসাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম! কেমন করে তুমি ভুলবে, দীর্ঘ পাঁচটা বৎসর কি সংসর্গে আমি কাটিয়ে এসেছি! ভুলতে তুমি পার না—তোমাদের সমাজ, তোমাদের সংস্কার, তোমাদের শিক্ষা সে কথা তোমাকে ভুলতে দিতে পারে না তো! তুমি হয়তো ভেবেছিলে, আমি দু দিন আগে যা ছিলাম—চোর, ডাকাত, শয়তান, তাই আছি আজও বুঝি।

হঠাৎ সুব্রত ডাকলে, রাজু!

কিন্তু সুব্রতকে বাধা দিল রাজু, না, আমায় বলতে দাও। মুখে তোমরা যতই বল না কেন, বিশ্বাসের ভিত্‌টা যে তোমাদের কত পলকা, তা আমি জানি। চোরকে তোমরা চিরদিনই চোর ছাড়া আর কিছু ভাবতে পার না। একদিন যে রাজু চোর ছিল, আজ সে তার মত বদলাতে পারে—সে ভাল হতে পারে, এটা হয়তো তোমাদের ধারণারও বাইরে। তোমার কথাই বা বলি কেন, আমি নিজেও কম বিস্মিত হইনি। মুহূর্তে যেন আমার মধ্যে দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে, সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেছে। রাজুর দু চোখের কোল বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু নেমে এল।

সুব্রত তাড়াতাড়ি বার্থ থেকে নেমে এসে রাজুর হাত ধরলে, ক্ষমা কর ভাই আমায়। আমি...

না, শোন—কেন আমি হঠাৎ কেবিন থেকে বের হয়ে গিয়েছিলাম, জান? হঠাৎ যেন আমার মনে হয়েছিল, কেবিনের ঠিক পাশেই যেন কে শিস দিল। তাই আমি চুপি চুপি দেখতে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম না যে তুমি জেগে আছ।

আমাকে তুমি ক্ষমা করো ভাই। আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। তোমার মন না বুঝে আমি সত্যিই কষ্ট দিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর বন্ধু।

ম্লান ব্যথিত কণ্ঠে রাজু বলতে লাগল, তোমারও এতে কোন দোষ নেই সুব্রত। সত্যিই তো একদিন আমি চোর-ডাকাতই ছিলাম। শুধু তুমি কেন, জগতের অনেকেই বিশ্বাস করতে পারে না যে, অতি হীন, শয়তান বা দুর্ধর্ষ চোর-ডাকাতও ভাল হবার সুযোগ বা সুবিধা পেলে আবার একদিন ভাল হতে পারে। আজ মার একটা কথা বারবারই আমার মনে পড়ছে সুব্রত। পয়সার অভাবে যখন আমি অসৎসঙ্গে মিশে হীন চোরের বৃত্তি নিয়ে দিন দিন নীচ হতে নীচ হয়ে চলেছিলাম—মা আমায় ডেকে বলেছিলেন একদিন, বাবা রাজু, এ কথাটা কোন দিনও যেন ভুলিস না যে, মানুষের সঙ্গই মানুষকে চরম অধঃপাতের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। সেদিন মার সে-কথা বুঝিনি বা বোঝবার চেষ্টাও করিনি, কেননা শয়তান তখন আমার ঘাড় ধরে চালাচ্ছিল। তখন ভাবতাম—এই বুঝি ঠিক। তারপর যেদিন তুমি আচমকা আমার চোখে আঙুল দিয়ে আমার ভুল ভেঙে দিলে, আমায় বোঝালে কি ন্যায় আর কি অন্যায়—সেদিন সারাটা রাত গত পাঁচ বছরের জীবনের কথা ভেবে ভেবে একটিবারের জন্যও চোখ বুজতে পারিনি—শুধু কেঁদেছি। তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলে, কিন্তু আমি ঘুমোতে পারিনি। একদিন যে আমি ভেবেছি, জগতে অন্যায় পাপ বলে কিছু নেই—ওসব বাজে কথামাত্র, ভীরু দুর্বলের আত্মরক্ষার কবচ মাত্র—আজ সেই আমিই অন্যায়ের কথা ভাবতেও শিউরে উঠি। একদিন যে আমি পাপের নেশায় বুঁদ হয়ে কোন রকম পাপকেই পাপ এবং চরম অন্যায়কেও অন্যায় বলে মনে করিনি, আজ সেই আমাকেই তুমি সন্দেহ করেছ এই কথা ভাবতে গিয়েই বেদনায় বুক ফেটে গেল, চোখে জল এল। মুহূর্তে যেন কে আমাকে পর্বতের চূড়া থেকে মাটির

ধূলোয় নিক্ষেপ করলে। মুহূর্তে আমায় আমার বিবেক যেন স্মরণ করিয়ে দিল, কি আমি ছিলাম, আর কোন্ অধঃপাতের অন্ধকারে আমি ছুটে চলেছিলাম অন্ধের মত নেশার ঘোরে!

অনুতপ্ত ব্যথিত রাজুর কথাগুলো যেন সুব্রতর মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বসে যাচ্ছিল। ওরও চোখের পাতা দুটো সজল হয়ে এল। ইতিমধ্যে ওরা কেউই লক্ষ্য করেনি কখন এক সময় অসুস্থ নীতীশও ওদের কথাবার্তার আওয়াজে জেগে উঠে বসে ওদের কথা শুনছিল।

হঠাৎ নীতীশের কথায় ওদের দুজনেরই চমক ভাঙল, সত্যি রাজু, তোমার কথাই ঠিক। তোমার মত আরও কত লোক যে আমাদের বোঝবার ভুলে ও সমাজের অব্যবস্থার দরুন সুযোগ ও সুবিধার অভাবে ভুলপথে ঘুরে ঘুরে মরছে, কজনা আমরা তাদের খোঁজ রাখি! আমাদের দেশের আইন-কানুন, পুলিস চোর বা ডাকাতকে বিচার করে জেলে ঠেলে দিয়েই খালাস! তারা ভাবে—বুঝি একজন দোষীকে কিছুকাল বন্দী রেখে কিছুটা শারীরিক কষ্ট দিলেই, সে আপনা-আপনি শুধরে একেবারে রাতারাতি সাধু-সন্ত বনে যাবে! মানুষের বাইরের খোলসটাকে নিয়েই তারা টানাটানি করে মরে, কেউ একবার ভাবেও না দেহের ভিতরে যে মনটা বসে আছে তার কথা। তারা বুঝতে চায় না, আজ যে চোর বা ডাকাত, সে চোর বা ডাকাত হয়েই জন্মায়নি। দিনের সূর্যের পিছনে আছে রাত্রির একটা ইতিহাস। তারা বীজের সন্ধান করে না, বীজ হতে যে ফল হল, সেইটেই তাদের চোখে বড় হয়ে দেখা দেয়।

সুব্রত এর পর সহসা রাজুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে স্নেহসিক্ত স্বরে বললে, ভাই রাজু, যে সম্পত্তির লোভে, যে মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে আজ এত কষ্ট স্বীকার করেও অনির্দিষ্টভাবে সকল প্রকার বিপদ তুচ্ছ করে অন্ধের মতই ছুটে চলেছি সে সম্পত্তি পাই না পাই তাতে আর আজ আমার এতটুকু দুঃখ নেই বন্ধু। আজ থেকে এইটাই সবচাইতে আনন্দ ও গর্বের জিনিস হবে রাজু যে তোমার মত একটি ভাই আমার মিলল। তুমি আমায় ফেলে কোনদিন কোথাও যেও না ভাই। তাছাড়া মানুষ মাত্রেরই তো ভুল হয়, শুধু সেইটুকু ভেবেই আজকের এ ভুল আমার ক্ষমা কর। বল ভাই, তুমি আমায় ক্ষমা করলে, নইলে যে আমি কিছুতেই মনে শান্তি পাব না।

রাজু গদগদ কণ্ঠে বললে, না ভাই, আর ওকথা নয়, let us forgive and forget! যে স্নেহ ও ভালবাসা তুমি আমায় দিয়েছ, এ কি জীবনে ভুলব? ভাই কি কখনও ভাইকে ফেলে কোথাও যায় সুব্রত—না সেটা কখনও সম্ভব? একথা কি জান না ভাই, দুঃখের ভিতর দিয়েই আমাদের বন্ধন দৃঢ় হয়?

এর পর সে-রাত্রে কারও কি আর ঘুম আসতে পারে! তাই তিন বন্ধুতে কথায়-কথায়ই রাত্রিটাকে এক সময় ভোর করে দিল।

তারপর একসময় সুব্রত বলল, চল যাই, সাগরের বুকে সূর্যোদয় দেখি গে। সে নাকি ভারি চমৎকার দৃশ্য!

রাজু বললে, চল।

নীতীশের শরীরটা তখনও তেমন সুস্থ হয়নি, তাই সে শুয়েই রইল। রাজু আর সুব্রত সূর্যোদয় দেখবার জন্যে কেবিনের বাইরে গেল।

হঠাৎ আকাশের বুকে দেখা দিয়েছিল একটা কালো মেঘ। এক পশলা বৃষ্টির পরে ।কাশ আবার পরিষ্কার হয়ে গেল যেন।

॥ ১৪ ॥
ঝড়ের রাতে

সুব্রত আর রাজু খোলা ডেকের উপরে রেলিংয়ের একেবারে কোল ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

একটা সূক্ষ্ম ধূসর পর্দা—বিলীয়মান অন্ধকারের শেষ আভাস সমুদ্রের কালো জলের সঙ্গে মিশে যেন একাকার হয়ে গিয়ে থির-থির করে কাঁপছে। ঝিরঝির করে বইছে সামুদ্রিক লোনা হাওয়া ; শরীর যেন নিমেষে জুড়িয়ে গেল। ক্রমে একটু একটু করে সেই অস্পষ্ট ধূসর পর্দাখানি অপসারিত হচ্ছে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে। সমুদ্র ফিরে পাচ্ছে তার আসল রূপ। সেই সীমাহীন অফুরন্ত নীলিমা। ক্ষণে ক্ষণে যেন বহুরূপী সমুদ্র বদলাচ্ছে তার রূপ। আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে চারিদিক। এখন মনে হচ্ছে যেন নীল সাগরের নীল জলের কোলে এসে উপরের নীলাকাশ আপনাকে ধরা দিয়েছে। ক্রমে দিকচক্রবাল কি অদ্ভুত চাপা লালচে আভায় জ্বলজ্বল করছে, কি অপরূপ সে দৃশ্য! মনোরম নয়নাভিরাম! দু-একজন করে যাত্রীদের মধ্যে ঘুম ভেঙে অনেকেই তখন ডেকের ওপর এসে জড়ো হচ্ছে সমুদ্রবক্ষে সূর্যোদয় দেখবার জন্য।

আকাশের ও জলের মিলন-রেখায় তখন নানা বর্ণের খেলা শুরু হয়েছে। হঠাৎ এক সময় ঐ দূরের ঢেউয়ের শীর্ষদেশ রক্তজবার মতই লাল হয়ে উঠল—তারপর সহসা অল্পক্ষণের মধ্যেই লাল সূর্য যেন আচম্বিতে সোঁ করে ঘুম ভেঙে জলশয্যা ছেড়ে উপরের দিকে ভেসে উঠল একটি গোলাকার লাল রক্তপিণ্ডের মত।

রাঙা সূর্যের প্রথম আলোয় দিগন্তপ্রসারী নীল সমুদ্রের লক্ষ লক্ষ ঢেউ ঝিমমিল করে উঠল, যেন কে এক দক্ষ রূপ-শিল্পী সোনা গলিয়ে সমুদ্রের বুকে ঢেলে দিয়ে গেল। সূর্য-সারথি তোমায় প্রণাম করি!

নীতীশের সামুদ্রিক পীড়া আরও একটু বেশী করে দেখা দিল। সকালের দিকে মাত্র কোনমতে মাথাটা উঁচু করে সেই যে খানিকটা লেবুর রস ও অল্প একটু আইসক্রীম খেয়ে বিছানার ওপরে কাত হল, সারাটা দিনের মধ্যে আর মাথাই তুললে না। জাহাজের ডাক্তার এসে দেখে কি একটা ওষুধও খাইয়ে দিয়ে গেলেন।

ডাইনিং সেলুনে বসে দ্বিপ্রাহরিক লাঞ্চ সেরে আবার রাজু আর সুব্রত বাইরের সেলুন-ডেকের ওপরে এসে দাঁড়াল। সমুদ্র দেখে যেন কিছুতেই আশ মিটতে চায় না। যতই দেখা যায় ততই যেন নেশা ধরে। প্রথম মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণে জলধি আর এক অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। হু-হু করে সমুদ্রবক্ষ হতে হাওয়া ছুটে আসছে। যেদিকে দেখ শুধু নীল জল আর জল। বিরাট নীল জলধির সীমাহীন বুকে সুব্রতদের জাহাজখানি হেলে-দুলে ছোট্ট একটি অসহায় মোচার খোলার মতই ভাসতে ভাসতে চলেছে তো চলেছেই। জাহাজের দুপাশে ঢেউগুলি অবিশ্রাম ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। নীল জলের বুকে ভাঙা ঢেউয়ের জলবিন্দুগুলো রৌদ্রালোকে ঝিলমিল করে।

রাজু বললে, জল আর জল। জল আর ভাল লাগে না সুব্রত। প্রাণটা যেন মাটি দেখবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে। এই জলরাশির মধ্যে যেন আমরা হারিয়ে গেছি।

সুব্রত বলল, মাঝে তো আর দুটো দিন!

এর পরের দিন সন্ধ্যার দিকেই আকাশের পশ্চিমদিকে একটা কালো মেঘ দেখা দিল। এবং একসময় সেই অল্প একটুখানি মেঘ রূপকথার কলসীর মুখখোলা দৈত্যের মতই যেন দেখতে দেখতে হু-হু করে আকাশের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুহূর্তে ঢেকে ফেলল।

সেই সঙ্গে ঘনিয়ে এল চারিদিকে একটা থমথমে ভাব—কিসের যেন একটা ভয়াবহ চাপা ইশারা বুকের মাঝে দুর-দুর করে কাঁপন জাগায়। বাতাসও গেছে থেমে। শুধু শোনা যায় সমুদ্রের গুম্ গুম্ আওয়াজ একটা একটানা।

ওপরের কালো মেঘের ছায়া নীচের কালো জলে প্রসারিত হয়ে বিশ্বচরাচরকে যেন একটা মসীকৃষ্ণ পর্দায় আবরিত করে ফেলেছে।

দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়। মাইকে জাহাজের ক্যাপ্টেনের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে শোনা যায়, যাত্রীরা যে যার কেবিনে যাও। ঝড় আসছে। এসময় কেউ বাইরে থেকো না।

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ডেক ছেড়ে ভিতরের দিকে পা বাড়ায়। সমুদ্রের ঢেউগুলোও যেন ক্রমে অশান্ত হয়ে উঠছে।

মাঝে মাঝে এক-একটা বড় ঢেউ ঝপাৎ করে এসে জাহাজের গায়ে আঘাত হানছে। রাজু ও সুব্রত কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে। হঠাৎ এক সময় একটা ঠাণ্ডা বাতাস কানের পাশে এসে শন-শন শব্দ করে যেন একটা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে যায়। সমস্ত শরীরটা যেন কি একটা অজানিত আশঙ্কায় আচমকা সিরসির করে ওঠে। মাঝে মাঝে নীচের ইঞ্জিনঘরের ঘণ্টার ঢং ঢং ধ্বনি কানে এসে বাজে।

অন্ধকারে সমুদ্রের কালো জলের বুকে ভাঙা সাদা ঢেউগুলো অপরূপ দেখাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে সেই ঘনায়মান আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে দিনের শেষ আলোটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল যেন একেবারে। জাহাজের সামনে সার্চলাইটটা এর মধ্যেই জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। নিশ্ছিদ্র কালো অন্ধকারের বুকে সেই সুতীব্র আলোর রশ্মি কখনও জলের বুকে, কখনও শূন্যে, কখনও ডাইনে, কখনও বা বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিরাট একটা অনুসন্ধানী চোখ মেলে যেন।

অন্ধকারের বুকে একসময় টিপ-টিপ করে বৃষ্টি নামল। আর থাকা নিরাপদ নয়।

সুব্রত ও রাজু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কেবিনের দিকে অগ্রসর হল। বৃষ্টি তখন বেশ জোরেই আরম্ভ হয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে বইতে শুরু করেছে প্রচণ্ড হাওয়া।

তীব্র বাঁশির মত হাওয়ার গর্জন। বাঁধন-হারা একপাল দৈত্য যেন হুড়মুড় করে সহসা পৃথিবীর বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেবে সব তছনছ ওলট-পালট করে। প্রচণ্ড ঢেউয়ের দোলায় অতবড় জাহাজটা একবাব এদিকে একবার ওদিকে কাত হয়ে পড়ছে। বৃষ্টির ঝাপটাগুলো যেন গায়ে চোখে মুখে এসে সূচের মত বেঁধে।

কোনমতে ওরা দুজনে রেলিং ধরে সন্তর্পণে কেবিনের দিকে এগিয়ে চলে।

মস্ত বড় একটা ঢেউ জাহাজের পাটাতনটাকে ধুয়ে দিয়ে গেল। ঢেউয়ের প্রচণ্ড টানে আর একটু হলে সুব্রত ভেসে যাচ্ছিল, কিন্তু কোন প্রকারে রেলিংটাকে সজোরে

চেপে ধরে সামলে নিল। টলতে টলতে অতিকষ্টে সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে ওরা এসে শেষটায় সিঁড়ির মুখে পৌঁছাল।

এইটুকু পথ আসতে কম পরিশ্রম হয়নি। দুজনেই হাঁপাতে থাকে। ওদের কেবিনের সামনে এসে দরজার হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে দেখল, কেবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। নীতীশ হয়তো দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সুব্রত দরজার গায়ে আঘাত করে ডাকল, নীতীশ! এই নীতীশ! দরজা খোল্! একেবারে ভিজে গেছি।

কিন্তু আশ্চর্য, দরজা খুলল না।

ওরা তখন আরও জোরে দরজা ঠেলে ডাকাডাকি শুরু করল, তবু দরজা খোলে না। এ কি ব্যাপার! নীতীশ কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? এত ঠেলাঠেলি ডাকাডাকি তবু কানে শুনতে পায় না! হঠাৎ আচমকা একটা সন্দেহ রাজুর মনে জেগে ওঠে। অন্য কেউ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়নি তো? নীতীশ তো অসুস্থ—মাথা পর্যন্ত তুলতে পারে না।

আমার যেন কেমন ভাল ঠেকছে না সুব্রত। দরজা ভেঙে ফেল লাথি মেরে।

কিন্তু রাজুর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সহসা বন্ধ দরজাটা ওদের চোখের সামনে দড়াম করে খুলে গেল। এবং কে যেন সামনে দণ্ডায়মান সুব্রতকে প্রবল এক ধাক্কায় ঠেলে ফেলে ঝড়ের মত সামনের গলিপথে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল উপরের ডেকের দিকে। সুব্রত হুড়মুড় করে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল। সমগ্র ঘটনাটি চকিতে এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে, রাজু বা সুব্রত কেউই ভাল করে কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। রাজুর হতভম্ব ভাবটা কাটতেই সে আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে যে লোকটা একটু আগে সুব্রতকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে ডেকের দিকে ছুটে গেছে তাকে অনুসরণ করে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুব্রতর হাতে ও পায়ে বেশ চোট লেগেছিল, কিন্তু সেও ততক্ষণে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়িয়েছে। সামনেই ওদের কেবিনের দরজাটা খোলা। কেবিনের মধ্যে আলো নেভানো—অন্ধকার!

॥ ১৫ ॥
ফটো চুরি

সুব্রত অন্ধকার কেবিনের মধ্যে ঢুকে প্রথমটা কিছুই দেখতে পায় না। অন্ধকারেই কোনমতে হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা টিপতেই আলো জ্বলে উঠল। এবং আলো জ্বলতেই যে ভয়াবহ দৃশ্য সামনে ওর চোখে পড়ল, চমকে ও দু পা পিছিয়ে এল।

কেবিনের ফ্লোরটা যেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর সেই প্রবহমান ধারার মধ্যে জ্ঞানহীন নীতীশ মুখথুবড়ে পড়ে আছে। হাত দুটো তার সামনের দিকে প্রসারিত।

দু-চার সেকেন্ড সুব্রত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। কি এখন ও করবে? কি করা ওর উচিত এখন? অত রক্ত যেন ওর দু চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে।

হতচকিত ভাবটা কেটে গেলে সুব্রত নীতীশের মাথার কাছে বসে পড়ল এবং সন্তর্পণে নীতীশের দেহটা স্পর্শ করলে। বাঁদিকে কপাল কেটে গেছে। সেই ক্ষতস্থান

দিয়ে রক্ত ঝরছে তখনও। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখলে, না, এখনও নিঃশ্বাস পড়ছে। তবে এখনও বেঁচে আছে!

সামনেই কাবার্ডের উপরে জলের জাগ্‌টা ছিল, সেটা তুলে নিয়ে নীতীশের চোখে-মুখে জলের মৃদু ঝাপটা দিতে লাগল।

কপালের রক্তে গায়ের জামাটা ভিজে একেবারে লাল হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে নীতীশ নিঃশ্বাস নিল।

নীতীশ! নীতীশ! সুব্রত নীতীশের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাকতে লাগল ব্যাকুল কণ্ঠে।

কিন্তু নীতীশের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। জলে রক্তে কেবিনের ফ্লোরটা থৈ থৈ করছে। সুব্রত সন্তর্পণে নীতীশের দেহটা বুকে করে তুলে নীচের বার্থে শুইয়ে দিল।

ভিজে জামাটা বদলানো দরকার। তা ছাড়া এখনই একবার জাহাজের ডাক্তারকে ডাকতে হবে। কপালের ক্ষতস্থানটা দিয়ে তখনও একটু একটু রক্ত পড়ছে।

নীতীশকে বার্থের উপরে শুইয়ে শুকনো জামার খোঁজে ফিরে দাঁড়াতেই সুব্রত আবার চমকে উঠল, ওদের বাক্স ও সুটকেসগুলো সমস্ত খোলা, লণ্ডভণ্ড, ছত্রাকার হয়ে চারিদিকে পড়ে আছে। এতক্ষণ নীতীশকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এসব ওর চোখেই পড়েনি। কিন্তু সেদিকে তখন মন দেওয়ার মত সময় নেই, তাই সুব্রত আগে তাড়াতাড়ি করে একটা জামা তুলে নিল খোলা বাক্সের ভিতর থেকে।

বার্থের ওপরে শোওয়া অবস্থাতেই সুব্রত কোনমতে নীতীশের ভিজে জামা-কাপড়গুলো বদলে দিল। একটা ধুতি থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে কপালের ক্ষতস্থানে একটা পট্টিও বেঁধে দিল।

নীতীশ! নীতীশ!

আঃ, একটু জল! নীতীশ চোখ মেলে তাকাল।

সুব্রত জাগ্‌ থেকে জল নীতীশের গলায় ঢেলে দিল।

খুব কি কষ্ট হচ্ছে ভাই?

মাথায় বড় যন্ত্রণা।

তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাক ভাই, এখনই আমি ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করছি।

সুব্রত কেবিনের কলিং বেলটা টিপে দিল। তাড়াতাড়ি ভিজে জামাকাপড়গুলো সমস্ত বদলে নিল।

একটু পরেই কেবিনের বয় এসে হাজির হল।

লোকটা গোয়ানিজ, বেশ ইংরেজী বলতে পারে।

Send the doctor please. Quick!

Yes sir! বলে কেবিন-বয় চলে গেল।

নীতীশ চোখ বুজে নিঝুম হয়ে পড়ে আছে।

কে এসেছিল কেবিনে—কেনই বা এসেছিল! সুব্রত প্রথমেই তার সুটকেসটা পরীক্ষা করতে বসল। টাকাকড়ি, টিকিট ও উইল সম্পর্কীয় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মায় সেই ছোটবেলার ফটোটা পর্যন্ত সুটকেসের মধ্যে ছিল।

টিকিটগুলো, পার্স ও তার মধ্যকার দুইশত টাকা নোটে খুচরোয় সব ঠিক আছে, কিছুই চুরি যায়নি।

সর্বনাশ! সেই ফ্ল্যাট ফাইলটা—যার মধ্যে অ্যাটর্নীর চিঠি ও ফটোটা ছিল সেটাই নেই?

ফটো—ফটোটাই যে উইল অনুযায়ী মামার সম্পত্তির দাবির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান নিদর্শন! অ্যাটর্নী চিঠিতেও তাই লিখেছে। এখন সেই ফটোটাই যদি না পাওয়া যায় তবে ও কোন দাবিতে, কিসের জোরে রেঙ্গুনে গিয়ে অ্যাটর্নী অফিসে সম্পত্তির দাবি জানাবে? কেউ তো ওর কথা বিশ্বাস করবে না! ওর দাবিকে তো সকলে হেসেই উড়িয়ে দেবে!

এত অর্থব্যয়, এত কষ্ট, এত শ্রম সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। এতদূর এসে শেষ পর্যন্ত ঘাটের কাছে হল নৌকাডুবি। এ শুধু ওর ব্যর্থতাই নয়, এ ওর পরাজয়—নির্মম পরাজয়। শেষ পর্যন্ত দস্যু কালো ভ্রমরের হল জয়। মিথ্যে সে আস্ফালন করেনি।

কালো ভ্রমর! কালো ভ্রমর!...মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। না, সুব্রত আর চিন্তা করতে পারে না।

সুব্রত খোলা এলোমেলো সুটকেসটার সামনে বসে পড়ল মাথায় হাত দিয়ে।

কেবিনের দরজায় 'নক' শোনা গেল এবং কেবিন-বয় এসে কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করল, Doctor is coming, sir!

Thank you.

কেবিন-বয় আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

না, এমনি করে সুব্রত পরাজয় মেনে নেবে না। না না, কিছুতেই নয়। শেষ পর্যন্ত ও লড়বে। দেখবে ঐ কালো ভ্রমর কে? কত শক্তি সে ধরে! আর তাছাড়া আর একটা কথা—কালো ভ্রমরের লোক তার ফটোটা চুরি করলেও এই জাহাজের মধ্যেই আছে তারা এখনও নিশ্চিত।

চকিতে মনে পড়ল জাহাজ-ঘাটে অকস্মাৎ দেখা সেই বৃদ্ধের কথা।

দোষ তো তারই, জানা সত্ত্বেও কেন সে অসুস্থ নীতীশের উপরে সব ভার ফেলে কেবিনের বাইরে গিয়েছিল!

এ তারই হঠকারিতা ও অবিবেচনার ফল। আহা বেচারী নীতীশ! হয়তো অসুস্থ শরীরেই সে লোকটাকে বাধা দিতে গিয়ে আহত হয়েছে!

মা! নীতীশ কাতরোক্তি করলে সুব্রত উঠে নীতীশের কাছে গেল।

॥ ১৬ ॥
সম্মুখ সমরে

আর রাজু!

পলায়নপর লোকটাকে অনুসরণ করে রাজু এক এক লাফে সিঁড়িগুলো টপকে আবার ডেকের উপর এসে দাঁড়াল।

বাইরে তখন প্রকৃতির রুদ্রলীলা চলছে। নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকার, চোখের দৃষ্টি অন্ধ হয়ে যায়। প্রমত্ত বায়ুর হাহাকার আর সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। হাওয়ার গর্জনের সঙ্গে মিশে গেছে উত্তাল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন।

রূপকথার হাজার হাজার দৈত্য-দানবগুলো যেন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে পৃথিবীর ওপরে এসে শুরু করেছে ভয়াবহ এক তাণ্ডব নৃত্য।

একে শীতের রাত্রি, তার ওপর এই প্রচণ্ড ঝড়-জল—ঠাণ্ডায় যেন হাত-পা সব অবশ হয়ে আসে, খিল ধরছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—সোনালী আলোর চকিত ইশারা।

ঢেউয়ের দোলায় জাহাজখানা যেন ওলট-পালট হচ্ছে। স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়াবার পর্যন্ত উপায় নেই।

অন্ধকার ডেকের দিকে তাকিয়ে রাজু ভাবছিল, এবার ও কি করবে? হঠাৎ এমন সময় বিদ্যুতের আলোয় ও দেখলে, লোকটা বেশী দূর যেতে পারেনি, রেলিংটা চেপে ধরে একটু দূরের অবশ্যম্ভাবী পতন হতে নিজের দেহটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

আর মুহূর্ত দেরি না করে রাজু ঐ ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই লোকটার দিকে এগিয়ে গেল। কোনমতে অন্ধকারেই টলতে টলতে গিয়ে রাজু লোকটাকে জাপটে ধরল। তার পর শুরু হল সেই ঝড়-জল-বৃষ্টির মধ্যে দুজনের মল্লযুদ্ধ।

গায়ের শক্তিতে কেউ কম যায় না। একবার রাজু লোকটাকে কায়দা করে নীচে ফেলে, আবার লোকটা রাজুকে কাবু করে উপরে উঠে বসে। কখনও আবার পরস্পরকে জাপটে ধরেই গড়াতে গড়াতে ডেকের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পড়ে।

রাজুর চোখের নীচে ও থুতনী কেটে রক্ত ঝরছে। লোকটিও আহত হয়েছে শরীরের অনেক জায়গায়। কতক্ষণ যে এইভাবে চলত কে জানে, হঠাৎ ওদের মাঝখানে আর একজন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তৃতীয় ব্যক্তি মাঝখানে পড়ে ওদের সঙ্গেই কয়েকটা গড়াগড়ি খেয়ে নিল। তার পরই হঠাৎ একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে রাজুর আক্রমণকারী ডেকের অন্যপ্রান্তে গড়িয়ে গেল।

রাজু উঠে বসবার আগেই, বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় দেখলে, কে একজন সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি উঠে টলতে টলতে রাজু লোকটিকে অনুসরণ করলে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে পৌঁছবার আগেই লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেছে ততক্ষণে। পরিশ্রান্ত রাজু উপায়ান্তর না দেখে কেবিনের দিকে পা বাড়াল। কেবিনে ঢুকে দেখে সুব্রত নীতীশের শিয়রের ধারে দাঁড়িয়ে। জাহাজের ডাক্তার নীতীশের মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন।

সুব্রত বা ডাক্তার কেউ রাজুকে লক্ষ্য করেনি। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর ফিরে দাঁড়াতেই ডাক্তারের দৃষ্টি রাজুর ওপরে গিয়ে পড়ল, এ কি! আপনার এ অবস্থা কেন?

সুব্রতরও দৃষ্টি ততক্ষণে রাজুর ওপরে গিয়ে পড়েছে। জল, ময়লা ও রক্তে রাজুর বীভৎস চেহারা। বাঁ চোখের নীচে ও থুতনীর ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছে।

এ কি রাজু!

ডাক্তার রাজুকেও ফার্স্ট এইড দিলেন তখনই।

সংক্ষেপে রাজু ও সুব্রত ঘটনাগুলো ডাক্তারকে যথাসম্ভব বলে গেল।

ডাক্তার লোকটি একজন ক্যানেডিয়ান। বয়স চল্লিশের উর্ধ্বে। তিনি ওদের মুখে আনুপূর্বিক ঘটনা শুনে বললেন, তোমাদের এখনই গিয়ে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একটা সংবাদ দেওয়া উচিত। আমি আজ প্রায় বরো বছর এই জাহাজে চাকরি করছি, এরকম

ঘটনা আমার চাকরি-জীবনে এ জাহাজে কখনই ঘটেনি। এক কাজ কর না হয়, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে এস, আমিই ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

সুব্রতই তখন ডাক্তারের সঙ্গে চলল ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে। ক্যাপ্টেন লোকটি বৃদ্ধ। সুব্রতর মুখে সব ঘটনা শুনে বললেন, It is really funny Baboo! However—চল, তোমাদের কেবিনটা একবার আমি দেখব।

বেশ তো চলুন।

ক্যাপ্টেন আরও দুজন জাহাজের কর্মচারীকে ডেকে আনলেন। সকলে মিলে তখন ওদের কেবিনের দিকে অগ্রসর হল। কেবিনে ঢুকতে যাবে সবাই, হঠাৎ এমন সময় সুব্রতর ঠিক পাশেরই কেবিনের দরজা খুলে যিনি বের হয়ে এলেন, তাঁকে দেখে সুব্রত যেন ভূত দেখবার মতই চমকে দাঁড়িয়ে গেল।—কলকাতার হোটেলের সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি!

যাহোক, দলবল নিয়ে ক্যাপ্টেন সুব্রতর কেবিনে প্রবেশ করে সব দেখলেন।

দেখবার পর গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, তাই তো বাবু, এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও যে আমি বুঝতে পারছি না! Beyond my imagination! কিন্তু তুমি আমায় কি করতে বল? যদি তুমি বল, সব কেবিন আমি সার্চ করতে পারি।

সার্চ করে কি কোন লাভ হবে সাহেব? কথাটা বললে জাহাজের অন্য একজন কর্মচারী, তাছাড়া এই জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছেন। তাঁরা হয়তো এ ব্যাপারটা আদপেই পছন্দ করবেন না। তাঁদের সম্মানের পক্ষে হয়তো হানিকর হবে।

অবশ্য তোমার কথাটাও ঠিক জন। কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপারকে তো আমরা একেবারে চেপেও যেতে পারি না। এক কাজ করলে হয়, যদি বাবুদের অবিশ্যি মত থাকে!

কি?

পোর্টে ডিস্ এমবার্ক করবার আগে আমরা জল-পুলিসকে সংবাদ দিতে পারি। তারা সার্চ করলে কারও কোন অভিযোগই থাকবে না। কারণ পোর্টে ও ধরনের সার্চ তো প্রায়ই হয়।

কি বলো বাবু, আমার কর্মচারী যা বলছে, তাতে তোমাদের মত আছে?

সুব্রত ভেবে দেখল কথাটা নেহাত অযৌক্তিক নয়। তাছাড়া শত্রুপক্ষকে নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। এতে করে হয়তো তারা আরও সাবধান হয়ে যাবে। এমন কি হয়তো কাগজপত্র ও ফটোটা নষ্টও করে ফেলতে পারে।

বেশ, আমিও ভেবে দেখি, যা হয় আমি তোমাকে কালই জানাব। সুব্রত বলে।

এর পর ক্যাপ্টেন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ক্যাপ্টেন ও জাহাজের অন্যান্য কর্মচারীরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর রাজু বললে, কিন্তু ফটোটা যে আমাদের ফেরত চাই-ই সুব্রত! তা সে যেমন করে, যে উপায়েই হোক।

সবই তো বুঝলাম রাজু। কিন্তু ফটোটা উদ্ধারের আপাতত কোন উপায়ই তো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা ডেকের ওপরে যে দুটি লোকের সঙ্গে তোমার একটু আগে সংঘর্ষ হয়েছিল, তাদের কাউকেই কি তুমি চিনতে পারনি রাজু?

না।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় রাজু, এ কালো ভ্রমরের দলের লোকেরই কাজ?

তাছাড়া আর কে তোমার ঘরে ঢুকে টাকাকড়ি সব ফেলে রেখে একটা সামান্য ফটো চুরি করবার জন্য আসবে বল! তাছাড়া ভুলে যাচ্ছ কেন, তোমার সেই অ্যাটর্নীর চিঠির কথাগুলো!

না রাজু, আমি ভুলিনি। বলে একটু থেমে সুব্রত আবার ডাকল, রাজু!

বল।

তোমার কি মনে হয় কালো ভ্রমর স্বয়ং নিজেই আমাদের সঙ্গে এই জাহাজে যাত্রী হয়ে চলেছে?

না।

কেন?

তার কারণ কালো ভ্রমর কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিল পরের জাহাজেই সে রেঙ্গুনে চলে যাবে।

সে কি! কালো ভ্রমরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি?

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে দেখা হবার দু'দিন আগে।

এ কথা তো এতদিন কই তুমি আমাকে বলনি রাজেন! সুব্রত স্থির দৃষ্টিতে রাজুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

না, বলিনি।

কিন্তু বললে তো তোমার কোন ক্ষতি ছিল না!

তা ছিল না বটে, তবে প্রয়োজন মনে করিনি বলেই বলিনি। অবান্তর কতকগুলো কথা বলবার মধ্যে, আমার ধারণা, কোন সার্থকতাই নেই সুব্রত। আর ধর যদি বলতামই, তাতেই বা তোমার কি এমন সুবিধা হত? তোমার হাতে যখন যে মুহূর্তে হাত মিলিয়েছি, সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত অতীত আমি বিসর্জন দিয়েই এসেছি। কালো ভ্রমরের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন তোমরা ছিলে আমার শত্রু, আর আজ তোমরা আমার প্রিয়জন—বন্ধু, এবং শুনলে হয়তো অবাক হবে, কালো ভ্রমর ডাকাত, দস্যু, তস্কর যাই হোক না কেন, তার ওপরে আমার অসীম একটা শ্রদ্ধা আছে মানুষ হিসেবে। তোমরা জানো না, কিন্তু কালো ভ্রমরই প্রথম আমার দস্যুজীবনে আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় যে ডাকাত, দস্যু বা তস্কর হলেও আমরা মানুষ। যাক সে-সব কথা, এখন কি করবে বলে ঠিক করেছ?

রাত্রি অনেক হয়েছে, বড় পরিশ্রান্ত আমি রাজু, তাছাড়া ঘুমও পেয়েছে।

সুব্রত নীতীশের বার্থটার ওপরে উঠে টান টান হয়ে শুয়ে কম্বলটা মুড়ি দিল।

॥ ১৭ ॥
পাষাণে নির্ঝর

বার্থের ওপর শুয়ে শুয়ে সুব্রত ভাবছিল রাজুর কথাই। এখনও রাজুকে নিয়ে সময়ে সময়ে তার মনে সন্দেহ জাগে কেন!

এ কদিনের অনুতাপের হোমানলে নিশিদিন পুড়ে পুড়ে রাজু যে সোনা হয়ে গেছে, এ প্রমাণ তো সে আরও একবার পেয়েছে। তাছাড়া রাজুর যদি কালো ভ্রমরের দলের সঙ্গে যোগাযোগ একটু কিছু থাকতই, তাহলে এই কদিনের নিকট-সাহচর্যে কি সেটা ওদের চোখে ধরা পড়ত না!

আচমকা সামান্য কয়টি মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে রাজুর এ পরিবর্তন এসেছে বলেই না ওর মন মাঝে মাঝে পীড়িত হয়ে ওঠে!

একদিন যে মন্দ ছিল, সে আবার ভাল হয়ে উঠেছে, এ দুনিয়ায় সে নজিরের তো অভাব নেই!

দস্যু রত্নাকরও তো ঋষি বাল্মীকি হয়ে উঠেছিলেন একদিন। যিনি একদিন অকাতরে অসহায় মানুষের বুকে ছুরি চালিয়ে আনন্দ পেতেন, তিনিই পরবর্তীকালে একদিন আবার ব্যাধের শরাঘাতে জর্জরিত ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে বিলাপ করে উঠেছিলেন। না, না—এ ওর অন্যায়!

আর রাজু! বার্থের উপরে শুয়ে শুয়ে সে একাকী নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করছিল। তার পাঁচ বৎসরের স্খলনের ইতিহাসকে সে ভুলতে চাইলেও এরা ভুলতে দিতে চায় না কেন?

যাকে সে মুহূর্তে নিঃশঙ্কচিত্তে বন্ধু বলে আপনার মত করে বুকে টেনে নিল, তাকে নিয়েও মনে সংশয়ের পীড়া! কেন এমন হয়?

তার মনে তো আর কই এতটুকু ক্লেদও অবশিষ্ট নেই। আজও তো সে নিরন্তর অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছে, আজও তো অনেক সময় হঠাৎ তার অতীত জীবনের স্মৃতি মনের পটে উদিত হয়ে লজ্জায় গ্লানিতে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল হয়তো, কিন্তু তবু রাজুর চোখে ঘুম নেই। সুব্রতও হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ওর কানে এল নীতীশের ক্ষীণ ক্লান্ত কণ্ঠস্বর, একটু জল!

তাড়াতাড়ি রাজু শয্যা ছেড়ে উঠে নীতীশের শিয়রের কাছে এসে দাঁড়াল, জলের জাগটা হতে গ্লাসে জল ঢেলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে গ্লাস হতে একটুখানি জল নীতীশের গলায় ঢেলে দিয়ে সস্নেহে নীতীশের মাথায় একখানি হাত রেখে রাজু ডাকলে, নীতীশ ভাই!

চোখ বুজেই নীতীশ কোনমতে সাড়া দিল, উঁ!

এখন কেমন আছ ভাই?

কি স্নেহমাখা কণ্ঠের সুর—প্রাণ যেন জুড়িয়ে যায়। শয়তানের বুকে ভগবান যখন জাগেন, এমনি স্নেহ-কোমল হয়েই বুঝি জাগেন। প্রত্যেক মানুষের বুকেই ভগবানের আসন পাতা থাকে ; কারও আসনটি জুড়ে ভগবান বসে থাকেন, আর কারও আসন

খালিই পড়ে থাকে চিরটা কাল। রাজুর বুকের যে আসন এতদিন ছিল খালি, আজ সেখানে দেবতা এসে বসেছেন। তাই তো আজ মানুষের দুঃখে ডাকাত রাজুর বুকে জেগেছে সমবেদনা। তার চোখের কোণে জমে উঠেছে সমবেদনার অশ্রু।

এখন কেমন আছ ভাই? একটু কি ভাল লাগছে? বলতে বলতে গভীর স্নেহে রাজু নীতীশের কপালে হাত বোলাতে লাগল।

নীতীশ বলে, ভাল।

কেমন করে তোমায় এমন জখম করে গেল ভাই? টের পেলে না লোকটা কে?

তা তো জানি না, লোকটার মুখে একটা মুখোশ পরা ছিল। ঝিম দিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ একটা শব্দে মাথা তুলে দেখি, একটা মুখোশ-আঁটা লোক সুব্রতর সুটকেসের তালাটা ভাঙ''র চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি কোনমতে আমি বিছানা হতে উঠে যেমন লোকটাকে পিছন থেকে গিয়ে জাপটে ধরেছি, অমনি লোকটা চমকে ফিরে দাঁড়াল। তারপরই লাগল মারামারি। উঃ, সে-সময় তোমরা কেউ যদি কেবিনে এসে পড়তে, নিশ্চয়ই বেটাকে ধরা যেত!

হুঁ, তারপর?

তারপর যখন দেখলাম, অসুস্থ শরীরে লোকটার সঙ্গে পেরে উঠছি না, তখন তোমাদের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে আরম্ভ করলাম। বলতে বলতে নীতীশ জোরে জোরে হাঁপাতে লাগল। একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল সে। ক্ষীণকণ্ঠে আবার বললে, আর একটু জল দাও রাজু। গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে।

থাক ভাই, আর বেশী কথা বলো না, তুমি এখনও অসুস্থ। বলতে বলতে রাজু আবার একটু জল গ্লাস হতে অসুস্থ নীতীশের গলায় ঢেলে দিল।

না ভাই, এখন আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করছি। তারপর জানো, সেই লোকটা হঠাৎ আমায় বেকায়দায় ফেলে আমাকে তীক্ষ্ণ একটা ছুরি দিয়ে আঘাত করল, এবং আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও অজ্ঞান হয়ে গেলাম, তারপর আর কিছুই আমার মনে নেই।

এখন থাক ভাই, তোমার সব কথা পরে শুনব। এবারে ঘুমোবার চেষ্টা কর। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

* * *

শেষরাত্রের দিকে নীতীশের খুব জ্বর এল। ডাক্তারও এই আশঙ্কাই করেছিলেন। সুব্রতর যখন ঘুম ভাঙল, দেখল রাজু নিদ্রাহীন চোখে নীতীশের শিয়রের সামনে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

এ কি রাজু, এখনও ঘুমোওনি? নীতীশ কেমন আছে?

খুব জ্বর, গা পুড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এবারে তুমি ঘুমিয়ে নাও, আমি ততক্ষণ নীতীশের কাছে বসছি।

ঘুম আর আমার আসবে না ভাই।

কিন্তু তা বললে চলবে না ভাই। এতক্ষণ তুমি জেগে আছ, এবারে তোমাকে একটু বিশ্রাম নিতেই হবে। যাও, শুয়ে পড় গে। ভুলো না সামনে এখনও আমাদের অনেক কাজ। সবাই যদি আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, সবারই শরীর ভেঙে পড়ে, যুদ্ধ করব কি

করে? এখন তো আমিই জেগে থেকে নীতীশকে দেখতে পারব। যাও, তুমি একটু ঘুমিয়ে য়াও।

এর পর আর তর্ক করা চলে না। তা ছাড়া রাজু নিজেও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিল। ও শুয়ে পড়ল।

॥ ১৮ ॥
মগের মুল্লুকে

অনেক বেলায় রাজুর ঘুম ভাঙল। সুব্রত ঘুম ভাঙতেই ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ঐ সময় ডাক্তার এসে ঘরে ঢুকলেন এবং নীতীশকে পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। অত বড় একটা চোট লেগেছে, তাছাড়া আগে হতেই শরীরটা অসুস্থ ছিল, তাই জ্বর হয়েছে। আমি একটা ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সারাটা দিন সুব্রত ও রাজু নীতীশকে নিয়েই ব্যস্ত রইল। ইতিমধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেনও ওদের কেবিনে একবার এসেছিলেন। সুব্রত ও রাজু পরামর্শ করে ঠিক করেছিল, চুরির ব্যাপারটা জল-পুলিসের ও পোর্টের পুলিসের গোচরীভূত করা প্রয়োজন। ক্যাপ্টেনকেও সেই রকম ওরা বলেছে। আগামী কাল প্রত্যূষেই জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে পৌঁছুবে, ক্যাপ্টেন বলে গেছেন, তিনি ওয়ারলেসে জল-পুলিসকে সংবাদ দেবেন।

* * *

তখনও ভাল করে ভোরের আলো আকাশের গায়ে ফুটে ওঠেনি। ভোরের অস্পষ্ট প্রথম আলোর স্বল্পাভাসে আকাশে ও মাটিতে চলেছে আলোছায়ার রহস্যঘন অপূর্ব লুকোচুরি।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় ইরাবতী নদীর মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করেছে, এবং মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে বন্দরের দিকে।

একপাশে দেখা যাচ্ছে সুবিখ্যাত রেঙ্গুন বন্দর, অন্যদিকে ইনসিন শহরটি। ইনসিনের অয়েল রিফাইনারির লম্বা লম্বা চোঙগুলো দেখা যাচ্ছে। বহুদূরে দেখা যায় রেঙ্গুনের সুবিখ্যাত সোয়েডাগন প্যাগোডার রৌদ্র-ঝলকিত স্বর্ণচূড়া। ছোটবড় অসংখ্য সাম্পান ও স্টীম-লঞ্চ নদীবক্ষ আলোড়িত করে এদিক-ওদিক যাতায়াত করছে। রেঙ্গুন বন্দরে আরও তিন-চারটি বড় বড় জাহাজ নোঙ্গর করে আছে।

বন্দরে অসংখ্য মানুষের ভিড়, নানা কাজে এদিক-ওদিক সব যাতায়াত করছে। জাহাজ বন্দরে লাগবার আগে স্টীম-লঞ্চে করে জল-পুলিস, পোর্ট-পুলিস ও কাস্টমস্-এর কর্মচারীরা এসে জাহাজে উঠল। পুলিসের লোকেরা সার্চ করেও কিন্তু সুব্রতদের হারানো জিনিসের কোন পাত্তাই পেল না।

এর পর জাহাজ বন্দরে লাগানো হল। লোকজন, আত্মীয়-স্বজন, যাত্রী ও কুলীদের ভীড় ও গোলমাল।

দীর্ঘ চার-চারটে দিন অফুরন্ত কেবল জলের ওপরে থেকে সবাই যেন মাটিতে পা ফেলবার জন্য হাঁপিয়ে ওঠে।

সুব্রতদেরও নামতে হবে। কিন্তু নীতীশের তখনো প্রায় একশতিন জ্বর। ডাক্তার

পরীক্ষা করে বললেন, খুব সাবধানে স্ট্রেচারে করে যদি নামিয়ে নেওয়া যায়, তবে কোন ক্ষতি হবে না।

ক্যাপ্টেনই স্ট্রেচার ও অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিলেন। স্ট্রেচারে করে অসুস্থ নীতীশকে নামিয়ে বরাবর অ্যাম্বুলেন্সে করেই রেঙ্গুন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। নীতীশকে হাসপাতালে রেখে, একটা ট্যাক্সি করে দুজনে বের হল ভাল একটি হোটেলের সন্ধানে।

অনেক অনুসন্ধানের পর শেষ পর্যন্ত ওরা একটি ইউরোপীয়ান হোটেলে গিয়েই ছোট দুটো সিঙ্গল রুম নিল, হোটেলটি একেবারে বড় রাস্তার ঠিক ওপরে। এক ঘরে দুটো সীট্ পাওয়া গেল না, অগত্যা পাশাপাশি সিঙ্গল সীটেড্ দুটি ঘর ওরা নিল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর রাজু ও সুব্রত দুজনে রাজুর ঘরে পরামর্শ করতে বসল এখন ওদের সর্বপ্রথম কাজ, অ্যাটর্নীর অফিসে গিয়ে সংবাদটা দেওয়া যে ওরা এসে ঠিক সময়েই পৌঁচেছে।

সুব্রত বলছিল, কিন্তু আমার নাম লেখা ছোটবেলাকার সেই ফটোটা যে হারিয়ে ফেললাম, সেটার অভাবে এখন কি করা যায় তাই ভাবছি!

যা হয়ে গেছে এবং যার মধ্যে তোমার কোনই হাত ছিল না, তার জন্য এখন বৃথা চিন্তা করে মনকে ব্যস্ত করে কি কোন লাভ আছে? তাছাড়া তোমার কলেজের প্রিন্সিপ্যালের দেওয়া সার্টিফিকেটটা তো এখনও আমাদের হাতেই আছে। এবং নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে রেঙ্গুনে আমরা পৌঁচেছিও। এখনও পুরো একটা দিন, একটা রাত্রি ও পরশুর বেলা বারোটা পর্যন্ত আমাদের হাতে আছে। আজকের দিনটা আমাদের পূর্ণ বিশ্রাম। কাল সকালে চা খেয়ে সর্বাগ্রে আমরা অ্যাটর্নী অফিসে গিয়ে দেখা করব। অ্যাটর্নীকে সব কথা আমাদের খুলে বলতে হবে।

সত্যি রাজু, আমার এমন আপসোস হচ্ছে! ঘাটে এসে শেষটায় বুঝি তরী ডুবল' সুব্রত বলে।

ভয় নেই সুব্রত। তোমার সোনার তরী ঘাটে ভিড়বেই। মৃদু হেসে রাজু তাকে সান্ত্বনা দেয়।

সোনার তরী, টাকার লোভ বা আকাঙ্ক্ষা আমার কোন দিনই নেই ভাই। একা মানুষ, মামার দয়ায় লেখাপড়া শিখেছি, গায়ে শক্তি আছে। যে করেই হোক দু বেলা দু'মুঠো ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে পারব। তাই এই সম্পত্তি পাওয়ার ব্যাপারে, সত্যি বলতে কি, প্রথমে আমার ততটা উৎসাহ ছিল না, কিন্তু ঘটনাবিপর্যয়ে আজ কেমন যেন একটা জিদ্ চেপে গেছে। যে করেই হোক, ও সম্পত্তি আমাকে পেতেই হবে। কালো ভ্রমর আমার শক্তি ও সামর্থ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে!

* * *

হোটেলের ম্যানেজারের কাছেই মিলিয়নিয়ার কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী মিঃ চৌধুরীর সংবাদ ওরা পেল।

কোকাইন লেকের কাছেই একেবারে বড় রাস্তার ওপরে প্রকাণ্ড বিদেশী প্যাটার্নের বাড়ি। মিঃ চৌধুরীর অবর্তমানে এখন তাঁর ভাগ্নে মিঃ সনৎকুমার রায়ই মামার সুবিপুল ব্যবসার অধিকারী হবেন বোধ হয়।

সন্ধ্যার দিকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সুব্রত কোকাইন লেকের দিকে চলল।

রেঙ্গুন শহরটি সত্যিই চমৎকার। আধুনিক আমেরিকান প্যাটার্নের রাস্তাঘাট, বরাবর কংক্রিটের তৈরী। সামনেই রাতের 'সুলে' প্যাগোডা আলোর মালা পরে যেন অভিসারে চলেছে। প্যাগোডা রোডের দু পাশে সিনেমাগুলোতে দর্শনার্থীদের বেশ ভিড়। বর্মী রমণীরা নানা বিচিত্র রং-বেরংয়ের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে। বড় রাস্তার দু পাশে মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁ, সেখানে পান-ভোজনকারীদের আনাগোনা চলেছে।

দূর থেকে সুব্রত কোকাইন রোডের ওপরে আলোকোজ্জ্বল সুদৃশ্য বাড়িখানা দেখল, 'চৌধুরী ভিলা'।

একবার ভাবলে, গাড়ি থামিয়ে 'চৌধুরী ভিলা'য় প্রবেশ করে সনতের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে। সনৎ নিশ্চয়ই বয়সে ওর চাইতে বড়ই হবে। কিন্তু না, সুব্রতর পরিচয় পেয়ে সে যদি সুখী না হয়, ওকে যদি সাদর আহ্বান না জানায়, সেটা বড় মর্মান্তিক হবে। অর্থ এমনি জিনিসই বটে, অতি আপনার জনকেও পর করে দেয়।

লেকের সামনে সুব্রত ট্যাক্সি থেকে নেমে ট্যাক্সিওয়ালাকে অপেক্ষা করতে বলে পায়ে হেঁটে চলল। রেঙ্গুনে এইটিই সর্বাপেক্ষা বড় লেক। লেকটির বিশেষত্ব এটি আর্টিফিসিয়াল নয়, ন্যাচারাল লেক। প্রকাণ্ড লেকটি।

যদিও আজ পূর্ণিমার রাত্রি, তথাপি কিন্তু আকাশে মেঘ জমেছে। এই সময় কখনও রেঙ্গুনে বৃষ্টি হয় না। পিছনে রেঙ্গুন ইউনিভারসিটি এরিয়া। কলেজ বিল্ডিং ও তারই আশেপাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অধ্যাপকদের থাকবার কোয়ার্টারগুলো।

ছোট একফালি লম্বা জমি লেকের মধ্যে অনেকখানি চলে গেছে। ঘন সন্নিবেশিত বৃক্ষ। অন্ধকার হয়ে আছে। অনেক মেয়ে-পুরুষ সেখানে ভিড় করেছে।

লেকের চারিদিককার শোভা সত্যই চমৎকার। একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ মনকে যেন ভাবরাজ্যে নিয়ে যায়। বেশ লাগে।

অনেক রাত্রে সুব্রত ফিরে এল।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় নিশাচরদের ভিড় তখনও কমেনি।

রাজু জেগেই ছিল ; প্রশ্ন করলে, কোথায় গিয়েছিলে?

লেকে বেড়াতে, সুব্রত বললে।

সে-রাত্রের মত তাড়াতাড়ি আহারাদি চুকিয়ে দুজনে শুতে গেল। কদিনের অবিশ্রাম জাহাজের দুলুনিতে শরীর দুজনারই বেশ ক্লান্ত। ঘুম আসতে খুব বেশী দেরি হল না।

রেঙ্গুনে শীত যদিও খুব বেশী নয়, তথাপি অকালে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ঠাণ্ডাটা যেন বেশ একটু বেশীই মনে হয়।

বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে টিপটিপ করে। বাদলধারার সঙ্গে সঙ্গে শীতের রাত্রিও বেশ কনকনে হয়ে উঠেছে। আলোটা কমিয়ে, মশারীটা ফেলে ভারী কম্বলে বেশ করে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। এবং ঘুম আসতে তার খুব দেরি হল না। শীঘ্রই সে বেশ গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

গভীর রাত্রে একটা অস্বস্তিকর চাপে রাজুর ঘুমটা ভেঙে গেল। আধো-ঘুমঘোর ও

আধো-জাগরণের মাঝেই যেন তার মনে হল, মশারীর চালটা একটু একটু করে নীচের দিকে নেমে আসছে এবং মুহূর্তেই তাকে চারপাশ থেকে ঢেকে চেপে ধরল। চিৎকার করতে চাইলে সে—কিন্তু বৃথা, বৃথাই সব। গলা দিয়ে একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত বেরুল না। নিঃশ্বাসটা বন্ধ হয়ে আসে।

অতবড় হোটেলটার মধ্যে কেউ জানতে পারলে না, এমন কি পাশের ঘরে নিদ্রামগ্ন সুব্রতও জানতে পারলে না, একটা জলজ্যান্ত মানুষকে হোটেলের তিনতলার একটি ঘর থেকে চার-পাঁচজন লোক নিঃশব্দে চুরি করে একটা কাপড়ের বোঁচকার মতই বহন করে হোটেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রাত্রি গভীর, বৃষ্টি-ঝরা শীতার্ত।

বড় রাস্তার ওপরে হোটেলের খুব কাছেই একটা ট্যাক্সির মধ্যে এনে লোকগুলো রাজুকে তুলল।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

॥ ১৯ ॥
শত্রুর জালে

রেঙ্গুন ছাড়িয়ে ইনসিনে ট্যাক্সিটা এসে একটা দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়িটা অন্ধকার। বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে কে যেন দরজাটা খুলে দিল। রাজুর জ্ঞান তখনও ফেরেনি।

ধরাধরি করে লোকগুলো জ্ঞানহীন রাজুর শিথিল দেহটা বাড়ির মধ্যে নীচেকার একটা ছোট অপরিসর নোংরা কামরার মধ্যে নিয়ে এল, একটু পরেই ঘরের বাইরে ভারী পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। দীর্ঘ লম্বা মুখোশ-পরা একজন লোক এসে ঘরে প্রবেশ করল।

সর্দার! কে একজন দলের মধ্যেই চাপা গলায় বললে।

আগন্তুক হাতের টর্চ জ্বালাতেই টর্চের তীব্র আলোর রশ্মি রাজুর মুখে এসে পড়ল এবং ততক্ষণে একজন এগিয়ে এসে রাজুর মুখের ঢাকনাটাও খুলে ফেলল। তখন টর্চের আলোয় রাজুর মুখের দিকে চেয়ে মুখোশ পরা আগন্তুক তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, এ কি! এ কাকে এনেছিস? এ তো সে লোক নয়!

দলের মধ্যে একজন বললে, আজ্ঞে হুকুম ছিল আমাদের উপরে—১০নং কামরায় যে লোক আছে তাকে নিয়ে আসতে। আমরা তো তাকেই এনেছি। এই লোকই তো ১০নং কামরায় ছিল।

তখন আগেকার লোকটি বলল, নিশ্চয়ই অন্ধকারে কামরা ঠিকমত চিনতে পারিসনি। তা যাকগে, ভালই হয়েছে, এটাকেও নীচের ঘরে নিয়ে আটকে রাখ। আমি দেখছি। মুখোশধারী আবার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

এদিকে লোকগুলোও রাজুকে তুলে নিয়ে চলে গেল একটা নড়বড়ে সিঁড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট ভূগর্ভস্থিত একটা ঘরের দিকে।

*　　*　　*

রাত্রি এখনও ভাল করে শেষ হয়নি। একে টিপটিপ করে বৃষ্টি, তার ওপরে আবার

বেশ কুয়াশা দেখা দিয়েছে। সমস্ত শহরটা যেন একটা আবছা কালো ঘোমটায় নিজেকে আড়াল করে নিয়েছে।

সুব্রত অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখন, হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে সুব্রতর ঘুমটা ভেঙে গেল। সে শুনতে পেল—হোটেলের একটা চাকর তাকে ডাকছে, বাবু, ও বাবু!

সুব্রত ধড়মড় করে উঠে বসল, অ্যাঁ...কি রে?

বাইরে একটা লোক আপনাকে ডাকছে, কি বিশেষ দরকার দেখুন!

সুব্রত চোখ দুটো ডলতে ডলতে চাকরের সঙ্গে চলল।

বাইরে একটা স্থানীয় বর্মী লোক অপেক্ষা করছিল। সে তার ভাষায় আবোল-তাবোল খানিকটা কি সব বলে গেল, সুব্রত তার একটি অক্ষরও বুঝে উঠতে পারল না। হোটেলের চাকরটা সুব্রতকে বুঝিয়ে দিল—রাজু নামে ওর একজন বন্ধু শত্রুর হাতে আটকে পড়ে এই শহরেরই এক জায়গায় বন্দী হয়ে আছে। সুব্রত যেন এখনই লোকটার সঙ্গে সেখানে চলে যায়, যদি সে বন্ধুকে বাঁচাতে চায়।

সুব্রত চাকরটার কথায় চমকে উঠল—সে কি! রাজু তো পাশের ঘরে শুয়েছিল!

তখনই সুব্রত ছুটল ওপরে। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখল, রাজুর ঘরের দরজাটা খোলা —হা-হা করছে। শয্যা খালি, খোলা জানলাপথে শুধু মাঝে মাঝে একঝলক শীতের কনকনে হাওয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একপাশের দড়ি-ছেঁড়া মশারীটাকে ওলট-পালট করছে। সুব্রত ছুটে এল শয্যার কাছে।

খালি—শয্যা খালি—কেউ নেই সেখানে। কোথায় গেল রাজু? তখন আর সুব্রতর কোন কিছুই ভাল করে ভেবে-চিন্তে দেখার মত মনের অবস্থা নয়। মাথার মধ্যে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তার প্রিয় বন্ধু রাজু—সে হয়তো এতক্ষণ শত্রুর হাতে পড়ে কত কষ্টই না পাচ্ছে! সে আর ভাবতে পারে না, তাড়াতাড়ি নীচে এসে হোটেলের চাকরটাকে ও ম্যানেজারকে নীতীশ সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলতে বলতে তখনই বেরিয়ে পড়ল সেই অজানা লোকটার সঙ্গে রাজুর খোঁজে। রাজু যে বিপদে পড়ে তাকে ডেকেছে—সে কি আর দেরি করতে পারে!

এ শহরের পথঘাট তার কিছুই পরিচিত নয়। অচেনা জায়গা। তার ওপরে আবার বৃষ্টি। পথঘাট সমস্ত জল-কাদায় প্যাচ-প্যাচ করছে। এখনও রাস্তায় তেমন লোকজনের চলাচল শুরু হয়নি। মাঝে মাঝে দু-একটা যানবাহন পথের কাদা ছিটিয়ে এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করছে। শীতের জলকণাবাহী হাওয়ায় মাঝে মাঝে শরীরের রক্ত জমাট হয়ে যায়। কিন্তু সেসব দিকে নজর দেওয়ার মত মনের অবস্থা সুব্রতর তখন নয়। একটি মাত্র কথাই তখন তার সমস্ত মনটা জুড়ে তোলপাড় করে ফিরছে—রাজু বিপদে পড়েছে —রাজু তাকে ডেকেছে!

এদিকে লোকটা সুব্রতকে নিয়ে কত পথ ঘুরে ঘুরে বহু সময় পরে শহরের সীমান্তে একটা দোতলা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ঠিক এমনি সময় আবার ঝম-ঝম করে বৃষ্টি নামল।

লোকটা বললে, এই বাড়ি—

সুব্রত বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। সামনেই কাঠের একটা পুরাতন ভাঙা নড়বড়ে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে সুব্রত একটা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই

হঠাৎ পিছন হতে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে মুহূর্তে সে যেন বোকা বনে গেল।

ঘরটা বিষম অন্ধকার। এক কোণায় একটা কেরোসিনের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে চমকে সুব্রত যেমন পিছনদিকে তাকিয়েছে, অমনি সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানকার কাঠের মেঝেটা দুই ফাঁক হয়ে ঝপ্ করে নীচের দিকে ঝুলে পড়ল আর সুব্রত হুড়মুড় করে একটা গর্তের মধ্যে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

অন্ধকারের বুকে একটা তীক্ষ্ণ হাসি খলখল্ করে উঠল।

আকস্মিকভাবে নীচে নিক্ষিপ্ত হয়ে সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।

॥ ২০ ॥
কে তুমি বন্ধু

রেঙ্গুন মেডিকেল হাসপাতালের একটি স্পেশাল কেবিন।

সকাল বোধ করি আটটা সোয়া-আটটা হবে।

অল্পবয়সী একটি বর্মী নার্স রোগীর টেমপারেচার নিয়ে দেখছিল।

ডাঃ সু'এন ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, গুড মর্নিং সিসটার! রোগী কেমন আছে?

জ্বর নেই। নর্মাল।

মে আই কাম ইন? বাইরে থেকে কার গলার স্বর শোনা যায়।

ইয়েস্!...হ্যালো মিঃ বাসু!

কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট আগন্তুক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন। মৃদু কথোপকথনের শব্দে ততক্ষণে রোগী নীতীশের ঘুমটা ভেঙে গেছে।

আগন্তুক মিঃ বসু রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, কেমন বোধ করছ এখন?

কে আপনি! আপনাকে...

ভদ্রলোক একটু মিষ্টি হেসে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে জবাব দেন, Don't worry my child! আমার নাম অমরেন্দ্রনাথ বসু। আমার বাকি পরিচয়ও এখনই দেব তোমাকে।

এদিকে নার্স রোগীর হাত-মুখ ধুইয়ে ঔষধ খাইয়ে দিল। একটু পরে মিঃ বসুর চোখের ইশারায় ডাক্তার ও নার্স ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

Now my boy. এবার আমার পরিচয় তোমাকে দেব। কিন্তু তার আগে আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, ইতিপূর্বে কখনও কোথাও আমাকে দেখেছ কিনা?

নীতীশ আগন্তুক ভদ্রলোকের কথায় বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকায়।

নীতীশের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক মৃদু মৃদু হাসছেন।

কই না, কিছুই তো মনে পড়ে না!

মনে পড়ছে না? কিন্তু আমি তো তোমাদের অপরিচিত নই!

না, তবু নীতীশের কিছুতেই কোন কথা মনে পড়ে না।

মাঝে মাঝে একটা অস্পষ্ট ছায়া মনের পটে ঝিলিক দিয়ে যায় বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তার চাইতে বেশী কিছু নয়।

শরীরের ক্লান্তি এখনও ভাল করে কাটেনি।

মাথাটা এখনও ভার ভার বোধ হয়।

ভদ্রলোক আবার একটু মধুর হাসি হেসে বললেন, কি দেখছ? কিন্তু এখন সে-সব কথা যাক, আমি মিঃ চৌধুরীর কোম্পানীর ম্যানেজার ও তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলাম এবং তাঁর উইলের অন্যতম প্রধান সাক্ষী। এখানে আসবার আগে আমি হোটেলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সুব্রত আবার বোকার মত ফাঁদে পা দিয়েছে, রাজেনও উধাও। সুব্রতকে খুঁজে বের করতে যেতে হবে, তা সে যেমন করেই হোক, বের করবই। মাঝে আর মাত্র আজকের দিন ও রাত্রি। এর মধ্যে তাকে যদি খুঁজে না বের করতে পারি, তবে সব পণ্ড হয়ে যাবে আমাদের।

সে কি! বলে নীতীশ চমকে উঠল।

হ্যাঁ, কিন্তু বিশেষ ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। আমার চোখে তারা ধুলো দিতে পারবে না। এ বর্মা মুল্লুকের কোন জায়গাই আমার অজানা নেই। সান্ত্বনা দেন অমর বসু নীতীশকে।

এমন সময় আবার ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। রোগীকে বেশ করে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, রোগী অনেকটা ভালর দিকে। আর তেমন বিশেষ ভয়ের কারণ নেই।

ডাক্তারকে আড়ালে ডেকে নীতীশ সম্বন্ধে বেশ ভাল ব্যবস্থা করে অমরবাবু বিকালের দিকে আবার আসবেন বলে তখনই বেরিয়ে গেলেন।

* * *

আর সুব্রত?

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, সে কোনমতে উঠে বসল। ক্রমে হাত দিয়ে ঠাহর করে দেখল, সে ভিজে ও নরম মাটির ওপরেই এসে পড়েছে। আশেপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার—কিছুই চোখে দেখা যায় না, চোখের দৃষ্টি যেন জমাট আঁধারের গায়ে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসে। ও বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে—উঃ কি অন্ধকার!

প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় সুব্রত হকচকিয়ে গিয়েছিল। ক্রমে সেই ভাবটা কেটে যেতে সুব্রতর চিন্তাশক্তি যেন আবার ফিরে আসে। এতক্ষণে সুব্রত বুঝলে, এ বিদেশ-বিভুঁইয়ে একটা পথের লোকের ডাকে হুট্ করে এমনি বোকার মত চলে আসবার কোন মানেই হয় না! উঃ, সে কী মূর্খের মতই না কাজটা করে বসল! কিন্তু এখন আর তার কোন উপায়ই নেই। ছি ছি, একবার ঠকেও তার শিক্ষা হল না! শেষকালে কিনা কূলে এসে তরী ডোবালে ও! কিন্তু এখন কি করবে ও—এই অন্ধকূপ হতে কে তাকে উদ্ধার করবে? এক রাজু, তা সেও তো শত্রু-কবলে। হঠাৎ না ভেবে-চিন্তে সে ছেলেমানুষের মত কি কাজটা করে বসল?...এ আপসোস ও রাখবে কোথায়?

... ...

ওদিকে রাজুর যখন জ্ঞান হল, সে দেখল তার হাত-পা সব দড়ি দিয়ে একটা খাটের সঙ্গে বাঁধা। একটু পাশ ফেরার পর্যন্ত উপায় নেই—এমনি কঠিন বাঁধন। রাজু চোখ বুজে পড়ে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার ভাল করে আগাগোড়া ভেবে দেখবার চেষ্টা করল। ভাবতে ভাবতে সবই তার মনে পড়ল। হাসপাতালে অসুস্থ নীতীশ, একা সুব্রত এই অচেনা দেশে কি করবে? সে নিজে এখানে বন্দী হয়ে রইল! প্রাণপণ শক্তিতে

রাজু একবার চেষ্টা করলে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে, কিন্তু চেষ্টা বৃথা—একটুও আগলা হল না সে কঠিন বাঁধন।

দুপুরের দিকে রাজু তেমনি পড়ে আছে বন্দী হয়ে। গলায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়েনি। ক্ষুধায় বত্রিশ নাড়ী চোঁ চোঁ করছে। খুব যখন ক্ষুধা পায়, তখন ক্ষুধার কথা বা ভাল ভাল খাবারের কথা মনে না করাই ভাল, তাতে ক্ষুধা আরও অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই রাজু চোখ বুজে শুয়ে যত সব তেতো আর বিশ্রী জিনিসের কথা মনে করতে লাগল—কুইনাইন, পলতার পাতা, উচ্ছেভাজা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্ষুধার জ্বালায় রাজুর একটু তন্দ্রার মত এসেছিল বোধহয়, হঠাৎ কার স্পর্শ পেয়ে চেয়ে দেখে কে একজন নীচু হয়ে ক্ষিপ্রহস্তে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে তার গায়ের ও হাত-পায়ের বাঁধনগুলো কচকচ করে কেটে দিচ্ছে। ব্যাপার দেখে রাজু তো অবাক! এ আবার কি রহস্য!

লোকটা ততক্ষণে সব বাঁধন কেটে রাজুকে মুক্ত করে দিয়ে বললে, বাঁচতে চাও তো শীগগির আমার সঙ্গে পালিয়ে এস।

রাজু বিস্মিত হলেও একটি বাক্যও ব্যয় না করে লোকটির অনুসরণ করল। ছোট-বড় অনেকগুলো ঘর পার হয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দুজনে এসে একসময় একটা অপরিসর নোংরা রাস্তায় নামল।

এতক্ষণ উভয়ের মধ্যে একটি কথাও হয়নি। পথে নেমে লোকটি বললে, যাও, সোজা হোটেলে চলে যাও। সুব্রতকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে পাওয়া যাবে এটা ঠিকই। একটু সাবধানে থাকবে।

আপনি? আপনাকে তো চিনলাম না?

ভদ্রলোক একটু হাসলেন, ব্যস্ত হয়ো না, সময়ে সবই জানবে। আমার নামটা শুধু জেনে রাখ—অমর বসু। অনেক কষ্টে তোমার খোঁজ পেয়েছি। হোটেলেরই একটা চাকর এদের দলে ছিল, পুলিসের গুঁতোয় সে-ই সব স্বীকার করেছে। বলেই ভদ্রলোক অন্য পথ ধরলেন।

রাজুও হোটেলের দিকে চলল।

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে একেবারে। রৌদ্রালোকিত শহরটা তখন ঝকঝক করছে।

চারিদিকে একটা শুচি-স্নিগ্ধ ভাব।

॥ ২১ ॥
ঠিক সময়ে

এদিকে দ্বিপ্রহরের দিকে একটা পুঁটুলিতে বেঁধে কিছু খাবার ও এক ঘটি জল ওপর হতে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুব্রতর অন্ধকূপের মধ্যে। ক্ষুধাও পেয়েছিল যথেষ্ট, সুব্রত সেই আহার্য দিয়ে ক্ষুধা মেটাল।

ক্রমাগত ভিজে মাটিতে থেকে থেকে ওর সমস্ত গায়ে অসহ্য বেদনা হয়ে গেছে তখন। মাথাটা লোহার মত ভারী বোধ হচ্ছে। ঘুমে সমস্ত শরীর নুয়ে আসছে। জমাট-বাঁধা অন্ধকারে থেকে থেকে একেবারে অন্ধই হয়ে গেছে ও।

... ...

বর্মার বিখ্যাত বসু অ্যাণ্ড চৌধুরীর অ্যাটর্নী অফিস। সম্পত্তির দাবি কার—আজই তা ঠিক করার দিন। বেলা এখন এগারোটা। নির্দিষ্ট সময়ের আর মাত্র একটি ঘণ্টা বাকি। এখনও অপর পক্ষ এসে পৌঁছল না। উইলের অন্যতম ওয়ারিশন সনৎ রায় ভাল জামা-কাপড় পরে সকলের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প-গুজব করছে।

সে তো জানেই কালো ভ্রমরের হাত থেকে সুব্রত এবারে আর কোনমতেই পালিয়ে আসতে পারবে না। কাজেই আর এক ঘণ্টা বাদেই তো এই সুবিপুল সম্পত্তি একা তারই হবে। কেউ আর একটি আধলাও এর দাবি করতে পারবে না।

আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি।

উইলের সর্বপ্রধান সাক্ষী অমর বসু এখনও অফিসে পৌঁছাননি। তাঁর খোঁজে একজন লোক পাঠানো হয়েছিল। সে এসে বললে, তিনি বাড়িতে নেই, কোথায় বেরিয়েছেন। বাড়ির কেউ বলতে পারলে না।

... ...

উঃ, সুব্রত আর পারে না! এবার তাকে নিশ্চয়ই মরতে হবে এই অন্ধকূপের মধ্যে, আর রক্ষা নেই। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না। উঃ মাগো!

সুব্রত! সুব্রত! কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে না? হ্যাঁ, ডাকছেই তো!...ঐ তো, আবার কে ডাকল, সুব্রত!

সুব্রত চমকে উঠল।

কে? কে ডাকে? বলে সুব্রত আঁধারেই চারিদিকে তাকাতে লাগল।

সুব্রত! এই যে ওপরে—এদিকে তাকাও!

শব্দ অনুসরণ করে এবারে সুব্রত ওপরের দিকে তাকালে। একটা আলো মাথার ঠিক ওপরেই দুলছে অন্ধকারে।

আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওপর থেকে দড়ি নামিয়ে দিচ্ছি ; এটাকে শক্ত করে ধর, টেনে তুলছি। উঠতে পারবে তো?

একটা বেশ মজবুত দড়ি নেমে এল সুব্রতর কাছে। আনন্দে উত্তেজনায় সুব্রতর শরীর কাঁপছে। দড়িটা যেন ও ধরেও ভাল করে ধরতে পারছে না। অনেক কষ্টে কম্পিত হাতে কোনমতে সুব্রত শেষ পর্যন্ত খুব শক্ত করে সেই দড়ি দিয়ে আপনাকে বেঁধে নিল। ওপর থেকে আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কি, দড়ি টানব?

হ্যাঁ। সুব্রত জবাব দেয়।

টেনে তুলছি তবে!

তুলুন।

ধীরে ধীরে দড়িতে টান পড়ে। উঠছে সুব্রত একটু একটু করে ক্রমে উপরের দিকে। শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে অবশেষে একসময় ওপরের গর্তমুখে সুব্রত এসে উপস্থিত হল। দুজন লোক তখন আস্তে আস্তে দড়িসমেত টেনে তাকে ওপরে তুলে নিল।

আঃ, প্রাণটা যেন বাঁচল!

অন্ধকারে চোখ দুটো যেন অন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিল!

একটি স্বল্প-পরিসর ঘর। সেই ঘরেরই মেঝের ফাঁক দিয়ে রাজু ও একজন অপরিচিত সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওকে নীচের অন্ধকূপ থেকে টেনে তুলেছে। ঘরে কোন জানলা নেই, একটিমাত্র দরজাপথে সামান্য আলো ঘরে এসে প্রবেশ করছে। এই ঘরের মেঝে ফাঁক করেই তাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছিল।

চল, আর দেরি নয়!

সুব্রত ওদের অনুসরণ করে দোতলা হতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, একটা বড় ঘর অতিক্রম করে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণে ভদ্রলোক আবার কথা বলেন রাজুর দিকে তাকিয়ে, রাজেন, এখনই তুমি সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে সোজা একেবারে অ্যাটর্নী অফিসে চলে যাও মার্চেন্ট স্ট্রীটে, বড় রাস্তার ধারে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

আপনি যাবেন না?

আমার কতকগুলো জরুরী কাজ এখনো বাকী, সেগুলো শেষ করে আমিও আসছি, যাও। তার পর হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আর মাত্র পঁচিশ মিনিট সময় আছে। বলে ভদ্রলোক দ্রুতগতিতে রাস্তার অন্যদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বহুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে আবদ্ধ থেকে প্রচুর আলো-বাতাসের মধ্যে এসে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল সুব্রতর।

ভদ্রলোকটি কে রাজু? সুব্রত প্রশ্ন করে।

অমর বসু।

* * *

রেঙ্গুনের বিখ্যাত বসু অ্যাণ্ড চৌধুরীর অ্যাটর্নী অফিস। অফিসের হলঘরে রেঙ্গুনের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভিড় সেদিন। মৃত লক্ষপতি ব্যবসায়ী মিঃ চৌধুরীর উইলের শেষ মীমাংসার তারিখ আজ। উইলের অপরপক্ষ শ্রীযুক্ত সুব্রত রায় এখনও এসে পৌছল না। মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি শেষ সময় উত্তীর্ণ হবার।

ঠোঁটের কোণে এক টুকরো বাঁকা হাসি টেনে এনে সনৎ অন্যতম অ্যাটর্নী মিঃ চৌধুরীর সামনে এসে বলে, আর কেন, তারা আসবে না।

মিঃ চৌধুরী বললেন, এখনও কয়েক মিনিট আছে।

চার মিনিট—তিন মিনিট। আর মাত্র দেড় মিনিট বাকী নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হবার।

মিঃ চৌধুরী উঠে দাঁড়াতে যাবেন, এমন সময় সহসা ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। উইলের অপর পক্ষ,—আমি সুব্রত রায় উপস্থিত!

সনৎ বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়ায়। ঘরের সব.কটি প্রাণীও যেন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেছে।

ঠিক এমনি সময়ে অফিসের দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

উইলের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত, এবারে উইল পাঠ করা হবে।

সুব্রত আরও একটু এগিয়ে এসে আবার বলে, আমি সুব্রত রায়, মিঃ চৌধুরীর ভাগ্নে, উইলের শর্ত অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে আমি আপনাদের সকলের সম্মুখে সম্পত্তির দাবি জানাচ্ছি।

এবার উইলের অন্য ওয়ারিশন সনৎ রায় এগিয়ে এলেন, কিন্তু তার প্রমাণ? আপনিই যে মিঃ চৌধুরীর ভাগ্নে সুব্রত রায়, প্রমাণ কি?

সনতের এই প্রশ্নে চারিদিকে ভিড়ের মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল।

সত্যিই তো, কি প্রমাণ যে ইনিই মৃত মিঃ চৌধুরীর অন্য এক ভাগ্নে, প্রকৃত সুব্রত রায়!

অ্যাটর্নী মিঃ চৌধুরী বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচয়-পত্র সমেত আপনার ছোটবেলাকার সেই ফটোটা আছে তো? এই উইলের সর্বপ্রধান evidence—সেটা কই? সেটা বের করুন।

এবারে সুব্রত চুপ করে যায়। একটু থেমে বলে, সেটা আমার চুরি গেছে জাহাজে।

সনৎ চিৎকার করে উঠল, ঠগ, জোচ্চোর—চুরি গেছে!

সুব্রত বোঝাতে গেল, কিন্তু কে তার কথা শোনে? চারিদিকে ততক্ষণে একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেছে। এমন সম: গোলমালের শব্দকে ছাপিয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে কে বললে, দাঁড়ান, ফটো আমার কা্ছে!

তখন আবার বিস্ময়। সকলেই চমকে ফিরে তাকালে। সুব্রত দেখলে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে যিনি এগিয়ে আসছেন, তিনি আর কেউ নন, কলকাতার হোটেলের পাশের ঘরের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

এ কদিন বৃদ্ধের কথা সুব্রত একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিল। এ কি বিস্ময়!

সুব্রত কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারে না।

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক?

॥ ২২ ॥
উইলের মর্মকথা

স্তম্ভিত বিস্মিত জনতা আগন্তুককে পথ করে দিলে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, ফটো আমার কাছে। এই দেখুন।

সকলে দেখলে, জামার বুকপকেট হতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক একখানি ফটো ও একতাড়া কাগজ বের করে অ্যাটর্নী মিঃ চৌধুরীর দিকে এগিয়ে দিলেন এবং পরক্ষণেই তিনি সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সহসা এক টান দিয়ে মুখের দাড়িটা খুলে ফেলতেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই তাঁর দিকে চেয়ে যেন চমকে উঠল। সকলের মুখ দিয়ে একই সময়ে কেবল একটিমাত্র কথা বেরিয়ে এল, এ কি, এ যে অমর বসু!

মিঃ বসু!

মিঃ বসু আপনি!

অমরবাবু তখন বললেন, হ্যাঁ, আমিই অমর বসু—মিঃ চৌধুরীর উইলের প্রধান ও অন্যতম সাক্ষী।

অমরবাবু বলতে লাগলেন, সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ও উইলের ওয়ারিশনগণ, আপনাদের কাছে আমি উইল-রহস্য উদ্ঘাটন করব। একটি কথা, যা আপনাদের মনে

একটা খট্‌কা বাধিয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, কেন মিঃ চৌধুরী এই উইলটাকে এমন একটা নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে ফেলে জটিল করে গেছেন? আজ আমি সব কথাই খুলে বলব—কিছুই গোপন করব না। চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী। জীবিতকালে ঝোঁকের মাথায় তিনি বহুবার এমন অনেক কাজ করে বসেছেন যে পরে তার জন্য তাঁকে বিশেষ অনুতপ্তও হতে হয়েছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই অমরবাবুর কথা শুনছে।

: আমার যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন আমার মা ও বাবা দুজনই মারা যান। সেই সময় যদি মিঃ চৌধুরী আমায় আশ্রয় না দিতেন, তবে আজ আমায় না খেতে পেয়ে রাস্তায় পড়ে মরতে হত। কিন্তু তাঁর অসীম দয়াই আমায় একদিন বাঁচিয়ে তুলেছিল। কিন্তু যাকগে সে সব কথা, যা বলছিলাম, লক্ষপতি নিঃসন্তান চৌধুরীর আপনার বলতে ঐ দুই ভাগ্নেই—আর কেউ নেই। সনতের মা-বাবা যখন মারা গেলেন, চৌধুরী তখন সনৎকে এখানে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। কিন্তু সনৎ খারাপ সংসর্গে পড়ে বিপথে চলে গেল। প্রথম প্রথম সে কথা টের পেয়ে চৌধুরী সনৎকে আবার ফিরিয়ে আনবার জন্য অনেক চেষ্টাই করেন, কিন্তু সবই বৃথা হয়। শয়তান তখন সনৎকে চেপে ধরেছে। তাঁর কথা সনতের কানে হয়তো ভাল লাগত না। মা-মরা ভাগ্নে, পাছে মনোকষ্ট পায় —তাই শেষের দিকে ইচ্ছা থাকলেও মিঃ চৌধুরী সনৎকে আর বিশেষ কিছু বলতেন না। কিন্তু মনে মনে এই ব্যাপার নিয়ে চৌধুরীর দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁর সেই অন্তর্বেদনার সাক্ষী ছিলাম আমি। আমার কাছে কোন কথাই তাঁর গোপন ছিল না।

একটু থেমে আবার অমরবাবু বলতে লাগলেন, এমন সময় খবর এল—সুব্রতর মা-বাবাও মারা গেছেন। সুব্রতর বয়স তখন মাত্র ছয় কি সাত বছর হবে—তার বেশী নয়। এবার চৌধুরী তাকে আর কাছে নিয়ে এলেন না। তাঁর বরাবরই একটা ভয় ছিল —এ ভাগ্নেটিও যদি সনতের মতই খারাপ হয়ে যায়! হয়তো সেই ভয়েই মিঃ চৌধুরী ভাগ্নেটিকে নিজের কাছে না আনিয়ে তাকে একটা মিশনে রেখে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং মিশনের কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে বলে দিলেন, তাঁর ভাগ্নেটিকে তাঁর কথা ঘুণাক্ষরেও যেন জানতে না দেওয়া হয়। সময় হলে তিনি নিজে তাকে সব কথাই একদিন জানাবেন।

মৃত্যুর বেশ কিছুকাল আগেই তিনি উইল করেছিলেন এবং আমায় সেই উইলের অন্যতম প্রধান সাক্ষী করেন। আমায় ডেকে একদিন বললেন, দেখ অমর, সনৎ যেমন আমার প্রিয়, সুব্রতও তাই। কেউই আমার কম আপনার জন নয়। উইলটাকে আমি এমনি করে জটিল করে গেলাম এইজন্য যে, একমাত্র মিশনের রিপোর্ট ছাড়া সুব্রতর সম্বন্ধে কিছুই আমি ভাল বা মন্দ জানি না, ড্রয়ারে তার ঠিকানা রইল, তুমি পার তো বাংলা দেশে গিয়ে সুব্রত সম্বন্ধে খুব ভাল করে খোঁজ নেবে, দেখবে সে সত্যি মানুষ হয়েছে কিনা, নচেৎ আমার এতদিনের এত কষ্টের উপার্জিত সম্পত্তি বৃথাই নষ্ট হয়ে যাবে—এ কথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়। আবার আমার একমাত্র আপনার জন না খেতে পেয়ে মরবে, এও তো আমি ভাবতে পারি না অমর। যদি সুব্রত সত্যিই মানুষের মত মানুষ হয়ে থাকে, তবে সমস্ত সম্পত্তিই সে পাবে, আর তা না হলে সনৎই পাক আর সুব্রতই পাক, আমার পক্ষে সে একই কথা। ভাববো সবই আমার বরাত। প্রথমে আমি

এদেশে যখন আসি, তখন আমার পকেটে মাত্র দশটি টাকা ছিল। আমি আমার চেষ্টা ও ভাগ্যের জোরে এত বড় সম্পত্তি করেছি। ভগবান না দিলে কেউই পায় না একটি পয়সাও। সুব্রত যদি সত্যি ভাগ্যবান হয়, তবে সে ঠিক সময়মত এসে পৌঁছাবেই, তাছাড়া সম্পত্তি না পেলেও উপযুক্ত মাসোহারা সে তো পাবেই, তার কোন কষ্ট হবে না। সনৎও এতকাল—যতই খারাপ বা মন্দ হোক—আমার ব্যবসার জন্যে খেটেছে, তারও তো একটা দাবি আছে সম্পত্তির ওপরে।

তারপর অমরবাবু সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ চৌধুরীর মৃত্যুর পর যখন তাঁর নির্দেশমত তাঁর ড্রয়ারে তোমার ঠিকানা পেলাম না খুঁজে, তখন আন্দাজে অফিস থেকে একখানা চিঠি দিয়ে আমি বাংলা দেশে চলে যাই। ভাগ্যক্রমে তোমার খোঁজও শীঘ্র পাই বাঁকুড়ার মিশনে গিয়ে এবং তোমার সঙ্গ নিই। আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম সুব্রত। প্রথমে বুঝিনি যে তোমাকে বাধা দিতে প্রবল এক শত্রুপক্ষ দাঁড়িয়েছে। প্রথম টের পেলাম সেরাত্রে—হোটেলে। কিন্তু তখন আমি গোলমাল করিনি এই জন্য যে তাতে করে বিপক্ষ দলকে সাবধান করে দেওয়া হবে এবং শুধু তাই নয়, তারা আমার উপস্থিতিও টের পাবে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঐ সময়ে তোমাদের যত উপকারেরই চেষ্টা করি না কেন, কিছুই করে উঠতে পারব না আমি। কলকাতার হোটেলে তোমাদের সেই রাত্রের কথা মনে পড়ে নিশ্চয়ই? সে-রাত্রে যে লোকটি রেলিং টপকে এসে আমার ঘরেই খাটের নীচে লুকিয়েছিল এবং তোমাদের দরজা খুলে কিছুক্ষণ আগে সে যখন আমার চোখের সামনেই দরজা খুলে পালায়, তখন টের পেয়েও চুপ করে ছিলাম, পাছে তোমাদের আরও বেশী বিপদে পড়তে হয়। জাহাজে শত্রুদলের পাশের কেবিনেই আমি থাকতাম এবং আমার আর এক পাশের কেবিনে থাকতে তোমরা। তাদের সব কথাই আমি যেমন শুনতাম, তোমাদের প্রতিও তেমনি লক্ষ্য রাখতাম সর্বক্ষণ। আমি শত্রুদলের ফটো-চুরির পরামর্শের কথাও আগে টের পেয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমায় একটুও সন্দেহ করেনি, ঝড়ের রাত্রে আমিই তাদের হাত থেকে ফটো কেড়ে নিয়ে যখন সরে পড়ি, সেই সময় সিঁড়ির কাছে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়। এখন বোধ হয় সুব্রত আর তোমার আমার ওপরে কোন রাগ নেই!

অমরবাবু সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বক্তব্য শেষ করলেন। রহস্য উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর যেন মনে হয় অমরবাবুর বর্ণিত কাহিনী।

অমরবাবুর কথা শেষ হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর যেন তখনও কাটেনি।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত কারও মুখে একটি টুঁ-শব্দ পর্যন্ত নেই। সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে।

॥ ২৩ ॥

পরের দিন রাত্রে

ইতিমধ্যে এক ফাঁকে কখন যে একসময় সকলের অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সনৎ সে-ঘর হতে চলে গেছে, তা কেউ টের পায়নি। সেদিকে তখন কারও লক্ষ্য ছিল না বোধ করি।

সুব্রত এগিয়ে এসে অমরবাবুর হাত দুটি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে গদগদ

কণ্ঠে বলল, অমরবাবু, আপনার কাছে যে আজ ক্ষমা চেয়ে নেব, সে ভাষাও আমার নেই, কিন্তু তবু বলছি, আপনার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করুন।

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে সস্নেহে অমরবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন, আমি স্বর্গগত বন্ধু ও অন্নদাতা মিঃ চৌধুরীর শেষ ইচ্ছাটুকু যে সফল করতে পেরেছি, সেইটাই আজ আমার সবচাইতে বড় সান্ত্বনা ও লাভ সুব্রত। আজকের দিনে সেই আনন্দের সুরই আজ আমার সমস্ত মন ভরিয়ে দিচ্ছে।

অমরবাবুর চক্ষু দুটি অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

অ্যাটর্নী অফিস থেকে যখন ওরা সবাই রাস্তায় বেরিয়ে এল, তখন রাস্তার দুপাশের আলোগুলো একে একে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে।

কিন্তু আজকের এই আনন্দের দিনে—অজস্র টাকা-পয়সার মালিক হওয়া সত্ত্বেও সুব্রতর মনের মাঝে যেন একটা অদৃশ্য আলোড়ন তাকে উন্মনা করে তুলছিল বার বার।

অমরবাবু রাস্তায় নেমে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

রাজু পথ চলতে চলতে সুব্রতর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলল, কি ভাবছিস এত সুব্রত?

কই, কিছু না তো!

তবে অমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন আজকের এই আনন্দের দিনে? উঃ, নীতীশটার কী আনন্দই হবে যখন এ খবরটা পাবে! আমার আর তর সইছে না, চল ঐ ট্যাক্সিটা করে হাসপাতালে গিয়ে নীতীশকে সুখবরটা দিয়ে আসি।

বেশ চল।

রাজু একটা চলমান ট্যাক্সিকে হাতের ইশারায় ডেকে সুব্রতকে নিয়ে তাতে চেপে বসল।

ট্যাক্সি ওদের নির্দেশমত হাসপাতালের দিকে ছুটে চলল।

* * *

কোকাইন রোডে চৌধুরী ভিলা।

গভীর রাত্রি।

কালো আকাশের গায়ে তারাগুলো হীরার কুচির মত ঝকঝক করে জ্বলছে। টেবিলের ওপর রক্ষিত সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্পটার ঈষৎ চাপা আলো সমস্ত ঘরখানির মধ্যে যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা জাগিয়ে তুলেছে। চারিদিকেই একটা সুগভীর মৌন ভাব।

সনৎ পাগলের মতই একাকী নিস্ফল আক্রোশে ঘরের মধ্যে অস্থিরপদে ইতস্তত পায়চারি করে ফিরছে।

উঃ এ আফসোস সে রাখবে কোথায়? কি লজ্জা যে তার হয়েছে, তা কে বুঝবে? মাঝে মাঝে সে হাতের আঙুল দিয়ে মাথার চুলগুলোকে টানছে অস্থিরতায়।

এ অপমানের চাইতে যে তার মৃত্যুও বুঝি ছিল ভাল। তার কল্পনার ইমারত গুঁড়িয়ে গেছে। সে আজ সর্বস্বান্ত।

সহসা ঘরের ভেজানো দরজাটা ঈষৎ একটু ফাঁক হয়ে গেল। কালো কাপড়ে

আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া কে একজন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই খট্ করে দরজায় খিলটা এঁটে দিল। সনৎ সেই শব্দে ফিরে চেয়েই চমকে দু-পা পিছিয়ে এল। লোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মুখের উপর হতে কাপড়টা একটু সরিয়ে নিয়ে বললে, ভয় পেলেন সনৎবাবু? তারপর মুচকি হেসে ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলল, সনৎবাবু, আমার টাকাটা?

রাগে দুঃখে সনৎ যেন বোমার মত ফেটে পড়ল, বললে, টাকা! বলতে লজ্জা করছে না অপদার্থ কোথাকার! মিথ্যুক, ধাপ্পাবাজ—এই তোমার কেরামতি!

সনৎবাবু, ভুলে যাবেন না, আপনি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন! কালো ভ্রমর কারও চোখ-রাঙানো সহ্য করেনি!

সনৎ চিৎকার করে উঠল, দারোয়ান! হীরা সিং!

আগন্তুক কালো ভ্রমর—সে ক্ষিপ্রগতিতে এক লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে সনতের মুখটা চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে কোমরবন্ধ হতে একটা তীক্ষ্ণ বাঁকানো ছোরা তুলে ধরল। ঘরের আলোয় সেটা ঝিকঝিক করে মৃত্যুলালসায় যেন পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল। ছোরাখানা সেভাবে ধরেই কালো ভ্রমর গম্ভীর স্বরে বললে, টুঁ-শব্দটি করেছেন কি এই ছোরার সবটা বুকে বসিয়ে দেব। আমার প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিন এখনও, নইলে—

বাকী কথাগুলো কালো ভ্রমর আর শেষ করতে পারলে না, আচমকা এক ঝটকায় সনৎ কালো ভ্রমরের হাতটা সরিয়ে দিয়েই চাপা সুরে গর্জন করে উঠল, মৃত্যু! আজ আর ওতে ভয় নেই বন্ধু। কিস্তি যখন বিপক্ষদল মাত করেছেই, তখন আমার সবই গেছে। বলেই সনৎ বিদ্যুৎগতিতে কালো ভ্রমরের ছোরাসমেত হাত কব্জির কাছে চেপে ধরল।

শক্তিতে সেও কম যায় না। তারপর সেই ঘরের মধ্যে আরম্ভ হল ভীষণ ধস্তাধস্তি। ছোরাটা একসময় কালো ভ্রমরের হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘরের কোণে। দুজনে মল্লযুদ্ধ চলেছে। কি অসীম শক্তি কালো ভ্রমরের গায়ে! সনতের সাধ্য কি তার সঙ্গে লড়ে? ক্রমেই সে যেন একটু একটু করে কাবু হয়ে আসতে লাগল। তার হাত-পা শিথিল হয়ে আসছে!

সেই শীতের রাত্রেও সনতের গা দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরছে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে।

কালো ভ্রমর একসময় কায়দা করে পরিশ্রান্ত সনতের বুকের উপর চেপে বসল এবং হাত দুখানা দিয়ে সাঁড়াশির মত করে সজোরে তার গলাটা চেপে ধরল। এমন সময় বন্ধ দরজার ওপর মুহুর্মুহু করাঘাত এবং একটা গোলমাল শোনা গেল।

সেই শব্দ শুনে কালো ভ্রমর চমকে উঠে এবং পরক্ষণেই সনৎকে ছেড়ে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে ছোরাটা তুলে নিল। তারপর যেমন সে জানলার দিকে ছুটে যাবে অমনি সনৎও কোনমতে টলতে টলতে উঠে একরকম ছুটে গিয়েই পলায়নরত কালো ভ্রমরের জামাটা পিছন দিক হতে সজোরে চেপে ধরল।

বাধা পেয়ে কালো ভ্রমর বিদ্যুৎগতিতে ফিরে হাতের ছোরাটা সনতের বাঁদিককার কাঁধে আমূল বসিয়ে দিল। সনৎ 'উঃ মাগো!' বলে একটা চিৎকার করে কালো ভ্রমরকে ছেড়ে দিয়ে মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত দেহে।

এদিকে সনতের নীচের ঘরেই থাকত দারোয়ান হীরা সিং। সে প্রথমে মনিবের ডাক শুনে বুঝতে পারেনি, পরে যখন সনৎ ও কালো ভ্রমরের মধ্যে কথা-কাটাকাটি, চেঁচামেচি, ধস্তাধস্তির শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল, তখন সে তাড়াতাড়ি ছুটে উপরে এল। সনতের আর্তনাদ শুনে অন্যান্য চাকর-বাকরেরাও যখন বাইরে হতে দরজা ভেঙে এসে ঘরে ঢুকল, তখন তারা সবিস্ময়ে দেখলে সনৎ রক্তাক্ত দেহে মেঝের উপর পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে—ঘর খালি, দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ভৃত্যেরা তাড়াতাড়ি তখনই অমরবাবু ও ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠালে। অমরবাবু এসে দেখলেন, সনৎ নিঝুমভাবে খাটের ওপর পড়ে আছে। একটা ভারী চাদরে তার দেহ ঢাকা। কিছুক্ষণ আগে ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে সনৎ এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে তার গলা দিয়ে যেন তখন আর স্বরও বেরুচ্ছে না।

অমরবাবুর পায়ের শব্দ পেয়ে সনৎ চোখ মেলে তাকাল, ক্ষীণকণ্ঠে বললে, অমরবাবু!

॥ ২৪ ॥
কালো পাথরের ড্রাগন

রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে। পূবের আকাশে তারই রঙিন ইশারা। সনতের চোখের কোলে দু-ফোঁটা জল চকচক করছে।

অমরবাবু সনতের শয্যার পাশটিতে এসে বসলেন।

সনৎ বলে, অমরবাবু, আপনি এসেছেন? কিন্তু আর বুঝি আমার সময় নেই। কালো ভ্রমর...বলতে বলতে সনতের কণ্ঠস্বর যেন বুজে আসতে চায়।

বিস্মিত অমরবাবু একান্ত মুহ্যমানের মতই সনতের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্নেহকোমল কণ্ঠে বলেন, ভয় কি! আঘাত খুব গুরুতর হয়নি—দুদিনেই সেরে উঠবে। কিন্তু ব্যাপার কি বল তো, কে তোমাকে এমনভাবে জখম করে গেল?

কালো ভ্রমর—কালো ভ্রমরই এই সর্বনাশ করে গেল অমরবাবু!

ডাক্তার বাধা দিয়ে বললেন, আপনি এসময় বেশী কথা বলবেন না সনৎবাবু, তাতে আপনার ক্ষতি হবে। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

হতভাগ্য সনতের ঠোঁটের কোণে বড় করুণ এক টুকরো হাসি জেগে উঠল, ম্লান কণ্ঠে বললে, ক্ষতি! আর আমার কি ক্ষতি হবে ডাক্তারবাবু?...না না, আমায় বাধা দেবেন না, আমায় বলতে দিন।

কেন তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ? যা বলবার পরে বললেও তো চলতে পারে! এবারে অমরবাবুই বললেন মৃদুস্বরে।

না, পরে বললে হবে না। সুব্রতকে বলবেন, তার ওপর আর আমার রাগ নেই। আমি আমার পাপের উপযুক্ত প্রতিফলই পেয়েছি। আমি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব বলেছিলাম কালো ভ্রমরকে, যদি সে সুব্রতকে আটকিয়ে রাখতে পারে এবং ঠিক সময়ে তাকে উইলের দাবী নিয়ে অ্যাটর্নী অফিসে পৌঁছতে না দেয়। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সব গেল ভেস্তে। সুব্রতরই জিত হল আর আমার হল হার। কালো ভ্রমরের

সমস্ত ফিকির-ফন্দি ফেঁসে গেল, কিন্তু কি শয়তান সেই ডাকাত! চক্রান্ত করে তো কিছুই করতে পারল না, তবু সে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার দাবি নিয়ে আমার কাছে এসেছে—

কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজনায় সনতের গলার স্বর বুজে এল। সে হাঁপাতে লাগল।

ক্রমে চারিদিক ফর্সা হয়ে উঠছে। ভোরের সিরসিরে হাওয়া খোলা জানলাপথে বয়ে এল। বাইরের বারান্দায় খাঁচায় বসে সনতের ক্যানারী পাখিটা কেবল থেকে থেকে সুন্দর শিস দিচ্ছে।

ডাক্তার ঘুমের জন্য সনৎকে একটা মরফিয়া ইনজেকশন দিয়েছিলেন, একটু পরে সনৎ ঘুমিয়ে পড়ল।

সনতের সঙ্গে কালো ভ্রমরের সাক্ষাৎ ও সমগ্র ঘটনাটি সুব্রত, রাজু ও নীতীশ অমরবাবুর মুখে আগাগোড়া সমস্তই শুনল।

বিকেলের দিকে অমরবাবুর সঙ্গে সুব্রত ও রাজু চৌধুরী ভিলায় দেখতে এল সনৎকে।

নীচে চাকরের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে ওরা জানল সনতের অবস্থা এখন অনেকটা ভালই। সমস্ত দুপুরই সে বেশ ঘুমিয়েছে। চাকরের পিছু পিছু সকলে এসে ঘরে প্রবেশ করলে।

খাটের ওপর শুয়ে সনৎ সেদিনকার স্থানীয় খবরের কাগজে যেখানে বড় বড় হেডিংয়ে সুব্রতর অদ্ভুত উপায়ে সম্পত্তি-প্রাপ্তির রোমাঞ্চকর কাহিনী বেরিয়েছে সেইটাই পড়ছিল, এমন সময় সুব্রত ডাকল, সনৎদা!

কে?

সুব্রত এসে সনতের পায়ের কাছটাতে বসল। এ কি! সনৎ জেগে স্বপ্ন দেখছে না তো? এও কি সম্ভব? তার এত বড় বিজয়ী শত্রু লক্ষপতি সুব্রত রায় আজ তারই ঘরে!—না, এ শুধু তার পরাজয়ে প্রফুল্ল হয়ে তাকে বিদ্রূপ করতে এসেছে!

সুব্রত আবার বললে, সনৎদা, এ জগতে আমার কেউ নেই। তুমি আমার দাদা। আমি তোমার ছোট ভাই। তুমি সম্পত্তির ভার নাও, আমি শুধু তোমার পাশে ছোট ভাইটির মত তোমার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকব। সম্পত্তির ওপরে আমার কোন লোভ নেই!

সনৎ আশ্চর্য! এই কি তার বিজয়ী শত্রুর কথা? এত উদার—এত মহৎ তার প্রাণ? সে তাকে বিপদে ফেলে এত কষ্ট এত যাতনা দিলে, তাকেই সে এসে আবার দাদা বলে ডাকছে?

সনতের মনের ভাব বুঝতে পেরে অমরবাবু বললেন, সনৎ, জান না যে সৎশিক্ষা সৎসঙ্গ মানুষকে কত মহৎ, কত বড় করে তোলে! তার প্রাণে কত ক্ষমা, কত স্নেহ, কত ভালবাসা! শত্রুকে সে হাসতে হাসতে আলিঙ্গন দেয়। পরের দুঃখে আপনি কেঁদে পরকে কাঁদায়। আর কুশিক্ষা অসৎসঙ্গ! মানুষকে নরকের গভীর পঙ্কিলতলে ডুবিয়ে দেয়।

সনতের চোখের কোল দুটি জলে ভরে উঠল। সুব্রতর দিকে চেয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সনৎ বলে, আমায় তুমি ক্ষমা কর ভাই।

সুব্রত সনতের পায়ের ওপরে মাথা গুঁজে স্নেহ-করুণ স্বরে বললে, তুমি যে আমার দাদা!

দুই ভাই স্নেহের ধারায় পরস্পরকে সিক্ত করে দিল। ভাইয়ে ভাইয়ে সেই মিলন-দৃশ্য বড়ই চমৎকার।

সাঁঝের আঁধারটা তখন চারিদিকে বেশ ঘন হয়ে এসেছে। এমন সময় সনতের একজন ভৃত্য একটা ছোট কাঠের বাক্স হাতে করে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সে অমরবাবুর কাছে গিয়ে বললে, একটা লোক এই বাক্সটা আপনাকে দিতে বলে গেল। বড্ড নাকি জরুরী। লোকটা নাকি আপনি এখানে বেরিয়ে আসবার পর বাক্সটা নিয়ে আপনার বাসায় যায়, কিন্তু আপনার চাকরের মুখে আপনি এখানে চলে এসেছেন শুনে এখানে এসে দিয়ে গেল।

অমরবাবু একান্ত বিস্মিত হয়ে চাকরের হাত থেকে বাক্সটা নিলেন।

ভৃত্য সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ছোট্ট কাঠের বাক্সটার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন অমরবাবু. কে আবার বাক্সটা দিয়ে গেল!

তিনি তখনই আবার চাকরটাকে ডেকে সেই লোকটা তখনও আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন।

ভৃত্য জবাব দিল, সে বাক্সটা দিয়েই চলে গেছে।

অমরবাবু একান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে ফিতেটা খুলে বাক্সের ডালাটা খুলতেই সকলে আশ্চর্য হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। বাক্সের মধ্যে ছিল একটা ছোট্ট চকচকে কালো পাথরের ড্রাগনের মূর্তি, আর সেই ড্রাগনের গলায় লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা ভাঁজকরা কাগজ। কাগজটা খুলে মেলে ধরতেই অমরবাবু বিস্ময়ে একেবারে থ হয়ে গেলেন। কাগজখানায় ভ্রমর-আঁকা একটি ছোট্ট চিঠি—আর তাতে লেখা ছিল এই কটি কথা—

মূর্খ অমরবাবু, এবারে তোমার পালা। প্রস্তুত থেকো। কালো ভ্রমরের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি। ক্ষুধার্ত নেকড়ের গহ্বরে এসে তুমি পা দিয়েছ। এই ড্রাগনই আমাদের মৃত্যু-দূত। তোমার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পরোয়ানা তোমায় পাঠানো হল।

কালো ভ্রমর

অমরবাবু ধীরে ধীরে চিঠিটা সুব্রতর দিকে এগিয়ে দিলেন। রাজুও এগিয়ে এল চিঠিটা দেখবার জন্য।

সনৎ জিজ্ঞাসা করলে, কি? কার চিঠি?

সুব্রত এবারে চিঠিটা নিঃশব্দে সনতের দিকে এগিয়ে দিল। চিঠিটা পড়ে সনৎ গর্জে উঠল, শয়তান! উঃ কি ভয়ঙ্কর আস্পর্ধা দেখেছ? মৃত্যুদূত!

এমন সময় সুব্রত ঝুঁকে পড়ে অমরবাবুর হাতের বাক্স থেকে পাথরের ড্রাগনটা তুলে নিয়ে সজোরে মেঝের উপর নিক্ষেপ করল। ড্রাগনটা ছিটকে গিয়ে দরজার কাঁচের শার্সির গায়ে লাগতেই কাঁচের শার্সিটা ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল।

সেইদিকে তাকিয়ে সুব্রত কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল, মূর্খ, এ মৃত্যুর পরোয়ানা আমাদের জন্য নয়—তোমার জন্যই; আর তোমার মৃত্যুরও খুব বেশী দেরি নেই।

কিন্তু অদুরে নিক্ষিপ্ত ভগ্ন কাঁচস্তূপের মধ্যে কালো পাথরের ড্রাগনটার দিকে চোখ পড়তেই কেমন যেন একটা অজানা আতঙ্কে অমরবাবুর বুকের ভিতরটা সিরসির করে ওঠে।

।। ২৫ ।।

শেষের কথা

তারপর সনৎ ও নীতীশ একটু সুস্থ হয়ে উঠলে রেঙ্গুনের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে দুই ভাই, নীতীশ ও রাজু সকলে এসে জাহাজে চাপল। অমরবাবুর কৃতিত্বের জন্য ওরা তাঁকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছিল এবং বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলে।

অমরবাবু পকেট থেকে কালো ভ্রমরের চিঠিটা বের করে বললেন, যাবার ইচ্ছা রইল, যদি মৃত্যুর পরোয়ানা আমায় বাঁচতে দেয়! শোনা যায় নাকি, আজ পর্যন্ত যার যার কাছে 'কালো ভ্রমরে'র এই ড্রাগনের মৃত্যু-পরোয়ানা গেছে, জগতের কোন শক্তিই তাদের এই ড্রাগনের কঠিন কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি—এমনি অমোঘ, এমনি ভীষণ এই ড্রাগনের মৃত্যু-পরোয়ানা!

ড্রাগনটা সুব্রত সঙ্গে নিয়েছে, রেখে দেবার মতই একটা জিনিস বটে।

সনৎ বললে, বিপদে পড়লেই আমাদের অবশ্যই জানাবেন, আমরা প্রাণ দিয়েও আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসব।

* * *

বাংলা দেশে ফিরে এসে মার পায়ে একে একে সকলেই প্রণাম করল। সুব্রত বলল, মাগো, তোমার আর একটি ছেলে—সনৎদা!

মার চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। তিনি হাসতে হাসতে পাতানো-ছেলের দলকে গভীর স্নেহে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মা-হারার দল মা পেয়ে ধন্য হয়ে গেল।...

দ্বিতীয় পর্ব

প্রীতিভোজ উৎসব সুব্রতর বাড়িতে।

আমহার্স্ট স্ট্রীটে প্রকাণ্ড বাড়ি কিনেছে সুব্রতরা। সেই বাড়িতেই গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে এই প্রীতিভোজের উৎসব।

অনেক আমন্ত্রিতই এসেছেন, তাঁদের মধ্যে এসেছে বিশেষ একজন, কিরীটী রায়।

রহস্যভেদী কিরীটী রায়।

কিরীটী রায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ চেহারা, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল ব্যাকব্রাশ করা।

চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা।

দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

মুখে হাসি যেন লেগেই আছে, সদানন্দ, আমুদে।

ওদের পাড়াতেই এক নবলব্ধ বন্ধুর গৃহে কিরীটীর সঙ্গে ওদের আলাপ-পরিচয় হয়।

প্রীতিভোজের পর বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে কিরীটী বলে, এই কালো পাথরের ড্রাগনটি আমি চাই সুব্রতবাবু। অপূর্ব মূর্তিটির গঠন-কৌশল—ঐটি আমি আমার মিউজিয়ামে রাখতে চাই!

বেশ তো, তা নিন না। সুব্রত বলে।

কিরীটী বলে, শুধু যে মূর্তিটিই তা নয়, ওর সঙ্গে যার নাম জড়িয়ে আছে, কেন জানি না, আপনাদের কাহিনী শুনে সেই নামটির প্রতিও আমার একটা দুর্বলতা জন্মে গেছে।

সুব্রত কিরীটীর কথায় হেসে ফেলে, জানেন না বোধ হয়, মা বলেন, ওটা নাকি একটা অমঙ্গলের চিহ্ন!

তবে তো ভালই হল। অমঙ্গলকে সাদরে আমার গৃহে বহন করে নিয়ে যাই আপনাদের ঘর থেকে। দেখা যাক কি অমঙ্গল আমার ঘরে ও নিয়ে আসে!

* * *

রাত্রি তার ঘন কালো পক্ষ বিস্তার করে দিয়েছে বিরাট এ কলকাতা মহানগরীর বুকে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

জনহীন রাস্তা যেন ঘুমন্ত অজগরের মত গা এলিয়ে পড়ে আছে। সাড়া নেই, শব্দ নেই।...

কিরীটী একা একা পথ অতিক্রম করে চলেছে।

পকেটের মধ্যে কালো পাথরের ড্রাগনটি।

আশ্চর্য? কিরীটীর যেন মনে হয়, নিঃশব্দে কে বুঝি আসছে কিরীটীর পিছু পিছু!

যে আসছে তার পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না, কিন্তু তবু স্পষ্ট বোঝা যায়—সে আসছে!

এরকম নাকি ঘটে, শুনেছে কিরীটী অনেকের মুখেই এবং এও শুনেছে, চোখ ফেরালেও নাকি তাকে দেখা যায় না। কেউ ওদের দেখতেও পায় না। অথচ বিশ্রী অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি যেন সমগ্র চেতনাকে ওরা ঘিরে থাকে। কখনও নিঃশব্দে মরা চাঁদের আলোয় জনহীন প্রান্তরেও ওরা এমনি করে হেঁটে বেড়ায়, অনুসরণ করে, কখনও বা অন্ধকারে পিছনে পিছনে আসে। তা আসে আসুক—অনুসরণ করে করুক!

কিরীটী এগিয়ে চলে।

অভিশাপকে বরণ করে নিয়ে চলেছে নিজের গৃহে।

কালো ভ্রমরের মৃত্যু-পরোয়ানা।

* , * *

কালো পাথরের ড্রাগনটির কথা সকলে একরকম ভুলেই গিয়েছিল, তা হল না বলেই আবার এ কাহিনীর শুরু।

কলো ভ্রমর আবার ফিরে এল।

সেই তাদের মত বুঝি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রাত্রির রহস্য-ঘন অন্ধকারে।

পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, নিঃসীম অতলান্ত অন্ধকারে চারিদিক যখন হয়ে আসে নিঝুম, মাথার ওপরে শুধু তারায় ভরা আকাশ বোবা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে, রাতের বাতাসের চুপিসাড়ে তখন যেন তাদের মতই আসে।

রহস্য দিয়ে ঘেরা কালো ভ্রমর। রহস্য-ঘন হয়েই ধরা দেয় যেন।

কতটুকুই বা পরিচয় সনতের! সনৎ ভাবে, কতটুকুই বা সে জানে কালো ভ্রমরের!

মুখোশ-ঢাকা ছিল, শুধু মুখোশের দুটি ছিদ্রপথে অন্তর্ভেদী দুটি চোখের দৃষ্টি।

কি সম্মোহন আছে ওই চোখের দৃষ্টিতে! একবার সে-চোখের দিকে যে তাকিয়েছে সে ভুলবে না আর সে দৃষ্টি—ভুলতে পারে না।

চোখের তারা তো নয়, যেন দুটি জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ড।

এখনও কত রাত্রে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্নের মত সেই চোখের দৃষ্টি সনৎকে যেন বিচলিত বিবশ করে দেয়। কি এক অজানিত আশঙ্কায় সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে ওঠে তার।

ভুলতে পারে না রাজু।

দস্যু কালো ভ্রমর!

শয়তান কালো ভ্রমর! কিন্তু সত্যিই কি তাই তার একমাত্র পরিচয়? সেই বলিষ্ঠ পেশল উন্নত গঠন, তেজোদৃপ্ত কণ্ঠস্বর!

রাজু শুনেছিল—মস্ত বড় নাকি একটা দল আছে কালো ভ্রমরের। অথচ আশ্চর্য, দলের লোকেরা কেউ নাকি আজ পর্যন্ত জানে না, কালো ভ্রমরের আসল ও সত্যিকারের পরিচয়। কে সে; কি সে এবং কেমন দেখতে সে!

দলের লোকেরা শুধু এইটুকুই জানে যে কঠোর তার অনুজ্ঞা। কঠোর তার নীতি। অপূর্ব তার সংযম। নির্লোভ। আজন্ম ব্রহ্মচারী। তবু সে শয়তান। তবু সে ডাকাত। তবু সে আতঙ্ক। তবু সে সমাজের বাইরে, সকলের ঘৃণা ও অভিশাপের পাত্র।

সুব্রত? সে ভাবে, একটা তেজোদৃপ্ত অহঙ্কার। অদ্ভুত কৌশলী ডাকাত, দস্যু। কালো পাথরের ড্রাগনটির কথা মনে হলেই মনে পড়ে সেই দুঃস্বপ্ন। রূপকথার কাহিনীর মত

সেই সম্পত্তি-প্রাপ্তি! তার পর সেই নীল পারাপারহীন মহাজলধি! কি অপূর্ব বিরাট বিস্ময়! মগের দেশ! বেচারী অমরবাবু!

সত্যিই কি শয়তান কালো ভ্রমর তাঁর ওপরে প্রতিশোধ নেবে?

আর ওদের সঙ্গে সঙ্গে ভাবে কিরীটী, রহস্যভেদী কিরীটী। রহস্য উদ্‌ঘাটনে ওর আছে একটা তীব্র নেশা। আছে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনা। কালো ভ্রমর সাধারণ ছিঁচকে চোর নয়। প্রখর বুদ্ধি ও অমিত শক্তির অধিকারী সে।

কালো ভ্রমর সম্পর্কে তাই বুঝি কিরীটী এক অদৃশ্য সঙ্কেত অনুভব করে, কি এক গভীর রহস্য যেন ওকে আকর্ষণ করে।

বিচিত্র এই জগৎ!

আরও বিচিত্র এই জগতের মানুষ!

কেন মানুষ এমনি করে অন্ধের মত ছুটে যায় সর্বনাশের পথে?

অকারণে আপনাকে বিপদের মধ্য ফেলে কেন নিজেকে করে ব্যস্ত?

এও হয়তো একটা নেশা।

নেশা বৈকি। নেশা না হলে কি কেউ এমনি করে আপনাকে বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে? সত্যি, বিচিত্র এই জগতের মানুষ! আরও বিচিত্র তার মতি-গতি!

॥ ১ ॥

বাদল-সন্ধ্যার আগন্তুক

শীতের সকাল নয়, এবারে বাদলের রাত্রি।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে বাইরে। মেঘ-মেদুর আকাশের গায়ে বিদ্যুতের সোনালী আলোর চকিত ইশারা উঠছে থেকে থেকে লকলকিয়ে।

মেঘনিবিড় রাত্রির অন্ধকার সূচীভেদ্য। রাত্রি সাড়ে সাতটা আটটার বেশী নয়।

সুব্রত, সনৎ ও রাজু পাশাপাশি তিনখানা চেয়ারের ওপরে বসে কি একটা বিষয় নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছে ঐ বাদলের সন্ধ্যারাত্রে।

রাজুর মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর ডিশে গরম গরম পাঁপর, বেগুনী ও মটরভাজা।

সুব্রত এক লাফে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসে। দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে, সত্যি মা, তোমাকে যে কি ভালবাসতে ইচ্ছা করছে! কেমন করে তুমি আমাদের মনের এই মুহূর্তের আসল কথাটি টের পেলে বল তো? এমন বাদলার রাতে তেলে-ভাজা! আমাদের এক বন্ধু কবি মণি দত্ত কবিগুরুর একটা কবিতার প্যারডি করেছিল একবার—

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব,—
পাঁপরভাজা দিয়ে মটর সাথে নিয়ে
জিহ্বা দিয়ে শুধু অনুভব...

সুব্রতর কবিতা শুনে মা হেসে ফেলেন, সঙ্গে অন্য সকলেও।

রাজু হাসতে হাসতে বলে, দাদা গো, বিশ্বকবিকে আর এভাবে স্মরণ করো না। তাঁর সর্বজনপ্রিয় বর্ষা কবিতাটির এই অদ্ভুত প্যারডি শুনে, আর যাই হোক, তিনি নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত হবেন না—তা এখন তিনি যেখানেই থাকুন।

কিন্তু এগুলো যে জুড়িয়ে গেল, বেশী রাত করিস নে। আজ মটরশুঁটির খিচুড়ি হচ্ছে। মা বলেন আবার মৃদু হেসে।

সত্যি! Three cheers for মা! সুব্রত বলে ওঠে। মা খোলা দরজাপথে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

সকলে আহার্যে মনোনিবেশ করে।

ঠিক এমনি সময়ে বাইরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল, খুট...খুট... খুট।...

রাজুই প্রথমে বলে, কে যেন কড়া নাড়ছে!

আবার কড়া-নাড়ার শব্দ।

কে? সুব্রত উঠে দাঁড়ায় এবং দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

সুব্রত দরজাটা খুলে দিল। রাস্তার অদূরবর্তী গ্যাসের আলো বৃষ্টিভেজা পিচঢালা রাস্তার ওপরে পড়ে চিকচিক করছে।

মধ্যে মধ্যে এক-এক ঝলক জলকণাবাহী হাওয়া গায়ে চোখে মুখে এসে ঝাপটা দেয়, সিরসির করে ওঠে সর্বাঙ্গ।

দরজার ওপরেই গায়ে বর্ষাতি, মাথায় বর্ষা-টুপি, হাতে ঝোলানো একটি ম্যাডস্টোন ব্যাগ—এক অপরিচিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

এইটাই কি ১৮নং বাড়ি? মিঃ সুব্রত রায়...? আগন্তুক প্রশ্ন করেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই। তা আপনি...

আমাকে চিনতে পারছেন না, এই তো? তা সে হবে'খন, আপাতত আমাকে এ বৃষ্টির মধ্যে না দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিলে—

বিলক্ষণ! আসুন আসুন।

সুব্রতর আহ্বানে আগন্তুক এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই রাজু ও সনৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাল বিস্মিতভাবে।

ভদ্রলোক প্রথমেই গায়ের ভেজা বর্ষাতিটা খুলে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে ঘরের দেওয়াল-আলনায় ঝুলিয়ে রাখলেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে জানালেন, নমস্কার।

আগন্তুকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছিই বোধ হয় হবে, দেহের গড়ন দোহারা ও বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়। ভদ্রলোক বেশ শৌখিন প্রকৃতির। মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশানো। ভ্রূযুগলের নীচে একজোড়া তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চক্ষুতারকা। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

আমায় চিনতে পারছেন না আপনারা কেউই—তাই সর্বাগ্রে পরিচয়টাই দিই, আমার নাম বনমালী বসু। ডিব্রুগড় থেকে আসছি। কলকাতায় এসেছি আপনাদের কাছেই একটি বিশেষ জরুরী পরামর্শের জন্য। সুব্রত, রাজেন ও সনৎবাবু—সকলের নিকটই আমার বক্তব্য আমি পেশ করব। কিন্তু তারও আগে যদি এক কাপ চা পেতাম! বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শরীর যেন একেবারে অবশ হয়ে গেছে!

নিশ্চয়ই, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত কুণ্ঠাবোধ করছেন কেন? বলে তখনই সুব্রত ভৃত্যকে ডেকে এক কাপ চা আনতে আদেশ দিল।

কিছুক্ষণ পরে চা এল। গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভদ্রলোক বললেন, শোনা যায়, সত্যযুগে অতিথি-সৎকার করা গৃহস্থের একটা প্রধান ও অবশ্যকরণীয় ধর্ম ছিল, আর আজকাল ভিখারী ও প্রার্থীকে বাড়ি হতে তাড়িয়ে দেওয়াটাই হয়েছে একটা রীতি!

রাজু প্রতিবাদের সুরে বললে, হ্যাঁ, তার কারণও আছে। আজকাল সকলেই ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ করতে চায়। পরের মাথায় যে যত সুন্দরভাবে হাত বুলোতে পারে তারই জয়জয়কার।

তা-যা বলেছেন! বলতে বলতে ভদ্রলোক নিঃশেষিত চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলেন।

বাইরে আবার জোরে বৃষ্টি নামল। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইতে শুরু করল।

আপনি কেন হঠাৎ এই ঝড়-বাদলের রাত্রে ডিব্রুগড় থেকে এত দূর আমাদের কাছে এলেন, তা তো কই শোনা হল না বনমালীবাবু এখনও? সুব্রত প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, সে-কথাই এবারে বলব। বলতে বলতে ভদ্রলোক একটু নড়ে-চড়ে বসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আরম্ভ করলেন, তা হলে খুলেই বলি কথাটা সুব্রতবাবু, যেজন্য এতদূর ছুটে এসেছি। তাই বলছি—একটা বিশেষ দুর্ভাবনায় পড়েছি মশাই।

সকলেই উদগ্রীব হয়ে বনমালী বসুর দিকে তাকাল।

বনমালী বলতে থাকেন, কেন আপনাদের কাছে আসতে হয়েছে, জানেন? আমার কাকা অমর বসু ছিলেন রেঙ্গুনের বিখ্যাত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী মিঃ চৌধুরীর ফার্মের ম্যানেজার ও প্রাইভেট সেক্রেটারী।

ছিলেন মানে? সকলে একসঙ্গে একই প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ ছিলেন, কিন্তু এখন আর নেই। কারণ গত ৩১শে তারিখে কোন অদৃশ্য আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হয়েছেন।

নিহত হয়েছেন! অমরবাবু! এ আপনি কি বলছেন বনমালীবাবু? সুব্রত উৎকণ্ঠিত ভাবে বলে।

বলছি যা তার মধ্যে এক বর্ণও মিথ্যা বা তৈরী করা নয়। কে বা কারা যে তাঁকে হত্যা করেছে তা অবিশ্যি এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। দিন দশেক আগের এই 'তার' আমি রেঙ্গুন থেকে পাই। এই দেখুন—বলতে বলতে ভদ্রলোক বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে সকলের চোখের সামনে আলোর নীচে মেলে ধরলেন।

কাগজের ভাঁজ খুলে ধরবার সময় ভদ্রলোকের হাতের জামাটা একটু সরে যেতেই খোলা হাতের উপরে সনতের নজর পড়ল মুহূর্তের জন্য। বিস্ময়ে আতঙ্কে চমকে উঠল সে। কিন্তু আর সকলে তখন সেই কাগজের লেখাগুলো পড়তেই ব্যস্ত, সেদিকে কারও নজর গেল না। কাগজে যা লেখা ছিল, তার বাংলা তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়—

গত শুক্রবার মিঃ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ অমর বসুকে তাঁর শয়নঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণ ছুরি কিংবা ঐজাতীয় কোন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর মুখখানি এমনভাবে বিকৃত করা হইয়াছে যে মিঃ বসুকে একেবারে চেনাই যায় না। অবশ্য মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হইয়াছে। সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টার মিঃ সলিল সেন তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি 'তার' পাওয়া মাত্র এখানে আসিবেন।
—ডি. আই. জি.

পড়া শেষ হলে ভদ্রলোক বললেন, সেদিনকার স্থানীয় সংবাদপত্রে যে সংবাদ বেরিয়েছে তারও কাটিং যোগাড় করেছি। এই দেখুন, কাটিংটায় লেখা রয়েছে—

স্বর্গীয় মিঃ চৌধুরীর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ অমর বসুর
অভাবনীয় মৃত্যু!

আপনারা সকলেই জানেন, মাত্র মাসখানেক আগে মিঃ বসু মৃত মিঃ চৌধুরীর অন্যতম প্রধান সাক্ষীর কর্তব্যপালনের জন্য কিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিখ্যাত দস্যু 'কালো ভ্রমরে'র মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইয়া উইল-সংক্রান্ত সমস্ত গোলমাল মিটাইয়া সব কিছুর নিস্পত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রভুভক্তি ও কর্তব্যপরায়ণতার কথা এখনও শহরবাসী কেহই আমরা ভুলিতে পারি নাই। গতকাল তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার শয়নকক্ষেব মধ্যে পাওয়া যায়। তীক্ষ্ণ ছোরা বা ঐজাতীয় কোন অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার

মুখ-চোখ এমনভাবে বিকৃত করা হইয়াছে যে, তাঁহাকে আর শ্রীযুক্ত অমর বসু বলিয়া চেনাই যায় না। আগের দিন প্রায় রাত ১২টা পর্যন্ত তিনি অফিস-সংক্রান্ত কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। ১২টার পর তিনি শয়নগৃহে ঘুমাইতে যান এবং ঐদেশীয় ভৃত্য আলো নিভাইয়া দিয়া শুইতে যায়। পরদিন প্রত্যূষে প্রভাতী চা লইয়া মনিবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া মনিবের রক্তাক্ত মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তখনই ফোনে পুলিসে সংবাদ দেয়। ইন্সপেক্টার মিঃ সলিল সেন তদন্তের ভার লইয়াছেন। কে বা কাহারা যে এইভাবে হত্যা করিয়া গেল, আজ পর্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। তবে আমাদের মনে হয় কালো ভ্রমর সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ একটু মনোযোগী হইলে ক্ষতি কি!

শেষ পর্যন্ত সেই ড্রাগনের মৃত্যু-পরোয়ানাই সত্যি হল, একজন দুর্ধর্ষ ডাকাতের জেদই বজায় রইল! সুব্রত বললে।

সনৎ কিন্তু একটিও কথা না বলে অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

॥ ২ ॥
গভীর নিশীথে

এত বড় একটা দুঃখের সংবাদ সকলের মনই যেন কেমন বিষণ্ন করে দেয়। সেই উইল-সংক্রান্ত ঘটনাটা কি আজ পর্যন্ত কেউ ভুলতে পেরেছে? ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। সুব্রত ভাবছিল, অজানা বন্ধু কেমন করে ছায়ার মতই পাশে পাশে থেকে সেদিন তাদের সকলকে সকল বিপদের কবল হতে আড়াল করে রক্ষা করেছিলেন! এক কথায় বলতে গেলে মিঃ বসু না থাকলে ঐ বিপুল সম্পত্তিপ্রাপ্তি তাদের ভাগ্যে রম্ভা-প্রাপ্তিতেই পরিণত হত।

কতক্ষণ এভাবে নীরবে কেটে গেল। সর্বপ্রথম সনৎই সেই নীরবতা ভঙ্গ করে বনমালীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, তা আপনি এখনও বর্মা-যাত্রা করেননি কেন বনমালীবাবু?

সনতের প্রশ্নটা শুনে বনমালী বসু যেন প্রথমটা একটু চমকে উঠলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, যাইনি তারও কারণ আছে। প্রথমত সে বিদেশ-বিভুঁই মগের দেশ। কাউকে জানি না, চিনিও না কাউকে। দ্বিতীয়ত মশাই, সত্যি কথা বলতে কি, আমি একটু ভীতু-প্রকৃতির লোক। খবরের কাগজে আপনাদের কথা ও কাকার সঙ্গে আপনাদের আলাপ-পরিচয়ের কথা পড়েছিলাম এবং পরে কাকাও আমাকে আপনাদের সম্পর্কে চিঠি দিয়েছিলেন। ডি. আই. জি.-র 'তার' পাওয়ার পর প্রথমটা অনেক ভাবলাম এবং ভাবতে ভাবতে কেন জানি না, আপনাদের কথাই আমার মনে পড়ল। তারপর অনেক কষ্টে আপনাদের ঠিকানা জোগাড় করে এখানে আসছি। এখন যদি আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই! এই পর্যন্ত বলে বনমালীবাবু থামলেন।

সনৎই আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা বনমালীবাবু, ঠিক কি ধরনের সাহায্য আপনি আমাদের কাছে আশা করে এখানে এসেছেন বলুন তো? কারণ এক্ষেত্রে যে ঠিক কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, সত্যি কথা বলতে কি, যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

সাহায্য অবিশ্যি আপনারা আমাকে অনেক ভাবেই করতে পারেন, তবে যেজন্য আমি এতদূর আশায় আশায় ছুটে এসেছি, যদি আপনারা একটিবার দয়া করে আমার সঙ্গে রেঙ্গুনে যান—তা হলে আপনাদের সকলের সাহায্যে হয়তো ব্যাপারটার একটা ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখতে পারতাম। তাছাড়া আত্মীয় বলতে আমার ঐ কাকাই যা একজন বেঁচেছিলেন। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে যেন। একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন, অবিশ্যি বলাই বাহুল্য যে, আপনাদের যাতায়াতের সর্ববিধ খরচ আনন্দের সঙ্গেই আমি বহন করব।

খরচের কথা বাদ দিন বনমালীবাবু। যেভাবে আমরা, বিশেষ করে আমি অমরবাবুর কাছে ঋণী, সামান্য অর্থের কথা সেখানে উঠতেই পারে না। কথাটা বলে সুব্রত।

তাছাড়া আমার কেন যেন মনে হচ্ছে মিঃ রায়, আমার খুড়ো মশাইয়ের এই নিষ্ঠুর হত্যার ব্যাপারে কোথাও যেন বেশ একটু গোলমাল আছে।

গোলমাল আছে মানে? সুব্রত প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, গোলমাল। ভেবে দেখুন, হত্যাই যখন তাঁকে করা হল, তখন অমন করে হত্যাকারী অস্ত্রের সাহায্যে মৃতব্যক্তির মুখ বিকৃত করে গেল কেন? কি তার উদ্দেশ্য ছিল? তারপর সংবাদপত্রে ঐ দস্যু কালো ভ্রমরের কথা ইঙ্গিত করেছে, কারণ ভেবে দেখুন, আপনাদের উইলের ব্যাপারে আমার কাকা আপনাদের সাহায্য করায় ঐ কালো ভ্রমরের বিপক্ষে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছিল, সে ব্যাপারে কালো ভ্রমরের একটা আক্রোশ কাকার ওপর থাকাটাও অসম্ভব নয়—তাতে করে ঐ দস্যুকেই আমার সন্দেহ হয়। তাছাড়া আপনাদের উইলের ব্যাপার নিয়ে কালো ভ্রমরের দলের সঙ্গে বহু সংঘর্ষ হয়েছে বলে ও বিষয়েও আপনাদের খানিকটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাও তো আছে। এই সব কারণেই আমি আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

সনৎ বলল, কিন্তু এ হত্যার ব্যাপারে আদপেই কালো ভ্রমরের কোন হাত নাও তো থাকতে পারে। কালো ভ্রমরের ঘাড়েই বা দোষটা চাপাচ্ছেন কেন? হত্যার ব্যাপারে কালো ভ্রমর যে জড়িত আছে, এমন কোন নিদর্শন কি পাওয়া গেছে? কিংবা সে কি কিছু রেখে গেছে? সবটাই তো সংবাদপত্রের অভিমত।

সনতের কথায় বাধা দিয়ে সুব্রত ও রাজু বলে উঠল, সে তুমি যাই বল সনৎদা, আমরা একেবারে হলফ করে বলতে পারি-কালো ভ্রমর ছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কারও হাত নেই। মনে পড়ে তোমার, সেই রেঙ্গুনের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যাবেলা বাক্সে করে সেই চিঠি ও ড্রাগন পাঠাবার কথা? সে সব কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি তুমি এত তাড়াতাড়ি!

না, ভুলিনি এত তাড়াতাড়ি। কিন্তু সেই ব্যাপারের সঙ্গে এর এমন কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে সুব্রত, সেটাই ভাই যেন বুঝে উঠতে পারছি নে!

কেন? সেই চিঠি ও ড্রাগন পাঠানোর পর অমরবাবুর এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু, এর পরও কি তোমার বোঝবার অসুবিধা হচ্ছে?

অসুবিধাটা ঠিক কালো ভ্রমরের এই ব্যাপারে জড়িত থাকার সম্ভাবনাটাই নয়, অন্য কিছু। সময় হলে বলব, এখন না।

সনৎ যেন ইচ্ছে করেই চুপ করে যায়।

আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না সনৎদা, এই সোজা ব্যাপারটাকে তুমি অত ঘুরিয়েই বা দেখছ কেন?

আপনার বুঝি এই মৃত্যু-ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে সনৎবাবু! সহসা বনমালীবাবু প্রশ্ন করলেন।

ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে ঐসময় প্রবেশ করল, বললে, মা বললেন খিচুড়ি তৈরী হয়ে গেছে, দেরি করলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপনাদের কি খাওয়ার জায়গা করা হবে?

সনৎ জবাব দিল, হ্যাঁ, জায়গা করে দিতে বল গে—তা হলে বনমালীবাবু, আপনিও এই গরীবদের ঘরে দুটো খুদকুঁড়ো যা হয়—আশা করি আপত্তি নেই...

বিলক্ষণ, এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন? আপনারা না বললেও আমি সেধে চেয়ে খেতাম। আমার আবার হোটেলের খাওয়াও তেমন সহ্য হয় না।

আহারের স্থান হলে সকলে গিয়ে একত্রে খেতে বসল এবং বেশ তৃপ্তিসহকারেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হল।

বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি নেমেছে। প্রমত্ত বায়ুর হাহাকারে দিগন্ত ঝঙ্কৃত ও কম্পিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎঝলকে চোখ যেন ঝলসে যায়। সেই ঝড়-বাদলের রাত্রে সুব্রতই যেচে বনমালীবাবুকে সেখানে থাকতে অনুরোধ জানালে। তিনিও সম্মত হলেন। একতলার বৈঠকখানার পাশের ঘরে বনমালীবাবুর শয়নের বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল।

*　　　*　　　*

রাত যত বাড়তে থাকে, সেই সঙ্গে ঝড় ও জলের প্রকোপও যেন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বনমালীবাবুকে এইভাবে যেচে বাড়িতে স্থান দেওয়াটা গোড়া হতেই যেন সনতের মনঃপূত হয়নি। তার পরামর্শ না নিয়েই কেন যে সুব্রত বনমালীবাবুকে গৃহে স্থান দিল! সনতের চোখে ঘুম আসছিল না, তাই সে একসময় ঘর থেকে বের হয়ে বাইরের টানা বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে নিশীথ রাতের তাণ্ডবলীলা দেখছিল। বাইরের রুদ্র তাণ্ডব কি তার মনের মধ্যেও তাণ্ডব শুরু করেছে? পাশের ঘরেই সুব্রত ও রাজু অঘোরে নিদ্রা দিচ্ছে আর তার পাশের ঘরে শুয়ে বনমালীবাবু!

এলোমেলো চিন্তা করতে করতে একসময় বুঝি সনৎ কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, সহসা কে যেন নিঃশব্দে সনতের কঁধের উপর হাত রাখলে।

কে? চমকে উঠে সনৎ ফিরে তাকায়।

বারান্দায় সিলিংয়ে ঝোলানো ম্রিয়মাণ বৈদ্যুতিক আলোর খানিকটা তির্যক গতিতে এসে এদিকে পড়েছে।

আগন্তুক বললে, আমায় চিনতে পেরেছ সনৎবাবু?

সনৎ যেন আগন্তুকের কথায় এতটুকু ভয়ও পায়নি, এমনি ভাবে ঠোঁটের কোণে মৃদু এক টুকরো হাসি টেনে বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বললে, তোমার কি মনে হয় বন্ধু?

বন্ধু, বন্ধু—চমৎকার! কিন্তু তোমার নামে যে একটা পরোয়ানা আছে!

পরোয়ানা? কিসের পরোয়ানা শুনতে পাই না?

নিশ্চয়ই। কালো ভ্রমরের মৃত্যু-গুহায় হাজিরা দেওয়ার।

তাহলে বলব? তুমি বা তোমার দলপতি এখনও সনৎ রায়কে ঠিক চিনতে পারনি!

চিনিনি তোমাকে! কে বললে? পাশ হতে চাপাকণ্ঠে অপর কেউ যেন বলে উঠল অকস্মাৎ।

অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় বারান্দাটা যেন আশু এক ভৌতিক সম্ভাবনায় থমথম করে ওঠে সহসা।

আকাশ ভেঙে যেন আজ রাতে বৃষ্টি নেমেছে—ঝম ঝম...ঝম্ ঝম। সেই অবিশ্রাম একটানা শব্দেও পার্শ্ববর্তী আগন্তুকের কণ্ঠস্বরটা শুনতে কষ্ট হয় না সনতের।

অতর্কিতে সেই কণ্ঠস্বরে সঙ্গে সঙ্গে চমকে সনৎ ফিরে তাকায়। ইতিমধ্যে ঠিক তার পশ্চাতে কখন যে আরও চারজন এসে নিঃশব্দে উপস্থিত হয়েছে তা সে টেরও পায়নি। প্রথমটায় সে অতর্কিতে এতগুলো লোকের আর্বিভাবে বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিমেষে নিজেকে সে সামলে নেয়।

একটু বেচাল বা অসতর্ক হলেই লোকগুলো যে তার ওপরে চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সনৎ ভেবেই পায় না, কি উপায়ে সে নিজেকে এই মুহূর্তে রক্ষা করতে পারে!

তোমাদের কি উদ্দেশ্য তা জানতে পারি কি?

কেন বন্ধু, এখনও কি তোমার সে কথা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে? নিশ্চয়ই এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওনি যে, কালো ভ্রমরের প্রতিশ্রুতির টাকা বা কালো ভ্রমরের ন্যায্য পাওনা এখনও শোধ করনি তুমি!

কালো ভ্রমরের ন্যায্য পাওনা! হু, তা পাওনাই বটে!

এতবড় বিপদের সম্মুখীন হয়েও সনতের কণ্ঠস্বর অবিচলিত। বলে, বেশ, সে টাকা আমি কালই দিয়ে দেব।

অনেক দেরি করে ফেলেছ সনৎবাবু, সুদে-আসলে এখন সে টাকার অঙ্ক তোমার ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। কি ভাবে যে তোমাকে সেটা শোধ করতে হবে, সেকথা কালো ভ্রমরই তোমায় যথাসময়ে বাতলে দেবে। রূঢ়-বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে লোকটি বলে।

লোকটার শেষ কথাগুলি যেন মুখেই আটকে গেল, বিদ্যুৎগতিতে সনতের বজ্রমুষ্টি ভীম বেগে এসে লোকটার চোয়ালে আঘাত করল।

সনৎ দ্বিতীয়বার মুষ্টি উত্তোলনের আগেই দুজন তাকে পশ্চাৎ দিক থেকে চকিতে জাপটে ধরল।

আক্রান্ত হয়ে সনৎ নিজেকে মুক্ত করবার জন্য প্রথমেই সামনে যে ছিল তাকে পা দিয়ে লাথি বসাল।

ধর শয়তানটাকে! শক্ত করে চেপে ধর! কে যেন বলে।

সনৎ ইতিমধ্যে নিজেকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে সিংহবিক্রমে সম্মুখের লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে পাশের লোক দুটিও দু'পাশ হতে সনৎকে আক্রমণ করল।

অন্ধকার জলে ভেজা বারান্দায় ওদের হুটোপুটি চলতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে ছায়ার মত আরও দুজন লোক এসে সেখানে হাজির হল। কাজেই সনৎকে শীঘ্রই বিপক্ষ দলের কাছে হার মানতে হল। এতগুলো লোকের মিলিত আক্রমণে পরাজিত

সনতের মুখটা ততক্ষণে আক্রমণকারীদের মধ্যে একজন ক্ষিপ্রহস্তে বেঁধে ফেলেছে এবং দুজনে মিলে তাকে কাঁধের পর তুলে নিয়েছে। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে সকলে সনৎকে বয়ে রাস্তায় এসে নামল।

ওদের বাড়ির অল্পদূরেই রাস্তার ওপর বৃষ্টির মধ্যে একখানা মোটরগাড়ি দাঁড়িয়েছিল, লোকগুলো তাড়াতাড়ি সনৎকে নিয়ে সেই গাড়ির মধ্যে তুলল।

পরমুহূর্তে গাড়িটা ছেড়ে দিল।

* * *

পরদিন সকালে যখন রাজুর ঘুম ভাঙল, সে দেখলে, সুব্রত তখনও ঘুমোচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে সুব্রতকে ডেকে বললে, এই সুব্রত, ওঠ ওঠ। বেলা অনেক হয়েছে।

রাজুর ডাকে সবে সুব্রত চোখের পাতা রগড়াতে রগড়াতে শয্যার ওপর উঠে বসেছে, ভৃত্য এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।—বড়দাদাবাবু উঠেছেন শিবু? সুব্রতই প্রশ্ন করে।

তিনি তো তাঁর ঘরে নেই।

নেই! আর কালকের সেই বাবুটি?

না, তিনিও নেই।

সে আবার কি! এত সকালে গেল কোথায় তারা? বাইরে তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, বর্ষাসিক্ত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রাজু বলে, এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় আবার গেল তারা!

মা এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন, হ্যাঁরে, সনৎ কোথায় গেছে জানিস? তাকে দেখলাম না তার ঘরে?

না তো মা! রাজু জবাব দেয়।

চল তো রাজু, ওদের ঘর দুটো একবার ঘুরে দেখে আসি!

প্রথমেই রাজু ও সুব্রত এসে সনতের ঘরে প্রবেশ করল। নিভাঁজ শয্যা, দেখে মনে হয় রাত্রে শয্যাস্পর্শ করা হয়নি।

হঠাৎ সামনের টী-পয়ের ওপর সুব্রতর নজর পড়ে, জলের গ্লাসটা চাপা দেওয়া একটা ভাঁজ-করা হলুদ বর্ণের তুলট কাগজ। সুব্রত এগিয়ে এসে কাগজটা তুলে চোখের সামনে মেলে ধরতেই বিস্ময়ে আতঙ্কে যেন স্তব্ধ হয়ে যায় ও।

সেই ভ্রমর-আঁকা চিঠি!

নমস্কার। চিহ্ন দেখেই চিনবে। সনৎকে নিয়ে চললাম। ভোরের জাহাজেই বর্মা যাব। ইচ্ছা হলে সেখানে সাক্ষাৎ করতে পার।

—কালো ভ্রমর

কিরে ওটা? রাজু এগিয়ে আসে।

সুব্রত চিঠিটা রাজুর হাতে তুলে দেয় নিঃশব্দে।

আবার সেই কালো ভ্রমর! মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি। উঃ, কি বোকাটাই সকলকে বানিয়ে গেল! শয়তান! ডিব্রুগড় থেকে আসছি, অমরবাবুর ভাইপো! ধাপ্পাবাজ! সনৎদা কি তবে শয়তানটাকে চিনতে পেরেছিল?

গতরাত্রের আগাগোড়া ব্যাপারটার মধ্যে তার এতটুকু উৎসাহও ছিল না। সে যেন এড়াতেই চাইছিল। বলে রাজু।

রাগে দুঃখে অনুশোচনায় সুব্রতর নিজের চুল যেন নিজেরই টানতে ইচ্ছে করে

উঃ, এত বড় আপসোস সে রাখবে কোথায়?

দেওয়ালে টাঙানো ওয়ালক্লকটার দিকে তাকিয়ে সুব্রত দেখল, বেলা তখন আটট বেজে পনেরো মিনিট। সাতটা তিরিশে জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। বাইরের দিকে তাকায় বৃষ্টি থেমেছে, মেঘ-ভাঙা আকাশে সূর্যের আত্মপ্রকাশ, স্নিগ্ধ-সুন্দর।

এখন তাহলে কি করা যায় বল্ তো সু?

আর দেরি করা নয়। চল এখনই গিয়ে আগে তো থানায় একটা ডাইরি করিয়ে আসি!

তাতে কি সুবিধা হবে?

তাহলে অন্তত 'বেতারে' জাহাজের ক্যাপ্টেনকে একটা সংবাদ দেওয়া যেতে পারে, যদি আজকের জাহাজেই তারা গিয়ে থাকে!

তারপর?

তারপর সামনের শনিবারের জাহাজে সীট পাই ভাল, না হয় পরের মঙ্গলবার আমাদের রেঙ্গুনের জাহাজ ধরতেই হবে, তা যে উপায়েই হোক। শুধু রেঙ্গুনে কেন, সনৎদের খোঁজে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে যেতে হলেও যাব, আমি খুঁজে বের করবই আর একবার সেই শয়তান শিরোমণির সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াব। সে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে, স্কাউন্ড্রেল...

মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন, তোদের চা জুড়িয়ে গেল! পরক্ষণেই ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে রে?

সুব্রত মার হাতে চিঠিটা তুলে দেয়।

চিঠিটা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক অস্ফুট কাতরোক্তি মার কণ্ঠ হতে নির্গত হয়ে আসে, সর্বনাশ! কালো ভ্রমর!

সুব্রত দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন স্বরে বললে, হ্যাঁ মা, আবার সেই কালো ভ্রমর! কিন্তু এবার সত্যি-সত্যিই তার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে।

কথাবার্তায় আর সময় নষ্ট না করে কিছু জলখাবার ও চা খেয়ে রাজু ও সুব্রত তাড়াতাড়ি লালবাজারের দিকে ছুটল।

লালবাজারে গিয়ে সোজা তারা একেবারে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে সব বললে।

ওদের সমস্ত কথা মনোযোগসহকারে শুনে সাহেব আবশ্যকীয় সব কথা নোট করে নিলেন এবং বললেন, বাবু, তোমাদের কথা শুনে আমি আশ্চর্য! এ একেবারে miracle (অত্যাশ্চর্য)! যা হোক, আমি এখনই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বেতারে সংবাদ প্রেরণের সব বন্দোবস্ত করছি।

সুব্রত লালবাজার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পোস্ট-অফিসে গিয়ে রেঙ্গুনে সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টার সলিল সেনকে একটা 'তার' করে দিল—সনৎ সম্পর্কিত সকল ব্যাপার জানিয়ে।

তারপরই দুজনে গেল জাহাজের বুকিং অফিসের দিকে। জাহাজ ছাড়বে শনিবার

—পরশুর পরের দিন এবং সেই জাহাজেই দুখানা সীট রিজার্ভের সব বন্দোবস্ত করে যখন ওরা বাড়ির দিকে পা বাড়ল, তখন প্রখর রৌদ্রে সারা পৃথিবী যেন ঝলসে যাচ্ছে। কর্মচঞ্চল শহরের বুকে অগণিত নরনারী ও বাস-ট্রামের আনাগোনার শব্দ।

ফিরতি পথে ওরা যে রাস্তাটা দিয়ে আসছিল তার দু পাশে চীনা-পট্টি। সেই চীনা-পট্টি দিয়ে চলতে চলতে এক সময় রাজু চাপাগলায় সুব্রতকে বললে, একটা লোক অনেকক্ষণ থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে সুব্রত!

সুব্রত পিছনপানে না তাকিয়েই বললে, তাই নাকি?

অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

লোকটা কি বাঙালী?

না, বর্মী বলেই মনে হচ্ছে।

কি করে বুঝলে যে লোকটা আমাদের পিছু নিয়েছে?

রাজু প্রত্যুত্তরে একটু হাসলে মাত্র, তার পরে বললে—তুই ভুলে যাচ্ছিস যে একদিন এ দলে আমি বহু ঘোরাফেরা করেছি। শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই আমাদের চিনতে কষ্ট হয় না।

আচ্ছা ওকে অনুসরণ করতে দে—দেখা যাক লোকটার দৌড় কতদূর পর্যন্ত!

একটা কাজ করলে হয় না?

কি?

আয়, শ্যামবাজারের একটা ট্রামে এখন উঠি; খানিকটা ঘুরেফিরে পরে বাড়ি যাওয়া যাবে।

মন্দ কি, বেশ তো!

চট্ করে তারা একটা শ্যামবাজার-গামী ট্রেমে চেপে বসল।

* * *

আমহার্স্ট স্ট্রীটের যেখানটায় সুব্রতর বাড়ি, তার পেছনে একটা খালি মাঠ। তারই ওপাশে বহুদিনকার একটা চারতলা বাড়ি।

শোনা যায় এককালে নাকি বাড়িটা ছিল এক মস্ত ধনী ব্যবসায়ীর। ব্যবসায়ী মারা যাবার পর তার ছেলে যখন সমস্ত অর্থের মালিক হয়ে বসল তখন বিপুল অর্থ হাতে পেয়ে তার মনে হল (বেশীর ভাগ লোকের যা হয়), দুনিয়া তো তারই। এখানকার রাজাই তো সে। স্ফূর্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে সে চোখ বুজে আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। আর হতভাগ্য পিতার বহু কষ্টার্জিত অর্থরাশি দুদিনের জন্য তাকে নিয়ে পুতুল খেলা খেললে, পরে তাকে হাত ধরে পথের ধুলোয় বসিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুখের দিনে একদিন যারা ছিল দিবারাত্র পাশাপাশি বন্ধুর মত, পরমাত্মীয়ের মত, সর্বনাশের নেশায় একদিন যারা ছিল তার মুখোশ-পরা একনিষ্ঠ বন্ধু—তারাই আজ অচেনার ভান করে অলক্ষ্যে বিদায় নিয়ে গেল। কেউ বা যাবার বেলায় দিয়ে গেল শুষ্ক সহানুভূতির সোনালী হাসি।

যার মুখে একদিন সোনার বাটিতে জমাটবাঁধা দুধ উঠত, আজ তার মুখে ভাঙা কাঁসর বাটিতে জলটুকুও ওঠে না।

সৌভাগ্যের শৈলশৃঙ্গ হতে সে দুর্ভাগ্যের নরককুণ্ডে নেমে এল। এতকাল সে শুধু হেসে-গেয়েই এসেছে, আজ তার দু-চোখে জল উঠল ছলছলিয়ে।

তারপর অভাবের তাড়নায় অধীর হয়ে একদিন সে নিজের শয়নগৃহেরই কড়িকাঠের সঙ্গে পরনের কাপড় গলায় দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিল। অভিমান না দুঃখে কে জানে!

এদিকে একজন ধনী মারোয়াড়ী লোকটার জীবিতকালেই বাড়িখানা ক্রয় করে নিয়েছিল দেনার দায়ে, কিন্তু ঐ কেনা পর্যন্তই—কারণ বাড়িখানা সে কোন কাজেই লাগাতে পারলে না। সমস্ত রাত্রি ধরে নাকি বুভুক্ষিত অশরীরীর দল সারা বাড়িময় হাহাকার করে বেড়াত। লোক এসে একদিনের বেশী দুদিন ওই বাড়িতে টিকতে পারে না। সারারাত্রি ধরে কারা নাকি সব সময় কেঁদে কেঁদে ফেরে। অসহ্য তাদের সেই বুকভাঙা বিলাপ।

ক্রমে একদিন বাড়িটা জনহীন হয়ে ধীরে ধীরে শেষটায় পোড়ো বাড়ি বা ভূতের বাড়িতে পরিণত হল।

তারপর আজ প্রায় দশ বৎসর ধরে বাড়িটা এমনিই পড়ে আছে। ভাড়াও কেউ নেয়নি, ক্রয় করতেও কেউ চায়নি।

সুব্রত গভীর রাত্রে ঘরে শুয়ে শুনত, রাতের বাতাসে নির্জন বাড়িটার খোলা আধভাঙা কপাটগুলো বার বার শব্দ করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কখনও বা দেখত জ্যোৎস্নারাত্রে চাঁদের নির্মল আলো বাড়িটার সারাগায়ে ছড়িয়ে পড়েছে দুঃস্বপ্নের মত করুণ বিষণ্নতায়।...

সেদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙতেই সুব্রত চমকে উঠল—সেই মাঠের ওপারে পোড়ো বাড়ির জানালার খোলা কপাটের ফাঁক দিয়ে যেন একটা আলোর শিখা দেখা যাচ্ছে! পোড়ো বাড়িতে আলোর শিখা! আশ্চর্য! কৌতূহলী চোখের পাতা দুটো রগড়ে নিল। তারপর আপনমনে বলল—না, ঐ তো মাঝে মাঝে হাওয়া পেয়ে আলোর শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে!

সুব্রত বিছানা থেকে উঠে খোলা জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। সহসা এমন সময় নিশীথ রাত্রির জমাট স্তব্ধতা ভেদ করে জেগে উঠল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজ। তারপর আর একটা, আরও একটা—পরপর তিনটে।

আকাশে মেটেমেটে জ্যোৎস্না উঠেছে। স্বল্প আলো-আঁধারিতে পোড়ো বাড়িটা যেন একটা মৃত্যু-বিভীষিকা জাগিয়ে তুলেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই। জীবজগৎ সুপ্তির কোলে বিশ্রামসুখ লাভ করছে। দিবাভাগের জন-কোলাহল-মুখরিত জগৎ যেন এখানকার এই স্তব্ধ ঘুমন্ত পৃথিবী থেকে দূরে—অনেক দূরে।

এমনি সময়ে হঠাৎ পোড়ো বাড়ির দোতলার দক্ষিণ দিককার একটা ঘরের একটা জানালার কপাট খুলে গেল এবং সেই খোলা জানালাপথে একটা টর্চের সুতীব্র আলোর রশ্মি মাঠের ওপরে এসে পড়ল।

সুব্রতর দু-চোখের দৃষ্টি এবারে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। রহস্যঘন পোড়ো বাড়ির মধ্যে যেন হঠাৎ প্রাণ-স্পন্দন!

ইতিমধ্যে কখন এক সময়ে যে রাজু এসে ওর পাশেই দাঁড়িয়েছে সুব্রত তা টেরও পায়নি। হঠাৎ কাঁধের ওপর মৃদু স্পর্শ পেয়ে সে চমকে ফিরে তাকাল, কে? ও রাজু!

হ্যাঁ, কিন্তু কি অমন করে দেখছিলি বল্ তো?

চেয়ে দেখ না! মাঠের ওদিকে ঐ ভাঙা বাড়িটা।

আলোটা ততক্ষণে নিভে গেছে, নির্জন মাঠের মাঝে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সহসা যেন একটা বিভীষিকার আবছা ছায়া নেমে এসেছে।

তাই তো! নির্জন পোড়ো বাড়িতে হঠাৎ কারা আবার এসে হাজির হলেন? এতক্ষণে বললে রাজু।

হুঁ, তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক রাজু।

কি বলছিস?

শিকারী বিড়াল!

শিকারী বিড়াল?

হ্যাঁ, তার গায়ের গন্ধ পেয়েছি। তারপর হঠাৎ চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সুব্রত বললে, চল একবার ওদিককার পথটা ঘুরে আসা যাক।

এই রাত্রে?

ক্ষতি কি, চল না!

তাড়াতাড়ি গায়ে একটা সার্ট চাপিয়ে দেওয়াল-আলমারি থেকে সিল্ককর্ডের মইটা ও একটা টর্চ নিয়ে সুব্রত ও রাজু রাস্তায় এসে নামল।

মাথার ওপর রাত্রির কালো আকাশ তারায় ভরা। অস্তমিত চাঁদের আলো তখন আরও ম্লান হয়ে এসেছে। চারিদিকে থমথমে জমাট রাত্রি যেন এক অতিকায় বাদুড়ের সুবিশাল ডানার মত ছড়িয়ে রয়েছে। বড় রাস্তাটা অতিক্রম করে দুজনে এসে গলির মাথায় দাঁড়াল।

কিরীটী রায়কে মনে পড়ে? সুব্রত সহসা একসময়ে প্রশ্ন করে।

কোন কিরীটী রায়?

ঐ যে, আমাদের এখানে ফিরে আসবার পর প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে যিনি এসেছিলেন! সাড়ে ছ' ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ, পাতলা চেহারা, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা!

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ঐ যে শখের ডিটেকটিভ—গোয়েন্দাগিরি করেন, টালিগঞ্জে না কোথায় থাকেন। যিনি ড্রাগনটা তোর কাছ হতে চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন!

হ্যাঁ, নির্জলা শখেরই গোয়েন্দাগিরি! কাকার প্রকাণ্ড কেমিক্যাল ল্যাবরেটারী আছে, আর সে তার একমাত্র ভাইপো।

ওঁর নামও তো খুব শুনি।

আমাদের পাশের বাড়ির শান্তিবাবুর বিশেষ বন্ধু উনি। তিনিই আমাদের কিরীটীবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা শান্তিবাবুর সঙ্গে কিরীটীবাবুকেও নিমন্ত্রণ করেছিলাম। মনে নেই, কিরীটীবাবু আমাদের সব কাহিনী শুনে কি বলেছিলেন? আবার কোন আপদ-বিপদ ঘটলে তাঁকে যেন আগেই খবর দেওয়া হয়। ওঁর কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিল না। কাল সকালে উঠেই একবার তাঁর ওখানে যেতে হবে, মনে করো।

ইতিমধ্যে ওরা চলতে চলতে দুজনে গলিটার মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে। আর একটু এগোলেই পোড়ো বাড়িটার পেছনের দরজার কাছে এসে পড়বে, এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের ঘন্টি শোনা গেল। পরক্ষণেই দুজনের দৃষ্টি পড়ল আবছা

আলো-আঁধারে কে একজন তীব্র বেগে সাইকেল চালিয়ে গলির ভিতর দিয়ে ঐদিকেই এগিয়ে আসছে। সাইকেলের সামনের আলোটা টিমটিম করে জ্বলছে।

রাজু বা সুব্রত সাবধান হয়ে সরে যাবার আগেই সাইকেল-আরোহী হুড়মুড় করে এসে একেবারে অতর্কিতে রাজুর গায়ের ওপরেই সাইকেল সমেত পড়ল।

সরি, আপনার লেগে গেল নাকি—দুঃখিত।

রাজুর পায়ে বেশ লেগেছিল। সে উষ্ণস্বরে বললে, ঐ ভাঙা আলো লাগিয়ে বাইক চালানো! চলুন আপনাকে থানায় handover করে দেব!

আহা, আপনার কোথাও লেগেছে নাকি? কিন্তু আপনিই বা এত রাত্রে এই চোরা গলির মধ্যে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন কেন?

কেন হাওয়া খেতে বের হয়েছি শুনতে চান? বলেই ক্রুদ্ধ রাজু লোকটার দিকে লাফিয়ে এসে সজোরে লোকটার নাকের ওপরে একটা লৌহ-মুষ্ট্যাঘাত করে।

লোকটা অতর্কিত ঐ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে প্রথমটা বেশ হকচকিয়েই গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে রাজুকে আক্রমণ করল।

কেউ শক্তিতে কম যায় না।

দুজনে জড়াজড়ি করে ঐ সরু গলির মধ্যেই লুটিয়ে পড়ে। সুব্রত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

হঠাৎ এমন সময় তীব্র একটা অস্ফুট যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করে রাজু একপাশে ছিটকে পড়ল।

সুব্রত কম বিস্মিত হয়নি। এক কথায় সে সত্যই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে আক্রমণকারী তড়িৎবেগে উঠে পড়ে সাইকেলে আরোহণ করে চালাতে শুরু করেছে।

রাজু যখন উঠে দাঁড়ল, সাইকেল-আরোহী তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুব্রত এগিয়ে এসে বলে, কি হল রাজু?

॥ ৩ ॥
কিরীটী রায়

রাজু যন্ত্রণায় কাতরক্লিষ্ট স্বরে জবাব দিল, হাতের পাতায় কি যেন ফুটল সুব্রত!

সুব্রত পকেট থেকে টর্চটা বের করে বোতাম টিপল। কিন্তু আশ্চর্য, হাতের পাতায় কিছুই ফোটেনি! কিছু বিঁধেও নেই। এমন কি এক ফোঁটা রক্ত পর্যন্ত পড়েনি। হাতটা ভাল করে টর্চের আলোয় ঘুরিয়ে দেখা হল—কোন চিহ্নই নেই। অথচ রাজুর হাতের পাতা থেকে কনুই পর্যন্ত ঝিমঝিম করছে অসহ্য যন্ত্রণায়। যেন অবশ হয়ে আসছে হাতটা।

কই, কিছু তো তোমার হাতে ফুটেছে বলে মনে হচ্ছে না! কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না! সুব্রত বলে।

কিন্তু মনে হল হাতে যেন কি একটা ফুটল। ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করে উঠেছে, এখনও হাতটায় যেন কোন জোর পাচ্ছি না। বললে রাজু।

চল ফেরা যাক। সুব্রত আবার বলে।

কিন্তু ঐ বাড়িটা দেখবি না? যে জন্য এলাম?

না, কাল সকালের আলোয় ভাল করে এক সময় এসে বাড়িটা না হয় খোঁজ করে দেখা যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি, ঐ সাইকেল-আরোহী লোকটা কে? কেনই বা এ পথে এসেছিল? লোকটা আচমকা এ পথে এসেছে বলে তো মনে হয় না! ও নিশ্চয়ই আমাদের ফলো করেই এসেছিল!

যা হোক দুজনে আপাতত বাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

রাতের আকাশ ফিকে হয়ে আসছে। শেষ রাতের আঁধার তরল ও ম্লান হয়ে এসেছে। নিশিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া ঝিরঝির করে বয়ে যায়। রাজু আর সুব্রত বাড়ি ফিরে এসে নিজেদের ঘরে প্রবেশ করে শয্যায় আশ্রয় নিল এবং শীঘ্রই দুজনের চোখের পাতায় ঘুম জড়িয়ে আসে।

সুব্রতর যখন ঘুম ভাঙল, রাজু তখনও ঘুমিয়ে।

পূর্ব রাত্রের ব্যাপারটা সুব্রতর একে একে নতুন করে আবার মনে পড়ে। আজই একবার কিরীটীবাবুর ওখানে যেতে হবে। চাকরকে ডেকে চা আনতে বলে সুব্রত বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

বাথরুমে ঢুকে ঝর্না-নলটা খুলে দিয়ে সুব্রত তার নীচে মাথা পেতে দাঁড়াল। ঝাঁঝরির অজস্র ছিদ্রপথে জলকণাগুলো ঝিরঝির করে সারা গায়ে ও মাথায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সুব্রত সমস্ত শরীর দিয়ে স্নানটা উপভোগ করল। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করার পর শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা হল। পূর্বরাত্রের জাগরণ-ক্লান্তি যেন অনেক পরিমাণে কমে গেছে।

ভিজে তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে সোজা রাজুর কক্ষে এসে সুব্রত দেখে রাজু হাতের মুঠো মেলে কি যেন একটা একাগ্র দৃষ্টিতে দেখছে।

সুব্রত বললে, কি দেখছ অত মনোযোগ দিয়ে?

রাজু সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে একটা কার্ড সুব্রতর দিকে তুলে ধরে।

কার্ডটার গায়ে কালি দিয়ে ছোট ছোট করে লেখা—

'কালো ভ্রমরের হুল, এমনি মিষ্টি-মধুর! কেমন লাগল বন্ধু!'

কোথায় পেলে এটা?—সুব্রত শুধাল।

রাজু বলল, জামার পকেটে ছিল এটা।

কার্ডটা রাজুর হাত থেকে টান মেরে নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে দিতে সুব্রত তাচ্ছিল্যভরে বললে, বড় আর দেরি নেই, হুলের খোঁচা হজম করবার দিন এগিয়ে এল। চল চল, একবার টালিগঞ্জে কিরীটীবাবুর ওখানে যাওয়া যাক। এর পর গেলে হয়তো আবার তাঁকে বাড়িতে নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি ভাবছি, ওরা জানলে কি করে যে অত রাত্রে আমরা গলিপথে যাব!

চর আছে সর্বত্র, যারা হয়তো সর্বদা আমাদের ওপর নজর রেখেছে—এ কি, তুই যে স্নান পর্যন্ত সেরে ফেলেছিস! রাজু বলে।

হ্যাঁ, শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

তবে দাঁড়া, আমিও স্নানটা সেরে নিই চট্ করে।

* * *

টালিগঞ্জে সুন্দর একখানা দোতলা বাড়ি। সেই বাড়িখানিই কিরীটী রায়ের। বাড়ির ফটকে শ্বেতপাথরের নেমপ্লেটে লেখা

কিরীটী রায়

রহস্যভেদী

দ্বিতল বাড়িখানি বাইরে থেকে দেখতে সত্যই চমৎকার, আধুনিক প্যাটার্নের নয়, পুরাতন স্টাইলে সবুজ রংয়ের বাড়িখানি।

বাড়ির সামনে ছোট একটা ফুলফল তরিতরকারির বাগিচা। ওপরে ও নীচে সবসমেত বাড়িতে চারখানি মাত্র ঘর। ওপরের একখানিতে কিরীটী শয়ন করে, একটিতে তার রিসার্চ ল্যাবরেটারী। নীচে একটায় লাইব্রেরী ও আর একটায় বৈঠকখানা। তিনজন মাত্র লোক নিয়ে সংসার—কিরীটী নিজে, একটা আধাবয়সী নেপালী চাকর—নাম তার জংলী ও পাঞ্জাবী শিখ ড্রাইভার হীরা সিং।

ভৃত্য জংলীর যখন মাত্র ন'বছর বয়স, তখন একবার কার্শিয়াং বেড়াতে গিয়ে কিরীটী তাকে নিয়ে আসে।

মা-বাপ-হারা জংলী এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের কাছে থাকত। সেবারে কিরীটী যখন কার্শিয়াং বেড়াতে গেল, তখন সব সময়ে তার ছোটখাটো ফাইফরমাস খাটবার জন্য একটা অল্পবয়সের চাকরের খোঁজ করতেই তার এক বন্ধু জংলীকে এনে দেয়।

দীর্ঘ পাঁচ মাস কার্শিয়াংয়ে কাটিয়ে কিরীটী যেদিন ফিরে আসবে, জংলীকে মাহিনা দিতে গেলে সে হাত গুটিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করলে।

তাকে ঐ অবস্থায় দাঁড়াতে দেখে কিরীটী সস্নেহে শুধায়, কি রে? কিছু বলবি জংলী?

জংলী কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিরীটী আবার বলে, হ্যাঁ রে, কিছু বলবি?

জংলীর মনে এবার বুঝি আশা জাগে, তাই ধীরে ধীরে মুখটা তোলে।

তার চোখের কোল দুটি তখন জলে উঁবুচুবু।

কি হয়েছে রে জংলী?

বাবুজী, আর কি আপনার চাকরের দরকার হবে না?

ও এই কথা!

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা যেন কিরীটীর কাছে জলের মতই পরিষ্কার হয়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে, তোর দেশ, তোর আত্মীয়স্বজন—এদের সবাইকে ছেড়ে তুই আমার কাছে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারবি?

চোখের কোলে অশ্রুমাখা হাসি নিয়ে খুশির উচ্ছলতায় গদ্‌গদ হয়ে জংলী জবাব দেয়, কেন পারব না বাবু, খুব পারব! আর এখানে থেকে আমি কি করব? এখানে আমার কেই বা আছে? মা-বাপ তো আমার কতদিন হল মারা গেছে—আমার তো কেউ নেই। শেষের দিকটায় বালকের কণ্ঠস্বর কেমন যেন জড়িয়ে যায়।

তাই কার্শিয়াং ছেড়ে আসবার সময় কিরীটী জংলীকে তার আত্মীয়দের কাছ হতে চেয়ে নিয়ে আসে। তারাও ঘাড়ের বোঝা নামল ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সে আজ দীর্ঘ সাত বছর আগের কথা। এখন জংলীর বয়স ষোল বছর। সে এখন

বলিষ্ঠ যুবা। কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই ছায়ার মত ঘোরে সে। অনেক সময় কিরীটীর সহকারী পর্যন্ত হয়। যেমনি বিশ্বাসী তেমনি প্রভুভক্ত।

পাহাড়ের দেশ থেকে কুড়িয়ে আনা অনাথ বালক স্নেহের মধুস্পর্শ পেয়ে আপনাকে নিঃস্ব করে বিলিয়ে দিয়েছে। মানুষ বুঝি অমনিই স্নেহের কাঙাল।

* * *

সেদিন সকালবেলায় একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে কিরীটী সেদিনকার দৈনিকটার ওপর চোখ বুলোচ্ছিল। এমন সময় পত্রিকার দ্বিতীয় পাতায় বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা সনতের উধাও হওয়ার সংবাদটা তার চোখে পড়ল।

কিরীটী কাগজের লেখাগুলোর উপর সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে, ঠিক এমনি সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ তার কানে এসে বাজল। জুতোর শব্দ আরও এগিয়ে একেবারে দরজার গোড়ায় এলে কাগজ হতে মুখ না তুলেই হাসিমুখে সংবর্ধনার সুরে বললে, আসুন সুব্রতবাবু। আমি জানতাম আপনি আসবেন, তবে এত শীঘ্র—বলতে বলতে কিরীটী হাঁক দিলে, জংলী, বাবুদের চা দিয়ে যা।

কিরীটী রায়ের কথা শুনে সুব্রত ও রাজু যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। লোকটা কি সবজান্তা! তা নাহলে না দেখেই জানতে পারে কি করে কে এল!

প্রথমটায় যে কি বলবে তা ওরা যেন ভেবেই পেলে না। বিস্ময়ের ভাবটা কাটবার আগেই কিরীটী কাগজের ওপর হতে চোখ সরিয়ে নিয়ে ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, নমস্কার সুব্রতবাবু, রাজেনবাবু—আরে দাঁড়িয়েই রইলেন যে, বসুন বসুন।

দুজনে এগিয়ে এসে দুখানা সোফা অধিকার করে বসল।

তারপর হঠাৎ এই সকালেই, কি খবর বলুন শুনি? কিরীটী রায় সাগ্রহে শুধায়।

সোফার ওপরে বসতে বসতে সুব্রতই বলে, বলছি, কিন্তু তার আগে বলুন তো, কেমন করে আমাদের না দেখেই বুঝলেন যে আমরাই এসেছি! আপনি কি পায়ের শব্দেই লোক চিনতে পারেন নাকি?

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, কতকটা হ্যাঁও বটে, আবার নাও বটে। এইমাত্র খবরের কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল সনতবাবুর গায়েব হওয়ায় চাঞ্চল্যকর সংবাদ। আর আপনাদের সঙ্গে তো আমার কথাই ছিল, আবার কোনরকম গোলমাল হলে আপনারা দয়া করে আগে আমাকে একটু খবর দেবেন। সহজ নিয়মে দুয়ে দুয়ে চার কষে ফেলতে দেরি হয়নি। এত সকালে জুতোর শব্দ পেয়ে প্রথমেই তাই আমার আপনাদের কথাই মনে পড়ল, আর সেই আন্দাজের ওপর নির্ভর করে আপনাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছি এবং আপনারাও যখন আমার অভ্যর্থনা শুনে চুপ করে রইলেন তখন আমি স্থির-নিশ্চিত হলাম, আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি।

চমৎকার তো! রাজু বললে।

না, এর মধ্যে চমৎকারের বা আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কতকটা সত্যি, কিছুটা মিথ্যে আর বাকিটা অনুমান—এই রীতির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের কার্যপদ্ধতি। বলতে পারেন কমনসেন্স-এর মারপ্যাঁচ মাত্র। একজন শয়তানকে তার দুষ্কর্মের সূত্র ধরে খুঁজে বের করা এমন বিশেষ কিছু একটা কঠিন বা আজব ব্যাপার নয়। দুষ্কর্মের এমন একটি নিখুঁত সূত্র সর্বদাই সে রেখে যায় যে, সে নিজেই আমাদের তার কাছে টেনে

নিয়ে যায় সেই সূত্রপথে। এ সংসারে পাপপুণ্য পাশাপাশি আছে। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের তিরস্কার—এইটাই নিয়ম। আজ পর্যন্ত পাপ করে কেউই রেহাই পায়নি। দৈহিক শাস্তি বা দশ বছর জেল হওয়া অথবা দ্বীপান্তর যাওয়াটাই একজন পাপীর শাস্তিভোগের একমাত্র নিদর্শন নয়, ভগবানের মার এমন ভীষণ যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও তার কাছে একান্তই তুচ্ছ। বিবেকের তাড়নায় মানসিক যন্ত্রণায় চোখের জলের ভিতর দিয়ে তিল তিল করে যে পরিতাপের আত্মগ্লানি ঝরে পড়ে, তার দুঃসহ জ্বালায় সমস্ত বুকখানাই যে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। স্থূল চোখে আমরা অনেক কিছুই দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বটাই একেবারে অস্বীকার করে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতাই বা আমাদের কোথায় বলুন? গায়ের জোরে সব কিছুকে অস্বীকার করতে চাইলেই কি মন আমাদের সব সময় প্রবোধ মানে সুব্রতবাবু?

হয়তো সব সময় মানে না।

হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। আচ্ছা যাক সে-কথা, তারপর আগে সব ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বলুন তো, শোনা যাক।

সুব্রত তখন ধীরে ধীরে এক এক করে সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বলল।

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে কিরীটি কিছুক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে বসে রইল, তারপর সোফা থেকে উঠে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে বললে, হ্যাঁ, জাহাজে দুটো সীট্ তো রিজার্ভ করেছেন—আরও দুটো সীট্ রিজার্ভ করুন সুব্রতবাবু। পরশু সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়ছে তা হলে, কি বলেন? কিন্তু আমি ভাবছি লোকটা আপনার চোখে বেশ স্বচ্ছন্দেই ধুলো দিয়ে গেল, আপনারা টেরও পেলেন না?

সুব্রত বললে, বনমালী বসু তো?

না, কালো ভ্রমর স্বয়ং।

হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি, বনমালী বসুই স্বয়ং কালো ভ্রমর।

না, বনমালী বসু কালো ভ্রমর নয়।

সে নয়? তবে?

আপনাদের পোড়ো বাড়ির সামনে শিকারী বিড়ালই স্বয়ং কালো ভ্রমর।

কি করে এ কথা আপনি বুঝলেন?

পরে বলব। তবে বনমালী বসুও কালো ভ্রমরের দলের লোকই বটে এবং সে বিষয়েও কোন ভুল নেই। এতে করে এও প্রমাণিত হচ্ছে যে তারা আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে এবারে। অবশ্য বনমালী বসুর কথাবার্তাতেই আপনাদের বোঝা উচিত ছিল, অনেক কিছু অসঙ্গতি তাঁর কথার মধ্যে আছে, ভদ্রলোক ডিব্রুগড়ে বসে সি. আই. ডি.-র 'তার' পেয়েছিলেন মাত্র দিন দশেক আগে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ডিব্রুগড়ে বসে 'তার' পেলেও ঐদিনকার রেঙ্গুনের সংবাদপত্রের কাটিংটা পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। সন্দেহ তো ঐখানেই ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য, এটা কিন্তু আমাদের আদপেই মনে হয়নি! বলে সুব্রত।

না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এর পর সুব্রত ও রাজু কিরীটীর নিকট বিদায় নিয়ে রাস্তায় এসে নামল।

॥ ৪ ॥

১৮ নম্বরের হানাবাড়ি

দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে সমস্ত শরহটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। প্রচণ্ড তাপে রাস্তার পিচ নরম হয়ে উঠেছে। একটা অস্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভূত হয়। ট্রাম-বাসগুলো খড়খড়ি এঁটে যে যার গন্তব্যপথে ছুটছে। রিক্সাগুলো ঠং ঠং আওয়াজ করে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রদগ্ধ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে।

সুব্রত দরজা-জানালা এঁটে মেঝেয় একটা মাদুর পেতে তার ওপর রেঙ্গুনের একটা ম্যাপ প্রসারিত করে ঝুঁকে পড়ে দেখছিল, এমন সময় বাইরে কড়া-নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। রাজু পাশেই শুয়ে দিব্যি নাক ডাকছে। এত গ্রীষ্মেও তার ঘুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না।

সুব্রত চোখ ফিরিয়ে নিদ্রাভিভূত রাজুর দিকে একবার চাইল, তারপর উঠে দরজা খুলবার জন্য ঘর হতে বেরুল।

তখনও সদর-দুয়ারে কড়া-নাড়ার শব্দ হচ্ছে—খট্‌-খট-খট্‌। দরজা খুলতেই ও দেখলে, সামনে দাঁড়িয়ে একজন এদেশীয় উৎকলবাসী।

কি চাই? সুব্রত লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

দণ্ডবৎ! রাজেনবাবুড় গলি কোঁটি পড়িব বাবু? মতে নূতন কটক হইতে আইছন্তি। কলকাতার শহর এমতি সে মু কিমিতি জানিব? অঃ গোট্টা শহর কত্ত ঘুরিল, ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাবু বলি দিলা, গুটে রাজেনবাবুড় গলি এক রাস্তা অছি বটে, আমহার স্ট্রীটের ধরে।

সুব্রত একদৃষ্টে শ্রীমান উৎকলবাসীর দিকে তাকিয়ে দেখছিল। লোকটা লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। চোখ দুটো উজ্জ্বল—চকচক করছে অসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তিতে, ছোট ছোট করে কদম-ছাঁট চুল। জুলপিটাকে ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে একেবারে রগ পর্যন্ত তোলা হয়েছে। একটা গোলাপী রংয়ের জাপানী সিল্কের জামা গায়ে, বহুদিনের ব্যবহারে তেল-চিটচিটে হয়ে কেমনতর যেন হয়ে উঠেছে। পরনে একটা নূতন চওড়া লালপাড় কোরা-ধুতি। গলায় একটা পাকানো চাদর গিঁট দেওয়া, কতকালের ময়লা যে তার ভাঁজে জমে উঠেছে, সঠিক নির্ণয় করাটা একান্তই দুষ্কর। মুখে একগাল পান, দুই কষের কোলে পানের রস ও সুপারির গুঁড়ো আটকে রয়েছে। বগলে পুরাতন একখানি ছাতা ও বাঁ হতে বটুয়া।

তোর নাম কি? সুব্রত শুধাল।

শ্রীল শ্রী শ্রীমান্‌ জগরনাথ।

এই বাঁ ধারের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলেই ডান দিকে যে সরু গলি সেটাই রাজেনবাবুর গলি।

দণ্ডবৎ! বলে জগন্নাথ চলে গেল।

সুব্রত লক্ষ্য করলে লোকটা একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। লোকটাকে যতক্ষণ দেখা যায় সুব্রত বেশ ভাল করেই দেখল, তারপর যখন সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে চলে গেল। মনে মনে কিন্তু জগন্নাথের কথাই ভাবছিল।

*   *   *

গত রাত্রের সরু গলিপথ ধরে সুব্রতর নির্দেশমত অবশেষে জগন্নাথ ১৮নং বাড়ির পিছনদিককার ভাঙা দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল। এইটাই সেই পোড়োবাড়ি। দু-একবার শ্যেন-দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে বাড়িটার মধ্যে ঢুকে পড়ল চট করে।

আগেই বলেছি বাড়িটা বহুদিনকার। দেওয়ালে দেওয়ালে চুন-বালি ঝরার সমারোহ। ইঁটগুলো দেওয়ালের গায়ে গায়ে বিশ্রীভাবে বেরিয়ে পড়েছে। জানালার কপাটগুলো গায়ে কোথাও অর্ধ-ভগ্ন, কোথাও বা জর্জরিত হয়ে ঝুলছে —মাঝে মাঝে বাতাসের ধাক্কায় এদিক-ওদিক নড়ে ওঠে। জগন্নাথ সামনের একটা দরদালান পার হয়ে একতলার উঠোনের সামনে এসে দাঁড়াল।

উঠোনের সিমেন্ট চটে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে, তার মাঝে মাঝে শ্যাওলা জাতীয় আগাছাগুলো গজিয়ে উঠেছে। উঠোনের ওধারে একই ধরনের গোটা পাঁচ-ছয় ঘর সারিবদ্ধভাবে আছে। কোনটির কপাট বন্ধ, কোনটির কপাট হা-হা করছে—একেবারেই খোলা। জগন্নাথ এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বারান্দার দক্ষিণের কোণ-ঘেঁষে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি, সহসা দোতলার বারান্দায় কাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা ক্রমে জোরেই শোনা যাচ্ছে। কে যেন দুম দুম করে সিঁড়িপথেই নেমে আসছে।

জগন্নাথ চট্ করে সিঁড়ির পাশের একটা বড় থামের পেছনে সরে দাঁড়াল। কে যেন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, তারই শব্দ। জগন্নাথ কান পেতে রইল। থামের আড়ালে থেকে সে দেখলে, আধাবয়সী একজন বেঁটে মত লোক নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। লোকটার গায়ে একটা সাধারণ বার্মিজ কোট। মাথায় একটা ফেজ। লোকটির একটি পা কাঠের। বগলে তার একটা কাঠের ক্রাচ। সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কাঠের পায়ে ঠক্ঠক্ শব্দ করতে করতে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চলল এবং ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

আকাশে বোধ হয় মেঘ করেছে। মেঘের আড়ালে সূর্য গেছে ঢেকে, তাই অবেলাতেই নেমে এসেছে অন্ধকারের একটা ধূসর ছায়া সর্বত্র। বাড়ির ভিতরটা হয়ে উঠেছে আরও অস্পষ্ট।

জগন্নাথ পা টিপে টিপে ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। সিঁড়ির ধাপগুলো প্রশস্ত হলেও ভেঙে ক্ষয়ে গিয়ে একেবারে ইঁট সব বের হয়ে পড়েছে। জগন্নাথ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। সামনেই একটা প্রশস্ত টানা বারান্দা। এখানটাও আবছা মেঘে ঢাকা আলোয় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেঘলা আকাশে বোধ হয় বিদ্যুৎ চমকে গেল মুহূর্তের জন্য আবছা অন্ধকারের বুকে একটা হঠাৎ আলোর ঢেউ তুলে। জনহীন এই বাড়িটার সর্বাঙ্গে যেন একটা পুরু ধূলার আস্তরণ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ধুলোবালির কেমন একটা তীব্র কটু গন্ধ নাসারন্ধ্রকে পীড়িত করে তোলে।

দোতলায় বারান্দার জমাট ধুলোর ওপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বহু পদচিহ্ন। পদচিহ্নগুলো অল্পদিনের বলেই মনে হয়। বর্তমানে যে এই জনহীন পোড়ো বাড়িতে অনেকের নিয়মিত আনাগোনা শুরু হয়েছে, সেটা বুঝতে কারুরই বিশেষ তেমন কষ্ট হবে না। জগন্নাথ তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে—একটু আগে কাঠের ক্রাচের সাহায্যে যে লোকটা নীচে নেমে গেল, কে ও? কি জন্যই বা এখানে এসেছিল?

লোকটা নিম্নশ্রেণীর—তার বেশভুষা চালচলন থেকেই বোঝা যায়।

বাইরে বোধ হয় টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে মুখে এসে ঝাপটা দেয়।

সহসা একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ জগন্নাথের কানে এসে প্রবেশ করে।

অতি সতর্ক জগন্নাথের শ্রবণেন্দ্রিয় মুহূর্তে সজাগ হয়ে ওঠে।

মৃদু গোঙানির শব্দ না? হ্যাঁ, ঐ তো অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে!

বৃষ্টিটা কি এবারে জোরেই নামল ঐ সময়!

আবছা আলোছায়ার মধ্যে সেই গোঙানির শব্দটা যেন আরও সুস্পষ্ট হয়ে হানাবাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুঝি অশরীরীর বুক-ভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাসের মতই মনে হয়। সহসা এমন সময় পাশ থেকে ফিস ফিস করে একটা অস্পষ্ট চাপা কণ্ঠস্বর জগন্নাথের কানে এল। চট করে সিঁড়ির কপাটের আড়ালে সরে এল সে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেল কে যেন বলছে ঃ না, কর্তার হুকুম। আগামী শনিবারের পরের শনিবারের মধ্যে যেমন করেই হোক ও তিন বেটাকেই ওখানে হাজির করাতে হবে। শির জামিন দিয়ে এসেছি।

আরে বাবা, এ তো তোমার মগের মুলুক নয় যে যা খুশি তাই করবে! এদিকে এক বেটা 'ফেউ' জুটেছে, কিরীটী রায়। বাছাধন শুনি নাকি আবার শখের টিকটিকি!

কিরীটী রায়? লোকটা কিন্তু খুব সুবিধার নয় বলেই শুনেছি। তা সে কথা যাক। দেখ একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে, কর্তাও যেন এখানে এসেছেন। তবে এ আমার অনুমান মাত্র।

অনুমান কেন, সত্যিও তো হতে পারে।

অসম্ভব কিছুই নেই। উনি যে কোথায় কি ভাবে যান তা বোঝাই দায়। উঃ, সেবার পাশাপাশি এক হোটেলে সারারাত কাটিয়েও টের পাইনি যে কর্তা আমার পাশেই আছেন। নিজে যখন ধরা দিলেন চমকে উঠলাম। সে কথা যাক, পরশুর জাহাজেই তো যাওয়া ঠিক?

এখন পর্যন্ত তো তাই ঠিক আছে, তবে শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, কে বলতে পারে বল্?

এমন সময় আবার সেই করুণ গোঙানির শব্দটা শোনা গেল।

প্রথম ব্যক্তি বললে, নাঃ, বেটা জ্বালালে দেখছি! আর ছাই বর্মা-মুলুকেই বা টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কি? এখানে শেষ করে দিলেই তো হয়, যত সব ঝামেলা! কণ্ঠে বেশ বিরক্তির ঝাঁজ।

জানিস তো, কর্তা খুনোখুনির ব্যাপারটা আবার তেমন পছন্দ করেন না।

কিন্তু পরে ঠেলা সামলাবে কে? আজ রাত্রি আটটায় আমাদের আড্ডায় যাবার কথা। সেখানে কাজের ফিরিস্তি সব ঠিক হবে। এখন চল্ সেদিকেই যাওয়া যাক।

প্রথম ব্যক্তি জবাবে বললে, তুই এগিয়ে যা। সেই চীনাপট্টির—নং বাড়িটাতেই তো? আমি একটু পরে যাচ্ছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

কথা শেষ হতেই লোকটা এগিয়ে আসে। জগন্নাথ যেখানে দাঁড়িয়েছিল লোকটা সেদিকেই আসছে দেখে জগন্নাথ একেবারে দেওয়াল ঘেঁষে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়াল। পোড়ো বাড়িতে সাঁজের আঁধারটা যেন থরে থরে চাপ বেঁধে উঠেছে তখন চারিদিকে।

বহুদিনকার বদ্ধ আবহাওয়ার বিশ্রী একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। জগন্নাথের যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

জনহীন হানাবাড়ির কঠিন মৌনতা যেন সেই সন্ধ্যার আঁধারে এক অশরীরী বিভীষিকার মায়াজাল রচনা করেছে চারিদিকে। কাদের অশ্রুত চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন আঁধারের গায়ে গায়ে বেঁধে উঠছে। বাতাস নেই। এমন কি চতুঃসীমায় নেই এক বিন্দু আলো। অভিশপ্ত পুরী...

লোকটা যে শেষ পর্যন্ত কোন্ পথে গেল জগন্নাথ বুঝতে পারলে না। আরো কিছুক্ষণ পরে জগন্নাথ যেদিক হতে কথার আওয়াজ আসছিল, নিঃশব্দে পা টিপে টিপে সেইদিকেই এগিয়ে চলল। খানিক দূর এগোতেই দেখা গেল অদূরে একটা ঘরের ভেজানো কপাটের ফাঁক দিয়ে একটুখানি অস্পষ্ট আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সন্তর্পণে জগন্নাথ এগিয়ে গিয়ে কপাটের ফাঁকে চোখ দিয়ে দাঁড়াল। আশেপাশে কেউ নেই। কপাটের ফাঁক দিয়ে জগন্নাথ দেখতে পেল ছোট একখানি ঘর। ভিতরে একটা মোমবাতির সামনে কে একটা লোক যেন ঝুঁকে পড়ে মোমবাতির আলোয় কি একটা পড়ছে।

লোকটার চোখ-মুখের রেখায় রেখায় গভীর একাগ্রতা ফুটে উঠেছে।

জগন্নাথ ধীরে অতি ধীরে ডান হাতের একটা আঙুল দরজার ভেজানো কপাটের গায়ে ছোঁয়ালে, তারপর ঈষৎ একটু চাপ দিতেই আপনিই কপাটটা একটু সরে গেল। কিন্তু লোকটার সেদিকে খেয়াল নেই, সে আপনমনে কাগজটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সেটা পড়ছে তখনও।

আরও একটু ঠেলা দিতেই দরজার কপাট দুটো বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। আরও একটু—ব্যস, এবার ধীরে অতি ধীরে নিঃশ্বাস বন্ধ করে জগন্নাথ বিড়ালের মতই যেন নিঃশব্দ সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। লোকটা তখনও একমনে সেই কাগজখানির ওপর ঝুঁকে কি দেখছে, সে কিছুই টের পেল না।

নিঃশব্দে পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে জগন্নাথ এগোতে লাগল। যখন আর মাত্র হাতখানেকের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে, সহসা জগন্নাথ ঝুপ করে এক লাফে লোকটার পিঠের ওপর পড়ে দু'হাতে তাকে দৃঢ়ভাবে জাপটে ধরল।

॥ ৫ ॥
সাঙ্কেতিক লেখা

লোকটা এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাগজখানি দেখছিল যে, অতর্কিতে পশ্চাৎ দিক থেকে সহসা আক্রান্ত হওয়ায় প্রথমটা একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের জন্যই, পরক্ষণে সে শরীরের সমস্ত বলটুকু প্রয়োগ করে আক্রমণকারীর কবল থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু আক্রমণকারীর সুকঠিন আলিঙ্গন তখন লৌহদানবের মতই লোকটাকে নিষ্পেষিত করছে।

সেই স্বল্প আলো-আঁধারে ঘরের ধূলিমলিন মেঝের ওপরেই আরম্ভ হল তখন দুজনের প্রবল হুটোপাটি। শক্তির দিক দিয়ে উভয়ের কেউ কম যায় না। ধস্তাধস্তিতে পায়ের ধাক্কায় মোমবাতিটা উল্টে নিভে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে নিশ্ছিদ্র আঁধারে সমস্ত ঘরখানি

জমাট বেঁধে উঠল। শীঘ্রই জগন্নাথের আসুরিক শক্তির কাছে লোকটাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল ও প্রয়োগ ক্রমে ক্রমে সে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল। জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ হতে লাগল। ধীরে অতি ধীরে লোকটা একসময় শেষ পর্যন্ত জগন্নাথের শক্তির কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হল।

ক্লান্ত অবসন্ন পরাভূত লোকটাকে মাটির ওপর ফেলে বুকের ওপরে চেপে বসে জগন্নাথ পকেট থেকে একটা সিল্ক কর্ড বের করে ক্ষিপ্রহস্তে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল।

গভীর শ্রান্তিতে জগন্নাথের সমগ্র শরীর তখন অবসন্ন ও ক্লান্ত। ঘামে জামাকাপড় সব ভিজে উঠেছে। সে হাত দিয়ে কপালের ঘামটা মুছে নিল। পকেট থেকে অতঃপর টর্চটা বের করে টিপতেই উজ্জ্বল একটা আলোর ইশারায় ঘরের জমাট আঁধার খানিকটা যেন জট পাকিয়ে সরে গেল।

এতক্ষণে টর্চের আলোয় লোকটাকে বেশ ভাল করে দেখা গেল। দোহারা বলিষ্ঠ চেহারা। গায়ে একটা পাটকিল-রংয়ের মের্জাই। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। মুখটা গোল। নাকটা চ্যাপটা। চোখ দুটো ছোট ছোট। লোকটা পিট পিট করে জগন্নাথের দিকে তাকাচ্ছিল।

অদূরে একটা কাগজ পড়ে আছে। জগন্নাথ ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে কাগজটাকে তুলে নিল, তারপর টর্চের আলোয় কাগজটাকে মেলে ধরল।

কাগজটা সাধারণ কাগজ নয়। নীল রংয়ের একটা অয়েল-পেপার। কাগজটার গায়ে একটা মানচিত্র আঁকা এবং তার নীচে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন পর পর সাজানো রয়েছে। কাগজটার এক কোণে একটা ড্রাগনের মূর্তি— মূর্তিটি রক্তের মত টকটকে লাল কালিতে আঁকা।

ড্রাগনের মূর্তির নীচে ছোট অক্ষরে লাল কালি দিয়ে ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে কি একটা লেখা আছে। লেখাটা অনেকটা কবিতার মত করে সাজানো। যদিও কবিতাটার মাথামুণ্ডুতে যেমন কোন কিছু মিল নেই, তেমনি সমস্তটা একেবারে দুর্বোধ্য।

মিয়াং—ভাঙা বুদ্ধদেবের মূর্তি। প্যাগোডার দক্ষিণে তার ডানদিকে চন্দনগাছ।—মূর্তির গায়ে গোল চিহ্ন—ভ্রমর আঁকা।

—সেই গাছের
৯০ সোপা পিঠের পরে
দুই DK o o o হাত
পারা রাস্তা আছে
চিহ্ন যত বাদ গেছে
তার BAMT ধরে
হাতী o o o o যাও যদি মাত।
ড্রাগন দেখ বসে আছে
ধনাগারের চাবি কাছে
মুখে তার লোহার বালা
দুলছে তাতে চিকন শলা;
দুইয়ের পিঠে শূন্য নাও

ত্রিশ দিয়ে গুণ দাও,
শূন্য যদি যায় বাদ
সেই কবারে পূরবে সাধ॥

জগন্নাথ বার দুই-তিন কাগজটা আগাগোড়া পড়ে ফেলল। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে না।

অথচ এটা বুঝতে তার কষ্ট হয় না যে জিনিসটা সাঙ্কেতিক লিপি, একটা-না-একটা কিছু এর অর্থ আছেই।

আরও ভাল করে চিন্তা করলে হয়তো তখন অর্থ ধরা যেতে পারে।

কিন্তু এইভাবে এখানে আর দেরি করাও সমচীন হবে না।

একটু আগে যে অস্ফুট কাতরোক্তি শোনা গিয়েছিল, সে ব্যাপারটার একটা খোঁজ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এবং ক্ষণপূর্বে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে যে কথাবার্তা ও শুনেছিল তা থেকে স্পষ্টই মনে হয়, এখানে এই পোড়ো বাড়ির কোন কক্ষে নিশ্চয়ই কাউকে এরা ধরে নিয়ে এসে বন্দী করে রেখেছে।

জগন্নাথ ভূপতিত রজ্জুবদ্ধ লোকটার দিকে একবার তাকাল।

লোকটা যেন একেবারে নির্বিকার, যেন ভালমন্দ কিছুই জানে না, নেহাত একেবারে গোবেচারী গোছের।

জগন্নাথ তাড়াতাড়ি কাগজটা ভাঁজ করে জামার ভিতর-দিককার পকেটে রেখে লোকটার সামনে এগিয়ে এল।

লোকটার মুখের ওপরে টর্চের আলো ফেলে কঠিন আদেশের স্বরে ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানিতে প্রশ্ন করলে, এই, যে লোকটাকে তোরা এখানে ধরে এনে আটক করে রেখেছিস, সে কোন্ ঘরে শীঘ্র বল, না হলে গলা টিপেই তোকে এখানে শেষ করে রেখে যাব।

লোকটা যে জগন্নাথের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারেনি তা স্পষ্টই বোঝা গেল; সে ওর কথার কোন জবাবই দিল না, কেবল নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থেকে শুধু জগন্নাথের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে বোকার মতই তাকাতে লাগল।

এবারে লোকটাকে পা দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে জগন্নাথ বললে, এই, চুপ করে আছিস কেন? জবাব দে না বেটা।

ঐ সময়ে আবার সহসা পূর্বের সেই গোঙানির শব্দটা শোনা গেল। জগন্নাথ এবারে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে বললে, এই, বল্!

লোকটা তথাপি নীরব। সে আগের মতই বোকা-চাউনি নিয়ে চেয়ে আছে।

নাঃ, এর কাছ হতে জবাব পাওয়া যাবে না দেখছি। জগন্নাথ মনে মনে বললে। তারপর সে একটা রুমাল বের করে লোকটার মুখ চেপে বেঁধে দিল, যাতে করে লোকটা চিৎকার বা কোন শব্দ করলেও কেউ শুনতে না পায়।

থাক্ বেটা, যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর। বলতে বলতে জগন্নাথ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাইরে থেকে ঘরের শিকলটা তুলে দিল।

অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে উঠেছে। দেওয়ালের কোন ফাটলে বুঝি একটা ঝিঁঝি পোকা ঝিঁঝিঁ করে একটানা বিশ্রী শব্দে ডেকে চলেছে তো চলেছেই।

॥ ৬ ॥

খোঁড়া ভিক্ষুক

বাইরের অন্ধকার বারান্দায় এসে জগন্নাথ হাতের টর্চটা টিপতেই দেখলে, উপরেও নীচের তলার মতই বারান্দার গায়ে পর পর চার-পাঁচটি ঘর। উঃ কি নিস্তব্ধ! সারা বাড়িটা মৃত্যুর মতই বিভীষিকাময় যেন। মনটা সত্যি কেমন যেন সির্-সির্ করে ওঠে। আশঙ্কায় থমথম করে।

বারান্দায় কত কালের ধুলো যে পড়তে পড়তে জমে উঠেছে তার ঠিক নেই।

জগন্নাথ টর্চ হাতে একে একে উপরের সব ঘরগুলোই পরীক্ষা করে দেখলে, কিন্তু কোন ঘরেই জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ বা চিহ্ন পর্যন্ত নেই। যুগ যুগ ধরে যেন এখানে কেউ বাস করেনি। কারও পায়ের স্পর্শও যেন পড়েনি।

কই, কেউ তো এখানে নেই! তবে কার অস্ফুট কাতর শব্দ কানে আসছিল? কে অমন করুণ স্বরে গোঙাচ্ছিল? মনে মনে বলতে বলতে জগন্নাথ দোতলার সিঁড়ি বেয়ে একসময় ছাদে গিয়ে উঠল। ছাদও নির্জন। জমাট আঁধারে থমথম করছে।

উপরে তারায়-ভরা কালো আকাশ। সামনেই চোখে পড়ে সেই পোড়ো মাঠটা। সেটাও রাতের আঁধারে অস্পষ্ট আবছা হয়ে উঠেছে। ওদিককার তালগাছটার পাতায় পাতায় নিশীথের হাওয়া কেমন একরকম সিপ সিপ শব্দ তুলছে।

ছাদে একটা মাত্র চিলে-কোঠা। সে ঘরের দুটো কপাটই খোলা, হাওয়ায় মাঝে মাঝে ঢপ ঢপ্ শব্দ করে বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে। আর কেউ নেই।

জগন্নাথ নীচে নেমে এল আবার।

নীচের তলার ঘরগুলো আর একবার ভাল করে দেখল। কিন্তু বৃথা। সেখানেও কিছু পাওয়া গেল না।

আর তো দেরি করা সঙ্গত নয়, যদি দলের কেউ আবার এসে পড়ে! অতঃপর জগন্নাথ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল।

গলিটা এর মধ্যে বেশ নির্জন হয়ে উঠেছে। জগন্নাথ সন্ধানী-দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে গলিপথ ধরে এগোতে লাগল।

গলিটা যেখানে এসে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে গ্যাস-পোস্টের নীচে মৃদু আলোয় একজন খোঁড়া ভিক্ষুক-শ্রেণীর লোক লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে করুণ স্বরে পথিকের করুণা ভিক্ষা করছে: বাবু গো, দয়া করে এই খোঁড়াকে একটি পয়সা দিয়ে যান। কত দিকে কত পয়সা আপনাদের যায়, মা জননী গো!

জগন্নাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভিক্ষুককে দেখতে লাগল। তার মনে হল সহসা, কে, কে এই ভিক্ষুক? কোথায় যেন ওকে সে দেখেছে! কোথায়?

জগন্নাথ চিন্তা করতে লাগল এবং চিন্তা করতে করতেই এক সময় তার মনে হয়, লোকটাকে সে সেদিন দেখেছে। ঐ পোড়ো বাড়িতে লোকটাকে দেখেছে সে। বগলে ক্রাচ ছিল লোকটার।

জগন্নাথ এবার দৃষ্টি আরও প্রখর ও অনুসন্ধিৎসু করে ভিক্ষুকটাকে দূর থেকে দেখতে লাগল।

তারপর একসময় জগন্নাথ ধীরে ধীরে গা-ঢাকা দিয়ে ওপাশের ফুটপাত দিয়ে পা চালিয়ে এগিয়ে গেল এবং সোজা এসে সে সুব্রতদের বাড়ির দরজায় কড়া ধরে নাড়া দিল ঃ খট্-খট্-খটা-খট্।

কে? সুব্রতর গলা শোনা গেল ভিতর থেকে।

আমি। দরজাটা খুলুন।

দাঁড়ান, খুলছি।

দরজাটা খুলতেই জগন্নাথ-বেশী কিরীটী রায় হাসতে হাসতে মাথায় বসানো রবারের পরচুলাটা খুলতে খুলতে বললে, মতে জগন্নাথ সাহু। কত্ত ঘুরি ঘুরি কটক জিলা কো মতে কলকাতায়...

কিরীটীর কথা আর শেষ হল না, সুব্রত হা হা করে হেসে বললে, উঃ, কি বিভীষণ লোক আপনি মশাই!

না মশাই, বিভীষণের মত আমি স্বজাতিদ্রোহী নই।

বিভীষণ স্বজাতিদ্রোহী? কি বলেন আপনি?

তা বৈকি। যে নিজের মায়ের পেটের ভাইয়ের মৃত্যুবাণ ও তার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বাধীনতা মান সম্ভ্রম অপরের হাতে তুলে দিতে পারে, তাকে শ্রীরামচন্দ্র যতই পূত আশীর্বাদ দিয়ে গরীয়ান করে তুলুক না কেন, তথাপি আমি বলব সে নীচ, সে জাতির কলঙ্ক। সে সমাজদ্রোহী—স্বজাতিদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক। উত্তেজনায় ও ভাবের দোলায় কিরীটীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল ঃ কিন্তু সে কথা থাক। তার চাইতেও বড় কাজ আমাদের সামনে। খোশগল্প করে আসর জমাবার মত অবকাশ আমাদের এখন এতটুকুও নেই।—বলতে বলতে ক্ষিপ্রহস্তে কিরীটী রায় গায়ের ছদ্মবেশগুলো খুলে ফেলতে লাগল।

ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ রায়? কণ্ঠস্বরে সুব্রতর খানিকটা উদ্বেগ ও কৌতূহল প্রকাশ পায়।

তাড়াতাড়ি একটা সাদা চাদর আর একটা লাঠি আনতে পারেন?

কি হবে? কাউকে লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করছেন নাকি?

শৃণু শৃণু রে বর্বর!
দেরি যদি কর, বিপদ হবে বড়।
শীঘ্র আন লাঠি ও চাদর!

রহস্যচ্ছলে জবাব দিল কিরীটী।

সুব্রত হাসতে হাসতে লাঠি ও চাদর সংগ্রহ করতে উপরে চলে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা মোটা বাঁশের লাঠি ও একটা সাদা চাদর এনে কিরীটীর হাতে দিল।

এবারে পকেট থেকে একটা টিকিওয়ালা পরচুলা বের করে কিরীটী মাথায় বেশ করে বসিয়ে নিল, তারপর চাদরটা গায়ে জড়িয়ে লাঠিটা হাতে নিয়ে দাঁড়াল সোজা হয়ে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে। কার সাধ্যি এখন তাকে একটু আগের কিরীটী রায় বলে চিনতে পারে! এখন সে অতি নিরীহগোছের একটি পূজারী ব্রাহ্মণ।

মৃদু হেসে ব্রাহ্মণোচিত গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে কিরীটী রায় বলল, বৎস, তোমার কল্যাণ হোক্। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। তারপর কি মনে করে বললে, হ্যাঁ ভাল কথা, আপনাদের পা-গাড়ি আছে?

হ্যাঁ আছে, কেন বলুন তো?

আপনি বাইকটা নিয়ে বড় রাস্তাটায় গিয়ে যেখানে ট্রাম-রাস্তার গায়ে মিশেছে সেখানে অপেক্ষা করবেন। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেখানে যাব। বলতে বলতে কিরীটী রায় ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় নেমে কিরীটী ধীরে ধীরে লাঠি হাতে গলির পথ দিয়ে এগোতে থাকে।

রাত্রি তখন সাতটার বেশী হবে না। মাঝে মাঝে দু-একটা মোটরগাড়ি রাস্তা দিয়ে হুস্ হুস শব্দে ছুটে যাচ্ছে। দু-একটা রিক্‌শার মৃদু ঠুং-ঠাং আওয়াজ শোনা যায়। সামনেই একটা মস্ত বড় ফটকওয়ালা বাড়িতে কোন উৎসব হচ্ছে বোধ হয়। রকমারি আলোতে আর লোকজনের গোলমালে বাড়িটা সরগরম। রাস্তার দু পাশে সারি সারি নানা রংয়ের ও আকারের মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে।

কিরীটী এগিয়ে চলে।

খোঁড়া ভিক্ষুকটা তখনও চেঁচাচ্ছে—বাবা গো, এই খোঁড়া ভিখারীকে একটি আধলা দাও বাবা! কত দিকে কত ভাবে কত পয়সা নষ্ট হয় বাবা গো! দয়া কর মাগো! জননী—

কিরীটী রায় একটা পয়সা হাতে নিয়ে ভিক্ষুকের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, এই নে, পয়সা নে।

ভিক্ষুক বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল। আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিরীটী ভিক্ষুকটাকে দেখে নিয়ে পয়সাটা ভিক্ষুকের হাতে ফেলে দিল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

ভিক্ষুক তখনও একই ভাবে চেঁচিয়ে চলেছে। হঠাৎ কিরীটী দেখলে, আর একজন ভিক্ষুক যেন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উল্টো দিক থেকে ওদিকেই আসছে।

কিরীটী চলার গতিটা একটু শ্লথ করে দিল এবং আড়চোখে ভিক্ষুকটাকে লক্ষ্য করতে লাগল দূর থেকেই।

দ্বিতীয় ভিক্ষুকটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগের ভিক্ষুকটার কাছাকাছি আসতেই দুজনে ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করতে লাগল পরস্পরের মধ্যে।

কিরীটীও আর অপেক্ষা না করে পা চালিয়ে চলল বড় রাস্তার মোড়ের দিকে এবারে।

মোড়ের পানের দোকানটার কাছে এক হাতে বাইক ধরে সুব্রত একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু অনভ্যাসের দরুন মাঝে মাঝে কাশিতে তার দম আটকে আসতে চায়।

কিরীটী সুব্রতর কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সুব্রতর হাত থেকে বাইকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরতে ধরতে তাড়াতাড়ি বললে, ট্রামে চেপে লালবাজারের মোড়ে যান সোজা। সামনেই যে রাস্তাটা বরাবর নয়া রাস্তায় মিশেছে, তার দু পাশে চীনাদের জুতোর দোকান আছে, ঐখানেই আমি যাচ্ছি। একটা ছুরি, সিল্ককর্ড ও একটা টর্চ নিতে ভুলবেন না যেন।

কথাগুলো বলেই কিরীটী একলাফে বাইকে চেপে সজোরে প্যাডেল করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিরীটীর নির্দেশমত তখনই সুব্রত ক্ষিপ্রপদে বাড়ির দিকে চলে গেল।

কিছুদূর এগিয়ে কিরীটী রাস্তার মোড়ে বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সহসা একসময় তার নজরে পড়ল দ্বিতীয় খোঁড়া ভিক্ষুকটা ঐদিকেই আসছে।

মহাপ্রভু নিশ্চয়ই এতক্ষণে যাত্রা করেছেন। কিরীটী বাইকে চেপে গলির দিকে চলল এবারে। গলির কাছাকাছি আসতেই ক্রিং ক্রিং আওয়াজ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই গলির মুখ দিয়ে একজন সাইকেলআরোহী দ্রুত বেরিয়ে এল।

লোকটার পরনে ঢিলা পায়জামা, গায়ে ঢোলা কাবুলী জামা, মাথায় কালো টুপি —কপাল পর্যন্ত টেনে দেওয়া হয়েছে; চোখে কালো কাচের গগল্‌স্‌।

গলিপথ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে লোকটা ট্রামরাস্তার দিকে সাইকেল চালাতে লাগল। কিরীটীও তার পিছু পিছু সাইকেল নিয়ে অনুসরণ করলে।

লোকটা সোজা আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে বৌবাজার স্ট্রীটে পড়ে বরাবর গিয়ে চিৎপুরে পড়ল।

দু পাশে যত সব ছবি আর আয়নার দোকান। কাচের গায়ে গায়ে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র রংয়ের রামধনু জাগিয়েছে।

রাত্রি কতই বা হবে! বড় জোর আটটা, তার বেশী নয়। কলকাতা শহরে সন্ধ্যা বললেই চলে। দোকানে দোকানে লোকের ভিড়। পথে ট্রামের ঢং ঢং ঘণ্টার আওয়াজ আর রিক্‌শাওয়ালাদের ঠুং ঠুং শব্দ ও মোটরের হর্ন।

লোকটা যে একজন পাকা সাইকেল-চালিয়ে, ওর গতি দেখেই বোঝা যায়। লোকটা অতি দ্রুত ভিড় বাঁচিয়ে লালবাজার ডাইনে ফেলে সোজা চীনাপট্টির মধ্যে ঢুকল।

রাস্তার দু পাশে সারি সারি চীনাদের জুতোর দোকান। মোড়ের একটা লাইটপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ সুব্রতকে দেখতে পেল কিরীটী।

সাইকেল চালিয়ে কিরীটী সুব্রতর পাশে এসে নামল। যে লোকটিকে এতক্ষণ কিরীটী অনুসরণ করছিল, সে তখন খানিকটা দূরে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেল হাতে করে এগোচ্ছিল।

এটা নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন। —এই বলে কিরীটী বাইকটা সুব্রতর হাতে দিয়ে লোকটির অনুসরণ করল তাড়াতাড়ি। লোকটি বাইক নিয়েই সামনের অন্ধকার গলিটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কিরীটীও আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে শিকারী বিড়ালের মত লোকটাকে অনুসরণ করল।

গলিটা বেশ প্রশস্ত। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাওর করা যায় না। দু পাশে বাড়ির খাড়া দেওয়াল উঠে গেছে। হাতদশেক উঁচুতে একটা জানলার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো এসে গলির অন্ধকারে ছিটকে পড়েছে যেন। অন্ধকার এত বেশী যে, পাশের লোককে পর্যন্ত নজরে আসে না। পচা মাছ ও চামড়ার বিশ্রী গন্ধে দম বন্ধ হবার যোগাড়।

কিরীটী অতি সন্তর্পণে দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে এগিয়ে চলল। আগের লোকটাকে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বামে সব দিকেই অন্ধকার। অন্ধকার যেন স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে উঠেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অন্ধকার গলির মধ্যে

বুঝি বাতাসও আসতে ভয় পায়। কিরীটী বুঝল আর এগিয়ে চলা বৃথা, তাই দাঁড়িয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে কান পেতে রইল। হঠাৎ এক-সময় একটা আওয়াজ কানে এল—খট্-খট্-খট্।

তারপরই খানিকক্ষণ চুপচাপ, আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। আবার শব্দ হল—খট্-খট্-খট্।

এবারে যেন কাছেই কোথায় একটা দরজা খোলার শব্দ হল। অন্ধকার গলিপথে একটা ম্লান আলোর শিখা দেখা গেল। তার পরেই ঈষদুন্মুক্ত একটা দরজাপথে একটা কুৎসিত চীনা বুড়ীর চেপ্টা মুখ দেখা গেল। হাতে তার কেরোসিনের বাতি। বাতিটা যেন আলোর চাইতে ধূমোদ্গিরণই বেশী করছে।

বুড়ী বাতিটি লোকটির মুখের উপর তুলে ধরল। অমনি লোকটা বাঁ হাতের দুটো আঙুল কোণাকুনি করে দেখালে। সেই বিশ্রী বুড়ীটার কুৎসিত মুখে ততোধিক কুৎসিত একটুকরো হাসি জেগে উঠল। বুড়ী রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াল।

লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

মুহূর্তে কিরীটী নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নেয় এবং ত্বরিৎপদে গলির ভিতর থেকে বের হয়ে গিয়ে সুব্রত যেখানে অপেক্ষা করছিল সেখানে এসে বলল, এখনই আপনি বাড়ি যান সুব্রতবাবু এবং যত শীঘ্র পারেন রাজেনবাবুকে নিয়ে এখানে চলে আসবেন। ঐ যে দেখছেন, 'হংকং সু ফ্যাক্টরী'র পাশ দিয়ে একটা গলি দেখা যাচ্ছে, ওরই আশপাশে কোথাও অন্যের সন্দেহ বাঁচিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। একেবারে শূন্যহাতে আসবেন না।

কি হাতিয়ার সঙ্গে আনি বলুন তো? সুব্রত প্রশ্ন করে।

একটা ছুরি বা একটা অন্ততঃ লোহার রড হলেও চলবে। ব্রিটিশ রাজত্বে তো আর পিস্তল বা রিভলবার চট করে পাওয়া যাবে না। কাজে-কাজেই আমাদের ভগবানপ্রদত্ত বুদ্ধিকেই কাজে লাগাতে হবে।

সুব্রত হেসে ফেলে।

হাসছেন সুব্রতবাবু? প্রায় পৌনে দুই শত বৎসরের পরাধীনতায় আমরা যে একেবারে পঙ্গু ও অথর্ব হয়ে আছি। কিন্তু থাক সেসব কথা, পরাধীন দেশের দুঃখের শেষ কোথায়! হ্যাঁ শুনুন, আপনি আর রাজেনবাবু এসে ঐ 'হংকং সু ফ্যাক্টরী'র কাছে অপেক্ষা করবেন, পর পর দুটো বাঁশীর আওয়াজ পেলেই ঐ গলির মধ্যে ছুটে যাবেন। বাঁশীর আওয়াজ না পাওয়া পর্যন্ত কোথাও যাবেন না। আচ্ছা আমি চললাম।

কিরীটী কথাগুলো বলে দ্রুতপদে গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

সুব্রত আর ক্ষণমাত্র দেরি না করে সামনেই একটি চলন্ত ট্যাক্সিকে হাতের ইশারায় থামিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললে, আমহার্স্ট স্ট্রীট।

ট্যাক্সি নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলল।

এদিকে গলির মধ্যে ঢুকে কিরীটী কিছুক্ষণ যেন কি ভাবলে, তারপর আঁধারে আন্দাজ করে ক্ষণপূর্বের দেখা সেই দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে টুক্-টুক্-টুক্ করে দরজার গায়ে তিনটে টোকা দিল।

কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নেই। অল্পক্ষণ পরে আবার টোকা দিল—টুক্-টুক্-টুক্।...

এবারে ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল এবং পরক্ষণেই দরজাটা খুলে গেল। আগের সেই চীনা বুড়ী বাতি হাতে বেরিয়ে এল।

কিরীটী আঙুল দিয়ে পূর্বের লোকটির মতই ইশারা করতে বুড়ী পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। সে বুড়ীর পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল তখন।

সরু একটা অত্যন্ত স্বল্পপরিসর অন্ধকার গলিপথ বরাবর খানিকটা চলে গেছে। তার মধ্যে দিয়ে বুড়ী আলো নিয়ে এগিয়ে চলে আর কিরীটী পিছন পিছন চলে।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই আচমকা কিরীটী হঠাৎ দুই হাত দিয়ে পিছন থেকে বুড়ীর মুখটি চেপে ধরল এবং ক্ষিপ্রহস্তে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে বুড়ীর মুখে গুঁজে দিল, তারপর সিল্ক কর্ড দিয়ে বুড়ীকে বেঁধে ফেললে।

॥ ৭ ॥
চীনা আড্ডায়

বুড়ীকে বাঁধতে কিরীটীর দু মিনিটও সময় লাগে না।

বুড়ীকে বেঁধে ফেলে কিরীটী উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। জাপটে ধরবার সময় বুড়ীর হাতের বাতিটা ছিটকে পড়ে নিভে গিয়েছিল। কিরীটী পকেট থেকে দেশলাই বের করে বাতিটা জ্বালাল, তারপর সেই সরু অন্ধকার গলিপথ দিয়ে খানিকটা অগ্রসর হতেই দেখা গেল অদূরে একটা ঘরের দরজার পাশে টুলে বসে একটা চীনা যুবক ঝিমুচ্ছে। দেওয়ালে একটা ওয়াল-ল্যাম্প পিটপিট করে জ্বলছে। তারই ম্লান আলো তন্দ্রাচ্ছন্ন চীনাটির মুখের উপর এসে পড়েছে। লোকটা কিছুই টের পায়নি তাহলে। সামনের ঘরের দরজাটা ভেজানো। ঘরের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কথাবার্তার দু-একটা টুকরো আওয়াজ শোনা যায়। কিরীটী একেবারে দেওয়ালের গায়ে গা লাগিয়ে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। তারপর চীনা লোকটির কাছাকাছি এসে হঠাৎ পিছনদিক থেকে দু হাত দিয়ে খুব জোর তার গলা জড়িয়ে ধরল।

আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে লোকটি যেমন চমকে উঠেছিল তেমনি হতবুদ্ধি হয়েও পড়েছিল। এবং সেই অবস্থাতেই লোকটাকে জাপটে ধরে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটা পিছনদিকে চলে এল কিরীটী।

অতর্কিত আক্রমণে চীনা লোকটা প্রথমটায় বিশেষ হকচকিয়ে গিয়েছিল সত্যিই, কিন্তু একটু পরেই নিজেকে সে কিরীটীর বাহুবেষ্টন থেকে ছাড়াবার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু কিরীটীর দৈহিক শক্তির কাছে পেরে ওঠে না এবং পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

প্রথম থেকে কিরীটী লোকটা যাতে কোনরূপ শব্দ না করতে পারে সেজন্য সতর্ক হয়ে লোকটার মুখে হাত চাপা দিয়েছিল, পরে একটা রুমাল ঠেসে ধরল মুখের মধ্যে। তারপর পকেট থেকে একটা সিল্ক কর্ড বের করে লোকটার হাত-পা বেঁধে ফেলল। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে লোকটার জামা ও মাথার টুপি খুলে নিয়ে নিজে সেগুলো পরে নিল।

পরাজিত রজ্জুবদ্ধ লোকটা তার ছোট কুৎসিত চোখ দুটো মেলে অন্ধকারে হয়তো

কিরীটীকে দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেদিকে কিরীটীর আদৌ লক্ষ্য ছিল না। মাথার কালো চীনা টুপিটা কপালের নীচে ভুরু পর্যন্ত কিরীটী টেনে দেয়। এই সমস্ত কাজ করতে কিরীটীর দশ-পনেরো মিনিটের বেশী সময় লাগেনি। আর দেরি না করে কিরীটী ঘরের ভেজানো দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। অতি ধীরে দু আঙুলে চাপ দিয়ে এবারে দরজাটায় একটু ঠেলা দিল। দুটো কপাট সরে গিয়ে সামান্য একটু ফাঁক হয়ে গেল। দেখা গেল একটা ভাঙা টেবিলের পাশে তিনজন লোক গভীর মনোযোগ সহকারে বসে বসে কি সব কথাবার্তা বলছে। মুখের হাবভাবে মনে হয় যেন অত্যন্ত জরুরী কিছুর গোপন পরামর্শ চলছে ঘরের লোকগুলোর মধ্যে।

দুজনের মুখ দেখা যায় না, তারা দরজার দিকে পিছনফিরে বসেছে। যার মুখ দেখা যায় সেরকম বীভৎস মুখ কিরীটী জীবনে দেখেছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি কোন শ্মশানচারী প্রেতলোকবাসী; প্রেতলোকের বিভীষিকায় মুখখানা বীভৎস। কি একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন যেন ওর মুখের প্রতি রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে।

লোকটার ডানদিককার কপাল ও গাল বোধ হয় কবে পুড়ে গিয়েছিল। সর্বগ্রাসী হুতাশন যেন তার নির্মম চিহ্ন রেখে গেছে ডানদিককার কপাল ও গালটাকে টেনে কুঁকড়ে বীভৎস করে দিয়ে। সেই সঙ্গে ডানদিককার চোখটাও যেন ঠেলে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই বীভৎস কুৎসিত মুখের ওপরে আলোর ম্লান শিখা পড়ে আরও ভয়াবহ ও বীভৎস মনে হয়।

লোকটার হাতে তীক্ষ্ণ বাঁকানো ছুরি। সে সেটিকে দু আঙুলে দোলাতে দোলাতে কাকে যেন লক্ষ্য করে বললে, সনৎবাবু, আবার ভেবে দেখ। এখনও সময় আছে।

সনৎবাবু নাম শুনেই কিরীটী চমকে উঠল।

লোকটি আবার বললে, হ্যাঁ, এখনও সময় আছে। আমাদের এইভাবে কলকাতায় আসতে বাধ্য করার জন্য খেসারত দশ হাজার না হোক, অন্তত আমার দাবির দশ হাজার এবং কথার খেলাপের জন্য দশ হাজার টাকা—সর্বসমেত কুড়ি হাজার দিলেই মুক্তি পাবে।

আমি তে' তোমাকে আগেই বলেছি, এখনও বলছি—টাকা তুমি পাবে না। তোমার যা খুশী আমাকে নিয়ে করতে পার।

সনৎবাবু, তোমার দুঃসাহস দেখে সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কেমন করে যে তুমি নিশ্চিন্ত থাকার ভান করছ তা তুমিই জান! একটু থেমে আবার বললে, সেবার বড্ড ফাঁকিটা দিয়েছিলে। রেঙ্গুনে তোমার বাড়িতে সেই অপমান, শুধু তাই নয়, এত দুঃসাহস তোমার, আমার প্রেরিত মৃত্যুদূত 'ড্রাগন'কে ঘৃণাভরে মাটিতে আছড়ে ফেলেছিলে। কিন্তু দেখছি, তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃসাহস ঐ টিকটিকি কিরীটী রায়ের। বলতে বলতে সহসা সে কথার মোড় ফিরিয়ে হাতে তীক্ষ্ণ ছুরিখানা একবার ঘুরিয়েই বোঁ করে চোখের নিমেষে দরজার দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। সোঁ করে ছুরির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগটা এসে কপাটের গায়ে বিঁধে থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

ব্যাপারটা এত চকিতে ঘটে গেল যে, কিরীটী ক্ষণপূর্বে স্বপ্নেও তা ভেবে উঠতে পারেনি।

কত বড় খরসন্ধানী দৃষ্টি চারিদিকে সজাগ রেখে লোকটা সদাসতর্ক থাকে, সে কথা

ভাবলেও বুঝি সত্যি শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ থেকে সরে পড়বার পূর্বেই ক্ষুধিত নেকড়ের মত দুই হাত দিয়ে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে, সামনের উপবিষ্ট লোক দুটোর ঘাড়ের ওপর দিয়েই সেই কুৎসিত-দর্শন লোকটি দরজার গোড়ায় এসে পড়ল মুহূর্তে এবং এক ঝট্‌কা মেরে দরজাটা খুলেই সে কিরীটীর কাঁধে একটা হাত দিয়ে চীনা ভাষায় কঠোর স্বরে বললে, কি শুনছিলি হতভাগা!

তারপর বিরাট এক ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড় ধরে তাকে সামনের টুলটির ওপর বসাতে যেতেই ঘরের আলোয় অদূরে দড়ি বাঁধা সেই চীনা যুবকটার দিকে তার নজর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে দু'পা পিছিয়ে গেল।

আর দেরি করা সঙ্গত নয়, শুধু বোকামি—ভেবেই মুহূর্তে জোরে একটা ধাক্কা মেরে লোকটাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে কিরীটী চকিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ভিতর থেকে খিল তুলে দিল।

অদূরে ঘরের মেঝেয় হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সনৎ। ওদিকে ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট লোক দুটো কিরীটীর খিল বন্ধ করার শব্দে চমকে ফিরে তাকাল। ততক্ষণে কিরীটী দরজার গা থেকে সেই ছুরিটা এক টান মেরে তুলে নিয়ে সনতের কাছে গিয়ে পটাপট করে তার বাঁধন কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

লোকদুটো সত্যিই বিস্ময়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই তারা দুজনেই একসঙ্গে ছুটে এল কিরীটীর দিকে। কিরীটী ফিরে দাঁড়িয়ে প্রথম লোকটির হাতে ছুরি দিয়ে ভীষণভাবে এক আঘাত করলে। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে পিছিয়ে গেল।

এদিকে দরজার গায়ে মুহুর্মুহু ধাক্কা পড়ছে। আর একটা বাঁধন কেটে দিতেই বাকী বাঁধনগুলো পট-পট করে ছিঁড়ে ফেলে সনৎ উঠে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে এই লোকদুটো ছুটে এসে আবার ওদের আক্রমণ করল। কিরীটী আর সনৎ ওদের কায়দা করে লোকদুটোর কবল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল।

ওদিকে বাইরে থেকে তখন মুহুর্মুহু ধাক্কায় দরজাটা প্রায় ভেঙে পড়বার যোগাড়, আর লোকদুটোও তখন ওদের ধরবার জন্য প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে-মুখে সে কি ব্যাকুল আগ্রহ!

কিরীটী স্পষ্টই বুঝতে পারছিল, এই ভাবে বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করা মোটেই চলবে না। বাইরে থেকে দরজা ভেঙে ওরা ফেলবেই, তাছাড়া এদের দলে কজন আছে তাই বা কে জানে! এখান থেকে বাঁশি হাজার জোরে বাজালেও বাইরে অপেক্ষমাণ সুব্রত বা রাজেনবাবু কেউই শুনতে পাবেন না।

সহসা এমন সময় মড়-মড় করে প্রচণ্ড শব্দে দরজাটার খিলটা ভেঙে গেল এবং ভাঙা দরজাপথে অল্প আয়াসেই ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল একটু আগের আক্রমণকারী কুৎসিত-দর্শন সেই লোকটা, পুচ্ছ-মর্দিত ক্রুদ্ধ শার্দুলের মত প্রচণ্ড জিঘাংসায়।

কিরীটী স্থির হয়ে দাঁড়াল।

॥ ৮ ॥
সংকট-মুহূর্ত

কেবল কিরীটীই নয়।

ভীষণ-দর্শন লোকটা দরজার কপাট ভেঙে ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের অন্য দুজনও একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের জন্য, যেন মন্ত্রপূত বারি ছিটিয়ে সকলকে মোহাচ্ছন্ন করা হয়েছে।

কয়েক সেকেন্ড ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে পলকহারা দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা আচমকা একটা বাজের মত তীক্ষ্ণ হাসি হেসে ওঠে। বীভৎস হাসিতে ঘরটা যেন ঝমঝম করে ওঠে। সেই ভীষণ-দর্শন লোকটি হাসছে হা হা করে—হাসির ধমকে যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ছে। পরক্ষণেই সহসা ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে জমাট অন্ধকারে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল। কিরীটী পকেট হতে পিতলের ভারি সিগার কেসটা নিক্ষেপ করে ঘরের বাতিটা ভেঙে দিয়েছে বলেই কাঁচ ভাঙার শব্দ উঠেছে।

আচমকা অন্ধকারে যেন মুহূর্তের জন্য সব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে আবার। কিন্তু সেও অতি অল্পক্ষণের জন্যই।

ততক্ষণে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা বিশ্রী হুটোপুটি বেধে গিয়েছে। কিরীটী বাঁ হাত দিয়ে সনতের একটা হাত আগে থেকে ধরে রেখেছিল, এখন গোলমালের মধ্যে সনৎকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোবার চেষ্টা করল এবং চাপা গলায় সনৎকে বললে, সনৎবাবু, চেষ্টা করুন পালাবার!

কিন্তু সহসা কে যেন এমন সময় পিছন থেকে তাকে দু হাতে জাপটে ধরল।

অন্ধকারেই কিরীটী একটা প্রবল ঝটকা দিয়ে আততায়ীর আক্রমণ থেকে আপনাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারে আততায়ীর দৈহিক শক্তি অপরিসীম। কাজেই সনতের হাতটা ছেড়ে দিয়ে দু হাতে সবলে আপনাকে মুক্ত করে নেবার জন্য সচেষ্ট হল।

দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে কেউ কম যায় না। উভয়েই প্রাণপণে যুঝে চলেছে।

কিরীটী যত যুযুৎসুর প্যাঁচ প্রয়োগ করে, আততায়ী ঠিক তার উল্টোটি দিয়ে আপনাকে অক্লেশে মুক্ত করে নেয়। ওদিকে ঘরের মধ্যে ক্রমে আরও গোলমাল বেড়ে উঠেছে। সহসা ঐসময় অন্ধকারে একটা ক্ষীণ যন্ত্রণা-কাতর চিৎকার শোনা গেল।

সেই চিৎকারের শব্দে সকলেই চমকে উঠল। সেই যন্ত্রণাকাতর শব্দে মুহূর্তের জন্য কিরীটী ও তার আক্রমণকারীর শক্ত মুষ্টিও বোধ হয় শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

কিরীটী ঐ সুযোগ হেলায় হারালে না। আততায়ীকে জোরে এক ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই খোলা দরজাপথে বাইরের সরু গলিপথের মধ্যে ছিটকে পড়ল। সেই চীনা যুবকটি তখনও তেমনি হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল সেখানেই।

এক লাফ দিয়ে সেই লোকটিকে ডিঙিয়ে কিরীটী দরজার দিকে ছুটল। ছুটতে ছুটতে সদর দরজার কাছাকাছি এসে দেখতে পেল চ্যাপ্টা-মুখ বুড়ীটা তখনও দরজার কাছে তেমনিভাবে পড়ে আছে।

কিরীটী যেমন দরজার খিলটায় হাত দিতে যাবে, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে শুনতে পেল খুট্-খুট্-খুট্ একটা শব্দ।

দরজা খোলবার সাংকেতিক শব্দ। খিল খুলতে উদ্যত হাতখানি যেন সহসা অর্ধপথেই থেমে যায়। কিরীটী অল্পক্ষণের জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাসে স্থির অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল—এক একটি মুহূর্ত যেন এক একটি যুগ।

কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা! প্রতি লোমকূপ—প্রতি রক্তকণা—দেহের ও মনের সমগ্র বোধশক্তি যেন এক অসীম প্রতীক্ষায় উম্মুক্ত হয়ে উঠেছে। এমন সময় অদূরে একই সঙ্গে অনেকগুলো দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনে মনে হয়, কারা যেন শশব্যস্তে ঐদিকেই ছুটে আসছে।

কিরীটী চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার বাইরে থেকে শব্দ হল—খুট্-খুট্-খুট্ ঐ সময়।

ওদিকে পায়ের শব্দ তখন একেবারে কাছে এসে পড়েছে। আর অপেক্ষা করা বিপজ্জনক, সনৎও এল না। এক ঝটকায় খিলটা খুলেই সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিরীটী।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঐ আড্ডারই বোধ হয় একজন লোক কপাটে সংকেতধ্বনি করছিল। দরজা খুলে কিরীটী আঁধারে আচমকা তার উপর ঝঁপিয়ে পড়তেই লোকটা হুড়মুড় করে ধরাশায়ী হল। কিরীটীও মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়িয়েই পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে গলিপথে বড় রাস্তার দিকে দৌড় দিল। ততক্ষণে আড্ডার সকলে দরজার কাছ এসে জড়ো হয়েছে।

কিরীটী গলিটার প্রায় শেষাশেষি এসে পড়ছে, ঠিক এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ ছুরির অগ্রভাগ এসে তার বাঁ হাতের মাংসপেশীর উপর বিঁধে গেল। বিষম যন্ত্রণায় অস্পষ্ট শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জন্য কিরীটী।

কিন্তু এইভাবে এই অন্ধকার গলিপথে শত্রুর সীমানার মধ্যে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও নিরাপদ নয় ভেবে কিরীটী অতিকষ্টে ডান হাত দিয়ে ছুরিটাকে টান দিয়ে খুলে, ডান হাতের পাতা দিয়ে ক্ষতস্থানটা সজোরে চেপে ধরে টলতে টলতে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে।

সুব্রত ও রাজু নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করছিল বটে, কিন্তু কিরীটী তাদের খোঁজ করলে না। সম্ভবত নিদারুণ পরিশ্রম এবং বারংবার আক্রান্ত হয়ে সেসব কথা চিন্তা করবারও বুঝি তার দেহের বা মনের অবস্থা ছিল না।

বড় রাস্তার ওপর এসেই প্রথমে সে রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরল। প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, মাথাটাও গুরু পরিশ্রমে ঝিম্-ঝিম্ করছে তখন।

॥ ৯ ॥

অনুসন্ধান

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে এগরোটা।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে শুধু দু-একটা মোটরগাড়ির হর্ন কিংবা রিক্‌শার ঠুং-ঠুং আওয়াজ পাওয়া যায়।

জনহীন শহরে যেন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন।

দোকানপাট প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। দু-একটা জুতোর দোকান তখনও অবিশ্যি খোলা। কোন দোকানে খদ্দের নেই, কেবল দোকানে ক্যাশিয়ার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে সারা দিনের বেচাকেনার জমাখরচ ঠিক করছে। দোকানের পাশে কয়েকটি চীনা জটলা পাকিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করছে।

একটা তেতলা বাড়ির নীচে বাঁধানো রোয়াকে কতকগুলো ভিখারী জড়ো হয়ে নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলছে। তাদের কেউ কেউ আবার দেয়াল থেকে প্ল্যাকার্ড ছিঁড়ে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করছে।

কিরীটী সেসবদিকে লক্ষ্য না করে এগিয়ে চলল। লালবাজার থানাটা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে এসেই কিরীটী কি ভেবে দাঁড়াল।

একখানা ট্যাক্সি সেদিকে আসছে। ট্যাক্সিটাকে হাত-ইশারায় দাঁড় করিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বললে, টালিগঞ্জ—

ক্লান্ত অবসন্ন কিরীটী চলমান ট্যাক্সির নরম গদিতে গা এলিয়ে দেয়।

ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে এসে যেন শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে যায়। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে টালিগঞ্জের দিকে।

নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি।

মাথার ওপরে সীমাহীন কালো আকাশ যেন সর্বাঙ্গে তারার রত্নখচিত ওড়না জড়িয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন!

চৌরঙ্গীর দীপমালা-শোভিত পিচ-ঢালা রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি বেগে ছুটে চলেছে। গাড়ির সীটে দেহভার এলিয়ে দিয়ে কিরীটী চোখ বুজে পড়ে থাকে।

বাড়িতে পৌঁছে কড়া নাড়তেই জংলী এসে দরজা খুলে দেয়।

ট্যাক্সির ভাড়াটা দিয়ে দে জংলী!

ভাড়া মিটিয়ে ওপরে এসে জংলী দেখে কিরীটী একটা সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। জংলী ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে কিরীটীর জামায় রক্ত দেখে সবিস্ময়ে বলে, ও কি বাবুজি, এমন করে জখম হল কি করে বাবুজি!

পিছন হতে অন্ধকারে ছুরি মেরেছে রে! তুই এক কাজ কর—ইলেকট্রিক স্টোভে খানিকটা জল গরম করে নিয়ে আয়। আর ঐ পাশের ঘরের সেলফে আইডিন আর তুলো আছে, নিয়ে আয়।

জখম খুব গুরুতর হয়নি। ক্ষতস্থান বেশ ভাল করে চেপে বেঁধে দিয়ে জংলী কিরীটীকে হাত ধরে এনে শয্যায় শুইয়ে দিল। ফার্স্ট এইড দেওয়া কিরীটীর নিকটেই জংলীর শিক্ষা।

পরের দিন সকালে যখন কিরীটীর ঘুম ভাঙল, তখন ভোরের সোনালী রোদে সুনীল আকাশ যেন ঝক-ঝক করছে। খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা প্রভাতী রোদ পায়ের ওপর এসে পড়েছে। বারান্দার খাঁচায় পোষা ক্যানারী পাখিটা থেকে থেকে শিস দিচ্ছে। বাগানে বোধ হয় রজনীগন্ধা তার মধুর মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভাসিয়ে আনে।

কিরীটীর গা-হাত-পায়ে অল্প অল্প বেদনা আছে, মাথাটাও যেন একটু ভারী-ভারী মনে হয়। শয্যার উপর চোখ বুঝে শুয়ে শুয়েই কিরীটী গতরাত্রের সমস্ত কথা আগাগোড়া একবার ভাববার চেষ্টা করে। গতরাত্রের দুঃসাহসিক অভিযানের ব্যাপারটা এখনও মনের উপর ছায়াবাজির মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নিঃশব্দে জংলী এসে ঘরে প্রবেশ করে। বললে, বাবুজি, তবিয়ত আচ্ছি হ্যায় তো?

হ্যাঁ, বহুৎ তন দুরস্তি মালুম হোতা। এক কাফ চা নিয়ে আয় তো বাবা!

শয্যা ত্যাগ করে কিরীটী বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করল।

মুখ হাত ধুয়ে মাথাটা বেশ করে জলে ভিজিয়ে স্নানের ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শিস দিতে দিতে কিরীটী বসবার ঘরে এসে ঢুকতেই সুব্রত ও রাজুকে সেখানে বসে থাকতে দেখল। অভ্যর্থনার পরে হাসতে হাসতে বলে ওঠে, সুপ্রভাত সুপ্রভাত—কতক্ষণ এলেন?

অল্পক্ষণ। তারপর কেমন আছেন? শুনলাম কাল রাত্রে নাকি হাতে জখম হয়েছে? প্রশ্ন করে সুব্রত।

হ্যাঁ, ও কিছু নয়। চলুন চা-পর্বটা শেষ করে একবার কালকের আড্ডাটায় হানা দিয়ে আসা যাক, যদি কিছুর সন্ধান মেলে!

তাতে কি কোন ফল হবে আপনি মনে করেন?

বলা যায় না, তাছাড়া যদি—

সুব্রত ও রাজু কিরীটীর কথায় হো হো করে হেসে উঠল। সুব্রত বললে—যদি কি? যদি এক পাটি ছেঁড়া জুতো বা একটা ভাঙা ছুরির বাঁট—নিদেনপক্ষে দেওয়ালের গায়ে একটা হাতের ছাপ পাওয়া যায়?

কিরীটী ওদের কথার ভঙ্গিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বললে, হ্যাঁ, ডিটেক্‌টিভরা নাকি ঐসব সূত্র ধরেই অনেক সময় বড় বড় পাপানুষ্ঠানেরও কিনারা করে ফেলেন শুনতে পাওয়া যায়।

জংলী এসে চায়ের ট্রে হাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং সামনের টিপয়ের ওপরে ট্রে-টা নামিয়ে রাখল।

চা-পানের পর তিনজন রাস্তায় এসে নামল।

এর মধ্যেই বাইরে রৌদ্রের তাপ বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে তিনজনে উঠে বসল।

একসময় কিরীটী বললে, আমরা তো কালই রওনা হচ্ছি, কি বলেন সুব্রতবাবু?

হুঁ। কিন্তু সনৎদার কোন একটা কিনারা তো হল না এখনও! বললে সুব্রত।

সনৎবাবু আপাতত কলকাতাতেই আছেন।

কিরীটীর কথায় রাজু ও সুব্রত চমকে উঠে বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে শুধাল, সে কি!

হ্যাঁ, কাল রাত্রে সামান্য একটু ভুলের জন্য তাঁকে সেই শয়তানের আড্ডায় ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছি।

কি?

তাকে তারা প্রাণে মারবে না।

তাদের আপনি চেনেন না মিঃ রায়। এ সংসারে তাদের অসাধ্য কিছুই নেই। এমন কোন পাপ কাজ, দুষ্কর্ম নেই যা করতে ওদের বিবেকে বাধে। ওরা নেকড়ের চেয়েও হিংস্র, সাপের চেয়েও খল।

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। পরে গম্ভীর ভাবে বললে, কিন্তু এক্ষেত্রে মেরে ফেললে যে ওদের কাজ হাসিল হবে না সুব্রতবাবু। যে ফাঁদ ওরা পাততে চায় সে বড় বিষম ফাঁদ। কিন্তু ওদের হিসাবেই সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছে এবং সেইটুকু শুধরে নেওয়ার জন্য ওরা বোধ হয় সনৎবাবুকে নিয়ে কালকের জাহাজে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রেঙ্গুন রওনা হবে। এ পর্যন্ত বলে কিরীটী একে একে গতরাত্রের সমস্ত ঘটনাই আগাগোড়া খুলে ওদের বলে গেল।

সুব্রত কিরীটীর মুখে গতরাত্রের আনুপূর্বিক কাহিনী শুনে বললে, তা হলে দেখছি সত্যসত্যই আপনি ভাগ্যবান! প্রথম যাত্রাতেই মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ মিলে গেল!

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, না, এবারেই প্রথম সাক্ষাৎ নয়, ইতিপূর্বে আরও একবার দর্শন মিলেছিল।

সে কি! দুজনে একসঙ্গেই প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, খোঁড়া ভিক্ষুকই স্বয়ং মহাপ্রভু। বলে আবার কিরীটী খোঁড়া ভিক্ষুকের কাহিনীটাও ওদের বললে।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে চীনাপট্টির উদ্দেশে। রাজপথে অসংখ্য লোক। পিপীলিকার সারির মত যে যার গন্তব্যপথে চলেছে। অফিস টাইম। বাস-ট্রামগুলো যাত্রীতে যেন একেবারে ঠাসা।

কিরীটী বললে, একটা কথা ভাবছি, চীনাপট্টিতে হুট্ করে গিয়ে আগেই ওঠা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আটঘাট বেঁধে কাজে নামতে হবে।

কি করবেন তাহলে? সুব্রত প্রশ্ন করে।

আমরা প্রথমে লালবাজারে যাব, সেখানে চৌধুরী বলে একজন সি. আই. ডি. ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় আছে। তাকে সব কথা খুলে বলে লালপাগড়ির সাহায্য নিতে হবে।

লালপাগড়ি!

হ্যাঁ, জানেন না তো, চোর-ডাকাত-গুণ্ডা মহলে লালপাগড়ির মহিমা অপরিসীম।

লালবাজারের কাছাকাছি এসে ওরা ট্যাক্সিটা বিদায় করে দিল ভাড়া মিটিয়ে। চৌধুরী অফিসেই ছিল। কিরীটী তাকে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবার পর চৌধুরী সানন্দে কিরীটীকে সাহায্য করতে রাজী হয়ে গেল। এবং চৌধুরীর নির্দেশমত তখনই থানা থেকে দুজন কনেস্টবল কিরীটী তার সাহায্যের জন্য পেল।

থানা থেকে বের হয়ে কিরীটী সদলবলে যখন হংকং সু ফ্যাক্টরীর সামনে এসে হাজির হল, বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে।

দোকানের ঠিক সামনেই একজন প্রৌঢ়বয়সী চীনা একটা কাঠের টুলের ওপরে বসে একটা লম্বা পাইপ মুখে গুঁজে ঝিমোচ্ছিল। ওদের জুতোর শব্দে লোকটা হঠাৎ

চমকে মুখ তুলে তাকাল এবং পরক্ষণেই সাদরে আহ্বান জানাল, জুতি সাব! আচ্ছা জুতি!...

দোকানের ভিতরে একটি অল্পবয়সী চীনা যুবতী কাঁচি দিয়ে চামড়া কাটছিল আর মেসিনে বসে একজন আধাবয়সী চীনা যুবক কি যেন সেলাই করছিল।

কিরীটীদের সকলকে দোকানে প্রবেশ করতে দেখে ওরা দুজনেই মুখ তুলে একবার মাত্র চেয়ে আবার যে যার কাজে মন দিল। দোকানটি যে খুব বড়গোছের তা নয়—নাতিপ্রশস্ত একখানা হলঘর। ওপরে প্ল্যাটফরমের মত কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। একপাশে পুরনো চামড়ার টুকরো স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে, অন্য একপাশে দেখা যায় উপরে ওঠবার জন্য একটা কাঠের সিঁড়ি। কিরীটী তার খরসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে চারিদিকে ভাল করে দেখতে লাগল।

কনেস্টবল দুজন কিরীটীর নির্দেশেই দোকানের ভিতর ঢোকেনি, তারা ওদিককার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

কি জুতি চাই বাবু? প্রশ্ন করলে চীনা যুবকটি আধো-আধো বাংলায়।

কিরীটী গম্ভীর হয়ে বললে, আমরা তোমাদের দোকানঘরটা একবার সার্চ করব বলে এসেছি।

কথাটা শোনামাত্র চীনা যুবকটি মেসিন ছেড়ে উঠে এল এবং বেশ পরিষ্কার ইংরাজীতে শুধাল, কেন, কি কারণে জানতে পারি কি?

কিরীটী দোকানের ভিতরে চারিদিকে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করতে করতে উদাস স্বরে জবাব দেয়, সরকারের হুকুম।

চীনা যুবক রুক্ষস্বরে জবাব দিল, তোমার ও হুকুম আমি মানি না বাবু। এখনই তুমি আমার দোকান থেকে বেরিয়ে যাও, তা না হলে বিপদে পড়বে।

কিরীটী গম্ভীর ভাবে জবাব দেয়, বিপদে আমি পড়ব না, আমায় না দেখতে দিলে তুমিই বিপদে পড়বে সাহেব।

ইতিমধ্যে ওদের ওই কথা-কাটাকাটির আওয়াজ পেয়ে পাশের একটা দরজা খুলে আরও দুজন হোমরা-চোমরা গোছের চীনা বেরিয়ে এল। তারা বলল, কি হল বাবু?

কিরীটী ওদের দিকে একান্ত তাচ্ছিল্য-ভরে চেয়ে জবাব দিল, এই দোকানটা একবার আমরা ভাল করে দেখতে চাই।

কেন? রুক্ষস্বরে একজন প্রশ্ন করে।

কিরীটী যেন ওদের ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন সুব্রতবাবু, আমরা আমাদের কাজ করি।

কিরীটীর মুখের কথা শেষ হল না, চোখের পলকে ওদের একজন সুব্রতর সামনে এসে দাঁড়াল এবং মুহূর্তে সেই পরিষ্কার দিবালোকেই একখানা সুতীক্ষ্ণ বাঁকানো ছুরি ওদের গতিপথ রোধ করে।

॥ ১০ ॥
কালো ভ্রমরের হুল

চোখের পলক ফেলার আগেই কিরীটী চীনা লোকটির ছুরিসমেত হাতখানা ধরে এক হেঁচকা টানে নিজের দিকে টেনে নিয়ে কনুইটা চেপে ধরে লোকটার হাতটা মুচড়ে দিল।

একটা অস্ফুট চিৎকার করে চীনাটা ছুরিখানা ফেলে দিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কিরীটী বাম হাত দিয়ে ছোট্ট একটা বাঁশি বের করে তাতে সজোরে ফুঁ দিল।

বাঁশির আওয়াজ পেয়ে দ্রুতপদে অপেক্ষমাণ কনেস্টেবল দুজন এসে দোকানে প্রবেশ করল। লালপাগড়ির শুভাগমন দেখে চীনাদের মুখের ভাব যেন নিমেষে বদলে যায়। তারা একান্ত নিরীহ পোষা জীবটির মত এক পাশে সরে দাঁড়াল মাথা নীচু করে সঙ্গে সঙ্গে।

কিরীটী একজন কনেস্টবলকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে যে দরজাটা খুলে একটু আগে সেই চীনা লোক দুটো ঢুকেছিল সেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল নির্ভীক পদক্ষেপে।

দরজা খুলে কিরীটী, সুব্রত ও একজন কনেস্টবল গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। সামনেই একটা মাঝারি গোছের ঘর। ঘরটা দিনের বেলাতেও বেশ অন্ধকার। উপরে ছোট ছোট দুটো স্কাইলাইট বসানো আছে বটে এবং ওদিকে আর একটা দরজাও আছে, কিন্তু সেটার কপাট ভেজানো থাকায় ঘরটা অন্ধকার।

বাইরের আলো আসবার কোন পথ তো নেই-ই, কৃত্রিম আলোরও তেমন কোন বন্দোবস্ত নেই ঘরটার মধ্যে। স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে সামান্য যে আলোটুকু ঘরে আসে তাতেই সামান্য যেন এক মৃদু আলো-আঁধারের সৃষ্টি হয়েছে।

কিরীটী খর-সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে চারিদিকে দেখতে লাগল। ঘরের এক কেণে স্তূপাকার করে একগাদা কাগজের তৈরি জুতোর বাক্স। আর এক কোণে একটা জুতো সেলাইয়ের কল। দেওয়ালে একটা ওয়াল-ল্যাম্প। ল্যাম্পটার চিমনির গায়ে একরাশ কালি জমেছে। কতকাল পরিষ্কার করা হয়নি কে জানে।

ওরা এগিয়ে এসে প্রথমেই ওদিককার দরজাটা খুলে ফেলল। সামনেই একফালি বারান্দা। সেখানে তবু যা হোক খানিকটা আলো এসে পড়েছে বাইরে।

বারান্দার সংলগ্ন পর পর দুখানা ঘর। প্রথম ঘরটা নেহাত ছোট নয়। সেখানে কতকগুলো চেয়ার-টেবিল ওলট-পালট হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মনে হয় কারা বুঝি ঘরটার মধ্যে এসে হুটোপাটি করে গেছে। ঘরের মেঝেয় একটা টেবিল-ল্যাম্প উল্টে পড়ে আছে, খানিকটা জায়গায় কেরোসিন তেলের দাগ। ভাঙা চিমনির টুকরোগুলো ঘরময় ইতস্তত ছড়ানো। কিরীটী ভাল করে সব দেখতে দেখতে বুঝতে পারে, এই ঘরটিই গতরাত্রের সেই ঘটনাস্থল। এই ঘরেই গতরাত্রের খণ্ডপ্রলয় ঘটে গেছে। শূন্য ঘরখানি যেন গতরাত্রির প্রলয়কাণ্ডের মৌন সাক্ষী হয়ে রয়েছে এখনও।

ঘরের বাতাসটা যেন কেরোসিনের তেলের উগ্র গন্ধে ভরে আছে। নাক জ্বালা করে।

কিরীটী আরও একবার ভালো করে ঘরের চতুষ্পার্শ্বটা দেখে নিল।

ভাঙা চেয়ার-টেবিলগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই।

কিরীটী অতঃপর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করল।

এ ঘরটা অবশ্য আগের ঘরের চাইতে অনেক ছোট এবং আগের ঘরটার চাইতে এ ঘরটা যেন আরো একটু বেশী অন্ধকার। মুক্ত দরজাপথে সামান্য যে আলো এসে ঘরে প্রবেশ করেছে তাতে দেখা গেল, একটা ভাঙা খাটিয়ার ওপরে আপাদমস্তক একটা মলিন দুর্গন্ধ চাদর মুড়ি দিয়ে কে একজন পড়ে আছে!

কিরীটীই এগিয়ে এসে চাদরটা টেনে তোলে।

একটা অস্ফুট কাতর শব্দ শোনা গেল।

কিরীটী দেখলে একটা চীনা বুড়ী। ভালো করে শায়িত বুড়ীটার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই কিরীটী যেন চমকে ওঠে।

চিনতে এতটুকুও কষ্ট হয় না।

বুড়ীটার বোধ হয় সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটেছিল, সে তার অসহিষ্ণু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে পিট্‌পিট্‌ করে কিরীটীর দিকে চেয়ে থাকে।

বুড়ীর জীবনে এ ধরনের উৎপাত হয়তো খুব কমই দেখা দিয়েছে।

কিরীটী চমকে উঠেছিল বুড়ীটাকে চিনতে পেরেই। এই তো সেই চেপ্টামুখ বুড়ী, যাকে সে গতরাত্রে দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল।

হঠাৎ বুড়ী কিচির-মিচির করে যেন কি বলতে বলতে উঠে বসল। কিরীটী ওর মুখের দিকে একবার চেয়ে সুব্রতকে বললে, চলুন সুব্রতবাবু, দেখা যাক আর কোন ঘর-টর আছে কিনা!

বারান্দাটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা টিনের বেড়া। বেড়ার গায়ে একটা দরজা, সেই দরজায় একটা দুর্গন্ধ পুরনো ময়লা চটের পরদা ঝুলছে।

কিরীটী এগিয়ে এসে হাত দিয়ে পরদাটি তুলে ধরল। ঘরের ভিতরে দেখা গেল তিনটি চীনা মেয়ে। তাদের একজন উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে কি যেন রাঁধছে, একজন একটা ছুরি দিয়ে তরকারি কেটে কেটে একটা ভাঙা সানকিতে রাখছে, অন্যজন একটা ভাঙা মোড়ার উপরে বসে একটা জামা সেলাই করছে। কিরীটীদের এমনি অতর্কিতভাবে প্রবেশ করতে দেখে তিনজনেই বিস্মিত ও চমকিত হয়ে একই সময়ে যে যার হাতের কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াল।

কিরীটী আফসোসের সুরে বললে, কোন ফল হল না। চলুন।

কিরীটীর কণ্ঠে রীতিমত একটা হতাশার সুর যেন ফুটে ওঠে।

সকলে আবার দোকান থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কিছুই পাওয়া গেল না, এখন কি করবেন ঠিক করলেন মিঃ রায়?

কনেস্টবল দুজনকে বিদায় দিয়ে কিরীটী অন্যমনস্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বললে, কালকের জাহাজে আমাদের রওনা হতেই হবে সুব্রতবাবু। সে-ভাবেই আমরা যেন প্রস্তুত হই।

সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, সেখানে যাওয়ার কি কোন প্রয়োজন আছে মিঃ রায়? সনৎদাকে যখন ওরা এখানেই রেখেছে তখন শুধু শুধু অতদূর দৌড়ে কি হবে?

সনৎবাবুকে অক্ষতদেহে ফিরে পেতে হলে আমাদের কালকের জাহাজে যেতেই হবে। কেননা একটু আগেই আপনাদের বলেছি, ওরা কালকের জাহাজেই রওনা হবে।

কিন্তু—

এর মধ্যে আর কোন কিন্তুই নেই সুব্রতবাবু। পাশার দান উল্টে গেছে, এ কথা খুবই সত্যি। কিন্তু আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর পাশার ঘুঁটি আবার নূতন করে সাজাবার মত বুদ্ধি বা ক্ষমতা বেশ আছে। এবং এবারে তার প্রথম ও প্রধান চেষ্টাই হবে, যাতে গতবারের মত ভুলের জের আর তাকে না টানতে হয়। সে যে একজন দস্তুরমত শয়তান সে বিষয়ে কোন মতদ্বৈধই নেই। সেই সঙ্গে এ কথাটাও যেন আমরা মুহূর্তের জন্য না ভুলি যে, বুদ্ধি তার অসম্ভব রকম তীক্ষ্ণ। কাজেই বুদ্ধির কৌশলে তাকে পরাস্ত করতে হলে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের একান্তই প্রয়োজন। বলতে বলতে হঠাৎ চমকে উঠে উৎকণ্ঠামিশ্রিত কণ্ঠে কিরীটী বলে উঠল, সরে যান, সরে যান!

কিন্তু সরে যাওয়ার আগেই সাইকেল-সমেত একজন আরোহী এসে হুড়মুড় করে একেবারে সুব্রতর ঘাড়ের ওপর পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত 'উঃ' করে একটা অস্ফুট চিৎকার করে ছিটকে পড়ল।

সকলে মিলে ভূপতিত সুব্রতকে সামলাবার আগেই সাইকেল-আরোহী সাইকেল ফেলে এক ছুটে সামনের একটা সরু গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিরীটী এগিয়ে এসে সুব্রতকে তুলতে তুলতে স্নেহ ও উদ্বেগপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, লেগেছে কি? কোথায় লাগল?

সুব্রত ডান হাত দিয়ে বামদিককার কোমরটা চেপে ধরে উঠতে উঠতে কাতরস্বরে বললে, কোমরে একটু লেগেছে।

ততক্ষণে রাস্তায় কৌতূহলী পথিকদের মধ্যে অনেকেই সেখানে এসে জুটেছে। নানারকম প্রশ্ন ও মন্তব্যে স্থানটি বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। ভিড় ও অবান্তর প্রশ্নোত্তর এড়াবার জন্য কিরীটী হাতের ইশারায় একখানা চলন্ত ট্যাক্সি ডাকল এবং সকলে ট্যাক্সিতে উঠে বসে বললে, আমহার্স্ট স্ট্রীট।

ট্যাক্সি ছুটে চলল।

কৌতূহলী হুজুগ-প্রিয় পথিকেরা এমন একটি সরস ব্যাপার সহসা বিনা গোলমালে থেমে যেতে দেখে বেশ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হল এবং অগত্যা যে যার গন্তব্যপথে চলে গেল।

চলমান ট্যাক্সিতে বসে গম্ভীরভাবে বললে কিরীটী, চারিদিকে চেয়ে পথ চলতে হয় সুব্রতবাবু!

সুব্রত সে কথায় কান দিল না। সে ততক্ষণে বাঁহাত দিয়ে একটা মোটা পিনসমেত একখানি গোল কার্ড কাপড় থেকে টেনে বের করে হাতের পাতার উপর মেলে দেখছিল। এ সেই রকমের একখানি কার্ড, যেমনটি রাজুর গায়ে পরশু রাতে বিঁধেছিল। তাতে খুব ছোট ছোট অক্ষরে কি যেন লেখা। কার্ডখানা চোখের কাছে নিয়ে সুব্রত পড়লে—

বন্ধু, কালো ভ্রমরের হুল শুধু হুলই নয়, এতে বিষের জ্বালাও আছে। সেই বিষ একবার শরীরে ঢুকলে আর নামে না। সাবধান!

॥ ১১ ॥

আবার যাত্রা শুরু

পিনটা কালো রংয়ের—দেখতে একটা মোটা বেলের কাঁটার মতই। তার এক দিক সূচের আগার মত তীক্ষ্ণ ও ধারালো, অন্য দিকটা ভোঁতা। পিনটা যেখানে বিঁধেছিল সেখানে হাত বুলোতে বুলোতে সুব্রত কাতরস্বরে বললে, উঃ, এখনও জ্বালা করছে!

ট্যাক্সিটা তখনও হ্যারিসন রোড ধরে পূর্বদিকে ছুটে চলেছে। ট্যাক্সি-চালক মুখ ফিরিয়ে শুধাল, আমহার্স্ট স্ট্রীট মে কিধার বাবু সাব?

তুমি চল। আমি বলবখন। কিরীটী ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল।

হ্যারিসন রোড ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এসে কিরীটী ড্রাইভারকে বললে গাড়ির মোড় ফিরিয়ে আমাহার্স্ট স্ট্রীট ধরে এগিয়ে যেতে।

সুব্রতদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে পৌঁছে কিরীটী সেখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করল। তারপর বিকালের দিকে আবার আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাস্তায় গিয়ে নামল।

বেলা তখন প্রায় দেড়টা হবে।

আবার যাত্রার উদ্যোগে সুব্রত একটা একটা করে আবশ্যকীয় জিনিসপত্র রাজুর দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, আর রাজু সেগুলো একটা চামড়ার সুটকেসের মধ্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভরে রাখছে।

একটা বড় তোয়ালে ভাজ করে সুটকেসের মধ্যে রাখতে রাখতে এক সময় রাজু বলে, কিন্তু তোমরা যতই বল ভাই, মনের মধ্যে থেকে কিছুতেই যেন আমি সাড়া পাচ্ছি না সুব্রত। সনৎদা এখানে পড়ে রইল, আমরা চলেছি রেঙ্গুনের দিকে। এমনিভাবে বৃথা অত দূর ছুটে গিয়ে যে কি লাভ হবে তা মিঃ রায়ই জানেন!

সুব্রতও মন থেকে সায় পাচ্ছিল না। সে বললে, কিন্তু মিঃ রায়ের মত তো শুনলে?

শুনলাম তো, যা ভাল বোঝ কর।

তিনি নিশ্চয়ই ভাল বুঝেই রেঙ্গুন চলেছেন।

এমন সময় মা এসে ঘরে ঢুকলেন, বললেন, হ্যাঁ রে, তা হলে সত্যিই কাল ভোরের জাহাজেই আবার তোরা সেই মগের মুল্লুকে চললি?

এখন পর্যন্ত তো তাই ঠিক মা, তবে জাহাজে চাপবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত বলা যায় না।

কিন্তু সনতের তো কোন খোঁজখবর মিলল না।

খোঁজ পাওয়া গেছে মা। সনৎদা প্রাণে বেঁচে আছে, এই পর্যন্ত জেনে রাখ।

আহা বেঁচে আছে তো? ঠিক খবর পেয়েছিস তো?

হ্যাঁ, মা। মিঃ রায় খবর এনেছেন।

আহা ভগবান তাঁর ভাল করুন। বলতে বলতে মার চোখের কোণ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি আবার বললেন, কোথায় তিনি তার দেখা পেলেন?

তা তো জানি নে মা, জিজ্ঞাসা করিনি সে কথা।

তা বাছাকে আমার নিয়ে এল না কেন?

সুব্রত মার কথায় মৃদু হেসে বলল, তারা ছেড়ে দেবে বলে তো আর অত কষ্ট করে চুরি করে নিয়ে যায়নি মা!

তা সে এইখানে পড়ে রইল, আর তোরা চললি রেঙ্গুনে?

ভয় নেই মা, এখানে থেকে তাকে উদ্ধার করা যাবে না, তাই আমরা রেঙ্গুনে যাচ্ছি কাল।

হঠাৎ সকলে ঘরের মধ্যে অন্য একজনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ফিরে তাকায়। দেখল দরজার কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে কিরীটী রায়।

রাজু বললে, মিঃ রায় কতক্ষণ এসেছেন?

কিরীটী ঘরের মধ্যে ঢুকে এগিয়ে আসতে আসতে বললে, আপনাদের সকলেরই মনে একটা সংশয় জেগেছে যে, সনৎবাবু এখানে পড়ে রইলেন, অথচ আমরা বর্মা চলেছি। আমার কথা যদি বিশ্বাস করতে না পারেন, তবে এইটুকুই এখন শুধু জেনে রাখুন যে, সনৎবাবুকে যেমন করেই হোক ওরা কালকে রেঙ্গুনগামী জাহাজে তুলবেই। আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কালো ভ্রমর যেমনি শয়তান তার চাইতেও ঢের বেশী তীক্ষ্ণধী! তার ওপর আরও একটা কথা হচ্ছে এই যে, সনৎবাবুকে ওরা প্রাণে মারবে না। তাই সনৎবাবু যেখানেই থাকুন না কেন, আমাদের দুর্ভাবনার আপাতত তেমন কিছু নেই। কালো ভ্রমর দুর্ধর্ষ হলেও তার শত্রুর অভাব নেই, এমনি দুনিয়ার নিয়ম। এই দেখুন—বলতে বলতে কিরীটী জামার পকেট থেকে সেই সকালের ১৮নং বাড়িতে পাওয়া সাংকেতিক কাগজখানা বের করে সকলের চোখের সামনে ধরল।

সুব্রত ও রাজু উভয়েই একান্ত কৌতূহলে দেখি দেখি বলে কাগজটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, সমস্ত জীবনভরে কালো ভ্রমর হয়তো প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেছে, কিন্তু তা থেকে তার ভোগে একটি পাই-পয়সাও বোধ হয় লাগাতে পারেনি। আজ পর্যন্ত যতদিন সে বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতে আরও যতদিন সে বেঁচে থাকবে, সে শুধু সেই সংগৃহীত অর্থ যখের মত আগলেই থাকবে। এ জীবনের অর্থ-পিপাসা মৃত্যুর পরও হয়তো তাকে এই পৃথিবীর মাটির বুকে টেনে আনবে। যে হাহাকার নিয়ে সে সারাজীবন কাটিয়ে গেল, সেই হাহাকারই থেকে যাবে তার বায়ুভূত দেহে।

কিরীটীর কথাগুলো যেমনি দরদভরা তেমনি সতেজ। সকলেই বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে কথাগুলো শুনছিল, উত্তরে কেউ একটি কথাও বলতে পারল না।

রাজু বললে, আমি কটা দিনই বা ওদের দলে ছিলাম, কিন্তু যে দলের সর্দার তার দেখা মাত্র একবারের বেশী দুবার মেলেনি, তাও ছদ্মবেশে মুখোশের অন্তরালে অন্ধকার ঘরে। শুনেছি ওদের দলের কেউ নাকি আজ পর্যন্ত সর্দারকে স্বাভাবিক বেশে একদিনও দেখেনি। সে হরেক রকমের রূপ ধরে সকলের মাঝে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, পাশে থেকেই তার হুকুম চালায় সকলের ওপরে, অথচ তাকে দেখলেও চেনা যায় না। একটা কথা ওদের মুখে আমি বরাবর শুনেছি, সর্দারকে নাকি রাত্রি ছাড়া দিনের আলোয় আজ পর্যন্ত কেউই দেখেনি এবং তাও ছদ্মবেশে। যে মুহূর্তে দিনের আলো নিভে গিয়ে রাতের অন্ধকার চারিদিকে নেমে আসে, ঠিক সেই মুহূর্তে সর্দারও তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। আবার যখন পূর্ব আকাশে ভোরের আলো প্রকাশ পায়, সর্দার যে কোন্ ফাঁকে কোথা দিয়ে আপনাকে লুকিয়ে ফেলে, শত চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত কেউ তা ধরতে পারেনি।

* * *

রাত্রি দশটা হবে

আকাশ বেশ পরিষ্কার। কালো আকাশের কোলে.দূরে, অনেক দূরে মেঘপুরীর বাতায়নে যেন তারার প্রদীপ জ্বালিয়েছে। তারই আলো সৃষ্টি করেছে পৃথিবী ও আকাশের মাঝে এক অপূর্ব আলো-ছায়া-ঘেরা পথ। ওপরে একখানা মাদুর পেতে মার পাসে বসে সুব্রত ও রাজু আসন্ন বিদেশযাত্রা সম্বন্ধেই নানা গল্প করছে।

সনৎদার বাড়ির সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে রাজু? সেই ড্রাগন—কালো ভ্রমরের মৃত্যুদূত! একসময় বললে সুব্রত।

রাজু হাসতে হাসতে বললে, মনে নেই আবার! কিন্তু যাই বল, ড্রাগনের সত্যসত্যই ক্ষমতা আছে বলতে হবে। অন্য কোন ক্ষমতা না থাকলেও আকর্ষণী ক্ষমতা যে আছে—সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ!

হুঁ, ক্ষমতা আছে বৈকি। কিন্তু একজনের কথা আজ আমার বারবারই মনে হচ্ছে রাজু। সেবার আমাদের বিদেশ-যাত্রার সময় এমন একজন বন্ধু ছিলেন আমাদের পাশে পাশে সর্বদা, যাঁর সদা-সতর্ক স্নেহদৃষ্টি সারাক্ষণ আমাদের নিরাপদে রেখেছিল। তিনি না থাকলে সেই মগের মুল্লুক থেকে ফিরে এসে বাংলার মাটিতে পা দেওয়া হয়তো এ জীবনে আর আমাদের কারোরই ঘটে উঠত কিনা সন্দেহ। আবার সেই বিদেশের পথে চলেছি। সেবারে যেমন অচেনা অজানা ছিল, এবারেও ঠিক তাই। সেদিনকার সেই পরম বন্ধুটি আজ আর আমাদের সঙ্গে নেই। এ পৃথিবী হতে তিনি চির-বিদায় নিয়ে গেছেন। আর সত্যি কথা বলতে গেলে সেজন্য দায়ী তো আমরাই।...

শেষের দিকে সুব্রতর কণ্ঠস্বর যেন বুজে এল অশ্রুতে।

সত্যি অমরবাবুর ঋণ আমরা আর এ জীবনে শোধ করবার সুযোগ পেলাম না। রাজু বললে।

* * *

তখনও রাতের আকাশ থেকে ভাল করে আঁধারের ঘোর কেটে যায়নি। সবেমাত্র পূবদিক লালচে আভায় রঙিন হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

সুব্রতর ঘুমটা ভেঙে গেল রাজুর ডাকে। রাজু ডাকছিল, এই সুব্রত, ওঠ্ ওঠ্! কত রবি জ্বলে রে, কে বা আঁখি মেলে রে! এরপর ব্যায়াম করবিই বা কখন, আর যাবিই বা কখন? জাহাজের সময় তো হয়ে এল।

সুব্রত চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল। পাশের ঘর থেকে স্টোভের গর্জন কানে আসে।

আসন্ন যাত্রার জন্য মা নিশ্চয়ই খাবার তৈরী করছেন।

সুব্রত তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখটা ধুয়ে ছাদে চলে গেল এবং খোলা বাতাসে বারবেল নিয়ে ব্যায়াম করতে শুরু করে দিল। তাড়াতাড়ি ব্যায়াম শেষ করে স্নানটাও সেরে নিল। স্নান শেষ করে জামাকাপড় পরে নীচের ঘরে এসে দেখে ইতিমধ্যে কিরীটী ওদের বাড়িতে পৌঁছে গেছে।

কিরীটীবাবু এসে গেছেন দেখছি!

আগের দিন কথা হয়েছিল যে, সকলে মিলে সুব্রতদের বাড়ি থেকে রওনা হবে।

কিরীটী বলে, হ্যাঁ, জাহাজের আর বেশী দেরি নেই, একটু তাড়াতাড়ি করুন।

অদূরে একটা মোড়া পেতে রাজু বসে ছিল। সে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিল।

মা গরম গরম লুচি ভেজে একটা পাত্রে রাখছিলেন। সকলে মিলে সেগুলোর সৎকার করতে লেগে গেল।

মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সকলে এসে গাড়িতে চেপে জাহাজঘাটে এসে পৌঁছে দেখল, জাহাজ ছাড়তে তখন আর বেশী দেরি নেই। জাহাজের ঘন ঘন হুইসেল চারিদিক প্রকম্পিত করে তুলছে। যাত্রী এবং তাদের আত্মীয়স্বজনে জাহাজঘাটে বেশ ভিড়।

একটা সেকেন্ড ক্লাস কেবিন রির্জাভ করা হয়েছিল। সুব্রত, কিরীটী, রাজু ও চাকর জংলী সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে গিয়ে উঠল।

নির্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ভোঁ দিতে দিতে জেটি ছেড়ে এগিয়ে চলল।

নবোদিত সূর্যের রঙীন আলোয় গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন গলিত রুপোর মতই ঝকঝক করে জ্বলছে।

গঙ্গাবক্ষ থেকে বয়ে আসছে প্রথম ভোবের ঠাণ্ডা হাওয়া মৃদু মৃদু, যেন স্নেহের স্নিগ্ধ কর-প্রলেপ কারও।

নির্মেঘ নীলাকাশ সূর্যালোকে যেন ঝলমল কবছে।

বর্ষার গঙ্গার গৈবিক জলরাশি ভেদ করে ধীর মন্থর গতিতে জাহাজ এগিয়ে চলেছে।

গঙ্গার দু পাশে সদ্য ঘুম ভাঙার সাড়া পড়ে গেছে। এদিক-ওদিক বড় বড় জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট স্টীম-লঞ্চগুলো এদিক-ওদিক যাতায়াত করে। ছোট বড় নানা আকাবের নৌকাও অনেক দেখা যায়। মাঝে.মাঝে শোনা যায় জাহাজের ইঞ্জিনঘরের ঘণ্টা।

রাতের রহস্যঘন অন্ধকার কেটে গিয়ে আবাব নতুন দিনের যাত্রা হয় শুরু। দিনের শেষে ঘুমের দেশের পথের বাঁকে সাঁজের আঁধার আবার বিদায় নেয শেষদিনের আলোর কাছে। রাত্রি আবার ফিরে আসে তার রহস্য নিয়ে।

এই তো নিয়ম।

আকাশের প্রতি গ্রহ-তারাও এগিয়ে চলেছে অনন্ত যাত্রাপথে। মানুষও তেমনি দিনের পর দিন, রাত্রির পর বাত্রি তাদের নব নব যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।

কালো ভ্রমব ওদের ডাক দিয়েছে!

সুব্রত ভাবে: কালো ভ্রমর!

কিরীটী ভাবে: কালো ভ্রমর!

রাজুও ভাবে : কালো ভ্রমর!

ডেকের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে কিরীটী, সুব্রত ও রাজু ক্রম-বিলীয়মান কূলেব দিকে চেয়ে।

কিরীটী বললে একসময়ে, মাটি আর জলের মধ্যে যেন একটা স্নেহের বাঁধন আছে সুব্রতবাবু।...দেখুন কূলের মাটি যেন বুক পেতে দিয়েছে জলের স্পর্শটুকু পেতে।

জাহাজ কূল ছেড়ে অনেকখানি এগিয়ে চলে। ক্রমে বজবজ, উলুবেড়িয়া পশ্চাতে পড়ে গেল।

হঠাৎ একসময় সুব্রত রাজুর দিকে ফিরে বলল, গেলবার নীতীশটা আমাদের সঙ্গে ছিল।

এবারেও নীতীশকে চিঠি দিয়ে নিয়ে এলে হত!

এখন তো সে হোস্টেলে থাকে না, রাধানগরে তার মামার ওখানে থাকে। ওদের বাধানগরের বাসার ঠিকানাও আমার জানা নেই। সুব্রত জবাব দেয়।

॥ ১২ ॥

ডাঃ সান্যাল

পরের দিন।

সন্ধ্যা হতে তখন আর খুব বেশী দেরি নেই। সাগরের কালো জলে সাঁজের ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। মেঘপুরীর বাতায়নে সবেমাত্র দিগাঙ্গনারা দু-একটি করে তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে গেল বুঝি।

বঙ্গোপসাগরের উত্তাল জলরাশির উপর দিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে নেচে চলেছে বিরাট অর্ণবপোত কত যাত্রী বুকে নিয়ে।

সাগরের বুক থেকে কেমন একটা যেন ঠাণ্ডা হাওয়া আসে, শীত-শীত করলেও তা বেশ আরামদায়ক।

ডেকে সেই বিকাল চারটে হতে এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক যাত্রীই সাগরের সান্ধ্যশোভা উপভোগ করছিল। সবাই এখন কেবিনে চলে গিয়েছে; শুধু যায়নি কিরীটী, সুব্রত, রাজু ও একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের চেহারা যেমন প্রশান্ত, তেমনি ধীর ও গম্ভীর; দার্শনিকের মত এক-মাথা এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, চোখে একজোড়া সোনার ফ্রেমের চশমা। পরনে একটা ঢোলা জাপানী সিল্কের পায়জামা। গায়ে স্ট্রাইপ-দেওয়া কিমনো। সেলুন ডেকের উপর পাতা একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে ভদ্রলোক এতক্ষণ গভীর মনেযোগ দিয়ে একটা কি মোটা ইংরাজী বই পড়ছিলেন। ডেকের উপর সমবেত বহু লোকজনের নানাজাতীয় কণ্ঠস্বরে একটিবারের জন্যও তাঁর মনোযোগ নষ্ট হয়নি।

সাঁঝের আঁধার গাঢ় হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক হাতের বইখানি মুড়ে সামনের অস্পষ্ট আলো-ছায়া-ঘেরা সাগরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

কিরীটী আপনমনে গুন-গুন করে গাইছিল।

বনের ছায়ায়, জল ছল ছল সুরে
হৃদয় আমার, কানায় কানায় পুরে
ক্ষণে ক্ষণে ঐ গুরু-গুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে
আমার দিন ফুরাল।

সহসা কিরীটী চমকে উঠল। ঠিক পাশ থেকে কে যেন বললে, চমৎকার গলাটি তো আপনার! যেমন মিষ্টি তেমন দরদভরা! আহা, থামলেন কেন? শেষ করুন না গানটা!

কিরীটী মুখ ফিরিয়ে দেখে—কথা বলছেন সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি, যিনি এতক্ষণ নিবিষ্টমনে বই পড়ছিলেন।

আপত্তি যদি না থাকে, তাহলে শেষ করুন গানটা, ভদ্রলোক পুনরাবৃত্তি করলেন।

কিরীটী মৃদু হাসলে, তারপর ধীরে ধীরে আবার শুরু করে ঃ

কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে
মনের আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।

সত্যি কিরীটীর গলাটি ভারি মিষ্টি।

কিরীটী তিন-চার বার সমগ্র গানটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে থামল।

ভদ্রলোক বললেন, সত্যি বড় ভাল লাগল আপনার গান। বসেছিলাম ওখানটায়, হঠাৎ গানের সুর কানে যেতেই উঠে এসেছি।

কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক যেন কেমন একটু আনমনা হয়ে যান। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলে চললেন, সংসারের কোলাহল, জীবনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রতিহিংসা, কর্তব্য-অকর্তব্য—সব যেন মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় এই গানের সুর। গানের সুরে আমি ভুলে যাই আমার নিজেকে।...কেউ বোঝে না—কেউ জানে না, কত দুঃখ আমার সমস্ত বুকখানায় জমাট বেঁধে আছে।

আমি কাঁদতে চাই; কিন্তু কই, কাঁদতে পারি না!...শেষের কথাগুলো যেন অনেকটা স্বগতোক্তির মতই শোনায় এবং শেষদিকে ভদ্রলোকের গলার আওয়াজও ক্রমে যেন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে জড়িয়ে যায়।

সহসা ভদ্রলোক আরও কি বলতে বলতে যেন চমকে উঠে থেমে গিয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর একটুকরো মৃদু হাসিতে মুখখানি ভরিয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না যেন, আমার কেমন একটা স্বভাব যে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এমনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি।...আপনারাও বুঝি বর্মাতেই চলেছেন?

হ্যাঁ। সুব্রত ও কিরীটী একসঙ্গেই জবাব দিল।

বেড়াতে? না অন্য কোন কাজে? ভদ্রলোক ফিরে প্রশ্ন করলেন।

না, ঠিক বিশেষ কোন কাজেও নয়—আবার কাজেও বটে। আমাদের এক ছেলেবেলার বন্ধু ওখানে থাকে। অনেকদিন থেকে সে আমাদের তার ওখানে যাওয়ার জন্য লিখছিল, কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। সময়ের অভাব। এখন পরীক্ষা হয়ে গেছে, সামনে লম্বা ছুটি। ভাবলাম বিদেশ বেড়াবার এই তো সুযোগ। তাই রওনা হয়ে পড়া গেল।

বেশ বেশ। পাশ্চাত্ত্য দেশের ছেলেমেয়েরা ছুটির সময় কখনও আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মত দিন-দুপুরে পড়ে পড়ে শুয়ে ঘুমিয়ে অথবা আড্ডা দিয়ে দিনগুলো কাটায় না—দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়।...মন ওদের বহুমুখী। দিবারাত্র অজানা ও অচেনার হাতছানি ওদের দেহ ও মনকে আকুল করে। নিত্য নূতনকে জানবার জন্য ওদের দেহ ও মনের ইচ্ছার অন্ত নেই। ঘরের চাইতে ওরা পথকেই ভালবাসে, তাই তো ওরা ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে দিকে দিকে ছোটে। কখনও আকাশ-পোতে চেপে সুদূরের পথে পাড়ি জমায়, কখনও বা সাঁতার কেটে দুরন্ত সাগর পার হয়, কিংবা সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উদ্দেশ্যে অভিযান চালায়। ওরা এমনি দুরন্ত, এমনি দুর্বার, এমনি সদা-চঞ্চল। জীবন আর মরণ তো ওদের কাছে ছেলেখেলা। আর আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা, দেখুন সযতনে জীবনশক্তিকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে জীবনকে ক্ষয় করে ফেলে। ছোটবেলার কথা আমার এখনও বেশ মনে পড়ে। স্কুলের ছুটি হলেই বাবা আমাকে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। খুব ছোট বয়সেই মাকে হারাই, সংসারে আমরা দুটি ভাই-বোন, বাবাকেই শুধু জানতাম ও চিনতাম। বলতে বলতে ভদ্রলোক আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

আপনি রেঙ্গুনে চলেছেন বুঝি? সহসা কিরীটী প্রশ্ন করে।

রেঙ্গুনেই আমি প্র্যাকটিস করি। আমার নাম সৌরেন্দ্র সান্যাল। সকলে আমায় 'ডাক্তার সান্যাল' বলেই ডাকেন। জন্ম হতেই আমি রেঙ্গুনে, বাবার মস্ত বড় ব্যবসা ছিল রেঙ্গুনে।

বাড়িতে আপনার আর কে কে আছেন?

কেউ না। আমি নিজে ও আমাদের এক পুরানো চাকর ভোলা। একটি মাত্র বোন ছিল, আমার চাইতে বয়সে প্রায় দশ বৎসরের বড়, তা তিনিও অনেক দিন হল আমার মায়া কাটিয়ে গেছেন। আর কোন বন্ধনেরই বালাই নেই—একা। ছোটবেলায় মা মরে যাবার পর দিদিই আমায় বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছিলেন মায়ের মত করে।

আচ্ছা, রেঙ্গুন শহরটা আপনার কেমন লাগে ডাক্তার সান্যাল? প্রশ্ন করলে কিরীটী।

জন্ম হতেই ওখানে আছি। দীর্ঘদিনের পরিচয় ঐ শহরের প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে, কেমন যেন একটা মায়ার বাঁধন গড়ে উঠেছে।

বাংলাদেশে কি কোনও দিন আর ফিরবেন না?

ফিরব নিশ্চয়ই, অন্তত মনে মনে সেই আশাই তো রাখি। চির-শস্যশ্যামল, দোয়েল-শ্যামার কলকাকলী-মুখরিত আমার বাংলাদেশ। ওরই শীতল মাটির বুকে যেন আমার শেষ শয্যা রচনা করতে পারি—এটাই আমার জীবনের শেষ সাধ। কিন্তু মৃত্যু তো কারও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। যদি বর্মার মাটির কোলেই আমার জীবনের শেষের দিনটি ঘনিয়ে আসে, তবে কি আর করব বলুন!...কিন্তু দেখছেন, নিজের কথাতেই মশগুল হয়ে আছি। আপনাদের পরিচয়টি পর্যন্ত নেবার কথা মনে নেই।

কিরীটী মৃদু হেসে বলল, আমার নাম ধূর্জটি রায়, এর নাম সত্যব্রত সেন, আর ওর নাম জীবেন্দ্রপ্রসাদ রায়। আমরা সকলেই স্টুডেন্ট।

ইচ্ছা করেই কিরীটী নিজেদের নাম ও পরিচয়ের মধ্যে খানিকটা গোপনতার আশ্রয় নিল।

বেশ বেশ, আপনারা যখন বন্ধুর ডাকে চলেছেন, তখন ওখানে গিয়ে সেই বন্ধুর বাড়িতেই তো উঠবেন! যাবেন আমার ওখানে, ভুলবেন না তো? কমিশনার রোডেই আমার বাড়ি, তাছাড়া যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে-ই ডাক্তার সান্যালের বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ডাক্তার থামলেন।

নিশ্চয়ই যাবো, বিশেষ করে যখন পরিচয় হয়ে গেল। কিরীটী জবাব দেয়।

রাত্রি বোধ করি আটটা হবে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। বিশ্বচরাচরে কালো আঁধার ছড়িয়ে পড়েছে।

জাহাজের সার্চ-লাইট সমুদ্রের কালো জলে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। মাঝে মাঝে সেই আলো সমুদ্র-বক্ষে চারিদিকে ঘোরানো হচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই কিরীটী লক্ষ্য করছিল, ডাক্তার সান্যাল কেমন যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

সুব্রত প্রশ্ন করলে, আপনার শরীরটা কি অসুস্থ ডাঃ সান্যাল?

ডাক্তার জবাব দিলেন, হ্যাঁ, না মানে, বছরখানেক থেকে রাত্রির দিকে শরীরের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করি। মানে...আমার মনে হয়, যেন কারা আমার চারপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আপনমনে কত কি বলে—আবার সময় সময় আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। তাদের গরম শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার সমস্ত শরীর জ্বলতে থাকে। কত চেষ্টা করি তাদের ভুলতে, কিন্তু পারি না।... উঃ আমি যাই। আমি যাই! বলতে বলতে ডাক্তার সান্যাল অনেকটা মাতালের মতই একরকম টলতে টলতে যেন ডেক থেকে কেবিনের দিকে চলে গেলেন দ্রুত চঞ্চল পদবিক্ষেপে।

সুব্রতরা আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

॥ ১৩ ॥
সলিল সমাধি

গভীর রাত্রি।

সুব্রত আর রাজু অঘোরে ঘুমিয়ে।

অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ঘুম এল না বলে কিরীটী শয্যা হতে উঠে বসল। স্লিপিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে কেবিনের দরজাটা খুলে সে বেরিয়ে এল এবং আস্তে আস্তে সেলুন ডেকের দিকে চলল।

ডেকের কাছাকাছি আসতেই হাওয়াইন গিটারের একটা মধুর বাজনার শব্দ কানে এল।

কিরীটী ক্ষণেকের জন্য থমকে দাঁড়াল।

ডেকের ওপর যে আলোটা রয়েছে সেটা খুব শক্তিশালী নয়। সেই ম্রিয়মাণ আলোয় ডেকের ওপর এক অপূর্ব আলো-ছায়ার সমন্বয় হয়েছে।

সেই আলো-ছায়া-ঘেরা ডেকের ওধার থেকেই বাজনার অপূর্ব আওয়াজটা ভেসে আসে।

কিরীটী পায়ে পায়ে ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল।

নিশীথের নিঝুম আঁধার সাগর-বক্ষ থেকে অপূর্ব এক গুমগুম শব্দ ভেসে আসে।

মাথার ওপরে তারায় ভরা আকাশের ছায়া সমুদ্রের বুকে ঢেউয়ের মাথায় কেঁপে কেঁপে ওঠে যেন।

বিচিত্র! অপূর্ব!

চারিদিক ঘুমের ছোঁয়ায় সব বুঝি নিঝুম হয়ে গেছে। সেই অতল মৌনতার মাঝে গিটারের মধুর বাজনা স্বপ্নলোক থেকে যেন ভেসে আসছে বলেই মনে হয়। এ বুঝি কোন ব্যথিতের বুকভরা কান্না নিশীথ রাতের মৌনতার বুকে হাহাকার জাগিয়ে তুলছে।

রেলিংয়ের কোল ঘেঁষে চেয়ারখানা রয়েছে, কে যেন তার ওপর বসে আপনমনে গিটার বাজাচ্ছে।

কিরীটী পায়ে পায়ে চেয়ারের ঠিক পিছনটিতে এগিয়ে এসে দেখে—এ কি, এ যে ডাক্তার সান্যাল!

কিরীটী সবিস্ময়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শুনতে লাগল বাজনা।

অনেকক্ষণ বাজিয়ে বাজিয়ে ডাক্তার একসময় বাজনাটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখলেন।

আর একটু পরে কিরীটী আস্তে আস্তে ডাকলে, ডাক্তার সান্যাল!

কে? বলে ডাক্তার ফিরে তাকালেন।

ধূর্জটিবাবু!...ঘুমোননি?

না। বলে কিরীটী একটু মৃদু হাসলে, তারপর বললে, আপনিও তো দেখছি ঘুমোননি!

না। অন্ধকার আমার বড় ভাল লাগে। অন্ধকার রাতে একা একা চুপটি করে বসে থাকলে মনটা যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। যেন নিজেকে খুঁজে পাই।

আপনার বাজনার হাত বড় চমৎকার! কতক্ষণ থেকে যে আপনার বাজনা শুনছি!

ডাক্তার কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, কিছু বললেন না।

ডাক্তারের কেবিনটা একেবারে জাহাজের ঐ ধারে। একসময় ডাক্তার বিদায় নিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেলেন।

কিরীটী কিন্তু তার পরেও অনেকক্ষণ ডেকের ওপর ঘুরে ঘুরে বেড়াল। রাতের অন্ধকারে সমুদ্রের বুকে ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে। ঢেউয়ের বুকে সাদা সাদা ফেনা ফসফরাসের আলোয় যেন শুভ্র রজনীগন্ধার স্তবকের মতই মনে হয়। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে কিরীটী দেখল রাত্রি তখন দেড়টা। আর বেশীক্ষণ জাগলে শরীর খারাপ হবে ভেবে কিরীটী কেবিনের দিকে পা বাড়াল।

কেবিনের দরজার কাছাকাছি আসতেই একটা অস্পষ্ট শিস শোনা গেল।

কিরীটী থমকে দাঁড়াল।

আবার একটা শিস শোনা গেল। এবারের শিসটা আগের চাইতেও অনেক স্পষ্ট।

আবার একটা শিস।

পর পর তিনটে শিস শোনা গেল। কিরীটীর আর কেবিনে ঢোকা হল না ; আন্দাজে ভর করে শিসের আওয়াজটা যেদিক হতে আসছে, প্রথমে সেইদিকেই সে এগিয়ে গেল। তারপর আবার যেন কি ভেবে ফিরে গিয়ে কেবিনে প্রবেশ করে সুটকেস থেকে টর্চটা নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

দোতলার ডেকের সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কতকগুলো প্যাকিং করা কাঠের বাক্স স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে। তারই ওধার থেকে কাদের যেন তর্কবিতর্কের চাপা স্বর শোনা গেল।

কিরীটী বিস্ময় ও কৌতূহলে প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর আড়ালে এগোতে এগোতে কথাগুলো শুনতে পেল—

এখনও বল, সেই নোট-বইটা কি করেছিস? বক্তার কণ্ঠে কঠিন আদেশের সুর।

জানি না—আমি জানি না! কার যেন কাতরোক্তি শোনা গেল।

হ্যাঁ, জানিস। আমার কালো ঢোলা জামাটার পকেটে ছিল। সেদিন রাতে সু-ফ্যাক্টরীর মধ্যে জামাটা একটা লোহার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে ঘুমিয়েছিলাম, সে কথা তো তুই ছাড়া আর কেউই জানত না।...ভোরবেলা উঠে পকেটে আর নোটবইটা পাইনি। পরের দিন নানা গোলমালে ছিলাম, সেজন্য ওদিকে নজর দিতে পারিনি। তুই ভেবেছিলি খুব আমার চোখে ধুলো দিলি, না?

অন্য পক্ষ বোধ হয় চুপ করে রইল, কোন জবাব শোনা গেল না।

গদর্ভ! তুই আমার চোখে ধুলো দিবি? সেই লোকটা যেন কাউকে আদেশ দিল—এই, বুকে হুল ফোটা!

পরমুহূর্তেই একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণা-কাতব শব্দ নিশীথের অন্ধকারে জেগে উঠল। উঃ, লোকটা কি পিশাচ!

উঃ থাম থাম, ফোটাসনি, বলছি, বলছি।

বল্।

লোকটা বোধ হয় গভীর যন্ত্রণায় হাঁপাতে থাকে।

* * *

কিরীটী বাক্সগুলোর গায়ে গায়ে পা দিয়ে উঠতে লাগল। ওপাশের একটা আলোর খানিকটা রশ্মি তির্যক ভাবে এদিকে এসে পড়েছ। সেই মৃদু আলোয় কিরীটী দেখলে—সেখানে তিনজন লোক।

একজনের হাত-পা বেঁধে একপাশে ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছে। আর দুজন একপাশে দাঁড়িয়ে।

হাত-পা-বাঁধা লোকটা বললে, আমার কাছে নোট-বইটা আছে বটে, কিন্তু তার ভিতরে যে একটা ছক আঁকা কাগজ ছিল, সেটা নেই।

কি করেছিস সে কাগজটা?

লোকটা তখন ভয়ে ভয়ে—সেদিন কেমন করে তার হাত থেকে ১৮নং বাড়িতে সেই সাংকেতিক কাগজটা চুরি হয়ে গিয়েছিল সে-সব কথা একে একে খুলে বললে।

কেন তুই আমার নোট-বুক চুরি করেছিলি?

তুমি কে—আজ ছয় বছর তোমার পাশে পাশে আছি, তোমার সমস্ত আদেশ নীরবে বিনা বিচারে সর্বদা মাথা পেতে নিয়েছি, পালন করছি। তোমারই আদেশে কতদিন নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি। কিন্তু যার জন্য দিবা-রাত্র এমনি করে জীবন-মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছি, সে যে কে—আজ পর্যন্ত হাজার চেষ্টাতেও তা জানতে পারিনি। তোমার ধনসম্পত্তির ওপরে আমার এতটুকু লোভ নেই, কেননা তুমি তো না চাইতেই যথেষ্ট দাও। আমি জানতে চাই—তুমি কে?—তুমি কে?...লোকটা বলতে বলতে গভীর উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল।

যে দুজন দাঁড়িয়েছিল, তাদের একজন চাপা গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল. তারপর সহসা গম্ভীর হয়ে বললে, আমি কে? অ্যাঁ, আমি কে?...তোর দুরাকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত তোর মৃত্যুর কারণ হল। সেই সাংকেতিক ছক-আঁকা কাগজটা কে নিয়েছে তাও আমি জানি, সেটা আমি উদ্ধার করবই। হতভাগ্য কিরীটী রায় আজও বুঝতে পারেনি যে, হিংস্র কেউটে সাপ নিয়ে সে খেলতে শুরু করেছে। তোর আগেও দলের আর দুজন আমায় জানবার চেষ্টা করেছিল, শেষ পর্যন্ত তাদের সে ইচ্ছা বুকে নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়েছে।

তারপর সহসা সে পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে ফিরে কঠিন নির্মম আদেশের সুরে বললে, ফেলে দে হতভাগাকে এখনই সমুদ্রের জলে! জলের অন্ধকারে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যখন ও তিল তিল করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবে, হতভাগা তখন জানতে পারবে, কে আমি? কি আমার পরিচয়?

না, না, আমায় এমনি করে জলের মধ্যে ডুবিয়ে মেরো না। এবারকার মত আমায় ক্ষমা কর। প্রতিজ্ঞা করছি, এ জীবনে আর তোমার পরিচয় জানবার চেষ্টা করব না।

আবার সেই নিষ্ঠুর হাসি।

হিংস্র হাঙরে যখন তোর দেহ ধারালো দাঁতে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে, তখন জানবি আমি কে!

ক্ষমা কর আমায়। ক্ষমা কর।

ফেলে দে! দে!

পাশে দণ্ডায়মান লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে নীচু হয়ে লোকটাকে অবলীলাক্রমে তুলে

উঁচু করে তখনই রেলিং টপকে নীচের গর্জমান অতল পারাপারহীন সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করল।

একটা বুক-ভাঙা আকুল চিৎকার নিশীথ রাত্রির গভীর স্তব্ধতাকে মুহূর্তের জন্য আলোড়িত করে তোলে। ঝপাং করে একটা শব্দ শোনা যায় মাত্র।

সমগ্র ব্যাপারটা এত চকিতে ও এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে, কিরীটী বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত তার মুখ ফুটে বের হল না। স্থাণুর মতই কিরীটী প্যাকিং বাক্সটার উপর দাঁড়িয়ে রইল।

পা দুটো যেন পাথরের মত ভারী ও অনড় হয়ে গেছে।

কেউ জানলে না, কেউ শুনলে না, রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে একজনের জীবন্ত সলিল সমাধি হয়ে গেল। সাগরের কালো জলের তলে চিরনিদ্রায় সে অভিভূত হল। কিরীটীর যেন দম আটকে আসে।...

হতভাগা ভেবেছিল আমার চোখে ধুলো দেবে! কিন্তু কি করব, এছাড়া উপায় ছিল না। বলতে বলতে লোকটার কণ্ঠস্বর কেমন যেন জড়িয়ে আসে। তারপর যেন কতকটা জোর করেই আপনাকে সামলে নিয়ে দ্বিতীয় লোকটির দিকে ফিরে বললে, ওই লোকটাকে বরাবর 'মৃত্যুগুহা'য় নিয়ে যাবে। জাহাজে আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। বলেই লোকটা ফিরে দাঁড়াল।

ফিরে দাঁড়াতেই সামনের একটা আলোর খানিকটা বাঁকা হয়ে তার মুখের ওপর পড়ল।

কিরীটী বিস্ময়ে আতঙ্কে চমকে উঠল। অন্ধকারে চলতে চলতে সামনে বিকটাকার ভূত দেখলেও বুঝি মানুষ এতটা চমকে ওঠে না।

॥ ১৪ ॥
নিশাচর ভূত

চিনতে কষ্ট হয় না কিরীটীর ঐ মুহূর্তের দেখাতেই। লোকটা আর কেউ নয় সেই চীনা আড্ডায় দেখা ভীষণ-দর্শন লোকটিই এই পৈশাচিক অনুষ্ঠানের হোতা।

কিরীটী ভাবলে, তবে আমার হিসাবে ভুল হয়নি! দলের নেতা ইনিই? স্বনামধন্য দস্যুরাজ 'কালো ভ্রমর'। হ্যাঁ, লোকটার শক্তি আছে বটে। তাহলে দস্যুরাজ আমাদেরই সহযাত্রী!

প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর আড়ালে কিরীটী স্তম্ভিত ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি, যখন খেয়াল হল তখন সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এল।

রাতও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

চোখ দুটো জ্বালা করছে। বেশ ঘুমও পেয়েছে।

কিরীটী ধীরে ধীরে এসে কেবিনে প্রবেশ করল এবং দরজাটা বন্ধ করে শয্যার ওপর এসে গা এলিয়ে দিল। সাগরের দোলায় দোলায় অল্পক্ষণের মধ্যেই কিরীটী ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

পরের দিন যখন কিরীটীর ঘুম ভাঙল, বেলা তখন প্রায় সাড়ে আটটা হবে, প্রভাতী চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সুব্রত ও রাজু তখন কেবিনে ছিল না—সম্ভবত ডেকে বেড়াতে গেছে।

একটু পরে জংলী কেবিনে ঢুকে বলল, চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আমি একবারে স্নানটা সেরে আসি। বলে কিরীটী তোয়ালে ও একটা ঢোলা পায়জামা নিয়ে স্নানঘরের দিকে পা বাড়াল।

স্নান সমাপ্ত করে আসতে আসতেই ব্রেকফাস্টের ঘণ্টা শোনা গেল। ব্রেকফাস্ট সেরে আবার ওরা সকলে যখন ডেকের ওপরে এল, তখন একে একে অনেক যাত্রীই ডেকের ওপর এসে জড় হতে শুরু করেছে।

একটি বছর সাতেকের মেয়ে ডেকের ওপর স্কিপিং করছিল।

ডাঃ সান্যালও ডেকেই ছিলেন। সুব্রত ও রাজু ডাঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কিরীটী যখন ওদের দলে এসে মিশল, ডাঃ সান্যাল, সুব্রত ও রাজু তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। কিরীটী ওদের এক পাশে এসে দাঁড়াল।

সুপ্রভাত মিঃ রায়! সুপ্রভাত!—ডাক্তার সান্যাল বললেন।

সুপ্রভাত! কিরীটী জবাব দিল।

একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন, কাল বুঝি বাকী রাতটুকু আপনার না ঘুমিয়েই কেটে গেছে মিঃ রায়?

কিরীটী আনমনাভাবে জবাব দিল, না, বেশ ঘুম হয়েছিল তো!

আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হল না।

সবাই একমনে সমুদ্রের জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

চারিদিকে কেবল জল। জল আর জল। নীল জলরাশি গভীর উচ্ছ্বাসে ঢেউয়ের তালে তালে নেচে নেচে ফিরছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন অস্ফুট স্বরে কি সব বলাবলি করছে।

সুনীল আকাশ রূপালী রোদের আভায় ঝিলমিল করছে।

* * *

সন্ধ্যায় ডাঃ সান্যালের কেবিনে সুব্রত, রাজু ও কিরীটী চা-পান করতে করতে ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছিল। কেবিনের মধ্যে স্টোভে চা তৈরি হয়েছে।

ডাক্তার বলছিলেন, বিশ্বাস জিনিসটা মানুষের মনের সহজ প্রবৃত্তি। যুক্তি দিয়ে তাকে খাড়া করা যায় ন। এই দেখুন না, আমি সকলকেই বিশ্বাস করি, আবার কাউকেই বিশ্বাস করি না। এক-একসময়ে আমাদের এক-একটা ব্যাপারে বিশ্বাস না করা ছাড়া আর উপায়ই থাকে না। মন না মানলেও আমরা তাকে মেনে নিতে বাধ্য হই। তেমনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দু রকমের প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে। অতি বড় শয়তান যে, তার বুকেও ভাল প্রবৃত্তি আছে। আবার সত্য-সত্যই যে অতি নিরীহ ও একান্ত ধীর-স্থির, তারও বুকে হয়তো শয়তানপ্রবৃত্তি ঘুমিয়ে থাকে। গাছের গোড়ায় জল ঢালতে ঢালতে যেমন সেটা ক্রমশ বড় হতে হতে শেষটায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের মনের ভিতরেও যে প্রবৃত্তিটা নিয়ে আমরা বেশী নাড়াচাড়া করি—যেটাকে আমরা বেশী প্রশ্রয় দিই, সেইটাই শেষ পর্যন্ত আমাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য

হয়ে দাঁড়ায়। যে চোর, যে ডাকাত, তার অন্তরেও হয়তো একটা নিরীহ প্রবৃত্তি ঘুমিয়ে আছে।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু দুষ্কর্ম করতে করতে দুর্জনের এমন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় যে, কিছুতেই সে আর ভাল পথে চলতে চায় না। পেঁচা যেমন আলো পরিহার করে চলে, দুর্জনেরাও তেমনি ভাল যা কিছু তা এড়িয়ে চলে।

আগের দিন সন্ধ্যার মত সেদিনও ডাঃ সান্যাল ক্রমশ যেন কেমন একটু চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। সেটা লক্ষ্য করে সুব্রত শুধাল, আপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে ডাঃ সান্যাল?

ডাক্তার কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত যেন জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, সন্ধ্যার দিকে 'মরফিয়া' ইনজেক্শন নেওয়া আমার একটা বদ অভ্যাস, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তবে...বলে ডাক্তার উঠে গিয়ে সুটকেস থেকে সিরিঞ্জ বের করে ইনজেক্শন নেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সিরিঞ্জের মধ্যে ঔষধ ভরে ডান হাতটা বৈদ্যুতিক আলোর কাছে তুলে ধরে তিনি ঔষধটা শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

সিরিঞ্জটা যথাস্থানে রেখে ডাক্তার যেন অনেকটা হৃষ্টচিত্তেই নিজের আসনে এসে উপবেশন করলেন।

ডাক্তারের সেই অস্থির-অস্থির ভাবটা ক্রমশ ঠিক হয়ে পূর্বের প্রফুল্লতা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল।

এই দেখুন! বলতে বলতে ডাক্তার বাঁ হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে সেটা আলোর নীচে সকলের চোখের সামনে প্রসারিত করে ধরলেন—হাতে অসংখ্য কালো কালো দাগ। একটু পরে তিনি আবার বলতে লাগলেন, দেখুন মরফিয়া নিয়ে নিয়ে হাতটা একেবারে ভরে গেছে। কিন্তু কি করব বলুন, শরীরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আর সেই যন্ত্রণায় আমার সমগ্র শরীরটা যেন বিষের মত জ্বলতে থাকে। তাই মরফিয়া নিতে হয়।

সুব্রত প্রশ্ন করল, আচ্ছা, এতে কি শরীরের কোন ক্ষতি হয় না ডাঃ সান্যাল।

ডাক্তার হেসে বললেন, ক্ষতি হয় বৈকি। আমাদের মস্তিষ্কে যন্ত্রণাবোধের যে স্নায়ুকেন্দ্র আছে, সেখানকার স্নায়ুকোষে 'যন্ত্রণা-বোধ-বাহী স্নায়ু' যন্ত্রণাবোধকে বহন করে নিয়ে যায় এবং তাতেই আমরা দেহের কোন-না-কোন স্থানে যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝতে পারি। এ মরফিয়া সেই যন্ত্রণা-বোধ-বাহী স্নায়ুকে অবশ করে দেয়। তার ফলে যন্ত্রণা-বোধ-স্নায়ু দিয়ে যন্ত্রণাটা প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কে আর উপস্থিত হতে পারে না বলেই যন্ত্রণার উপশম হয়।

কিন্তু এইভাবে মরফিয়া নেওয়াটা কি একটা নেশা নয়?

ডাক্তার একটু হাসলেন, তারপর বললেন, নিশ্চয়ই নেশা বৈকি! নেশা...বদ অভ্যাস! বুঝতে কি আমি পারি না, পারি, বুঝতে পারি সব, কেননা আমি একজন ডাক্তার। তবু নিজেকে সংযত করতে পারি না। কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন আমার সমস্ত দেহ-মনকে অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সিরিঞ্জ ও মরফিয়ার দিকে ঠেলতে থাকে। আমি পারি না, কিছুতেই নিজেকে রোধ করে রাখতে পারি না।

ডাক্তারের মুখে একটা করুণ অসহায় ভাব ফুটে ওঠে।

রাত্রি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর দেহ ও মন কি জানি কেন সেই প্যাকিং-করা বাক্সগুলোর দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আকর্ষণটা কিছুতেই রোধ করতে পারে না কিরীটী, তাই গায়ে একটা ধূসর বর্ণের নিদ্রাবস্ত্র চাপিয়ে মাথায় একটা নাইট-ক্যাপ এটে সেটাকে টেনে একেবারে কপালের নীচ পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে কিরীটী কেবিন থেকে বেরিয়ে পড়ল। রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত্রি তখন দেড়টা।

অতি সন্তর্পণে নীচে দোতলায় ডেকের দিকে চলল কিরীটী।

প্যাকিং-করা বাক্সগুলো যেখানে একটার ওপর একটা সাজানো আছে, তার আড়ালে এসে কিরীটী থমকে দাঁড়াল। আর ঠিক ঐ সময় কতকগুলো ফিস ফিস আওয়াজ তার কানে এল। মনে হল, দুজন লোক যেন নিম্নকণ্ঠে কথাবার্তা বলছে।

কেউ কিছু টের পেয়েছে?

না।

ঠিক জান?

হ্যাঁ।

এই ঔষধটা আজও আবার শেষরাত্রে লোকটার শরীরে ইনজেকশন করে দেবে। আর যেমন বলে রেখেছি ঠিক তেমনি ব্যবস্থা করবে। কোন গণ্ডগোল হবে না, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে বাধা দেবে না।

এর পরে আর কোন কথা শোনা গেল না। লোক দুটো তখন চলে গেছে বোধ হয়।

মাঝে মাঝে শুধু সাগরের একটনা গর্জন আঁধারের বুকে ভেসে আসে।

তারপর সহসা একসময় একটা স্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ শুনে কিরীটী চমকে উঠল। ঐ পাশে সিঁড়ির নীচটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে বলে মনে হয়। কিরীটী দ্রুতপদে এগিয়ে গেল।

সিঁড়ির নীচে সে জায়গাটায় তত আলো নেই। সিঁড়ির গায়ে যে বৈদ্যুতিক আলোটা জ্বলছে, তার ক্ষমতাও খুব বেশী নয়। সেই অস্পষ্ট আলোতে দেখা গেল সিঁড়ির নীচে একটা লোক পড়ে গোঁ গোঁ করছে।

কিরীটী লোকটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখল, লোকটা কোন কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ির ধারে যে কলিং-বেল ছিল সেটা টিপে দিল।

দেখতে দেখতে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে আরম্ভ করে খালাসীরা পর্যন্ত অনেকেই এসে হাজির হল। সকলের মুখেই শঙ্কিত ভাব।

একজন খালাসী ক্যাপ্টেনের আদেশে লোকটির চোখে-মুখে জল দিতে শুরু করলে। জাহাজের ডাক্তার খবর পেয়ে ছুটে এলেন এবং নাড়ি দেখে বললেন, ও কিছু নয়, কোন কারণে হয়তো লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

লোকটি অল্পক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসল। চোখে-মুখে তার তখনও একটা ভয়ার্ত ভাব। চারিদিকে চকিত দৃষ্টিতে দেখে লোকটা অস্ফুট স্বরে কেবল বললে, ভূত! ভূত!

জাহাজের মেট শুধায়, ভূত! কি বলছিস রে?

হ্যাঁ কর্তা, ভূত। আমি দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। এই দেখুন আমায় গলা টিপে ধরেছিল। উঃ, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! বলে লোকটি আবার হাঁপাতে লাগল।

লোকটার কথা শুনেই সকলে যেন একটু ভয় পেয়ে গেছে। বুড়োগোছের একজন খালাসী এগিয়ে এসে বললে, আমিও কাল রাত্রে এমনি সময় ওই বাক্সগুলোর পিছনে কি একটা দেখেছিলাম। উঃ, কী ভীষণ মুখ তার! এই পর্যন্ত বলেই বুড়ো ভয়ে চোখ বুজল।

সমবেত সমস্ত লোকের মনেই কেমন একটা অস্পষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেই একটা শঙ্কিত চাউনি নিয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের মুখটাও গম্ভীর হয়ে গেল।

রাত্রি আর বেশী নেই। একটি দুটি করে আকাশের তারাগুলো নিভতে শুরু করেছে।

॥ ১৫ ॥
আবার মগের মুলুকে

রেঙ্গুন শহর।

জাহাজ তখনও জেটিতে লাগেনি।

সুব্রত, কিরীটী, রাজু ও ডাঃ সান্যাল জাহাজের রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়ে জেটির দিকে তাকিয়ে আছে।...

লোকজন, কুলী, কর্মচারী প্রভৃতির সমাগমে স্থানটি একেবারে সরগরম।

প্রভাতী সূর্যের সোনালি আলো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজে বসে রেঙ্গুন নদীর পাড়ে ভাসমান অবস্থায় শহরটিকে যেন একটি ছবির মতই দেখায়।

ডাক্তার বলছিলেন, কাল দুপুরে আমার ওখানে আপনাদের মাধ্যাহ্নিক নিমন্ত্রণ রইল। এই নিন আমার কার্ড। বলতে বলতে ডাক্তার কোটের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে সুব্রতর হাতে দিলে। তাতে লেখা ছিল—

ডাঃ এস্ সান্যাল
এম. বি., এম. আর. সি পি., (লন্ডন)
৩০, কমিশনার রোড, রেঙ্গুন।

সুব্রত কার্ডটা পকেঠে রেখে দিল।

জাহাজ ততক্ষণে জেটিতে লেগেছে। ক্রমে যাত্রী একে একে নামতে শুরু করে।

কিরীটীর পরামর্শমতই ঠিক হয়েছিল সর্বশেষে ওরা নামবে। তাড়াতাড়ির কিছুই নেই।

সুব্রত আনমনে রেলিংয়ে ভর দিয়ে যাত্রীদের অবতরণ দেখছিল।

একটা স্ট্রেচারে করে বোধ হয় একজন রোগীকে নামানো হচ্ছিল। দুটো খালাসী স্ট্রেচারটা ধরে নামাচ্ছিল। স্ট্রেচারে শায়িত ব্যক্তির কপাল পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা।

সহসা একজন যাত্রীর হাত লেগে লোকটার মুখের কাপড় সরে যেতেই সুব্রত চমকে উঠল, সেদিকে হাত বাড়িয়ে কি বলতে যেতেই তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল যেন, কে? কে?

কিরীটীর চোখেও সে দৃশ্য এড়ায়নি। কিন্তু ততক্ষণে আর একটা লোক, যে স্ট্রেচারের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল, ক্ষিপ্রহাতে মুখের কাপড়টা আবার টেনে দিয়েছে স্ট্রেচারে শায়িত লোকটার।

সহসা সুব্রত অদৃশ্য নিজের হাতের ওপরে একটা চাপ অনুভব করে পাশের দিকে তাকাতেই কিরীটীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। কিরীটীর চোখে অদৃশ্য কিসের যেন সংকেত।

সুব্রত নিজেকে সামলে নেয় মুহূর্তে।

কিরীটীর মুখে কোন কিছু চিন্তার ছায়া পর্যন্তও যেন নেই, একান্ত নির্বিকার সে মুখ।

পাশেই দণ্ডয়মান ডাক্তারও সুব্রতর সেই অস্ফুট শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি হল মিঃ রায়?

কিরীটী ততক্ষণে নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। রাজু কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়নি, তাই সে হঠাৎ বলে ওঠে, সনৎদা!

সনৎদা? ডাক্তার প্রশ্ন করেন।

কিন্তু ততক্ষণে রাজুর সুব্রতর চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় নিজেকে সামলে নিয়ে একটু মৃদু হেসে বললে, না, কিছু না, আমাদের একজন চেনা লোককে যেন জেটিতে দেখলাম।

চেনা লোক! ডাক্তার বিস্মিতভাবে তাকান।

হ্যাঁ। মানে খবর পেয়েছিলাম, তিনি যেন এই—

তিনি যেন কি? ক্ষমা করুন, যদি বিশেষ কোন গোপনীয় কিছু থাকে তবে অবিশ্যি আমি শুনতে চাই না।

সুব্রত হেসে বললে, না, এমন বিশেষ গোপনীয় নয়, আচ্ছা বলবখন আপনাকে। চলুন এবারে নামা যাক।

জাহাজ-ঘাটের বাইরে কিরীটী একটা লাইট-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল।

সুব্রত এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, মিঃ রায়!

দেরি হয়ে গেছে। পেলাম না সুব্রতবাবু।

পেলেন না?

না, চলুন।

ডাক্তারের প্রকাণ্ড কালো রংয়ের সুদৃশ্য হাম্বার গাড়িটা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল।

ডাক্তার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে চেপে বসলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

একটা গাড়িতে সমস্ত মালপত্র চাপিয়ে ওরা চালককে মিঃ চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়ে গাড়িতে চেপে বসল।

চলমান গাড়ির মধ্যে বসে একসময় সুব্রত বলে, ডাক্তার সান্যাল চমৎকার লোক, কি বলেন মিঃ রায়?

কিরীটী চলন্ত গাড়ির খোলা জানালা দিয়ে রাস্তার দু পাশের নানাজাতীয় অগণিত লোকজনের দিকে খর-দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

সুব্রতর কথায় চমকে উঠে বললে, অ্যাঁ! কিছু বলছিলেন সুব্রতবাবু?

কি ভাবছেন মিঃ রায়?

না, কিছু না।

একসময় গাড়ি ডাঃ চৌধুরীর বাড়ির সামনে এসে থামল।

চৌধুরীর পুরনো চাকর দাশু দরজার গোড়াতে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল, কারণ তাকে আগেই তার করা হয়েছিল।

ওদের সকলকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ব্যাকুলকণ্ঠে দাশু প্রশ্ন করে, আমার দাদাবাবু আসেননি বাবু?

সুব্রত আমতা আমতা করে বললে, না দাশু, সনৎবাবু আসেননি তো এ জাহাজে. পরের জাহাজে আসছেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিরীটী একসময় বললে, আজকের দিনটা একেবারে পূর্ণ বিশ্রাম। পাদমেকং ন গচ্ছামি।

কথা শেষ করেই সে কলহাস্যে গান ধরল...

আজ আমাদের ছুটি রে ভাই,
আজ আমাদের ছুটি!

সুব্রত কিরীটীর হঠাৎ হাসিখুশির কারণ বুঝতে পারল না, তবু হাসতে হাসতে বললে, ছুটি নয়, বলুন এই তো সবে শুরু!

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, না। তার পরই আবার আগের মত গান গেয়ে চলল।

গান থামিয়ে কিরীটী আবার একসময় বললে. এখন একটা লম্বা ঘুম, তারপর জাগরণ। চা-পান ও জলখাবার ভক্ষণ, মোটরে চেপে রেঙ্গুন শহরটা ভ্রমণ, প্রত্যাগমন, স্নান-আহার, অতঃপর সারাটি রজনী ঘুম—এই হল আমার কর্মতালিকা অদ্য।

কিরীটী যেন দুই বছরের শিশু। আনন্দে আর কলহাস্যে সে যেন মশগুল হয়ে উঠেছে।

সুব্রত হাসতে হাসতে বলে, ব্যাপার কি বলুন তো মিঃ রায়?

ব্যাপার কিস্তিমাত!

বলেন কি? রাজু ও সুব্রত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কিরীটী ডান হাতের একটা আঙুল ওষ্ঠের উপর রেখে গম্ভীরভাবে মাথাটা দোলাতে দোলাতে বললে, চুপ করুন, চুপ করুন। সর্বদা মনে রাখবেন এটা কলকতা শহর নয়, এটা কালো ভ্রমরের নিজের এলাকা। কিন্তু দেখলেন তো, শেষ পর্যন্ত আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি! সনৎবাবুকে ওরা নিয়ে এল! যাক, তাঁর পক্ষে এ একপ্রকার ভালই হল. কি বলেন? বিনা খরচায় সাগরযাত্রাটা হয়ে গেল তাঁর।

কিন্তু তার উদ্ধারের কি করা যায়?

মাভৈ!...হবে হবে, সব হবে। জানেন তো, সবুরে মেওয়া ফলে!

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

॥ ১৬ ॥
কিরীটীর যুক্তি

সমস্ত দ্বিপ্রহর একটানা দিবানিদ্রা দিয়ে সকলেই যেন শরীরটা বেশ সুস্থ বোধ করে।

কয়েকদিন ধরে জাহাজে অবিশ্রাম ঢেউয়ের দোলায় দোলায়, মনে হয়, এখনও যেন দেহটা দুলছে।

বৈকালিক চা-পানের পর রাজু শহর দেখতে বের হয়েছিল, কিরীটী আর সুব্রত দোতলার ব্যালকনিতে পাশাপাশি দুখানা চেয়ার পেতে বসে গল্প করছিল।

সুব্রত বলছিল, যদিও আমি মুহূর্তের জন্য স্ট্রেচারে শায়িত সনৎদাকে দেখেছি, তবু...

কিরীটী বাধা দেয়, যদিও বলছেন কেন এখনও? আপনার মনে কি কোন সন্দেহ আছে সুব্রতবাবু? আপনি আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন, তাহলে জানবেন, সকাল বেলার সেই স্ট্রেচারে শায়িত ব্যক্তি আর কেউ নন, আমাদের সনৎবাবুই।

কিন্তু কেন যে আপনি ভাবছেন কালো ভ্রমর সনৎদাকে প্রাণে মারবে না, এটা আমি ঠিক যেন এখনও বুঝতে পারছি না।

প্রাণে যে মারবেই না বা প্রাণে মারা একেবারেই অসম্ভব, সে কথা তো আমি বলিনি সুব্রতবাবু। আপনারা আমার কথার ঠিক অর্থ ধরতে পারেননি। আমি বলতে চেয়েছি, বর্তমানে তারা সনৎবাবুর প্রাণহানি করবে না, করতে পারে না।

কেন?

আচ্ছা আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই সুব্রতবাবু।

বলুন।

আচ্ছা, আপনার অমরবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে কি ধারণা? আপনি কি মনে করেন সত্যিই কোন আততায়ীর হাতে অমরবাবুর মৃত্যু ঘটেছে?

না।

না কেন?

কারণ তাই যদি হবে, তা হলে অন্তত কালো ভ্রমর নিশ্চয়ই মৃতদেহের মুখটা ওভাবে বিকৃত করে রেখে যেত না।

তাহলে আপনি ধরেই নিচ্ছেন যে, এই হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গে কালো ভ্রমর সুনিশ্চিতভাবেই জড়িত আছে?

হ্যাঁ।

ঠিক তাই সুব্রতবাবু। এবং সেইজন্যই সনৎবাবুকে বর্তমানে কালো ভ্রমর প্রাণে মারতে পারে না। কালো ভ্রমরের বিদ্বেষ শুধু সনৎবাবুর ওপরেই নয়, আপনার ওপরে, অমরবাবুর ওপরেও। তবে সেই সঙ্গে আরও একটা কথা আমার মনে হচ্ছে, সনৎবাবুর ওপরে কালো ভ্রমরের রাগ বা বিদ্বেষ থাকাটা স্বাভাবিক এবং তার কারণও আমাদের চোখের সামনে আছে। কিন্তু আপনার ওপরে বা অমরবাবুর ওপরে তার সত্যিকারের

বিদ্বেষের কারণ যে কেবলমাত্র গতবারের লজ্জাকর পরাজয়ের ব্যাপারটাই, এটা মানতে যেন কিছুতেই মন আমার চায় না সুব্রতবাবু।

কেন? এ কথা বলছেন কেন কিরীটীবাবু?

তাই যদি বুঝতে পারতাম, তা হলে কালো ভ্রমরের এবারের অভিযানের অর্থটাও আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে যেত। এই ঘটনা ঘটবার কিছুদিন আগে থেকেই কালো ভ্রমর সম্পর্কে আমি যথাসাধ্য খোঁজ নিয়েছি। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করছি, কালো ভ্রমর আর যাই হোক, ছিঁচকে চোর-ডাকাত নয়। কারণ বিশেষ করে তাহলে ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিই তার যত কিছু বিদ্বেষ যত কিছু বিতৃষ্ণা থাকত না এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলো কুকীর্তি ছাড়া সাধারণ আরও পাঁচটা দুর্ধর্ষ ডাকাত বা চোরের মতই হাঙ্গামা, ডাকাতি ও খুনখারাপি করে করে বেড়াত।

কিরীটীর শেষের কথায় কান না দিয়েই সুব্রত বলে, কিন্তু একটা কথা এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না কিরীটীবাবু, এই এত বড় রেঙ্গুন শহরে কোন পথে আপনি সনৎদার সন্ধান করবেন?

সুব্রতর কথায় কিরীটী মৃদু হেসে বলে, তার জন্যও চিন্তা নেই সুব্রতবাবু। কালো ভ্রমরকে আমাদের গৃহেই আসতে হবে।

এ আপনি কি বলছেন?

ঠিকই বলছি, এমন একটি বহুমূল্য সম্পদ হতে সে বঞ্চিত হয়েছে এবং বর্তমানে যা সম্পূর্ণ আমার অধিকারে, তারই আকর্ষণে সে আসবে। হ্যাঁ, কালো ভ্রমর আসবে! আসতে তাকে হবেই!

কিরীটীর কথাগুলো সুব্রতর নিকট যেন কেমন রহস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। যেন পূর্ণ হেঁয়ালি।

আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারলাম না কিরীটীবাবু।

ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই সুব্রতবাবু। সময় এলেই সব বুঝতে পারবেন।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। কিরীটী যেন হঠাৎ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, ঐ রাজেনবাবু আসছেন, আর তাঁর সঙ্গে বোধ হয় সলিলবাবুও আসছেন—যদি আমার অনুমান মিথ্যা না হয়ে থাকে।

সত্যিই কিরীটীর কথা শেষ না হতে হতেই প্রথমে রাজু এবং তার পশ্চাতে সলিলবাবু এসে ব্যালকনিতে প্রবেশ করলেন।

আসুন মিঃ সেন! কিরীটী আহ্বান জানায়, আপনাকে ডাকতে রাজেনবাবুকে পাঠিয়েছিলাম বটে, তবে ভাবিনি এখনই আপনি আসবেন।

জানেন তো, বিদেশে স্বজাতি—সলিলবাবু হাসতে হাসতে চেয়ারে উপবেশন করলেন। তারপর প্রাথমিক পরিচয়-পর্ব শেষ করে সলিলবাবু বললেন, রাজেনবাবুর মুখেই সব শুনলাম মিঃ রায়।

এখন আপনি আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা মিঃ সেন। কিরীটী বলে, আচ্ছা অমরবাবুর মৃত্যু সম্পর্কে আপনার মতামত কি জানতে পারি কি?

নৃশংস হত্যা সন্দেহ নেই। এবং এ যে সেই [illegible]গের ঘটনারই জের তাও আমাদের ধারণা।

তারপর আবার একসময় কিরীটী কথায় কথায় সলিল সেনকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিঃ সেন, অমরবাবু যে কক্ষে শয়ন করতেন, সেখান থেকে চিৎকার করলে বা কোন গোলমাল হলে, নীচের ভৃত্যদের ঘরে কি শোনা যায়?

না। আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখেছি, শোনা যায় না।

ভৃত্য তাহলে কোন চিৎকার বা গোলমালই শুনতে পায়নি সে রাত্রে?

না।

আচ্ছা লোকটা এদেশীয় কি?

হ্যাঁ।

লোকটা এখন কোথায়, নিশ্চয়ই হাজতে? ভাল কথা, করোনারের ভারডিক্ট কি?

কেউ বা কারও দ্বারা অমরবাবু নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন।

আচ্ছা, আপনাদের ডি. আই. জি. লোকটা ইউরোপীয়ান নিশ্চয়ই?

অ্যাংলো-বার্মিজ।

আপনাদের ডিপার্টমেন্টে কালো ভ্রমরের একটা full details নিশ্চয় আছে?

আছে।

সেটা আমি একবার দেখতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, কাল আমার ডিপার্টমেন্টে আসবেন, দেখাব। তাছাড়া আমাদের সুপারও আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছুক।

রাত্রি প্রায় নটার সময় ইন্সপেক্টার সলিল সেন ওদের নিকট হতে বিদায় নিলেন।

ভৃত্য ঐ সময় সংবাদ দিল আহার্য প্রস্তুত।

আহারাদির পর সকলে এসে যে যার শয্যায় আশ্রয় নিল।

সুব্রত ভাবছিল কিরীটীর কথাগুলিই।

কিরীটীর অদ্ভুত বিচার ও বিশ্লেষণ-শক্তি সত্যই তাকে মুগ্ধ করেছে।

কিন্তু তবু কিছুতেই সে যেন বুঝে উঠতে পারছিল না, কেন কিরীটীর ধারণা কালো ভ্রমর সনৎদাকে এখনই প্রাণে মারবে না!

কি জানি, সুব্রত আবার ঐ সঙ্গে ভাবে, সব কথা কেন যে কিরীটীবাবু খোলসা করে খুলে বলতে চান না!

উনি কি সুব্রতকে বিশ্বাস করেন না?

রাজুকে যে সলিলবাবুর সন্ধানে পাঠিয়েছেন, সে কথা পর্যন্ত উনি তার নিকট গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু কেন?

আর কিরীটী ভাবছিল সম্পূর্ণ অন্য কথা।

কালো ভ্রমর নিজে থেকে ধরা না দিলে কোনমতেই তাকে ধরা যাবে না।

সনতের উধাও হওয়ার দিন থেকে পরপর এই কদিনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে যেন তাই মনে হচ্ছে।

অবিবেচকের মত কোন কাজই কালো ভ্রমর করতে পারে না। প্রতিটি পদবিক্ষেপ সে হিসাব করে ফেলে।

এত বড় দলের সে দলপতি, অথচ কেউ আজ পর্যন্ত তার আসল পরিচয়টা পর্যন্ত জানে না এবং জানাতেও কালো ভ্রমর শুধু অনিচ্ছুকই তাই নয়, যাতে অন্য কেউ তার

সত্যকারের পরিচয়টা না জানতে পারে তার জন্য সে অত্যন্ত সচেষ্ট ও যত্নবান। কিন্তু কেন?

॥ ১৭ ॥
রাতের আঁধারে অনুসরণ

রাত্রি কত হবে কে জানে! সুব্রত আর কিরীটী পাশাপাশি এক শয্যায় শুয়ে। সুব্রত বোধহয় অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।

ও-পাশের একটা খাটে ঘুমিয়ে আছে রাজু। সেও গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

গত দু রাত্রি কিরীটীর ভাল করে ঘুম হয়নি। কাজেই দু চোখের পাতা এবারে ঘুমে ভারী হয়ে আস্তে আস্তে বুজে আসে।

কিন্তু সহসা মাঝরাতে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় কিরীটীর ঘুম ভেঙে গেল।

রাত্রি কত হয়েছে ঠিক নেই। কিসের যেন একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মনে হল পাশের অন্ধকার ঘর থেকে শব্দটা আসছে।

কিরীটী উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। পাশেই সুব্রত গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তার নিদ্রায় কোন ব্যাঘাত হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

হ্যাঁ, কার যেন সাবধানী পায়ের নিঃশব্দ চলাচলের অস্পষ্ট মৃদু আওয়াজ। এত রাত্রে পাশের ঘরে কে!

খানিক পরে সে শব্দটা আর শোনা গেল না। কিরীটী পাশ ফিরে শুলো।

কিন্তু আবার! হ্যাঁ, ঐ তো আওজয়াটা আবার পাওয়া যাচ্ছে! কেউ নিশ্চয়ই নিঃশব্দে ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে! নাঃ, দেখতে হল।

কিরীটী উঠে বসে। শয্যা ত্যাগ করে দু ঘরের মধ্যবর্তী যে দরজাটা আছে তার সামনে গিয়ে সে কান পেতে দাঁড়াল। তারপর দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে গিয়ে দেখলে দরজাটা ওদিক হতে বন্ধ। আশ্চর্য, শোবার সময়ও তো দরজাটা খোলাই ছিল! তবে? কিরীটী আরও একটু জোরে দরজাটায় ঠেলা দিল। কিন্তু দরজা খুলল না। কিরীটী বিস্মিত, বিমূঢ়।

সহসা মনে পড়ে ওদিককার বারান্দার দিকে ও-ঘরটার দুটো জানালা আছে। সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী এ-ঘরের দরজা দিয়ে ওদিককার বারান্দায় গেল।

অন্ধকার বারান্দা।

নীচের বাগান থেকে ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে ঝিঁ-ঝিঁ শব্দ ভেসে আসে। রাতের হাওয়া নিঃশব্দে চোরের মতই আনাগোনা করে ফেরে। নাম-না-জানা একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

কিরীটী পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দেখে জানলাটি খোলা। দেওয়ালের গা ঘেঁষে চোরের মত চুপি চুপি এসে সে জানলাটার আড়ালে দাঁড়াল।

অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটু সরু আলোর রশ্মি এদিক-ওদিক ঘুরছে। চোখের দৃষ্টি যতটা সম্ভব প্রখর করে কিরীটী ঘরের ভিতরের সব কিছু দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

যেখানে ওদের সুটকেস ও বাক্সগুলো সাজানো আছে, সেখানে একটি ছায়ামূর্তি

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো ফেলে কি যেন দেখছে। লোকটা কে? কিই বা দেখছে?

কিরীটী উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে।

খট্ করে একটা শব্দ হল—হ্যাঁ, বাক্সের ডালা খোলার শব্দ বটে! বাক্সের মধ্যে আঁতিপাতি করে লোকটা কি খুঁজছে অমন করে?

কিরীটী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সব ব্যাপার দেখতে লাগল।

ওপরের বাক্সটা নামিয়ে রেখে লোকটা আর একটা বাক্স খোলবার জন্য তার হাতের চাবির গোছার এক-একটা চাবি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল। আবার খট করে একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে বাক্সর ডালাটাও খুলে গেল।

এবারে অল্পক্ষণ হাতড়াতে কি একটা কাগজ পেয়ে লোকটা টর্চের আলোয় সেটা মেলে ধরে দেখলে এবং সেটা পকেটে পুরে টর্চ নিবিয়ে ওদিককার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর জানলা টপকে ওদিকে চলে গেল।

কিরীটীও সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে জানলা টপকে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। জানলাটার কাছে ছুটে এসে সে দেখে, জানলার গায়ে একটা দড়ির মই ঝুলছে, আর লোকটা নিঃশব্দে সেই দড়ির মই বেয়ে নীচে বাগানে নেমে যাচ্ছে দ্রুত।

আর দেরি না করে কিরীটী একপ্রকার ছুটেই বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে বাগানের দিকে চলে যায়।

রাতের অন্ধকারে বাগানটি অস্পষ্ট। ভাল করে কিছু দেখাও যায় না—বোঝাও যায় না।

বাগানের পিছনদিক দিয়ে একটা স্বল্পপরিসর রাস্তা ঘুরে এসে এদিককার বড় রাস্তায় মিশেছে। যেতে হলে লোকটিকে বাগানের প্রাচীর টপকে ওই রাস্তা দিয়ে এই বড় রাস্তায় আসতেই হবে। কিরীটী মনে মনে এই চিন্তা করে দ্রুতপদে সদর দরজার দিকে চলল, তারপর দরজা খুলে রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়াল।

সহসা তার নজরে পরে রাস্তার ঠিক ওপরেই ছোট একটা টু-সীটার মোটরগাড়ি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। শব্দটা বাগানের পিছনের সরু রাস্তার দিক থেকেই যেন আসছে মনে হয়। শব্দটা ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর মনে হয়।

কিরীটী দরজার কপাটের আড়ালে একটু সরে দাঁড়িয়ে দেখল, সরু রাস্তা দিয়ে একটা লোক বড় রাস্তার দিকে আসছে। লোকটির গায়ে একটা কালো রংয়ের কিমনো চাপানো, মাথায় একটা নাইট ক্যাপ। লোকটা আস্তে আস্তে মোটরটির কাছে এসে দরজা খুলে গাড়ির ভিতর গিয়ে বসল।

কিরীটী দ্রুতপদে এগিয়ে এসে গাড়ির পিছনে যে চাকার ক্যারিয়ারটা ছিল, সেটার ওপর চট করে উঠে বসে কোনমতে, তারপর গাড়ির হুড আটকাবার জন্য পিছনে যে দুটো লোহার হুক্ ছিল, দু হাতে সে দুটোকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরল।

গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করেছে।

গাড়ির বেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সামান্য একটা চাকার ওপরে ঠিক হয়ে বসে থাকা সত্যি বড় কষ্টকর। গাড়ি রাত্রির অন্ধকারে রেঙ্গুন শহরের বিভিন্ন পথ ধরে ছুটে চলেছে।

সামান্য জায়গায় একই ভাবে বসে থেকে কিরীটীর হাত-পা সব টনটন করছে। অনেকক্ষণ পরে গাড়িটা এসে একটা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করল। গাড়ির গতি ধীরে ধীরে কমে আসতেই কিরীটী লাফ দিয়ে গাড়ির পিছন থেকে নেমে পড়ল। গাড়িটা আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট গাড়িবারান্দার নীচে দাঁড়াল।

কিরীটী অন্ধকারে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। খানিক পরেই গাড়িবারান্দার আলোটা জ্বলে উঠল। সেই আলোয় কিরীটী দেখতে পেল, মোটর থেকে সেই কিমনো-পরিহিত লোকটি বেরিয়ে দেওয়ালের গায়ে একটা বোতাম টিপতেই সামনের একটি দরজা ফাঁক হয়ে রাস্তা করে দিল। লোকটি দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। আলোটাও নিভে গেল।

কিরীটী উঠে গাড়িবারান্দায় এল, কিন্তু অন্ধকারে গাড়িবারান্দাটা ভাল করে দেখা যায় না। কোনমতে দেওয়াল ধরে ধরে আন্দাজে ভর করে কিরীটী সেই বোতামটা খুঁজতে লাগল, কিন্তু কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারলে না। একটি দরজা যদিও বা হাতের কাছে পাওয়া গেল, কিন্তু হাত দিয়ে ভাল করে দেখতে গিয়ে কিরীটী বুঝল, একই রকমের দরজা পর পর আরও দুটো আছে। তার সব কিছু যেন গুলিয়ে যায়। কোন্ দরজাটা দিয়ে এক মূহুর্ত আগে যে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। কিরীটী ভাবল—বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আসবার সময় যদি টর্চটা অন্তত নিয়ে আসতাম।

রাগে দুঃখে কিরীটীর নিজের হাত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছা করে। কিন্তু উপায় কি? কি এখন করা যেতে পারে? এত দূরে এসে সে কি বিফল হয়ে ফিরে যাবে শেষটায়?

এমন সময় সামনেই কোথাও একটা ওয়াল ক্লক ঢং ঢং ঢং ঢং করে রাত্রি চারটে ঘোষণা করলে। কিরীটী চেয়ে দেখল পুবের আকাশে রাত্রিশেষের লালচে আভা জেগে উঠেছে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আর এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়। কিরীটী নিঃশব্দে গেট পার হয়ে রাস্তায় চলে আসে।

॥ ১৮ ॥
ডাঃ সান্যালের গৃহে

রাস্তায় নেমে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কিছুক্ষণ কিরীটী যেন কি ভাবে, তারপর আবার সে বাড়ির গেটের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে স্বল্প আলো-আঁধারে সে গাড়ির নম্বরটা দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল যে গাড়ির নাম্বার প্লেটই নেই—সেটা খুলে রাখা হয়েছে। গাড়িবারান্দায় যেখানে গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল সেখানে কাঁকর বিছানো। কিরীটী একটা কাঁকর তুলে নিয়ে গাড়ির বডির উপরে ঘষে ঘষে ইংরাজীতে লিখল 'K' ; তারপর আবার বের হয়ে রাস্তায় এসে নামল।

রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। চারিদিকে অল্প আলো ফুটে উঠেছে। সবেমাত্র দু-একজন করে লোক রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে।

কিরীটী নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে শুরু করল। আনমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ভুলপথে এসে পড়েছে তা সে নিজেও টের পায়নি। যখন খেয়াল হল তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। লোকজন গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করেছে।

কিরীটী সামনেই একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে কিছু জলখাবার ও চা খেয়ে নিল। তারপর রাস্তায় এসে নামতেই হঠাৎ ওর কানে এসে বাজল, মিঃ রায়!

কিরীটী চমকে উঠে ফিরে দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে ডাঃ সান্যাল ও মিঃ সলিল সেন।

সুপ্রভাত! কোথায় চলেছেন? ডাক্তারই প্রথমে প্রশ্ন করলেন।

এই...মানে সকালবেলা বেড়াতে বেড়াতে... কিরীটী আমতা আমতা করে জবাব দিল।

ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, একেবারে রাত্রিবাস চাপিয়েই বেড়াতে বেরিয়েছেন দেখছি যে!

কিরীটী নিজের বেশভূষার দিকে সহসা এতক্ষণে তাকিয়ে লজ্জিত হল, একটু অপ্রস্তুতও হল। সত্যি, এ খেয়াল তো তার মোটেই হয়নি! তাড়াতাড়ি সেকথাটা ঢাকবার জন্য কিরীটী হাসত হাসতে প্রশ্ন করলে, আপনিও মর্নিংওয়াকে বুঝি?

হ্যাঁ, না, মানে ভোরবেলা গেছলাম আমার এই বন্ধুর বাড়ি। এঁর পায়ে হেঁটে বেড়ানোর শখ। তাই বেড়াতে বেরিয়েছি। আমার এ বন্ধুটিকে বোধ হয় চিনতে পারছেন না! ইনি সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টার মিঃ সলিল সেন।

বিলক্ষণ! আগেই এঁর সঙ্গে পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। সুপ্রভাত মিঃ সেন! বলে কিরীটী হাত তুলে নমস্কার জানাল।

মিঃ সেনও প্রতি নমস্কার দিলেন মৃদু হেসে।

ডাঃ সান্যাল সলিল সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ও তাই নাকি, বেশ বেশ। ...কিন্তু মিঃ সেন, ধূর্জটিবাবুর আসল পরিচয়টুকু পেয়েছেন তো? ভদ্রলোক চমৎকার গান গাইতে পারেন। আসছেন তো আজ আমার ওখানে, শুনবেন এঁর গান,...এবার জাহাজে ওঁর সঙ্গে আলাপ হল।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, শুনবেন না মিঃ সেন ডাক্তার সান্যালের কথা, বিনয় করে বড্ড বেশী বাড়িয়ে বলছেন। বরং ওঁরই বাজনার সুর এখনও আমার দু কান ভরে আছে।

যা বলেছেন মিঃ রায়! সত্যি অতি অদ্ভুত ওঁর বাজনার হাত—যেন সুধাবর্ষণ করে। মিঃ সেন বললেন।

মিঃ সেন, আপনি তো এদিকেই চলেছেন, চলুন আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাব। বলে যেন একপ্রকার জোর করেই কিরীটী মিঃ সেনকে সঙ্গে করে এগিয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে কিরীটী সংক্ষেপে ডাঃ সান্যালের কাছে যে কেন পরিচয়টা তার গোপন করেছে সবই বলে।

* * *

দ্বিপ্রহরে ডাঃ সান্যালের গৃহে সকলেই এসে হাজির হয়েছে—কিরীটী, সুব্রত, রাজু ও মিঃ সলিল সেন।

কমিশনার রোডে ডাক্তার সান্যালের বাড়ি। মস্ত বড় দোতলা বাড়ি, বাড়ির পিছনে ফুলের বাগান ও গ্যারেজ। দোতলায় একটি ল্যাবরেটোরী। তার পাশেই লাইব্রেরি ঘর, দশ-বারোটা আলমারিতে ঠাসা ইংরাজী, বাংলা, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ভাষায় সব ডাক্তারী বই। শয়নঘরে একটা ছোট ক্যাম্পখাটে সামান্য একটা কম্বল বিছানো। তার ওপরে একটা

কাশ্মীরী চাদর পাতা। ঝালর দেওয়া পরিষ্কার দুটি মাথার বালিশ। মাথার কাছে টি-পয়ের ওপরে একটা টেবিল ল্যাম্প ও তার পাশে ধ্যানস্থ বুদ্ধের ছোট্ট একটি পিতল-মূর্তি।

ঘরে তিনটি ফটো—একটি ডাক্তারের মার এবং অন্য দুটি তার বাবার ও বোনের। ডাক্তার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের সবাইকে সব বাড়ি-ঘর দেখালেন।

খেতে বসে নানা গল্প করতে করতে ডাঃ সান্যাল একসময়ে প্রশ্ন করলেন, মিঃ অমর বসুর মৃত্যুর কোন কিনারা হল মিঃ সেন?

না, এখনও তো কোন সন্ধান পাইনি।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তো খুব বলছিল যে, এর মধ্যে কালো ভ্রমরেরও নাকি হাত আছে।

কালো ভ্রমরের নাম শুনেই মিঃ সেন সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, চাপা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, কালো ভ্রমর! উঃ, একটিবার যদি সেই শয়তানকে—সেই দুশমনকে হাতের কাছে পেতাম, তবে তার কাঁচা মাথাটাই চিবিয়ে খেতাম বোধ হয়।

মিঃ সেনের ভাব দেখে ডাক্তার সান্যাল হেসে বললেন, কালো ভ্রমরের ওপরে আপনার যে ভয়ানক রাগ দেখছি মিঃ সেন!

রাগ কি আর সাধে হয় ডাক্তার! সভ্য সমাজের মধ্যে সে একটা গলিত কুষ্ঠ। সর্বত্র এমন বিভীষিকা সে জাগিয়ে তুলেছে যে আঁতকে শিউরে উঠতে হয়।...শয়তান!

ডাক্তার এবারে যেন একটু গম্ভীর হলেন, বললেন, সত্যি সে বেটা বড় বাড়িয়ে তুলেছে। আর আশ্চর্য লোকটার ক্ষমতা! ভয়-ডর বলে কি কিছু ওর শরীরে নেই? আপনাদের ডিপার্টমেন্টটাই বা কেমন? সামান্য একটা ডাকাতের দলের আজ পর্যন্ত কিনারা করে উঠতে পারল না! দিনের পর দিন সে তার অত্যাচার চালিয়ে চলেছে!

পাপের ঘড়া তার পূর্ণ হয়েছে। এবার তার সকল কিছুর হিসাবনিকাশ হবে দেখুন। বললে রাজু।

এ একটা কথাই হতে পারে না, একটা ডাকাতের দলকে খুঁজে বের করা যায় না। আপনাদেরও সে-রকম চেষ্টা নেই মিঃ সেন, নইলে—। বললেন ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে।

আহারাদির পর সলিল সেন বললেন, আমি এখন ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বিদায় নেব। আবার চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে ফিরব, জরুরী একটা কাজ আছে।

মিঃ সেন উঠে পড়লেন।

কিরীটী বললে, আমারও একটু কাজ আছে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরব। সুব্রত তোমরা এখানেই থেকো।

কিরীটীও মিঃ সেনের সঙ্গে উঠে গেল।

ছোট টু-সীটার গাড়িখানি মিঃ সেনের। একজন ভৃত্য গাড়ির মধ্যে বসেছিল। সে গিয়ে ভিতরের সীটে বসল, মিঃ সেন গিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসলেন।

মিঃ সেন কিরীটীর দিকে ফিরে গুড-বাই বলে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল।

এমন সময় গাড়ির বডির পিছনদিকটায় নজর পড়তেই কিরীটী চমকে উঠল। কারণ সে দেখল, গাড়ির গায়ে ঘষে ঘষে "K" অক্ষরটি তখনও স্পষ্ট লেখা রয়েছে!

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটবার আগেই গাড়িটা সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে স্থানটাকে ধূমায়িত ও পেট্রলের গন্ধে ভরিয়ে দিয়ে গেটের বাইরে চলে গেছে।

সহসা কিরীটীর চমক ভাঙল ডাক্তারের কণ্ঠসরে। ইতিমধ্যে কখন যে একসময় ডাঃ সান্যাল নীচে নেমে একবারে ওর পাশটিতে দাঁড়িয়েছেন সে টেরই পায়নি। ডাক্তার বললেন, মিঃ রায়, আপনি কোথায় যাবেন না বলছিলেন?

কিরীটী ততক্ষণে আপনাকে সামলে নিয়েছে, বললে, হ্যাঁ, এই যে যাই! বলে সে গিয়ে রাস্তায় নামল।

* * *

সন্ধ্যার তখন আর খুব বেশি দেরি নেই।

দিনের আলোয় বিলীয়মান রশ্মিগুলো আকাশের মেঘের গায়ে গায়ে ইন্দ্রধনু রচনা করছে।

ঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিলের চারপাশে হেলানো বেতের চেয়ারে বসে সুব্রত, কিরীটী, ডাঃ সান্যাল, রাজু ও মিঃ সেন।

কিরীটী গাইছিল—

"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ওপারের ঐ সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান।"

কিরীটীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর সান্ধ্য-প্রকৃতির গায়ে যেন মায়াজাল রচনা করে চলেছে। মুগ্ধ বিস্ময়ে সকলে শুনছে।

কিরীটী তখনও গাইছিল—

"ফুলের বাহার নেইকো যাহার
ফসল যাহার ফলল না,
অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়।
দিনের আলো যার ফুরালো
সাঁজের আলো জ্বললো না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়—
ওরে আয়। আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়—"

ধীরে ধীরে কিরীটী গানটা শেষ করল।

ইতিমধ্যে ডাক্তারের ভৃত্য ভোলা এসে ঘরের বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে।

ওরা সবিস্ময়ে দেখলে, ডাক্তারের দু চোখের কোলে দু ফোঁটা জল টলমল করছে।

ডাক্তার মৃদুস্বরে কি যেন বলছেন আত্মগতভাবে। তাঁর মনের মাঝে যেন বিষম ঝড় উঠেছে।

হঠাৎ একসময়ে ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে অশান্ত অস্থির পদে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করেন।

॥ ১৯ ॥
ডায়েরী কার?

ডাক্তার! ডাক্তার!

সহসা যেন সলিল সেনের ডাকে ডাক্তারের সম্বিৎ ফিরে এল।

তিনি বললেন, না, কিছু না। মাঝে মাঝে মনটা আমার কেন যে উতলা হয়ে ওঠে বুঝি না। একটু অপেক্ষা করুন আপনরা, আমি আসছি। বলে দ্রুত পদবিক্ষেপে ডাক্তার ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

বোঝা গেল ডাক্তার তাঁর ল্যাবরেটারী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, কারণ সে ঘরেরই দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটা এদিকে একেবারে চমৎকার, কিন্তু রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি যেন ওঁর ঘাড়ে চাপে—পাগলের মত যা-তা করেন। অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠেন...আশ্চর্য! মিঃ সেন বললেন।

রাজু বললে, মাথার কোন গণ্ডগোল আছে বোধ হয়; অন্তত আমার তো তাই মনে হয়।

কি জানি! এত বড় জ্ঞানী ডাক্তার এ শহরে আর দুজন নেই। কিন্তু লোকটা এমন খামখেয়ালী যে সন্ধ্যার পরে লক্ষ টাকা দিয়েও ডেকে পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা হয়েছে কি সদর দরজা একেবারে পরের দিন সকালের মত বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে শুধু গভীর রাতে গিটারের করুণ সুর-মূর্ছনা শোনা যায়। আমার মনে হয় মাথা খারাপ-টারাপ কিছু নয়, হয়তো জীবনে বড় রকমের কোন আঘাত পেয়ে থাকবেন, তারই জন্য এইরকম মানসিক অবস্থা হয়েছে।

রাত্রে কি সত্যি-সত্যিই ডাক্তার কোথাও বের হন না মিঃ সেন? কিরীটী শুধাল।

না। আমার সঙ্গে ওঁর আজ সাত বছরের আলাপ। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একটি দিনের জন্যও শুনিনি যে উনি রাত্রে বাড়ির বাইরে গেছেন। তবে একদিন জিজ্ঞাসা করায় উনি বলেছিলেন, রাত্রে উনি নিরিবিলিতে ল্যাবরেটারী ঘরে বসে নাকি ডাক্তারী সম্বন্ধে রিসার্চ করেন।

হ্যাঁ, সত্যিই রিসার্চ করি।

কথাটা শুনে সকলে চমকে ফিরে দেখল খোলা দরজার ওপর দাঁড়িয়ে সহাস্য মুখে ডাক্তার সান্যাল।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, আপনারা হয়ত জানেন, টিউবারকল ব্যাসিলি বলে একরকম জীবাণু আছে; প্রতিবছর এই ভীষণ জীবাণুর প্রকোপে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শুধু সভ্য সমাজই নয়, সমগ্র মানবজাতির এত বড় শত্রু আর দ্বিতীয়টি নেই। আপনাদের ঐ কালো ভ্রমরের হাতে পড়লে তবু অনেক সময় নিস্তার পাওয়া যায় শুনেছি, কিন্তু এই ভীষণ দুশমনের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া সত্যই দুরূহ ব্যাপার। কালো ভ্রমর আসে রাতের আঁধারে লুকিয়ে চুপি চুপি, কিন্তু এ শয়তান দিন-রাত্রি কিছু মানে না—এ তিল তিল করে মানুষের জীবনী-শক্তি শুষে নেয়। আমি আজ

দীর্ঘ এগারো বছর এই অদৃশ্য শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার জীবনের সমস্ত শক্তি তিল তিল করে এর পায়ে ঢেলে দিতে প্রস্তুত আছি, দেখি এ আমার কাছে হার মানে কিনা।...

ডাক্তারের স্বরে উত্তেজনা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাস ঝরে পড়ল যেন। ভাবাতিশয্যে মাঝে মাঝে তাঁর সমস্ত দেহ যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

একটু থেমে ডাক্তার আবার বললেন, কিন্তু আর নয়, আজকের মত আপনাদের কাছ থেকে আমি বিদায় চাই।

সকলে উঠে পড়লেন।

ঘরের ওয়াল-ক্লকটা ঢং ঢং করে রাত্রি সাতটা ঘোষণা করলে।

পথে নেমে কিছুদূর এগিয়ে একসময় সলিল সেনের মুখের কাছে মুখ এনে ঈষৎ চাপা গলায় কিরীটী ডাক দিল, মিঃ সেন!

সলিল সেন ফিরে বললেন, অ্যাঁ,. আমায় ডাকলেন?

হ্যাঁ, মিয়াং এখান থেকে কতদূর হবে?

মিয়াং! বলে বিস্মিত দৃষ্টি তুলে মিঃ সেন কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ। মিয়াং! কিরীটী জবাব দিল।

সে তো অনেক দূর হবে। টোয়ান্টে খাল ধরে কুড়ি মাইল উজানে গেলে পথে পড়ে মৌবিন, আরও এগুলে ইয়ান্ডুন, তারপর পড়বে ডোনাবিষু—তারপর হেনজাদা শহর। হেনজাদার পরেই ইরাবতী নদী। যেখানে টোয়ান্টে খাল ইরাবতীর সঙ্গে মিশেছে সেইখানেই মিয়াং শহর।...কিন্তু হঠাৎ মিয়াং সম্বন্ধে প্রশ্ন কেন মিঃ রায়?

আপনি কালো ভ্রমরকে ধরতে চান?

কালো ভ্রমর! শুনেই একরাশ বিস্ময় যেন মিঃ সেনের কণ্ঠ দিয়ে ঝরে পড়ল। তিনি যেন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। প্রথম দু-চার মিনিট মিঃ সেনের কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বেরুল না।

কিরীটী চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বললে, রাত্রি এখন সাতটা কুড়ি মিনিট। হাতে আর মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা সময় আছে। যেমন করেই হোক আজ রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যে মিয়াং পৌঁছতে হবে আমাদের।

কিন্তু—, মিঃ সেন কি যেন বলতে গেলেন, কিন্তু কিরীটী তাঁকে একরকম বাধা দিয়ে থামিয়ে বললে, আজকের রাত যদি হারান, তবে এ জীবনে আর কালো ভ্রমরকে ধরতে পারবেন না। সে চিরদিনের মত মুঠোর বাইরে চলে যাবে। তাকে হাতেনাতে যদি ধরতে চান তো আজকের রাত পোহাতে দেবেন না।

আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না কিরীটীবাবু!

বুঝবেন, সময় হলেই সব বুঝতে পারবেন। আপনাদের দ্রুতগামী পুলিসলঞ্চ আছে না?

হ্যাঁ আছে।

এখন সেটা পাওয়া যাবে?

যাবে।

তবে চলুন, আর একটি মুহূর্তও দেরি নয়।

* * *

অন্ধকারে সার্চলাইট জ্বেলে পুলিশলঞ্চখানা টোয়ান্টে খালের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

লঞ্চে আরোহী আছে ছয়জন—সুব্রত, রাজু, কিরীটী, মিঃ সলিল সেন ও দুইজন আর্মড বর্মী পুলিস।

কিরীটী একটা লেদারের বাঁধানো ডায়েরী হাতে করে নাড়তে নাড়তে বললে, মিঃ সেন, আপনি হয়তো সমগ্র ব্যাপারটার আকস্মিকতায় আশ্চর্য হয়ে গেছেন! এই ডায়েরী পড়লেই ব্যাপারটা সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। শুনুন পড়ছি—

লঞ্চের কেবিনের আলোয় ডায়েরীখানা মেলে ধরে কিরীটী বললে, আমি অবিশ্যি ডায়েরীর সব কথা এখন আপনাদের পড়ে শোনাব না, কয়েকটা পাতা মাত্র পড়ব। শুনুন।

কিরীটী ছোট একখানা ডায়েরী খুলে পড়তে শুরু করল—

বাবা!—আমার স্নেহময় বাবা আর ইহজগতে নেই। বিলাতে থেকে শেষ পরীক্ষা দিয়ে দেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ সংবাদে আমার বুকখানা একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে।

তারপর বাবার ডায়েরী পড়ে বুঝতে পারলাম বাবার অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী তিনটি লোক। দুজনের নাম তাঁর ডায়েরীতেই পেলাম। তারা দুজনেই বর্মায় এখন বিপুল সম্পত্তির অধিকারী—একজন মিঃ চৌধুরী আর একজন বিখ্যাত তামাক ব্যবসায়ী বিপিন দত্ত। তৃতীয়জনের নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বাবা, বিপিন দত্ত, মিঃ চৌধুরী ও আর একজন মিলে কাঠের ব্যবসা করেন। বিপিন দত্তের দুই ছেলে ও বৌ ছিল, মিঃ চৌধুরী অবিবাহিত। আমরা দুই ভাই-বোন ছাড়া বাবার আর কেউ ছিল না। বাবার ব্যবসায় উন্নতি হওয়ার আগেই মা মারা যান। বাবা ছিলেন যেমন সরল তেমনি নিরীহ-প্রকৃতির। এ জগতে কাউকেই তিনি অবিশ্বাস করতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসই তাঁর কাল হল।

মা মারা যাবার পর থেকে বাবা কেমন উদাস প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। এ দুনিয়ার কোন কিছুর ওপরই তাঁর আর তেমন কোন আকর্ষণই যেন ছিল না। ব্যবসা-সংক্রান্ত সকল কিছুই দত্ত ও চৌধুরী তাঁর ব্যবসার অন্য দুই অংশীদার দেখাশুনা করতেন। বাবার কাছে কোন কিছুর সম্বন্ধে মত নিতে গেলে বলতেন, ওর মধ্যে আর আমায় টেনো না তোমরা, তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর গে।

আমি ছিলাম তখন বিলেতে।

দত্ত আর চৌধুরী বাবার এই উদাসীন ভাব ও একান্ত নিরপেক্ষতার ও সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র করলে।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল, ব্যবসার অবস্থা নাকি খুব খারাপ। বাবা শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। অডিটার এল, কমিটি বসল, শেষ পর্যন্ত সত্যিই দেখা গেল ব্যবসাতে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপরে ডিফিসিট পড়েছে। যে ব্যবসার মূলধন মাত্র সাড়ে তিন লক্ষ্য টাকা, সে ব্যবসায় এত বড় ডিফিসিট দিয়ে আর চলা একেবারেই অসম্ভব। অতএব ব্যবসা লালবাতি জ্বালাতে বাধ্য হল।

ভিতরে ভিতরে গভীর ষড়যন্ত্র করে দত্ত ও চৌধুরী নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে বাবাকে একেবারে পথে বসাল।

সরল-প্রাণ বাবা আমার। তাদের বন্ধু বলে আপনার জন বলে বিশ্বাস করেছিলেন; তাই তারা তাঁকে বন্ধুত্বের ও বিশ্বাসের চরম পুরস্কার দিয়ে গেল। এ আঘাত ও অপমান বাবা আমার সহ্য করতে পারলেন না—অসুখে পড়লেন এবং আমি ফিরে আসবার আগেই চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন। যাবার সময় তিনি আমার নামে একটা চিঠি রেখে যান।

'সুরো বাবা আমার,

এ জীবনের শেষক্ষণে তোমায় দেখে যেতে পারলাম না, এ যে আমার কত বড় দুঃখ তা একমাত্র ভগবানই জানেন। মনে মনে তোমার জন্য আমার শেষ আশীর্বাদ ভগবানের শ্রীচরণে দিয়ে গেলাম। যাবার আগে তোমায় দেবার মত আর আমার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই, তোমার মার নামে জমানো হাজার পাঁচেক টাকা আর আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সঞ্চয় করা দুটি কথা রেখে যাচ্ছি।

প্রথম কথা—এ দুনিয়ায় সরল বিশ্বাসের কোন দাম নেই।

দ্বিতীয় কথা—যে বিশ্বাসহন্তা তার একমাত্র ব্যবস্থা কঠোর মৃত্যুদণ্ড।...

যারা তোমার বাবাকে এমনি করে পথে বসিয়ে গেল তাদের তুমি ক্ষমা করো না।'

চোখের জলের মধ্য দিয়ে বাবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করেই হোক, যারা বাবাকে আমার এমনি করে লাঞ্ছিত করেছে তাদের আমি উপযুক্ত দণ্ড দেব।

ভালো করে খোঁজ নিয়ে শুনলাম, দত্ত আর চৌধুরী এখন দুজনেই শহরের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য লোক। একজন কাঠের ব্যবসা ফেঁদে লক্ষপতি, অন্যজন তামাকের ব্যবসায়ে প্রায় তাই।

এই পর্যন্ত পড়ে কিরীটী থামল।

তারপব আবার পাতা ওল্টাতে লাগল।

তারপর শুনুন। বলে কিরীটী আবার পড়তে শুরু করে: দত্তের চরম শাস্তি মিলেছে, প্রাণে মারিনি। সমস্ত ব্যবসা তছনছ করে দিয়েছি। আজ লক্ষপতি তামাকের ব্যবসায়ী বিপিন দত্ত পথের ভিখারী। পয়সার শোকে আজ সে পাগল, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

এক নম্বর হল।

এবার চৌধুরী তোমার পালা।

চৌধুরীর ভাগ্নে সনৎকে লোক দিয়ে দলে ভিড়িয়েছি। ভাগ্নেটি বুড়োর খুব আদরের। উঃ, বুড়ো একেবারে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে! দিনের পর দিন সনৎ অধঃপাতের পথে নেমে চলেছে। অর্থাৎ সে জানে না এর মধ্যে আছে এক হতভাগ্যের প্রতিহিংসার চক্রান্ত। কিন্তু দিনকে দিন এ কি হচ্ছে আমার? দুশ্চিন্তা সর্বদা যেন আমায় ভূতের মত পিছু পিছু তাড়া করে চলেছে। এ কি হল?...

ডায়েরীর আর এক জায়গায় লেখা আছে—

আরও কিছুদিন যাক। সনৎকে একেবারে পথের ধুলোয় টেনে এনে বসাই, তারপর বুড়ো চৌধুরীকে ধরব। ওকে শেষ করতে তো আমার এক মাসও লাগবে না। কিন্তু আর একজন কে? কি তার নাম, কে আমাকে বলে দেবে?

কিন্তু আমার এ কি হল? এ কি যন্ত্রণা? রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের

শয়তানটা যেন আমায় শত বাহু মেলে শয়তানির পথে টেনে নিয়ে চলে, কোনমতেই যেন আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না।

আর এক জায়গায় লেখা—

ডঃ চৌধুরী হঠাৎ মরে আমায় বড় ফাঁকিটাই দিয়ে গেল! আমার স্বপ্ন ধুলোয় মিশে গেল! কি করি? এখন কি করি?...কিন্তু এ কি! দুষ্কর্ম কি আমার জীবনের সাথী হয়ে দাঁড়াল নাকি? আমি কি পাগল হয়ে যাব?

ডায়েরীর আর এক পাতায় লেখা—

হ্যাঁ, সেই ঠিক হবে। যেমন করে হোক বুড়ো চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করে দিতে হবে। ওর ভাগ্নেদের পথে বসাতে হবে।

মিলেছে, সুযোগ মিলেছে। সনৎ লোক পাঠিয়েছিল আমার কাছে উইলের অন্যতম উত্তরাধিকারীকে যদি কোনমতে প্রতিরোধ করতে পারি, তবে সে আমায় দশ হাজার টাকা দেবে...

আরও এক পাতায় লেখা—

অমর বসু সব ভেস্তে দিল। শেষ পর্যন্ত কূলে এসে তরী ডোবাল। কিন্তু আমার যে সব গোলমাল হয়ে যায়! ভেবেছিলাম সনৎকে মুঠোর মধ্যে এনে ধীরে ধীরে তাকে পথের ভিখিরী করে পিঁপড়ের মত পিষে মেরে ফেলে দেব একদিন। তা তো হল না। সব ভেস্তে গেল। এখন উপায় ? মিলেছে—উপায় মিলেছে! আজ রাত্রেই সনৎকে শেষ করব।

উঃ, কি সর্বনাশ! সংবাদ পেলাম, অমর বসুই নাকি বাবার ব্যবসায় ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল, চৌধুরীর সহকারী হিসাবে। দাঁড়াও বন্ধু, এবারে তোমার পালা।

তারপর অনেক পাতার পরে লেখা আছে—

দলের লোকেরা আমায় জানবার জন্য কী ব্যাকুল—কী ইচ্ছুক! অমর বসুর মৃত্যুর ঘটনা খুব চাঞ্চল্য জাগিয়েছে যাহোক।

কলকাতায় যেতে হবে।

সনৎ আর সুব্রত ওদের মধ্যে যে কোন একজনকেও যদি কোনমতে এখানে এনে ফেলতে পারি তবেই কিস্তিমাত। একজন ধরা পড়লেই ওরা সব কজনই ছুটে আসবে। ধরে সব কটাকে রেঙ্গুনে আনতে হবে—আমার মুঠোর মধ্যে।

আর এক জায়গায় লেখা—

নাঃ, কিরীটী বড় বাড়িয়ে তুলেছে! কিন্তু ভদ্রলোকের দেখছি বুদ্ধি আছে। হ্যাঁ, বলতেই হবে বুদ্ধি আছে। ঠিক আঁচ করেছে তো!

বুদ্ধির লড়াই আমার বড় ভাল লাগে। দেখি না একচাল খেলে!

আবার এক জায়গায় লেখা—

দেখছি ধনাগারের চার্টটা চুরি গেছে। তা যাক, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ও তো আমি জানিই। ওটা আবার কিরীটীটাই হাত করেছে। ওটা চুরি করে আনতে হবে। রেঙ্গুনে গিয়ে চুরি করলেই হবে। ব্যস্ততার কিছু নেই।

ডায়েরীর শেষ পাতায় লেখা আছে—

টাকাকড়ি সঞ্চয় করে আমার কি হবে?...আমি আমার ধনাগারের সমস্ত অর্থ তাকে দিয়ে যাব—মরবার আগে যে আমার কাছে সবচাইতে বিশ্বাসী বলে মনে হবে। ও তো পাপের অর্থ, পাপের নেশায় অর্জন করা অর্থ। আমি চাই না।

ডায়েরীর সব শেষ পাতায় লেখা—

আজ শনিবার এগারোই।

মৃত্যুগুহায় সনৎ ও অমরকে আটকে রেখেছি। কাল যাব মৃত্যুগুহায় রাত্রি বারোটায়। তপ্ত শলা দিয়ে অমরের চোখ কানা করব। আর সনৎকে চিরজীবনের জন্য আমার ধনাগারে বন্দী করে রেখে আসব। অর্থপিশাচ! দেখি আমার আজীবনের সঞ্চিত অর্থে ওর সাধ মেটে কিনা! যে সামান্য অর্থের জন্য ভাইকে মেরে ফেলতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত নয়, তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া দরকার। তাছাড়া আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারও শাস্তি হোক। থাকুক ও ওই রুদ্ধ ধনাগারে—যুগ যুগ ধরে অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে বন্দী হয়ে যখের মত!

এই পর্যন্ত পড়ে কিরীটী ডায়েরী বন্ধ করল এবং সকলের মুখের দিকে চেয়ে বলল, আজ সেই ভীষণ রাত্রি অর্থাৎ এগারোই, এবং আজই রাত বারোটায় হবে সেই ভীষণ পাপানুষ্ঠান!

সকলে এতক্ষণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে কিরীটীর পড়া শুনছিল, এবার বলে উঠল, উঃ, কী ভয়ঙ্কর!

অন্ধকারে মোটর-লঞ্চ ঝরঝর শব্দে জল কেটে চলেছে তখন।

কিরীটী ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। এখনও দেড় ঘণ্টা বাকী।

॥ ২০ ॥

শয়তানের কারখানা

মিয়াংয়ে এসে যখন লঞ্চ পৌঁছাল রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। কৃষ্ণপঞ্চমীর চাঁদ আকাশের এক কোণে উঁকি দিচ্ছে।

ইরাবতীর উচ্ছ্বসিত জলধারা অক্লান্ত কল্লোলে বয়ে যাচ্ছে।

স্বল্প চন্দ্রালোকে নদীর বুকে ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় যেন কি এক মায়াস্বপ্নের সৃষ্টি করেছে। অদূরে অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় ইরাবতীর স্রোত-বিধৌত বিশাল গৌতম পর্বত প্যাগোডা মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে চন্দ্রকিরণ-স্নাত হয়ে।

সকলে লঞ্চ হতে নামল একে একে তীরে।

কিরীটী পকেট থেকে একটা ছোট কাগজ বের করল। তাতে আলো ফেলতে দেখা গেল তার ওপর সাঙ্কেতিক ভাবে কি কতকগুলো লেখা আছে।

কিরীটী সেই কাগজ দেখতে দেখতে বললে, ঐ দেখা যাচ্ছে গৌতম পর্বত। বোধ হয় প্যাগোডার দক্ষিণ কোণ দিয়ে এগিয়ে যেতে একটা চন্দনগাছ পাওয়া যাবে। চলুন, আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলুন।

সকলে দ্রুতপদে এগিয়ে চলল।

কারও মুখে একটি কথা নেই। উৎকণ্ঠিত আগ্রহে রুদ্ধনিঃশ্বাসে এক রহস্যময় বিভীষিকার দ্বারোদঘাটন করতে সব এগিয়ে চলেছে যেন নিঃশব্দে।

এই সেই প্যাগোডা...চল দক্ষিণ কোণ ধরে। চলতে চলতে একসময় থেমে কিরীটি বললে।

সকলে আবার কিছুদূর এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথায় ভাঙা বুদ্ধদেবের মূর্তি?

সুব্রত ও রাজু বললে, মিঃ রায়, আমরা বোধ হয় ভুলপথে এসেছি।

কিরীটী জোর গলায় বললে, না, ঠিকই চলেছি, ঐ দেখুন ভাঙা বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখা যাচ্ছে সামনেই আমাদের।

সত্যিই অদূরে ভাঙা একটা বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখা গেল, একখণ্ড বড় পাথরের ওপর বসানো।

বুদ্ধমূর্তির ডানদিকে এগোতেই দেখা গেল সেই চন্দনগাছও।

কিরীটী উল্লসিত কণ্ঠে বললে, সব ঠিক ঠিক মিলছে!

তারপর কাগজটা মেলে ধরে বলতে লাগল, এই লেখাগুলোর তলায় যেসব চিহ্ন আছে সেগুলো বাদ দিতে হবে, কেননা বলেছে—চিহ্ন যত বাদ গেছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে —দশ পা পরে দুই DK০০০ অর্থাৎ দুই দিকে তিন শূন্য বা ৩০ হাত রাস্তা আছে' হ্যাঁ, এই তো দুদিকে দুটো রাস্তা গেছে দেখছি, একটা ডাইনে, একটা বাঁয়ে।...এখন এই দুই রাস্তার BAMT অর্থাৎ বাঁয়ের রাস্তাটি ধরে হাতী ০০০০ যাও। হাতী মানে গজ চার শূন্য হল চল্লিশ, সব মিলে হল চল্লিশ গজ অর্থাৎ বাঁয়ের রাস্তাটি ধরে চল্লিশ গজ যেতে হবে। চল এগিয়ে। মন্ত্রমুগ্ধের মতই অন্য সকলে কিরীটীর কিছু পিছু এগিয়ে চলে ত্রিশ হাত যাওয়ার পর দেখা গেল সত্যিই দুই দিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে। বাঁয়ের রাস্তাটি ধরে চল্লিশ গজ এগোবার পর দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড পাথরের ওপর এক ছোট লোহার ড্রাগন বসানো। তার মুখে একটা লোহার বালা পরানো। কিরীটী আবার কাগজ দেখে পড়তে লাগল—

ড্রাগন দেখ বসে আছে
ধনাগারের চাবি কাছে।
মুখে তার লোহার বালা
দুলছে তাতে চিকন শলা!

হ্যাঁ, এই তো ড্রাগনের মুখে লোহার বালা। দেখ দেখ একটা লোহার শলাও আছে!

আনন্দের উত্তেজনায় কিরীটীর সর্বশরীর থরথর করে কাঁপছে তখন। সে পুনরায় চাপা সুরে বলতে লাগল—

দুইয়ের পিঠে শূন্য নাও
ত্রিশ দিয়ে গুণ দাও,

অর্থাৎ তাহলে হল ২০ x ৩০ = ৬০০

শূন্য যদি যায় বাদ
সেই কবারে পুরবে সাধ।

অর্থাৎ ৬০০ থেকে শূন্য বাদ গেলে থাকে মাত্র ৬।

উত্তেজনায় ও অধীর আবেগে কিরীটীর সমগ্র দেহখানি কেঁপে কেঁপে ওঠে, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে।

ছবার ড্রাগনের মুখে দোলানো লোহার বালাটা ঘোরাতেই ড্রাগনটি যে পাথরের ওপর বসনো ছিল, সেই পাথরখানি ড্রাগন-সমেত সর সর করে বাঁয়ে সরে গিয়ে দু-হাত পরিমাণ একটা গর্ত প্রকাশ পেল।

পেয়েছি, পেয়েছি! ইউরেকা, ইউরেকা! কিরীটী চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, সত্যি, এ কি ভোজবাজি না স্বপ্ন!

সকলেই যেন বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

সেই গর্তমুখে আলো ফেলতে দেখা গেল, ধাপে ধাপে সুন্দর সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। প্রথমে কিরীটী, তারপর মিঃ সেন, সুব্রত ও রাজু পর পর সিঁড়ির পথে পা বাড়াল। পুলিস দুজন বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কিরীটীর নির্দেশের অপেক্ষায়।

গোটা পনেরো সিঁড়ি ডিঙিয়ে যাবার পরই সমতলভূমি পায়ে ঠেকল।

অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা সরু পথ।

সেই অপরিসর-পথে অতি কষ্টে দুজন লোক পাশাপাশি যেতে পারে।

কিরীটীদের মাথা নীচু করে এগোতে হল। কিছুদূর এগোতেই অদূরে একটা আলোর ক্ষীণ রশ্মি অন্ধকারে মিটমিট করছে দেখা গেল।

এমন সময় মাটির নীচে অন্ধকার গুহার ভিতর থেকে একটা বুক-ভাঙা করুণ আর্তনাদ জেগে উঠল।

সকলেই থমকে দাঁড়াল।

মনে হল এ বুঝি কোন অশরীরীর করুণ হাহাকার যুগ যুগ ধরে এই মাটির নীচে কেঁদে কেঁদে ফিরছে আজও।

অল্পক্ষণ বাদে আবার তারা এগিয়ে চলল। সকলে এসে একটা বিস্তৃত উঠোনের মত জায়গায় দাঁড়াল। মাথার ওপরে ছাদের খিলান খুব বেশী উঁচু নয়।

সহসা অন্ধকারের মধ্যে ঝনঝন্ শব্দ শুনে সকলেই ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলে, একটা ছোট্ট গোলাকার ছিদ্রপথ দিয়ে সরু একটা আলোর রশ্মি অন্ধকারে ছিটকে এসে পড়েছে।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে সেই ছিদ্রপথে চোখ রেখে চমকে ওঠে, এ কি স্বপ্ন না সত্যি! এ যে সেই গল্পের আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপকেও হার মানিয়ে দেয়! সহসা সহস্র আরব্য রজনীর বিস্ময়কর একখানা পাতা যেন এই পাতালপুরীর আঁধার কক্ষে সত্য হয়ে এসে ধরা দিয়েছে।

আলোতে দেখা গেল ছোট একখানি ঘর। সেই ঘরের ছাদের ওপর হতে শিকলের মাথায় একটা কাঁচের প্রদীপদান ঝুলছে। সেই প্রদীপের স্বল্পালোকে দেখা যায় ঘরের চারপাশে ছোট ছোট বেতের ঝাঁপিতে ভর্তি অসংখ্য চকচকে গিনি। কে একজন আগাগোড়া কালো পোশাক পরা লোক নীচু হয়ে এক একটা ঝাঁপির কাছে আসছে, আর দু'হাত দিয়ে সেই ঝাঁপি হতে মুঠো করে গিনি তুলে নিয়ে পরক্ষণেই মুঠো আলগা করে ধরছে—অমনি সুমধুর ঝন্ঝন্ শব্দ করে সেই সব গিনির শব্দ কক্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে।

কিরীটী ছিদ্রপথ দিয়ে সকলকেই তা দেখাল। তারা সবিস্ময়ে দেখল—এ যে সত্যই অতুল ঐশ্বর্য!

কিছুক্ষণ বাদে লোকটা পাশের একটা দরজা দিয়ে ঐ ঘর থেকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরেই আবার জেগে উঠল সেই বুক-ভাঙা চিৎকার।

কোথা হতে চিৎকার আসছে তা জানবার জন্য সকলে ফিরে দাঁড়াল।

চিৎকারের শব্দটা ডানদিক হতে আসছে বলে মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, তাই!

সহসা সেই বেদনার্ত চিৎকারকে ডুবিয়ে দিয়ে বাজের মতই একটা তীক্ষ্ণ হাসির খলখল শব্দ যেন সেই গুহা-গিরি-তলে শব্দায়মান হয়ে উঠল—হাঃ হাঃ হাঃ!

দয়া কর! দয়া কর! কার করুণ আবেদন শোনা যায়।

দয়া! হাঃ হাঃ! মনে পড়ে অমর বসু, দিব্যেন্দু সান্যালের সেদিনকার সে হতমানের কথা? মানুষের বুকে ছুরি মেরে তাকে তোমরা শয়তান সাজিয়েছ। দয়া, মায়া, ভালবাসা কিছু সেখানে নেই, সেখানে পড়ে আছে শুধু জিঘাংসা আর প্রতিশোধ।...এবারে সনৎবাবু! এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে বন্ধু? কালো ভ্রমরের প্রতিহিংসা—সে বড় ভীষণ জিনিস! চৌধুরীর ভাগ্নে তোমরা। চৌধুরী ফাঁকি দিলেও তোমরা যাবে কোথায়? লক্ষপতি নিরীহ সরল-বিশ্বাসী বাবাকে আমার একদিন তোমার মামাই রাজসিংহাসন থেকে পথের ধুলোয় নামিয়ে এনেছিল, এমনি ছিল তার অর্থপিপাসা! তুমিও অর্থপিশাচ! এমন কি একদিন তুমি তোমার ভাইয়ের বুকেও ছুরি বসাতে পশ্চাৎপদ হওনি! তারপর সকলে মিলে আমাকে সেদিন যে অপমান করেছ, সে অপমানের জ্বালায় এখনও আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আমি সেই দুঃসহ পরাজয়ের গ্লানি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

আমি আমার এই সুদীর্ঘ এগারো বছরের পাপ-দস্যু-জীবনে পাপানুষ্ঠানের দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছি। ভেবেছিলাম আমার দলে সবচাইতে বিশ্বাসী দেখব যাকে তাকেই সব দিয়ে যাব, কিন্তু দেখলাম সত্যিকারের বিশ্বাসী মেলা এ দুনিয়ায় একান্তই দুরূহ ব্যাপার। আমার কাজ শেষ হয়েছে। স্বর্গত পিতার আমার প্রতিশোধ নেওয়া হয়তো হয়েছে।...এখন আমার এই পাপ-ঐশ্বর্যের মধ্যে তোমাকে বন্দী করে রেখে যাব। তুমি তোমার বাকী জীবনের দিনগুলোর প্রতি মুহূর্তটিতে অর্থগৃধ্নুতার তীব্র অনুশোচনায় তিলে তিলে মৃত্যুর কবলে এগিয়ে যাবে। মৃত্যুর সেই করাল ভয়াবহ বিভীষিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তুমি দেখবে বন্ধু, যে অর্থের জন্য একদিন তুমি তোমার ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাতে চেয়েছিলে, সে অর্থ তোমার কেউ নয়। এই পর্যন্ত বলেই লোকটা থামল।

তারপর আবার সে বলতে শুরু করলে, এই দেখছ তপ্ত শলা! এটা দিয়ে তোমার চক্ষু দুটি চিরজীবনের মত নষ্ট করে দিয়ে যাব। অন্ধ হয়ে তুমি তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর অমর বসু এই গিরিগুহায়।

দয়া কর! দয়া কর! তোমার পায়ে পড়ি!

দয়া! চুপ শয়তান!

অন্য কোন কথা শোনা গেল না। কেবল একটা হৃদয়দ্রাবী করুণ গোঙানি আঁধার-মধ্যে করুণ বিভীষিকায় জেগে উঠল যেন। এমন সময় কিরীটী সবলে সামনের দরজাটির ওপরে একটা লাথি মারল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজু আর সুব্রতও তার ইঙ্গিতে সজোরে ধাক্কা দিতে লাগল। তিনজনের মিলিত শক্তি প্রতিরোধ করবার মত ক্ষমতা সামান্য কাঠের

দরজাটির ছিল না—দরজা ভেঙে গেল। হুড়মুড় করে সকলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

শয়তান! কিরীটী গর্জন করে উঠল।

ছোট্ট ঘরখানির একপাশে হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা অমর বসু। তাঁর চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ধারে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তখন। বেচারী যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে একটা শিকলে বাঁধা সনৎ।

আর একজন মাত্র লোক ঘরে ছিল, একটু আগেকার সেই বক্তা। সে তখন ওদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। উঃ, কী কুৎসিত তার মুখ! এ বুঝি কোন মাটির নীচেকার কবরখানা থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে। যুগ-যুগান্তের বিভীষিকা যেন মূর্তিমান হয়ে সচল হয়েছে।

এখানেও এসেছ? তবে মর! বলে মুহূর্তে সেই ভীষণদর্শন লোকটা কোমর থেকে ছোরা বের করে কিরীটীর দিকে ছুঁড়ে মারল।

কিরীটী চকিতে সরে গেল, ছোরাটা এসে সলিল সেনের পাঁজরায় বিঁধে গেল।

শয়তান! সুব্রত গর্জে উঠল।

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে কালো ভ্রমর। জামার পকেট থেকে ছোট একটা অ্যাম্পুলের মত জিনিস বের করে সেটা পট্‌ করে শরীরের চামড়ার মধ্যে বিঁধিয়ে দিল।

সুব্রত লাফিয়ে গিয়ে কালো ভ্রমরের একখানি হাত ততক্ষণে চেপে ধরেছে।

মূর্খ! পিপীলিকার ওড়বার সাধ! বলে অক্লেশে এক হেঁচকা টান দিয়ে সুব্রতর দৃঢ়মুষ্টির কবল থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, কাজ আমার শেষ। তারপর হঠাৎ যেন তীব্র যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠল, উঃ জ্বলে গেল! তীব্র বিষ! বিষধর কালনাগিনীর উগ্র বিষ!...হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্ত—সারাজীবন যে সহস্র পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজ হাতে স্বেচ্ছায় করে গেলাম। তা না হলে আমার অনুতপ্ত বায়ুভূত আত্মা এই মাটির পৃথিবীর শত সহস্র পাপানুষ্ঠানের স্মৃতির দংশনে হাহাকার করে ফিরত।

কালো ভ্রমর আর কিছু বলতে পারল না—টলতে টলতে বসে পড়ল।

কণ্ঠস্বর তার ক্ষীণ হয়ে আসছে।

কম্পিতহস্তে সে নিজের মুখের মুখোশটা টেনে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল...

কিরীটী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ক্ষিপ্রহস্তে কালো ভ্রমরের গায়ের জামাগুলো খুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু সফল হল না। পাতলা রবারের মত জামাটা যেন গায়ে এঁটে বসে আছে, এবং তার ভিতর থেকেও দেহসৌষ্ঠব যেন ফুটে বের হচ্ছে লোকটার। সত্যি, কি অদ্ভুত তার দেহের প্রতিটি মাংসপেশী, নিয়মিত ব্যায়ামে সুগোল ও সুষ্ঠু! কিন্তু কি আশ্চর্য, ভীষণ-দর্শন কুৎসিত অন্তরের সঙ্গে দেহের তো কোন সাদৃশ্যই নেই! সকলে বিস্মিত হয়ে তার দেহসৌষ্ঠব দেখতে লাগল।

অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে কালো ভ্রমর বলতে লাগল, এই বদ্ধ ঘরের বদ্ধ হাওয়া ছেড়ে আমি বাইরে যাব।

তখন সকলে ধরাধরি করে তাকে বাইরে নিয়ে এল।

অমর বসু, সনৎ ও আহত সলিল সেনকেও একে একে বাইরে মুক্ত আকাশের তলায় নিয়ে আসা হল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে।

প্রভাতী পাখীর কলকাকলীতে স্থানটি মুখরিত হয়ে উঠেছে।

সকলে এসে কালো ভ্রমরের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল।

অমরবাবুর জ্ঞান তখনও ফেরেনি।

আঃ, আলো বাতাস! কিন্তু আমার মৃত্যুর পর আমার এ দেহটা নিয়ে আর টানাটানি কোরো না। ঐ ইরাবতীর শান্ত শীতল জলে ভাসিয়ে দিয়ে যেও। বলতে বলতে কালো ভ্রমর শ্লথ কম্পিত হস্তে নিজ মুখের মুখোশটা টেনে নিল।

তার মুখ দেখে সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হতবাক্ হয়ে পড়ল। তারা সকলে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে না তো!

সলিল সেন যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, ডাক্তার সান্যাল! এ কি।

হ্যাঁ, আমিই ডাক্তার সান্যাল। কালো ভ্রমর কোনমতে অস্পষ্টভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা কটা বললে।

তখন প্রভাতের রাঙা সূর্য মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে উঠছে।

॥ ২১ ॥

বেদনার অশ্রু

ধীরে ধীরে হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বোধ করি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সকলের চোখের কোলেই অশ্রু। এত বড় শয়তান, তবু সকলের বুকেই যেন আজ দোলা দিয়ে গেছে।

এত বড় একটা*পাপের এমনি করুণ পরিসমাপ্তি! তীব্র বিষের ক্রিয়ায় সমস্ত দেহ একেবারে নীল হয়ে গেছে। কিরীটী অশ্রুসজল চোখে ডাক্তারের বা কালো ভ্রমরের মাথায় হাত রেখে বললে, ভগবান তোমার আত্মার মঙ্গল করবেন।

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী যেই কালো ভ্রমরের মাথায় হাত বোলাতে যাবে, অমনি তার কাঁচাপাকা চুলের পরচুলাও কিরীটীর আঙুলের সঙ্গে খসে এল।

একমাথা-ভর্তি সুন্দর ঢেউ-খেলানো কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল। এতক্ষণে যেন মাথার চুল থেকে দেহের প্রতি অণু-পরমাণু পর্যন্ত অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠল। এত সুশ্রী যে কেউ হতে পারে এ যেন ধারণারও অতীত। এমন সুন্দর দেহের অন্তরালে জঘন্য এক শয়তান লুকিয়ে ছিল, আজ শয়তান দেহ ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহ আবার সৌন্দর্য ফিরে পেল।

* * *

কিরীটী বলতে লাগল, ডাক্তার প্রথম পরশু রাতে আমাদের গৃহে গিয়েছিল এই নকল সাঙ্কেতিক লেখাটির আসল কাগজটা চুরি করতে। কিন্তু সে জানত না যে তার মতলব আমি জাহাজেই ধরে ফেলি। বলে সে একে একে জাহাজে দু-রাত্রির সমস্ত ঘটনা খুলে বললে।

তারপর একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে লাগল, কিন্তু তখনও আমার সন্দেহটা ভাল করে দানা বেঁধে ওঠেনি। সেদিন রাত্রে যখন কাগজটা চুরি করে গাড়িতে করে

পালায় তখন তার গাড়ির পিছনে চেপে তার বাড়ি পর্যন্ত যাই। শুধু তাই নয়—কাঁকর দিয়ে তার গাড়ির গায়ে একটা 'K' অক্ষরও লিখে রেখে আসি। কাল দুপুরে ডাক্তারের ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে ওর শোবার ঘরে পিতলের মূর্তিটার পাশে ওর ডায়েরীটা পেয়ে তখনই সকলের চোখের আড়ালে সেটা লুকিয়ে ফেলি। তারপর মিঃ সেনকে নীচে বিদায় দিতে এসে তাঁর গাড়ির গায়ে 'K' অক্ষরটা দেখে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। যা হোক, তখনই বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারের বাড়ির পিছনে গেলাম। চিনতে পারলাম, সেখানেই গতরাত্রে গাড়ির পিছনে করে এসেছিলাম। তখন আর আমার কোন সন্দেহ রইল না। হ্যাঁ, ডাক্তার সান্যালই যে কালো ভ্রমর তাতে আর কোন সন্দেহই আমার রইল না। তারপর ডায়েরীটা খুলে পড়তে পড়তে একেবারে সকল সন্দেহের অবসান হল। কিন্তু একটা কথা তখনও বুঝতে পারিনি—মিঃ সেনের গাড়িতে 'K' লেখা হল কেমন করে? সেটাও পরে একটু ভাবতেই পরিষ্কার হয়ে গেল, ভাবলাম হয়তো সে রাত্রে মিঃ সেনের গাড়িটাই ডাক্তার নিয়ে এসেছিল।

এমন সময় মিঃ সলিল সেন বললেন, হ্যাঁ, ডাক্তার তাঁর গাড়িটা কারখানায় দেওয়া হয়েছে বলে বিকালের জন্য আমার টু-সীটারটা চেয়ে নিয়েছিলেন।

কিরীটী অমনি সহাস্যে বলে উঠল, তবে তো সব কিছুই ঠিক ঠিক মিলে গেছে। আর একটা কথা, সনৎবাবুকে যে রেঙ্গুনে আনবে এ কথায় স্থির-নিশ্চিত কেমন করে হয়েছিলাম আপনারা এখন হয়তো বুঝতে পেরে থাকবেন। কালো ভ্রমরের আগাগোড়াই ইচ্ছা ছিল যে, সে সকলকে নিজের এলাকার মধ্যে টেনে নিয়ে আসে। সে ভেবেছিল দলের একজনকে যদি টেনে নিয়ে আসা যায়, তবে সকলেই তার উদ্ধারের জন্য বর্মা পর্যন্ত ছুটে আসবে। তার অনুমানের বিষয় সে ডায়েরীতেও লিখে রেখেছে। বলা বাহুল্য, তার অনুমান ভুল হয়নি। এবং এও জানতাম ঐ সাঙ্কেতিক লেখাটা উদ্ধার করতে কালো ভ্রমর আমার গৃহে আসবেই এবং এসেছিলও।

তবে তার ব্যথার দিকটা অর্থাৎ কি কারণে অমরবাবু ও সনৎবাবুর ওপর তার একটা প্রতিহিংসার ভাব জেগে উঠেছে সেটা আমরা তার ডায়েরী পড়বার আগে পর্যন্ত টের পাইনি। এবং ঐখানেই ছিল আমার যত সন্দেহ।

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী তার কথা শেষ করল।

সব কথা শুনে তারা সবাই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে গেল।

* * *

প্রভাতী সূর্যের সোনালী আলোয় ইরাবতী হেসে যেন গড়িয়ে পড়ছে।

সুব্রত, রাজু আর কিরীটী ডাক্তারের মৃতদেহ ধীরে ধীরে ইরাবতীর বুকে ভাসিয়ে দিল। ঢেউয়ের তালে দেহটা ভেসে চলল।

সকলের চোখই অশ্রুভারে ঝলমল করে উঠল।

ইরাবতীর শান্ত শীতল জলের তলে কালো ভ্রমর ঘুমিয়ে রইল। স্রোতবিধৌত গৌতম পর্বতোপরি প্যাগোডা ও পর্বতগাত্রে খোদিত অসংখ্য বুদ্ধদেবের মূর্তি সূর্যের আলোয় অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কালো ভ্রমরের কি সত্যিই মৃত্যু হল?

এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? কে ও? কে?

তীয় পর্ব

বাবলু, দীপু, সীমু, টুকুকে—

আশীর্বাদক বাবা

কথামুখ

নিজ হাতে কালকূট নিজের শরীরে সংক্রামিত করে যে কালো ভ্রমর স্বেচ্ছামৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল মিয়াং মিয়াংয়ের মৃত্যুগুহায় ও যার প্রাণহীন (?) দেহ সাশ্রুনেত্রে ইরাবতীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে কিরীটী ও সুব্রত পরম নিশ্চিন্তে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিল, সেই সমাপ্ত কাহিনীরই যে আবার নতুন করে জের টানতে হবে কে ভেবেছিল? সত্যিই কি বিচিত্র এই মানুষের চরিত্র!

একটা অত্যাশ্চর্য প্রতিভা নিয়েই ডাঃ এস. সান্যাল কালো ভ্রমর জন্মেছিল, কিন্তু যেন দুর্ভাগ্যের অভিশাপে রাহুগ্রস্ত হয়ে নিজের জীবনটাকে তো সে নিজে তছনছ করে দিলই, সেই সঙ্গে অতবড় একটা প্রতিভারও ঘটল অপমৃত্যু।

এবং সেই অপমৃত্যু তিলে তিলে তাকে যেন গ্রাস করছিল, অজগর যেমন তার ধৃত শিকারকে একটু একটু করে ক্রমে গ্রাস করে তেমনি করেই।

দুইটি বৎসরের ব্যবধান।

ইরাবতীকূলের সেই প্রভাতেরই যেন সন্ধ্যা।

সুদূর বর্মা থেকে এবারে কাহিনী শুরু হল কলকাতার পটভূমিকায়।

মৃত্যুগুহা হতে টালিগঞ্জে স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণের মার্বল প্যালেসে!

সুব্রতর জবানীতেই এবারের কাহিনী।

শামুক যেমন খোলার মধ্যে আপনাকে মাঝে মাঝে গুটিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি কিরীটীকেও মাঝে মাঝে দেখছি বাইরের জগৎ থেকে যেন আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে অদ্ভুত আত্মস্বতন্ত্র এক জগতের মধ্যে যেন নিজেকে নির্বাসিত করত।

কয়েক মাস থেকে লক্ষ্য করছিলাম কিরীটীর সেই অবস্থা। বাড়ি থেকে কোথাও বের হয় না। নিজের ল্যাবরেটোরী ঘরে না হয় বসবার ঘরে সমস্ত দিনটা তো কাটায়ই, এমন কি কোন কোন দিন গভীর রাত পর্যন্তও কাটিয়ে দেয়।

এই সময়টা ও বন্ধুবান্ধব কারও সঙ্গেই বড় একটা দেখা করে না। আমিও দুদিন এসে ফিরে গেছি, কিরীটীর সঙ্গে দেখা হয়নি।

দু দিন এসে জেনেছি কিরীটী লাইব্রেরী ঘরেই আছে। কিন্তু আমি জানতাম মনের মধ্যে বাইরের জগৎ থেকে সে যখন নিজেকে এভাবে নির্বাসিত করে, তখন কাউকেই সে সহ্য করতে পারে না। সেই কারণেই আমিও তাকে বিরক্ত করিনি।

দিন দশেক বাদে গেলাম।

সেদিনও জানতে পারলাম কিরীটী সকাল থেকে তার ল্যাবরেটোরী ঘরের মধ্যেই আছে।

জংলীর কাছে সংবাদ নিচ্ছি এমন সময় সহসা ল্যাবরেটোরীর দরজা খুলে কিরীটী বের হয়ে এল এবং আমাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে বললে, এই যে সু, খবর কি? হঠাৎ? অনেকদিন এদিকে আসিস না!

আমি মৃদু হেসে বললাম, ঠিক উল্টোটি। আজকে নিয়ে তিন দিন। বরং তোরই পাত্তা নেই।

পাত্তা নেই মানে! আমি তো দু মাস ধরে বাড়ি থেকে কোথাও বেরই হই না।—

আবার বুঝি কোন জটিল মামলা হাতে নিয়েছিস?

মামলা নয়, মামলা-কাহিনী। বলে জংলীর দিকে তাকিয়ে বললে, এই, চা নিয়ে আয়।

জংলী আদেশ পালনের জন্য ঘর হতে বের হয়ে গেল।

মামলা-কাহিনী মানে? বিস্মিতভাবে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

একটা আত্মচরিত লিখছি।

আত্মচরিত লিখছ?

হ্যাঁ। তবে আত্মচরিত সাধারণত যে-রকমটি হয়, এ সে-রকম নয়। আত্মচরিতের 'আত্মা'টিকে বাদ দিয়ে কেবল জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে সাজিয়ে যাচ্ছি পর পর।

সত্যি?

হ্যাঁ!

॥ ১ ॥

কিছুদিনের ব্যাপার।

হাতে কোন কাজকর্ম নেই বলে কিরীটী তার বৈচিত্র্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখছিল। রাত্রে সে লিখত এবং যতটুকু লেখা হত পরদিন প্রত্যুষে সেটা পাঠিয়ে দিত আমাকে পড়তে।

আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই সমস্ত দুপুরে পড়ে সেটা আবার সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দিতাম।

সত্যিই ডায়েরীটা পড়তে বেশ ভাল লাগছিল।

গতকাল সকালে কী একটা জরুরী কাজে কিরীটী রাণাঘাট গেছে। ডায়েরীটা তাই আমার কাছেই রয়ে গেছে।

নতুন করে আর কিছু লেখা হয়নি।

বিকালের দিকে সে আমাকে রিং করে জানিয়েছে—রাত্রে আমাদের দুজনের কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ আছে; সে এখানেই আসবে, তারপর সন্ধ্যার পর দুজনে একসঙ্গে বেরুবে; আমি যেন প্রস্তুত হয়ে থাকি। ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বেজে গেল।

শীতের রাত্রি, তারপর আবার সন্ধ্যা থেকেই টিপ্ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে। শীতের হিমেল হাওয়া মাঝে মাঝে উত্তর দিকের জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছে বেপরোয়া। ঠাণ্ডা গায়ে যেন ছুঁচ ফোটাচ্ছে।

সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে কিরীটীর আত্মজীবনীটা আবার খুলে বসলাম।

গতকাল ডায়েরীর একটা জায়গা পড়তে পড়তে সত্যিই অদ্ভুত লেগেছিল।

সেই জায়গাটাই আবার পড়া শুরু করলাম :

এ জীবনে অনেক কিছুই বিচিত্র ও অদ্ভুত দেখলাম। কিন্তু নিশাচরদের মত ভয়ঙ্কর বোধ হয় আর কিছুই নেই। আধুনিক সভ্য সমাজে "নিশাচরের" অভাব নেই। সাক্ষাৎ শয়তানের যেন প্রতীক এরা, দিনের আলোয় এদের দেখলে চিনতে পারবে না কেউ। অতি শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র, বিনয়ী, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন, কিন্তু যত রাতের অন্ধকার একটু একটু করে পৃথিবীর বুকে ঘনিয়ে আসে, চারিদিক হয়ে আসে নিঝুম, ক্ষুধিত হায়নার মতই ঐ তথাকথিত নিশাচরেরা তখন যেন হয়ে ওঠে রক্তলোলুপ ও হিংস্র ভয়ঙ্কর। তখন এদের দেখলে আঁতকে উঠবে নিশ্চয়ই। তাই বলছিলাম, যদি কোন গভীর রাত্রে কখনও এই শহরেও ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত শোন, দরজা খুলো না। সাবধান, কে বলতে পারে...

এই পর্যন্ত লিখেই হয়তো সে রাতের মত শেষ করেছে। কেননা এর পর আর কিছু লেখা নেই।

গায়ের মধ্যে যেন কেমন সির্ সির্ করে ওঠে। গায়ের লোমকূপগুলো খাড়া হয়ে ওঠে কি একটা দুর্জ্ঞেয় ভয়ে।

একটা অশরীরী ছায়ার মত অদ্ভুত আশঙ্কা যেন মনের মধ্যে মাকড়সার বাঁকানো বাঁকানো রোমশ সরু সরু কুৎসিত ঠ্যাং ফেলে ফেলে এগিয়ে আসে!

বাইরের দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গেল।

কে? উঠে দরজাটা খুলে দিতেই কিরীটী এসে ঘরে প্রবেশ করল, সুব্রত, রেডি?

হ্যাঁ। মৃদুস্বরে জবাব দিলাম। তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এক্ষুনি বের হবে তো?

না। বাড়িতে ঢুকেই মাকে বলে এসেছি এক কাপ গরম কফি পাঠিয়ে দিতে। বলতে বলতে কিরীটী একটা সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিল, উঃ কি ঠাণ্ডা পড়েছে, দেখেছিস? এক কাপ স্ট্রং এবং গরম কফি না হলে আর যেন যুৎ হচ্ছে না।

অদূরে রক্ষিত টেবিল-ল্যাম্পের আলোর খানিকটা কিরীটীর মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। আজ কিরীটীর পরিধানে সার্জের অ্যাস-কলারের সুট, গলায় সাদা শক্ত উঁচু কলার ও বড় বড় রক্তলাল বুটি দেওয়া টাই, ব্যাকব্রাশ করা চুল। সুক্ষ্ম মৃদু একটা অতিমিষ্টি ল্যাভেন্ডারের গন্ধ ঘরের বাতাসকে আমোদিত করে তুলেছে।

কিরীটীর চিরকালের অদ্ভুত শান্ত মুখখানা যেন আজ আরও শান্ত ও গম্ভীর মনে হচ্ছিল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, এ বেশ কেন বন্ধু? একেবারে বিলিতী!

আজ আমরা কোথায় নিমন্ত্রণে চলেছি জানিস?

কোথায়? প্রশ্ন কললাম।

বিশালগড়ের কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের জন্মতিথি উৎসব আজ।

কোন দীপেন্দ্রনারায়ণ? সকৌতুকে প্রশ্ন করলাম।

স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে নিশ্চয়ই ভুলিসনি। যাঁর মাথা খারাপ হয়েছে বলে বছর দুয়েক আগে রাঁচির পাগলা গারদে রাখা হয়েছিল?

কোন স্যার দিগেন্দ্র, বিখ্যাত সেই সায়েন্টিস্ট না? আমি প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ। স্যার দিগেন্দ্র আর গণেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন দুই ভাই। গণেন্দ্রনারায়ণ বড়, আর দিগেন্দ্র ছোট। দিগেন্দ্র অবিবাহিত, আজন্ম ব্রহ্মচারী। গণেন্দ্রর একটি মাত্র ছেলে—ঐ দীপেন্দ্র। দীপেন্দ্রর যখন বছর ষোল বয়স তখন হঠাৎ তাঁর ভয়ানক অসুখ হয়। স্যার দিগেন্দ্র শহরের সমস্ত বড় বড় ডাক্তারকে ডাকলেন, অনেক চেষ্টা করা হল, কিছুতেই কিছু হয় না। এমন সময় এক সন্ধ্যায় ডাক্তারেরা শেষ জবাব দিয়ে গেলেন। বলতে বলতে কিরীটী থামল, বাইরে তখন সমগ্র আকাশ আসন্ন ঝড়ের ইশারায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

তারপর? রুদ্ধশ্বাসে কিরীটীর কথা শুনছিলাম।

তারপর সেই রাত্রেই দীপেন্দ্রনারায়ণ মারা গেলেন। সে রাত্রে ঝড়-জলের মধ্যেই দাহকারীরা শবদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ভৃত্য এসে কাচের একটা প্লেটের ওপর ছোট একটা কাচের জাগে ভর্তি ধূমায়িত কফি দিয়ে গেল।

কিরীটী জাগটা তুলে নিল।

গরম কফিতে মৃদু চুমুক দিতে লাগল।

সারাটা শহর সে রাত্রে ঝড়-জলে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। জনহীন রাস্তা, শুধু মাঝে মাঝে অল্প দূরে গ্যাসপোস্টগুলো একচক্ষু ভূতের মতই যেন এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। দাহকারীরা শবদেহ নিয়ে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে দুর্যোগ মাথায় করেই।

কেওড়াতলার কাছাকাছি আসতে সহসা একটা প্রকাণ্ড কালো রংয়ের সিডনবডি গাড়ি ওদের পথ রোধ করে এসে দাঁড়াল। গাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা একটা লোক, হাতে তার উদ্যত একটা রিভলভার। রিভলবারের ইস্পাতের চোংটা চকচক করে ওঠে। লোকটা কঠিন আদেশের সুরে বললে, শবদেহ এখানে রেখেই তোমরা চলে যাও। লোকগুলো প্রাণের ভয়ে শবদেহ রাস্তার ওপরে ফেলে দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

বাড়িতে যখন ওরা কোনমতে ফিরে এল, রাত্রি তখন অনেক। বাইরের ঘরে একাকী স্যার দিগেন্দ্র ভূতের মত পায়চারি করছিলেন। সব কথা ওরা স্যার দিগেন্দ্রকে একটু একটু করে খুলে বললে। স্যার দিগেন্দ্র ওদের মুখে সমস্ত কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ; পুলিসে খবর দেওয়া হল, কিন্তু শবদেহের কোন কিনারাই আর হল না। শবদেহের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা মিস্ট্রি হয়েই থেকে গেল।

কিরীটী নিঃশেষিত কফির কাপটা টিপয়ের ওপর নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, ওঠ সু, সময় হয়েছে, বাকিটা গাড়িতে বসে বসে শেষ করব। পাশের ঘরেই দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা ঘোষণা করলে।

বাড়ির দরজাতেই রাস্তায় কিরীটীর সদ্যক্রীত কালো রংয়ের সিডনবডি প্লাইমাউথ গাড়িখানা শীতের অন্ধকার বাদলা রাত্রির সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন একপ্রকার নিশ্চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিখ ড্রাইভার হীরা সিং আমাদের দরজার একপাশে নিঃশব্দে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা দুজনে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম; হীরা সিংও আমাদের পিছু পিছু এসে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম দুজন ভদ্রলোক আগে থেকেই গাড়িতে চুপ করে বসে ছিলেন। আমি কোন প্রশ্ন করবার আগেই কিরীটী বললে, এঁরা দুজন আমাদের সঙ্গেই যাবেন।

বুঝলাম কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওঁরা আমাদের সঙ্গে চলেছেন। গাড়ি স্টার্ট দিল।

কিরীটী হীরা সিংকে সম্বোধন করে বললে, বেহালা, কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের মার্বেল হাউস। নিঃশব্দ গতিতে গাড়ি ছুটল।

শীতের অন্ধকার রাত্রি কালো মেঘের ওড়না টেনে দিয়ে নিঃশব্দে টিপ টিপ করে অশ্রুবর্ষণ করছে। এর মধ্যেই শহরের দোকানপাট একটি দুটি করে বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। কিরীটী নিঃশব্দে গাড়ির সীটে গা এলিয়ে দিয়ে একটা চুরুট টানছিল। কিরীটীর ওষ্ঠধৃত চুরুটের জ্বলন্ত অগ্রভাগটা যেন একটা আগুনের চোখের মত অন্ধকারে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সহসা এক সময় সেই কঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিরীটীই প্রথমে কথা বললে, তারপর দীর্ঘ বারো বছর পরে সেই দীর্ঘ বারো বছর আগেকার শ্মশান-রাত্রির স্মৃতি যেন আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। সহসা এক সন্ধ্যায় সেই মৃত দীপেন্দ্রনারায়ণ অকস্মাৎ সজীব হয়ে ফিরে এলেন। এসে বললেন, একদল নাগা সন্ন্যাসী সেই রাত্রির শ্মশান থেকে মৃত বলে পরিত্যক্ত তাঁর দেহ কুড়িয়ে এনে কি সব তন্ত্রমন্ত্র ও বন্য ঔষধ খাইয়ে বাঁচিয়ে তোলে। বছর পাঁচেক বাদে তাদের কবল থেকে কোনক্রমে তিনি পালিয়ে এসেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য, হঠাৎ পথিমধ্যেই একদল দস্যুর পাল্লায় গিয়ে পড়লেন। আট বছর তাদের কাছে বন্দী থাকার পর এক রাত্রে অদ্ভুত উপায়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। বিচিত্র রহস্যময় সে কাহিনী।

কিছুক্ষণ থেমে আবার কিরীটী শুরু করে, স্যার দিগেন্দ্র অবিশ্যি প্রথমে ভাইপোকে বিশ্বাস করতে পারেননি। কিন্তু ভাইপো অনেককিছু প্রমাণের দ্বারা কাকার সমস্ত সন্দেহের নিরবসান করে দিলেন। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে নিঃসন্দেহে গণেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র সন্তান 'দীপেন্দ্র' বলে মেনে নিলেন। এবং অতঃপর স্যার দিগেন্দ্র ভাইপো দীপেন্দ্রকে প্রাসাদে স্থান দিলেন। এরপর কিছুদিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন শোনা গেল স্যার দিগেন্দ্রের নাকি কেমন মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। দিনের বেলায় লোকটি ধীর স্থির, অত্যন্ত ভদ্র ও অমায়িক; কিন্তু রাত্রি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর মাথায় খুন চাপে; ধারালো ছুরি বা ক্ষুর নিয়ে সামনে যাকে দেখেন তাকেই খুন করতে যান। ডাক্তার এল, বললে রোগটা ভাল না। অত্যধিক চিন্তার ফলে নাকি এরকমটি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিলেন রোগীকে প্রথম সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হবে। এমনি করেই কিছুদিন চলল, সহসা এক রাত্রে স্যার দিগেন্দ্র কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণকেই ধারালো একটা ক্ষুর দিয়ে কাটতে উদ্যত হলেন।

হ্যাঁ, আমিও খবরের কাগজে এ ব্যাপারটা পড়েছি। বললাম, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলেন সেদিন কুমারসাহেব। এবং তারপরই স্যার দিগেন্দ্রকে রাঁচির পাগলা-গারদে ভর্তি করে দেওয়া হয়, না?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ।

এখনও বোধ হয় পাগলা-গারদেই আছেন? বেচারী! অত বড় একটা প্রতিভাসম্পন্ন লোক!

না, মোটেই না। কিরীটী মৃদু হেসে বললে, তোমারা জান লক্ষপতি স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে রাঁচির পাগলা-গারদে একটা প্রাইভেট সেলে বছর তিন আগে যেমন রাখা হয়েছিল, এখনও বুঝি তেমন আছেন?

তবে? বিস্মিত দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম।

বছর দুই হল সহসা এক রাত্রে স্যার দিগেন্দ্র সবার অলক্ষ্যে পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে যান।

বল কি! তারপর?

তারপর, তারপর আর কি? পুলিস ও আই. বি. ডিপার্টমেন্টের লোকেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর টিকিটির দর্শন আজ পর্যন্ত পাননি। তারপর একটু থেমে কিরীটী বললে, কিন্তু মাত্র সপ্তাহখানেক হল একটা মজার সংবাদ পাওয়া গেছে। সংবাদটা অবিশ্যি অত্যন্ত গোপনীয়, আই. বি. ডিপার্টমেন্টের এক কনফিডেনসিয়াল ফাইলেই মাত্র টোকা আছে।

আমি রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলাম, কী?

মাস দুই আগে খবরের কাগজে বিখ্যাত ডাঃ রুদ্রের অদ্ভুতভাবে নিহত হবার কথা পড়েছিলি, মনে আছে সু?

মৃদুস্বরে বললাম, মনে আছে বৈকি!

কিরীটী প্রায়-নিভন্ত চুরুটটা গাড়ির জানালা গলিয়ে ফেলে দিল। তারপর বলতে লাগল, সমগ্র ভারতবর্ষে ডাঃ রুদ্রের মত Plastic Surgeryতে (গঠনমূলক-অস্ত্র-চিকিৎসা) অদ্ভুত পারদর্শিতা আর কারও ছিল না। তিনি দেহ ও মুখের ওপর অস্ত্র দিয়ে

সামান্য কিছু কাটাকুটি করে দেহ ও মুখের চেহারা এমনভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারতেন যে, তাকে পরে আর আগেকার সেই লোক বলে চিনবারও কোন উপায় পর্যন্ত থাকত না।

কিন্তু ডাঃ রুদ্র যেমন একদিকে ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন, অন্যদিকে ছিলেন তেমনি একটু বেশ আধপাগলাটে ধরনের ও খামখেয়ালী প্রকৃতির। লোকটার একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল, প্রত্যেক রবিবার রাঁচির পাগলা-গারদে গিয়ে বেছে বেছে যারা criminal পাগল, তাদের সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা বলে বহু সময় কাটিয়ে আসা। ডাক্তার রুদ্র আগে যখন কলকাতায় প্র্যাকটিস করতেন, শোনা যায় তখনও তিনি নাকি বছরের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ বার রাঁচি ও বহরমপুরের পাগলা-গারদে ছুটে যেতেন। শেষটায় বছর দুই হল কলকাতার প্র্যাকটিস তুলে দিয়ে রাঁচিতে গিয়েই সুন্দর চমৎকার একটা বাড়ি তৈরী করে নানকুমে স্থায়ীভাবে বসবাস ও প্র্যাকটিস শুরু করেন। ডাক্তার রুদ্র ছিলেন আজন্ম ব্রহ্মচারী। মাস দুই আগে অকস্মাৎ একদিন অতি প্রত্যুষে ডাঃ রুদ্রের দেহহীন মস্তকটি তাঁরই ল্যাবরেটারী ঘরের কাচের টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা কাচের জারের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। পুলিস অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর দেহটি খুঁজে পায়নি। কাটা মাথাটা দেখে স্পষ্টই মনে হয়, কোন ধারালো অস্ত্র দিয়েই নিখুঁতভাবে দেহ থেকে মাথাটা পৃথক করে নেওয়া হয়েছিল। কিরীটী আবার একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করল। গাড়ি তখন কালীঘাট ব্রীজ ক্রস করে ছুটে চলেছে বেলভেডিয়ার রোড ধরে।

শীতের জলসিক্ত হিমেল হাওয়া চলন্ত গাড়ির মুক্ত জানালা-পথে প্রবেশ করে নাকে মুখে আমাদের যেন সূঁচ ফোটাচ্ছিল। জ্বলন্ত সিগারের লাল আগুনের আভায় ঈষৎ রক্তাভ কিরীটীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চুপটি করে বসে রইলাম।

কিরীটী আবার বলতে লাগল, পুলিসের ধারণা স্যার দিগেন্দ্রই নাকি হতভাগ্য ডাঃ রুদ্রের হত্যার ব্যাপারে অদৃশ্যভাবে লিপ্ত।

কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

কেন, তা ঠিক বলতে পারব না। কিরীটী বলতে লাগল, পুলিসের লোকেরা ডাঃ রুদ্রের অ্যাসিট্যান্ট ডাঃ মিত্রের কাছে কতগুলো কথা জানতে পারে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাঃ মিত্র বলেন, একটি পেসেন্ট নাকি ডাক্তারের নিহত হবার দিন দশেক আগে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসে এবং ডাক্তার নিজেই একা একা পেসেন্টকে ক্লোরোফর্ম করে তার মুখে অপারেশন করেন, পেসেন্টেরই ইচ্ছাক্রমে, ডাঃ মিত্রের কোন সাহায্য না নিয়ে। অ্যাসিস্ট্যান্ট মিত্র অবিশ্যি জীবনে কখনও স্যার দিগেন্দ্রকে দেখেননি বা চিনতেনও না এবং লোকটি যে ঠিক কেমন দেখতে তাও তিনি বলতে পারেননি। ডাঃ মিত্রের জবানবন্দি থেকে জানা যায়, সেই পেসেন্ট ডাক্তারের সঙ্গে অন্ধকার ঘরে বসে নাকি কথাবার্তা বলত; তবে অপারেশনের পর রাত্রে একবার অ্যাসিস্ট্যান্টটি পেসেন্টকে পথ্য ও ঔষধ খাওয়াতে কয়েকবার গিয়েছিল তার সামনে; কিন্তু তখন পেসেন্টের সমস্ত মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা, চিনবার উপায় ছিল না। অপারেশনের দিন দুই বাদে এক গভীর রাত্রে পেসেন্ট ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। আগেই বলেছি, শহরের একধারে ছিল ডাঃ রুদ্রের বাড়ি।

তারপর? আমি প্রশ্ন করলাম।

তারপর সেইরাত্রে একজন লোককে নাকি কালো একটা ওভারকোট গায়ে, মাথায় একটা কালো টুপি চোখের পাতা পর্যন্ত নামানো ডাক্তারের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে একজন প্রহরারত পুলিস দেখেছিল। প্রহরারত পুলিসটা তখন নাকি সেই রাস্তা দিয়েই ফিরছিল। পুলিস যাকে সেই রাত্রে ডাঃ রুদ্রের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখেছিল সেই লোকটি পুলিসের দিকে একটিবারও না তাকিয়ে তার পাশ দিয়েই রাস্তা ধরে নাকি চলে যায় খোসমেজাজে একটা গানের সুর শিশ্ দিতে দিতে। পুলিস তাকে সন্দেহ করেনি, কারণ তাকে সে কোন একজন সাধারণ পথচারীই ভেবেছিল।

আগেই বলেছি, পরদিন ভোরবেলা ডাক্তারের মুণ্ডুটা তাঁরই ল্যাবরেটারী ঘরে টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা কাচের জারের মধ্যে পাওয়া যায়। সে যাই হোক, এই এতগুলো ঘটনাকে যদি এক সূত্রে গাঁথা যায় তবে একটা কথা বিশেষভাবে মনের মধ্যে স্বতঃই উদিত হয়।

কী? আমি প্রশ্ন করলাম।

স্যার দিগেন্দ্র বোধ হয় এখনও জীবিত। এবং তাঁর সেই বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা—

কিরীটী হঠাৎ চুপ করে গেল।

কিরীটী কি বলতে বলতে থেমে গেল জানি না, তবে আমার মনে হল স্যার দিগেন্দ্র এখনও যেন রাতের অন্ধকারে বিকৃত একটা রক্ত-নেশায় কুমার দীপেন্দ্রের পিছু পিছু ছায়ার মতই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মনটার মধ্যে যেন সহসা কি একটা অজানিত আতঙ্কে ছাঁত করে উঠল।

একটা অদৃশ্য ভয় যেন অন্ধকারে অক্টোপাশের মতই ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল অষ্টবাহু দিয়ে আমার চারিপাশে ঘন হয়ে উঠেছে।

গাড়ির মধ্যকার মৃদু নীলাভ আলোয় কিরীটীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম- কিরীটীর দুটি চক্ষু বোজা।

কি এক গভীর চিন্তায় যেন সে তলিয়ে গেছে।

বাকি দুজন ভদ্রলোক, যাঁরা ঠিক আমার পরেই সেই একই সীটে পাশাপাশি বসে, অন্ধকারে তাঁদের মুখগুলো যেন পাথরের মতই কঠিন ভাবহীন।...

আমি চোখটা ফিরিয়ে নিলাম।

॥ ২ ॥

গাড়িটা একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। একটা মৃদু গোলমাল অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত আমাদের কানে এসে বাজল।

আমরা এসে গেছি সুব্রত। চল নামা যাক। কিরীটী বললে।

আমরা দুজনে গাড়ি থেকে নামলাম প্রথমে এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুজন ভদ্রলোকও গাড়ি থেকে নামলেন।

কুমার দীপেন্দ্রর প্রাসাদতুল্য মার্বেল প্যালেস আজ নানা বর্ণের আলোকমালায়, ফুল ও পাতাবাহারে সুশোভিত। সবুজ, নীল, লাল নানা বর্ণবৈচিত্র্য আলোর নয়নাভিরাম দৃশ্য

বহু সুবেশ ও সুবেশা নরনারীর কলকাকলীতে সমগ্র প্রাসাদটি মুখরিত।

দরজার গোড়ায় একজন ভদ্রলোক অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে সাদর আহ্বান জানালেন। বললেন, আসুন আসুন।

কিরীটী তার পরিচয় দিতেই সেই ভদ্রলোক বললেন, ওঃ, আপনি মিঃ কিরীটী রায়? কুমারসাহেব ওপরে আছেন—সোজা ওপরে চলে যান।

সামনে একটা সুপ্রশস্ত মার্বেল পাথরে বাঁধানো টানা বারান্দা গোছের। ডানদিকে প্রকাণ্ড একখানি হলঘর। সেখানে টেবিল চেয়ার পেতে আধুনিক কেতায় অতিথি অভ্যাগতদের খাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই হলঘরের বাঁ দিকে একটি ছোট ঘর, কয়েকখানি সোফা পাতা, সাত-আটজন ভদ্রলোক খোসগল্পে মগ্ন।

ঘরে ঘরে অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। বারান্দার এক পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি, সেটাও মার্বেল পাথরের তৈরী। ভদ্রলোকের নির্দেশমত আমরা সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলের দিকে অগ্রসর হলাম।

দ্বিতলে উঠে কিরীটী সঙ্গের সেই দুইজন ভদ্রলোককে যেন নিম্নকণ্ঠে কি বললে, তারা সঙ্গে সঙ্গে নীচে চলে গেল। আমরা অতঃপর দোতলায় উঠেই সামনে যে প্রকাণ্ড হলঘর, সেই হলঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম। প্রচুর সাজ-সজ্জায় ও আলোকমালায় যেন ইন্দ্রপুরীর মতই মনে হচ্ছিল ঘরটাকে।

ঘরের মেঝেতে দামী পুরু লাল রংয়ের কাশ্মীরী কার্পেট বিছানো। হলঘরের সংলগ্ন একটা নাতি-প্রশস্ত ঘর দেখা যায়। হলঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করে পর পর পাশাপাশি দুটি দরজায় দামী সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে; এবং পর্দা ভেদ করে সেই ঘর থেকে আনন্দ-কলরব কানে ভেসে আসে মাঝে মাঝে।

হলঘরের মধ্যে ছোট ছোট সব গোলাকার টেবিল পেতে তার চারপাশে চেয়ার রাখা হয়েছে। ভদ্রলোকেরা সেই চেয়ারে বসে চা ও সরবৎ সহযোগে খোসগল্পে মত্ত।

একজন ভদ্রলোককে দেখে কুমারসাহেবের খোঁজ নিতেই, কুমারসাহেব ঐ সামনের ঘরে আছেন বলে ভদ্রলোকটি দুই দরজাওয়ালা ঘরটি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। আমরা এগিয়ে গেলাম।

ঘরের ঠিক নীচে দিয়েই ট্রাম-রাস্তা চলে গেছে। ট্রাম-রাস্তার দিকে মুখ করে ঘরে প্রায় পাঁচ-ছটি জানলা, প্রত্যেকটিতে দামী নেটের বাহারে পর্দা টাঙানো। ঘরের বাঁ দিকে কতকগুলো দেয়াল-আলমারির মত আছে, তাতেও পর্দা ঝুলানো। বোধ হয় সেগুলিতে জিনিসপত্র রাখা হয়। ঘরের ডান দিকের দেওয়ালটা ঘরের ছাদ থেকে ডিমের মত ঢালু হয়ে যেন মেঝেতে নেমে এসেছে; মাঝখানে একটা দরজা। ঘরের মধ্যে সোফা ও চেয়ারে বসে কয়েকটি ভদ্রলোক গল্প করছেন। কুমারসাহেব সেখানে নেই।

মাঝে মাঝে উচ্চহাসির রোল উঠছে।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে দামী ফ্রেমে সব সুদৃশ্য ছবি ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের চারপাশে বসে চারজন ভদ্রলোক তাস খেলছেন।

ঘরে ঢুকে যেটাকে গা-আলমারি মনে হয়েছিল, হঠাৎ সেই দিকের পর্দার আড়াল থেকে একটা হাসির শব্দ শোনা গেল; কিরীটী আর আমি দুজনেই চমকে সেদিকে ফিরে তাকালাম।

ঐ যে কুমারসাহেবের গলা, চল্ পর্দার ওধারে বসে আছেন বোধ হয়! কিরীটী আমার হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ করল।

দুজনে পর্দার দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিরীটীর অনুমানই ঠিক। গা-আলমারি না হলেও অনেকটা গা-আলমারির মত খানিকটা জায়গা। সেখানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি ভেলভেটমোড়া দামী সোফা পাতা। এবং তার সামনে ঐ আকারেরই একটি ছোট্ট টেবিল। টেবিলের ওপর নীল রংয়ের ঘেরাটোপে ঢাকা একটি ক্ষুদ্র টেবিলল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলল্যাম্পের মৃদু নীলাভা আলো সামনে ঝুলন্ত নীল রংয়ের পর্দার সঙ্গে যেন মিশে একাকার হয়ে গেছে—তাই ওদিক থেকে তেমন বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি।

সোফার ওপর সাহেবী বেশ পরিহিত চোখে কালো কাচের চশমা একজন ভদ্রলোক ও অন্য একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে মৃদুস্বরে গল্প করছিলেন, আমাদের দেখে সাহেবী পোশাক পরিহিত ভদ্রলোকটি উঠে দাঁড়ালেন এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন, হ্যালো মিঃ রায়, গুড ইভনীং! ইনিই বোধ হয় মিঃ সুব্রত রায়? আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

কিরীটী নমস্কার করে বললে, হ্যাঁ কুমারসাহেব, ইনিই সুবিখ্যাত মিলিওনিয়ার সুব্রত রায়, আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকারী।

কিরীটীর কথায় বুঝলাম বক্তাই কুমারসাহেব।

কুমারসাহেবের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। নাতিদীর্ঘ সবল দেহাবয়ব; মাথায় লম্বা কাঁচা-পাকা চুল, মাঝখানে সিঁথি কাটা, পরিধানে দামী সার্জের সুট, চোখে একজোড়া রঙিন কাচের চশমা। তাছাড়া মুখের ভাব অত্যন্ত শান্তশিষ্ট প্রকৃতির।

এই সময় দ্বিতীয় প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা তিনজনে সোফার ওপর কুমারসাহেবের নির্দেশক্রমে উপবেশন করলাম।

ইনিই আমাদের কুমারসাহেব দীপেন্দ্রনারায়ণ, সুব্রত। কিরীটী বললে আমার দিকে এবারে তাকিয়ে।

একজন বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ-ভর্তি ধূমায়িত চা ও প্লেটে করে কিছু প্লাম্‌কেক দিয়ে গেল। ট্রের ওপর হতে একটা ধূমায়িত চায়ের কাপ তুলে নিয়ে কাপে মৃদু চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বলল, জানিস, ভারী বৈচিত্র্যপূর্ণ এঁর জীবনকথা সুব্রত!

এমন সময় দামী সুটপরা একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক পর্দা তুলে এসে সেখানে প্রবেশ করলেন।

হ্যালো ডাঃ চট্টরাজ! কলকাতায় কবে ফিরলেন? কিরীটী সোল্লাসে বলে উঠল।

এই তো কদিন হল। তারপর রায়, তোমার সংবাদ কী বল? ডাঃ চট্টরাজ কিরীটীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন এবং সহাস্যমুখে বললেন, দাও হে রহস্যভেদী, একটি বর্মা সিগার দাও তোমার। অনেক দিন খাইনি। খেয়ে দেখি।

কিরীটী মৃদু হেসে তার পকেট থেকে সুদৃশ্য হাতীর দাঁতের সিগারকেসটা বের করে ডাক্তারকে একটা সিগার দিল।

কুমারসাহেব বললেন, ডাঃ রায়, আপনারা ততক্ষণ আলাপ করুন, আমি ওদিকটা একটু দেখে আসি।

কুমারসাহেব চলে গেলেন।

তারপর ডাক্তার, আপনি এক সময় স্যার দিগেন্দ্রের চিকিৎসা করেছিলেন না? কিরীটী প্রশ্ন করলে ডাঃ চট্টরাজের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

হ্যাঁ, সে প্রায় বছর তিন সাড়ে তিন আগেকার কথা। কিন্তু তাহলেও তাঁর সম্পর্কে সবকিছুই আমার আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

একটা কথা আপনাকে আজ জিজ্ঞাসা করব ডাঃ চট্টরাজ?

বলুন!

আচ্ছা, স্যার দিগেন্দ্রের সত্যসত্যই মাথার কোন গোলমাল হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

ডাঃ চট্টরাজ যেন অল্পক্ষণ কি একটু ভাবলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, দেখুন, আমার যতদূর মনে হয়, ভদ্রলোকের Hyperoes-thisia ছিল। তাঁর মধ্যে প্রায়ই একটা খুনোখুনি করবার যে tendency জেগে উঠেছিল তাতে ও ধরনের ব্যাপারকে Lust Murder বলা যায়, অর্থাৎ যাকে সহজ ভাষায় খুন করবার একটা ইচ্ছা বলা চলে এবং স্যার দিগেন্দ্রের মত ঠিক ঐ ধরনের 'কেস' আমার ডাক্তারী-জীবনে চোখে বড় একটা পড়েনি। ডাক্তারী শাস্ত্র ও নানা প্রকারের নজির থেকে বলা যায়, এ ধরনের মনের বিকৃতি যাদের হয় তারা প্রিয়জনের বড় একটা ক্ষতি করে না। অথচ আশ্চর্য, স্যার দিগেন্দ্র তাঁর অতি প্রিয় ভাইপোকেই শেষটায় খুন করতে গিয়েছিলেন। ভাগ্যে বেচারা চিৎকার করে লোকজন জড়ো করে; তা ছাড়া কুমারসাহেবের গায়েও অসীম ক্ষমতা ছিল। ভদ্রলোককে অমন হাবাগবা বোকাটে ধরনের দেখতে হলে হবে কি, গায়ে শুনেছি নাকি অসুরের মতই ক্ষমতা রাখেন।

ডাক্তার আবার বলতে লাগলেন, আমি তখন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পুরী বেড়াতে গেছি, সেই সময় হঠাৎ একদিন সকালে কুমারসাহেবের বাড়ি থেকে call পেয়ে স্যার দিগেন্দ্রকে দেখতে যাই। সেও আজ বছর কয়েক আগেকার কথা। সকালবেলা রোগী দেখতে গেলাম। পুরীতে সমুদ্রের ধারেই ওঁদের সুন্দর একখানা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি আছে। স্যার দিগেন্দ্র তখন বারান্দায় একটা ডেকচেয়ারে বসে শেক্সপীয়র পড়ছিলেন; কুমারসাহেবও তাঁর কাকার পাশেই বসেছিলেন, আলাপ পরিচয় হবার পর স্যার দিগেন্দ্র আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দীপু আমার জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ডাক্তার চট্টরাজ।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, কেন?

স্যার দিগেন্দ্র জবাবে বললেন, ওর ধারণা আমার কিছুদিন থেকে রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না বলে শীঘ্রই নাকি অসুস্থ হয়ে পড়ব।

বলতে গেলে অতঃপর কুমারসাহেবের বিশেষ অনুরোধেই স্যার দিগেন্দ্রকে আমি পরীক্ষা করি এবং আশ্চর্য, আমি স্যার দিগেন্দ্রকে খুব ভালভাবেই পরীক্ষা তো করলামই এবং অনেকক্ষণ ধরে সে-রাত্রে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও বললাম, দেখলাম মাথার কোন গোলমাল নেই, চিন্তাশক্তিও স্বাভাবিক শান্ত ও ধীর, মস্তিষ্কের কোন রোগের লক্ষণই পাওয়া গেল না। তবে পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানতে গিয়ে একটা জিনিস পাওয়া গেল।

কী? কিরীটী সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

ডাক্তার বলতে লাগলেন, ওঁদের ফ্যামিলিতে নাকি কবে কোন্ এক পূর্বপুরুষের

'এপিলেপ্‌সি' (অনেকটা ফিটের মত ব্যারাম) ছিল। যাহোক স্যার দিগেন্দ্রকে পরীক্ষা করে দেখলাম, দেহ তাঁর বেশ সুস্থ ও সবল এবং রোগের কোন লক্ষণমাত্রও নেই। তবে চোখের দৃষ্টি-শক্তি একটু কম ছিল। সম্ভবত অতিরিক্ত পড়াশুনোর জন্যই সেটা হয়ে থাকবে। লোকটি উঁচু, লম্বা, বলিষ্ঠ গঠন। চোখের তারা দুটো অন্তর্ভেদী ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ভদ্রলোক বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। কথায় কথায় এক সময় স্যার দিগেন্দ্র বললেন, বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে একটিবার আসবেন ডাক্তার, আপনাকে আরও গোটাকতক কথা বলব।

জবাবে বললাম, বেশ তো। এবং কথামত বিকেলের দিকে সমুদ্রের ধারে স্যার দিগেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। খানিকটা ঘুরে বেড়াবার পরই সন্ধ্যা হয়ে এল। সমুদ্রের ধারে একটু অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থান দেখে নিয়ে বালুবেলার ওপরেই দুজনে পাশাপাশি বসলাম। নানা ধরনের গল্প করতে করতে সহসা একসময় স্যার দিগেন্দ্র আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, দেখুন ডাক্তার, দীপু যাই বলুক না কেন, আমার নিজের ব্যাপারটা আমি নিজেই আপনাকে বুঝিয়ে বলছি শুনুন।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে স্যার দিগেন্দ্র বলতে লাগলেন, সত্যি বলতে কি, আমার মনে সত্যি সত্যি কোন abnormal idea বা instinct বা কোন কুৎসিত ভয়ঙ্কর গোপন ইচ্ছা লুকিয়ে আছে কিনা আমি নিজেই তা জানি না বা আজ পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও কোনদিন টেরও পাইনি। আর এও আমি মনে করি না, যদিবা অমন কুৎসিত ভয়ঙ্কর কোন গোপন ইচ্ছা আমার মনের কোথাও থাকেই, সেটা আমার পুরুষানুক্রমে পাওয়া। আমার নিজের যতদূর মনে হয়, ছেলেবেলা হতেই অদ্ভুত অদ্ভুত সব বই পড়ে পড়ে ও-রকম একটা কুৎসিত ভয়ঙ্কর ইচ্ছা আমার মনে মাঝে মাঝে আমার চিন্তাশক্তির অজ্ঞাতে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। মানুষকে যেমন ভূতে পায় এও অনেকটা তেমনি। এটা আমার অবচেতন মনের একটা ক্ষণিক পাগলামিও বলতে পারেন, কিংবা দুর্বলতাও বলতে পারেন।

একটু থেমে আবার স্যার দিগেন্দ্র বলতে শুরু করলেন, ডাক্তার, শিশুবয়স থেকেই আমি চিরদিন অনুভব করেছি, আমার মনের চিন্তাশক্তি যেন একটু বেশী প্রখর। সেটাকে অবিশ্যি সাধারণ অকালপক্কতাও বলতে পারেন। যে বয়সে যা ভাবা উচিত নয় চিরদিন আমি সেই সব ভেবেছি। অদ্ভুত ছিল আমার মনের ভাবনাগুলি। অন্য সকলের কাছে যেটা মনে হবে অসংবদ্ধ এলোমেলো অর্থহীন, আমার কাছে সেগুলো ছিল একান্ত স্পষ্ট ও সত্য। যাহোক, কেন জানি না, ছোটবেলা হতেই মধ্যযুগের শক্তিমান ইংরাজ লেখকদের লেখা সব বই পড়তে আমার বড় ভাল লাগত। বিশেষ করে যেসব লেখকদের লেখা একটু বেশী রকম কল্পনাময়, সেইগুলিই আমি বেশী পড়তাম। যেমন ধরুন 'বডলেয়ার' 'ডিকুইনসি' 'পোয়ে' ইত্যাদি। এঁদের বইগুলো পড়তে পড়তে আমার কি মনে হত, জানেন? যেন একটা অদৃশ্য দুর্নিবার অদ্ভুত ইচ্ছা আমার সমগ্র চিন্তা ও মনের ভিতরকার ভাল-মন্দের বোধশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে, যেমন করে সাপুড়ের হস্তচালনায় সাপ হয়ে পড়ে মন্ত্রমুগ্ধ। বিশেষ করে রাত্রের ঘন অন্ধকারে যেন একটা অদম্য রক্ত দেখবার লালসা ভূতের মতই আমায় তাড়া করে ফিরছে। সেই অদ্ভুত তাড়নায় কতদিন আমি পাগলের মতই হয়ে উঠেছি। রক্ত! রক্ত চাই। টাট্‌কা, তাজা, লাল টকটকে রক্ত, তা সে মানুষেরই হোক বা পশুপক্ষীরই হোক—রক্ত! রক্ত চাই!

মনে হয়েছে, রক্তের জন্য আমার সমগ্র দেহমন যেন মরুভূমির মতই তৃষ্ণাকাতর হয়ে উঠেছে। আমি যেন কতকালের তৃষ্ণার্ত বুভুক্ষিত উপবাসী।

ডাঃ চট্টরাজ বলতে লাগলেন, আমরা সেই অন্ধকারে সাগরকিনারে বালুবেলার ওপরে বসে, কেউ কোথাও নেই; শুধু আমার ওপরে কালো আকাশপটে অগণিত তারা মিটমিট জ্বলছে আর নিভছে। অদূরে উচ্ছ্বসিত সাগরতরঙ্গ সেই ম্লান নক্ষত্রালোকে যেন কোন এক ক্ষুধার্ত হিংস্র ভয়ঙ্কর পশুর ধারালো দাঁতের মত মনে হয়। একটা অশরীরী ভয়ে যেন সহসা বুকের মধ্যে শির শির করে ওঠে।

দুই হাতে হাঁটুটা জড়িয়ে স্যার দিগেন্দ্র বসে। অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে তাঁকে যেন কেমন অশরীরী ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। সহসা এক সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্যার দিগেন্দ্র কেমন যেন একপ্রকার কুৎসিত বীভৎস হাসি হাসলেন। অন্ধকারেও তাঁর চোখের তারা দুটো ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছিল। ভদ্রলোকের গায়ের রং ছিল অস্বাভাবিক রকম ফর্সা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।

স্যার দিগেন্দ্র আবার বলতে লাগলেন, ডাক্তার, আপনার কাছে আমি গোপন করব না। খুন আমি অনেকগুলো করেছি, এবং প্রায়ই করি। রাত্রের নিঃশব্দ অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার শিক্ষা, সংযম, সভ্যতা, কৃষ্টি সব কিছু নিঃশেষে লোপ পায়। আমি যেন পাগল হয়েই রক্ত-তৃষ্ণায় ক্ষুধিত হায়েনার মত ছুটে বেড়াই। ডাক্তার, ডাক্তার, তুমি পালাও, পালাও, আমার কাছ থেকে শীঘ্র পালাও। Get away! Get away from me!

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সহসা পাগলের মতই বুকপকেট থেকে একটা ধারালো কালো হাড়ের বাঁটওয়ালা ক্ষুর স্যার দিগেন্দ্র টেনে বের করলেন। অস্পষ্ট আলোয় ক্ষুরের ইস্পাতের ধারালো ফলাটা যেন মৃত্যু-ক্ষুধায় লক্ লক্ করে উঠল। আমি বিদ্যুৎগতিতে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্দমনীয় অট্টহাসির বেগ সমুদ্রের একটানা গর্জনকে ছাপিয়ে হা হা করে সাগর-কূল সচকিত করে তুলল। উঃ, সে কী হাসি! যেন শরীরের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে বরফ হয়ে যাবে। সারারাত ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখলাম। ঐদিনই গভীর রাত্রে আমার ঘরের দরজায় কার মৃদু করাঘাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন অতি মৃদু মিষ্টি কোমল স্বরে দরজার ওপাশ থেকে আমায় ডাকছে—দরজা খোল! আমি ভয়ে কাঠ হয়ে মড়ার মত বিছানায় চোখ বুজে পড়ে রইলাম। ঘামে সর্বাঙ্গ আমার ভিজে যেতে লাগল। পরের দিন ভোরেই পুরী থেকে রওনা হয়ে এখানে ফিরে আসি। এরই দু-তিন দিন বাদে শুনলাম, স্যার দিগেন্দ্র ধারালো ক্ষুর দিয়ে নাকি নিজের ভাইপোকেই কাটতে উদ্যত হয়েছিলেন।

ডাঃ চট্টরাজ চুপ করলেন। বড্ড গরম বোধ হচ্ছিল, তাই সামনের পর্দাটা তুলে দিলাম।

হঠাৎ আমার নজর পড়ল, কুমার দীপেন্দ্র আমাদের দিকেই ধীরপায়ে এগিয়ে আসছেন। চোখের দৃষ্টি ভাবলেশহীন। যেন অনেকটা ঘুমক্লান্ত, তন্দ্রাতুর। মাথাটা নীচু করে এগিয়ে আসছেন।

আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ঘরের আলো তাঁর মুখের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছে। সমগ্র মুখখানি রক্তশূন্য ফ্যাকাশে, মনে হয় যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন কোন কারণে।

॥ ৩ ॥

বরাবর আমাদের সামনে এসে কুমারসাহেব একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন অত্যন্ত ক্লান্তভাবে।

আমি, কিরীটী ও ডাঃ চট্টরাজ ওঁর মুখের দিকে নিঃশব্দে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ একসময় কঠিন স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কুমারসাহেব চাপা উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, মিঃ রায়, আপনাকে গতকাল ফোনে যা বলেছিলাম সেই রকম ব্যবস্থা করেছেন তো?

কিরীটী ম্লান একটুখানি হেসে বললে, নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কুমারসাহেব। আপনি কি অসুস্থ? বলতে বলতে কিরীটী হাতীর দাঁতের সিগার-কেসটা পকেট থেকে বের করে নিজে একটা তুলে নিয়ে কুমারসাহেবের দিকে খোলা কেসটা এগিয়ে দিল, সিগার প্লিজ!

নো, থ্যাংকস্। বলে কুমারসাহেব নিজের জামার পকেট থেকে বহুমূল্য সুদৃশ্য সোনার ওপরে ডায়মণ্ডে নাম লেখা সিগারেট কেসটি বের করে তার থেকে একটি দামী সিগারেট তুলে ধরালেন।

টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু নীলাভ আলো কুমারসাহেবের মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। ডান হাতে সিগারেটটি ধরে বাঁ হাত দিয়ে কুমারসাহেব মাঝে মাঝে কপালটায় বোলাতে লাগলেন।

সহসা কিরীটীই প্রথম প্রশ্ন করল, আপনার সেই নবনিযুক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ শুভঙ্কর মিত্র এখানেই আছেন, না?

কে, শুভঙ্কর? হ্যাঁ। মৃদুস্বরে কুমারসাহেব বলতে লাগলেন, বেচারী বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছে। অবিশ্যি আমি তাকে দোষ দিই না। এক্ষেত্রে ওরকম না হওয়াটাই আশ্চর্য। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবেন না, আজ আবার স্বচক্ষে আমি এই বাড়িতেই কাকাবাবুকে স্পষ্ট দেখেছি। তিন-তিনখানা চিঠি তাঁর কাছ থেকে আমি ডাকে পেয়েছি, আপনি তো সবই জানেন মিঃ রায়, আমাকে তিনি প্রত্যেক চিঠিতেই বারংবার সাবধান করে দিয়েছেন, আমার রক্ত তিনি দেখবেনই! এ নাকি তাঁর জীবন-পণ!

কিরীটী অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, ঠিক বোঝা গেল না! কাকে দেখেছেন?

অস্ফুট স্বরে কুমারসাহেব বললেন, যেন মনে হল দিগেন্দ্রনারায়ণ, স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণকে! ঐ যে আমার সেক্রেটারী মিঃ মিত্র আমার প্রাইভেট রুমে ঢুকছেন।

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে চোখ তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ডান দিককার দেওয়ালে যে ছোট দরজাটি ছিল, সেটার কপাট দুটো আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল এবং যে ভদ্রলোক একটু আগে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল তার শরীরের পিছন দিকের কালো রঙের কোটের খানিকটা অংশ দেখতে পেলাম। দরজাটার কপাট দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা।

সহসা আবার কুমারসাহেবের কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল, মিঃ রায়, আজ সন্ধ্যার দিকে স্বচক্ষে আমি কাকাকে দেখেছি।

আমি বা ডাঃ চট্টরাজ কোন কথা বললাম না। কিরীটী শুধু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, আপনি ঠিক জানেন কুমারসাহেব, দেখতে ভুল হয়নি তো?

আজ দুপুর থেকেই বাড়িতে আমার জন্মোৎসবের আয়োজন চলছিল। আমি আর আমার সেক্রেটারী মিঃ মিত্র বৈষয়িক কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। দুপুরের পর থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চারিদিক থমথম করছিল, মাঝে মাঝে কড় কড় করে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকে উঠছে। কাজ সারতে বোধ করি সন্ধ্যা সাতটা হবে তখন—আমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা সব একে একে এখানে আসতে শুরু করেছেন, মিঃ মিত্রকে নীচে সকলের অভ্যর্থনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিজে পোশাক বদলাবার জন্য সাজঘরে গিয়ে ঢুকেছি, বাইরে তখন ঘন অন্ধকার ; মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে ; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।... সাজঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপরে একটা লাল ঘেরাটোপে ঢাকা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। মিঃ রায়, আমি যা বলছি তার একবর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নয়, পোশাক পরা হয়ে গেছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলার টাইটা ঠিক করছি, এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাতের শব্দ শোনা গেল, কুমারসাহেব!

দরজা খুলে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ মিত্র আর মিঃ কালিদাস শর্মা। মিঃ শর্মা এখানকার এক কলেজের প্রফেসার ; কিছুদিন হল তাঁর সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়েছে। মিঃ শর্মা মিঃ মিত্রের ছোটবেলার বিশেষ বন্ধু। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সহসা আমার মনে পড়ল বাথরুমে আমার মুখ ধোয়ার সময় ডান হাতের অনামিকা থেকে হীরার আংটিটা খুলে সাবানের বাক্সের ধারে রেখেছিলাম, আসবার সময় নিয়ে আসতে ভুলে গেছি...

কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে কুমারসাহেবের হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটা তিনি অ্যাসট্রেতে ফেলে দিলেন। পাশের হলঘর থেকে পিয়ানো সহযোগে সুমিষ্ট গানের লহরী ভেসে আসছিল।

কুমারসাহেব আবার বলতে শুরু করলেন, কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না মিঃ রায়, সে দৃশ্য কী ভয়ানক! ভাবতে গেলে এখনও আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে : মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো ঘরের কাচের জানলা দিয়ে হঠাৎ আলোর চমকানি লাগিয়ে যাচ্ছিল। মিঃ মিত্র ও মিঃ শর্মা দুজনে আমার সামনেই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, তাঁদের একটু অপেক্ষা করতে বলে আমি বাথরুমের দিকে অগ্রসর হলাম।

বাথরুমের আলো নেভানো ছিল—অন্ধকার। দরজাটা যেমন আমি খুলেছি, সহসা অন্ধকার বাথরুমটা বাইরের বিদ্যুতের আলোকে ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ; কড় কড় করে মেঘের গর্জন শোনা গেল, হঠাৎ চমকে উঠলাম। বিদ্যুতের আলোয় ঘরের জানালার দিকে চোখ পড়তেই আমি স্পষ্ট দেখলাম...কাকা! হ্যাঁ, আমার কাকা স্যার দিগেন্দ্র জানলার কাচ দিয়ে রক্তচক্ষুতে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষছেন। আমি অস্ফুট চিৎকার করে চোখ বুজলাম।

কথা বলতে বলতে অধীর আগ্রহে কুমারসাহেব কিরীটীর হাত দুটো সজোরে চেপে ধরলেন, যেন অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন। চোখেমুখে একটা ব্যাকুল আতঙ্কের চিহ্ন পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। কপালে এই শীতের রাতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে।

জানলার ধারে, কুমারসাহেব আবার বলতে লাগলেন, কাকা ছায়ার মত দাঁড়িয়েছিলেন, মাথাটা একদিকে একটু হেলিয়ে, একটা হাত ঝুলছে। তখনকার তাঁর সেই চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা দানবীয় জিঘাংসা ফুটে বের হচ্ছিল।

ডাঃ চট্টরাজ আমাদের মুখের দিকে তাকালেন।

কুমারসাহেব নিঝুম হয়ে মাথা নিচু করে বসে আছেন।

সহসা যেন এক সময় কুমারসাহেব কেঁপে উঠলেন।

কিরীটী ধীরস্বরে প্রশ্ন করলে, তারপর?

আমার অস্ফুট চিৎকার বোধ হয় পাশের ঘরে মিঃ মিত্র ও মিঃ শর্মার কানে গিয়েছিল; তাঁরা এক প্রকার ছুটেই বাথরুমে এসে প্রবেশ করলেন এবং প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কি কুমারবাহাদুর?

তাড়াতাড়ি তাঁরা সুইচ টিপে বাথরুমের আলোটা জ্বেলে দিলেন; আশ্চর্য, ঘরে কেউ নেই। একদম খালি! অথচ...

বাথরুমে অন্য কোন দরজা ছিল কী? কিরীটী প্রশ্ন করল।

না। আমি যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম সেটা ছাড়া বাথরুমে আর দ্বিতীয় দরজা নেই। যে জানলায় কাকাকে দেখেছিলাম, তারও শার্সি দুটো ঘরের ভিতর থেকে আটকানো ছিল।

ডাঃ চট্টরাজ বললেন, আপনার অবচেতন মনে আপনার কাকা সম্পর্কে যে অতীত দিনের আতঙ্ক সেটাই আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল কুমারসাহেব এবং সেই চিন্তা থেকেই আপনার এ বিভীষিকার সৃষ্টি। এটা আপনার স্বগত কৃত্রিম নিদ্রাচ্ছন্নতা বা ইংরাজীতে যাকে বলে 'self-hypnosis'—আপনার স্নানঘরের মধ্যস্থিত আলো ও আয়নার সংমিশ্রিত প্রভাবেই ওটা সৃষ্টি হয়েছিল।

ডাক্তারের কথা শেষ হতে না হতেই কুমারসাহেব বলে উঠলেন, ডাক্তার আপনাকে আমি আগেই বলেছি, আমি যা দেখেছি বা শুনেছি সেটা আমার ভ্রান্ত ধারণা বা মতিভ্রম, যাকে আপনারা ইংরাজীতে hallucination বলেন, সে রকম কোন কিছুই নয়; আমি কাকাকে স্পষ্ট দেখেছি। সত্যই তাঁকে আমি দেখেছি কিন্তু তারপর তিনি আর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; অদৃশ্য হয়ে যান। আমার সেক্রেটারী ও মিঃ শর্মা চারিদিকে আশপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অবিশ্যি তাঁদের আমি তখন বলেছিলাম, ব্যাপারটা আগাগোড়াই হয়তো আমার চোখের ভুলও হতে পারে। কেননা এ ব্যাপারে তাঁদের আমি, বিশেষ করে আজকের উৎসবের দিনে, চিন্তিত করতে চাইনি। কিন্তু আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি মিঃ রায়, আমার ভুল হয়নি। আমি তাঁকে দেখেছি, সুস্পষ্ট ভাবেই প্রত্যক্ষ দেখেছি।

কিরীটী বললে, ভাল কথা, আচ্ছা ডাঃ চট্টরাজ, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের মনোবিজ্ঞানে এ ধরনের ব্যাপারকে কি বলে?

ডাঃ চট্টরাজ প্রবলভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, কুমারসাহেব হয় আমাদের আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছেন, না হয় তামাসা করছেন নিছক আনন্দ দেবার জন্য। কিন্তু সে যাই হোক, এ ধরনের তামাসা...না, উনি একেবারে অসম্ভব কথা বলছেন।

ঘরের আলোয় কুমারসাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যেন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ভীত হয়ে পড়েছেন।

ধীরে ধীরে এক সময় কুমারসাহেব বললেন, দেখুন ডাঃ চট্টরাজ, বিশেষ করে এ ব্যাপারে আপনাদের চাইতেও আমি বেশী বুঝি। একদিন আমি আমার কাকাকে কতখানি শ্রদ্ধা করতাম ও ভালোবাসতাম সে কথা কারও অজানা নেই; কাকার এই দুর্ঘটনার জন্য হয়তো জগতে আমার চাইতে আর কেউ বেশী দুঃখ পায়নি; শিশুবয়সে মা-বাবাকে হারাই, তারপর বারো বছর পর্যন্ত ঐ কাকার কাছেই আমি একাধারে মা ও বাবার স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে এসেছি। কাকা যে আমার কতখানি ছিলেন, তা বুঝিয়ে আপনাদের বলতে পারব না। কিন্তু এখন তাঁকেই আমি পৃথিবীতে সবচাইতে বেশী ভয় ও ঘৃণা করি। আমার সুখ শান্তি সব গেছে। রাতের পর রাত আমি নিদ্রাহীন চক্ষে নিদারুণ ভয়ে বিছানার ওপরেই বসে কাটিয়েছি।

এমন সময় সুশ্রী দোহারা পাতলা চেহারার ডিপ-ব্লু রঙের সুট্ পরা একজন ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে যেন কুমারসাহেব আপনাকে সামলে নিলেন এবং ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে সহাস্য মুখে বললেন, আসুন মিঃ শর্মা, এঁদের সঙ্গে বোধ হয় আপনার পরিচয় নেই! ইনি মিঃ কালিদাস শর্মা—সিটি কলেজের প্রফেসার। আর ইনি মিঃ কিরীটী রায়—বিখ্যাত রহস্যভেদী, ইনি মিলিওনিয়ার মিঃ সুব্রত রায়—ওঁর বিশেষ বন্ধু...আর ইনি ডাঃ চট্টরাজ, বিখ্যাত নিউরোলজিস্ট (মনোবিজ্ঞান বিশারদ)।

আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে নমস্কার ও প্রতি-নমস্কার করলাম।

এতক্ষণ বরাবরই আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলাম, ওদিককার যে দরজা দিয়ে অল্প আগে মিঃ মিত্র গিয়ে ঢুকেছেন কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে, সেইদিকেই কিরীটী যেন সর্বক্ষণ তাকিয়েছিল এবং সেদিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই এক সময় মৃদুকণ্ঠে বলল, আচ্ছা কুমারসাহেব, আপনি স্যার দিগেন্দ্রকে ঠিক চিনলেন কি করে? এক বছরে কি তাঁর দেহের কোন পরিবর্তন হয়নি?

কি জানি তা বলতে পারি না ঠিক। কুমারসাহেব বললেন, ক্ষণিক আলোয় তাঁকে দেখেছি, তবে...

আঃ থামুন কুমারসাহেব! মিঃ শর্মা বাধা দিলেন, ঐসব আজগুবী ব্যাপার নিয়ে এখনও আপনি মাথা ঘামাচ্ছেন? আশ্চর্য, আপনার মত একজন শিক্ষিত আধুনিকের পক্ষে...উঠুন, মিঃ মিত্র কফির অর্ডার দিয়ে অনেকক্ষণ হল আপনার প্রাইভেট-রুমে গিয়ে হয়তো অপেক্ষা করছেন...একটু আগেই তিনি আপনার খোঁজে এদিকেই আসছিলেন। কি একখানা আপনার বিশেষ জরুরী চিঠি এসেছে, আপনাকে সেখানা এখুনি নাকি দেখানো দরকার। একজন বেয়ারাকে আমার সামনেই বলে গেলেন আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দেবার জন্য। বেয়ারা কি আপনাকে কোন খবর দেয়নি?

কই না! কুমারসাহেব ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন, আশ্চর্য, আমি নিজেই যে তাঁকে অনেকক্ষণ আগে আমার প্রাইভেট-রুমে ঢুকতে দেখলাম। ভাবলাম হয়তো কোন বিশেষ জরুরী কাজে ও-ঘরে গেছেন তিনি।...ক্ষমা করবেন, আমি এখুনি আসছি। বলতে বলতে কুমারসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

অ্যাসট্রেতে কুমারসাহেবের অর্ধদগ্ধ যে সিগারেটটি পড়েছিল, দেখলাম কিরীটী সেটি নিঃশব্দে হাত দিয়ে তুলে পকেটের মধ্যে রেখে দিল। কিরীটীর ব্যাপারটা ভাবছি, এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, খুন! খুন!

চমকে আমরা সকলে একসঙ্গে সামনের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। কুমারসাহেব তখনও ঘরের অর্ধেকটা গেছেন কিনা সন্দেহ, অদূরে দাঁড়িয়ে মিঃ শর্মা, একজন সাদা উর্দিপরা বেয়ারা, হাতে কফির ট্রে—সে-ই কুমারসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে।

ঘরের সকলে যেন সহসা সামনে ভূত দেখে চমকে থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

সকলের চোখেই উৎসুক ভয়ব্যাকুল দৃষ্টি।

কিরীটী ধীরে ধীরে ঘরের মাঝখানে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে গেল। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধানী হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে সে বেয়ারা ও কুমারসাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

শুনুন, আপনারা এখন গোলমাল করবেন না। এটা উৎসব-বাড়ি। আসুন কুমারসাহেব, আমার সঙ্গে আপনার প্রাইভেট-ঘরে চলুন। এই বেয়ারা, তুমভি আও। এস সুব্রত, তুমিও এস। আর চট্টরাজ, আপনি ততক্ষণ লালবাজারে একটা আর বেহালা থানাতে একটা ফোন করে দিন।

আমরা তিনজনে দরজা ঠেলে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বেশ প্রশস্ত চতুষ্কোণ একটি ঘর। ঘরে ঢুকে আড়াআড়ি ভাবে চাইলেই দেখা যায়, ঘরের চারপাশে গদি-মোড়া সব চেয়ার পাতা। সিলিংয়ের বাতিটা নেবানো। অদূরে একটি ছোট টেবিলের ওপরে রক্ষিত লাল রংয়ের টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় ঘরখানি আলোকিত। টেবিলটার ঠিক পাশেই একটা বড় সোফা। ঘরের দেওয়ালে ফিকে গোলাপী রং দেওয়া এবং দেওয়ালে গায়ে এঁদের পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সব অতীত যুগের ঢাল তরোয়াল ঝুলছে। ঘরের লাল আলো সেগুলোর ওপর প্রতিফলিত হয়ে যেন কেমন এক বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে উঠেছে। ঘরের মেঝেয় দামী পুরু লাল রংয়ের কার্পেট বিছানো। হঠাৎ টেবিলের ওপরে যে ল্যাম্পটি বসানো ছিল তার আলোয় সামনে নজর পড়তেই বিস্ময়ে আতঙ্কে যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

একজন কালো সুট পরা লোক উপুড় হয়ে কার্পেটের ওপর টেবিলের ঠিক সামনে পড়ে আছেন। তাঁর হাতের আঙুলগুলো যেন ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছিলেন, মনে হয় যেন হাতের পাতায় দেহের ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিলেন। হাঁটু মোড়া অবস্থায় তিনি পড়ে আছেন। কিন্তু ভদ্রলোকের দেহের সঙ্গে মাথাটি নেই। রক্তাক্ত গর্দানটা শুধু ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় উঁচু হয়ে আছে। মাথাটা ঘরের ঠিক মাঝখানে কার্পেটের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে কাটা গলার ওপরেই। কে যেন মাথাটাকে দেহ থেকে কেটে বসিয়ে রেখে গেছে মেঝেয় কার্পেটের ওপর। চোখের মণি দুটো সাদা, মুখটা হাঁ করা। সহসা পাশের খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকল। আমরা কেঁপে উঠলাম।

॥ ৪ ॥

কিরীটী কুমারসাহেবের রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে বললে, এ সময় আপনি নিজে এত নার্ভাস হয়ে পড়লে তো চলবে না কুমারসাহেব, বুকে সাহস আনুন।

আর সাহস! কুমারসাহেব ক্লান্ত অবসন্ন স্বরে বললেন, আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে মিঃ রায়! এ কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো! উৎসব-বাড়ি—

কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সুব্রত, তুমি বাইরে গিয়ে ডাঃ চট্টরাজকে সঙ্গে নিয়ে এ বাড়ি থেকে বাইরে যাবার সমস্ত দরজা এখুনি বন্ধ করে দাও। ওপরের কিংবা নীচের হলঘরের কেউ যেন এ ব্যাপারের একটুকুও না টের পায়। তারা যেমন গান-বাজনা স্ফূর্তি করছে তাই করুক।

আমি তখন ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফিরে আসছি, হলঘরে কুমারসাহেবের ম্যানেজার পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এলেন। ম্যানেজারবাবু ঘরে ঢুকে প্রথমেই বেয়ারাটাকে ভাঙা কাচের টুকরোগুলো নিয়ে যেতে বললেন। এ ঘর থেকে ভয় পেয়ে ছুটে বাইরে যাবার সময় চাকরটার হাত থেকে পড়ে ভেঙে ছড়িয়েছিল। চাকরটা আদেশ পালন করে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই থানা থেকে পুলিসের লোক এসে উপস্থিত হল। কিরীটী সংবাদ পেয়ে বাইরে গিয়ে তাঁদের যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে আবার ঘরে ফিরে এল। তারপর আবার চুপচাপ সকলে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

কিরীটী এতক্ষণ পরে একটু একটু করে মৃতদেহটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কাটা মুণ্ডুটার দিকে চেয়ে বুকটার মধ্যে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম! দেহের গর্দানের ঠিক কাছেই, মৃতদেহের বাঁ হাতে একটা তীক্ষ্ণ তরবারি ধরা আছে। তলোয়ারটা দেখতে অনেকটা দেওয়ালে টাঙানো তরবারিগুলোর মতই। মনে হয় যেন দেওয়াল থেকেই একটা নেওয়া হয়েছে, কেননা দেওয়ালের গায়ে এক-একটা ঢালের দুইদিকে আড়াআড়ি ভাবে দুটি করে তলোয়ার টাঙানো আছে। দেখলাম কেবল ঠিক টেবিলের সামনে উপরিভাগের দেওয়ালে ঢালের সঙ্গে মাত্র একটি তলোয়ার দেখা যাচ্ছে। মৃতদেহের হাতে ধরা তরবারিটাতে রক্ত মাখা।

উঃ, ভদ্রলোককে কসাইয়ের মত জবাই করা হয়েছে! কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে, একেবারে পাশবিক হত্যা! দেখ দেখ সু, তরবারিটায় বোধ হয় খুব শীঘ্র শান দেওয়া হয়েছিল। বলতে বলতে কিরীটী ঘরের একটিমাত্র জানলার দিকে এগিয়ে জানলাটিকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে বাইরের দিকে ঝুঁকে দেখেশুনে বললে, প্রায় চল্লিশ ফিট নীচে ট্রাম রাস্তা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে কারও লাফিয়ে নীচে যাওয়া বা প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিরীটী কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারি করতে লাগল, তারপর সহসা এক সময় কার্পেটের রক্ত এড়িয়ে মৃতদেহের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে ঝুঁকে কি যেন পরীক্ষা করতে লাগল। এমন সময় ওপাশের দরজাটা খুলে গেল। একটা লোকের মাথা দেখা গেল।

ম্যানেজারবাবু যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিরীটী বাধা দিল, ও আমার লোক—হরিচরণ। কি খবর হরিচরণ? ঐ পথ দিয়ে কেউ বেরিয়েছে?

আজ্ঞে না।

বেশ। নজর রাখ।

মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঐ দরজা দিয়ে এ-ঘর থেকে হলঘরে যাওয়া যায়, না ম্যানেজারবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ম্যানেজারবাবু মৃদুস্বরে জবাব দিলেন। জানলায় একটা লাল রংয়ের সিল্কের পর্দা টাঙানো ছিল, হাওয়ায় সেটা পত্ পত্ করে শব্দ করছিল।

আসুন ডাক্তার, মাথাটা একটু পরীক্ষা করা যাক! বলতে বলতে কিরীটী চুলের গোছা ধরে কাটা মুণ্ডুটা তুলে ধরল। তারপর দুজনে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা পরীক্ষা করল। এটা এখানেই থাক। বলে আবার মুণ্ডুটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখল।

কুমারসাহেব এক পাশে ভূতের মত নির্বাক নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; কিরীটী তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, দেখুন তো কুমারসাহেব, ঐ তরবারিখানা এই ঘরেরই একখানা কিনা?

কুমারসাহেব মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মজার ব্যাপার, কিরীটী বলতে লাগল, এইরকম ধারালো চকচকে তলোয়ারগুলো দিয়ে ঘর সাজিয়ে রেখেছেন—এইভাবে খুনের সাহায্য করতেই নাকি কুমারসাহেব?

জবাবটা দিলেন ম্যানেজারবাবু, আজ্ঞে, উনি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। পিতামহ ও প্রপিতামহের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিটা উনি এমনিভাবে সাজিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

চমৎকার যুক্তি, একেবারে অকাট্য। মৃদুস্বরে কিরীটী শুধু বললে, কিন্তু সে যাক গে, হতভাগ্য মৃত ব্যক্তিকে চেনেন আপনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইনি আমাদের কুমারসাহেবের নবনিযুক্ত সেক্রেটারী মিঃ শুভঙ্কর মিত্র। ম্যানেজারবাবু জবাব দিলেন।

আজ রাত্রে আপনি এঁকে এই ঘরে ঢুকতে দেখেছিলেন?

আজ্ঞে না, সন্ধ্যার পর ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল, তারপর আর দেখা হয়নি।

কোথায় দেখা হয়েছিল?

আজ্ঞে, আমি তখন নীচে সিঁড়ির ওদিকে হলঘরে যাচ্ছিলাম, দেখলাম উনি সিঁড়ির কাছাকাছি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

ওঁর সঙ্গে আর কে কে ছিল?

প্রফেসার কালিদাস শর্মা আর দীনতারণবাবু। দীনতারণবাবু তার একটু পরেই চলে যান।

বেশ, এবারে আপনি দয়া করে বাইরে গিয়ে প্রফেসার কালিদাস শর্মাকে একটু ডেকে আনুন। তিনি কিছু জানেন না, কোন কথা তাঁকে বলবেন না, শুধু বলবেন, কুমারসাহেব একটিবার তাঁকে ডাকছেন।

ম্যানেজার ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল।

তারপর ডাক্তার, আপনার এ ব্যাপারটাকে কী মনে হয়? কিরীটী প্রশ্ন করল।

ডাঃ চট্টরাজ বললেন, দেখ রায়, এ ধরনের হত্যা করাটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, হত্যাকারীর খুন করবার ইচ্ছা ছিল এবং ধারালো অস্ত্র হাতের কাছে পেয়ে সেই ইচ্ছাই এই ভয়ঙ্কর হত্যায় পরিণত হয়েছে। কে বলতে পারে, হয়তো খুনীর মনে রক্ত দেখবার পিপাসা জেগেছিল। তারপরই এই খুন।

দয়া করে একটু ভেবে দেখুন ডাক্তার, যতদূর সব দেখেশুনে মনে হয়, এক্ষেত্রে খুনটা হঠাৎ একটা ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে হয়নি। খুব সাবধানের সঙ্গে এবং আগে থেকে ভেবেচিন্তেই এই খুন করা হয়েছে। চেয়ে দেখুন, মৃতদেহের positionটা দেখেও কি আপনার মনে কোন কিছুই আসছে না?

মৃতদেহ দেখে এইটুকু কেবল বোঝা যায়, খুনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের কোন রকম হাতাহাতি বা ঝটাপটি হয়নি।

নিশ্চয়ই না, মৃতদেহের position থেকে স্পষ্টই মনে হয়, পিছন থেকে আচমকা কেউ ওঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে, সে সময় হয়তো বেচারী কোন কারণে টেবিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু করতে যাচ্ছিল। তাছাড়া এক্ষেত্রে আর একটা জিনিস বিশেষ করে লক্ষ্য করবার আছে। টেবিলের ঠিক ওপরে দেওয়ালে ঝুলানো যে ঢাল তলোয়ার আছে, মেঝে থেকে ওর উচ্চতা প্রায় আট-নয় ফিট হবে এবং একথা যদি ধরে নেওয়াই হয়, মৃতদেহের হাতে ধরা ঐ ধারালো তলোয়ারটা সামনের ঐ দেওয়ালে টাঙানো ঢালের অন্য পাশ থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাহলে হত্যাকারীকে নিশ্চয়ই টেবিলের ওপরে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল দেওয়ালে টাঙানো তলোয়ারটা নামাতে, কেননা অতখানি লম্বা কোন মানুষ হতে পারে না। শুধু তলোয়ারটা নামানোই নয়, সেই তলোয়ার দিয়ে মিঃ মিত্রকে খুন করতে হলে মিঃ মিত্রকে নিশ্চয়ই সুবোধ শিশুটির মত গলাটা বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। আর তা যদি না হয়ে থাকে, অর্থাৎ মিঃ মিত্রের অজান্তেই যদি তাঁকে খুন করা হয়ে থাকে, তবে বলতে হয় মিঃ মিত্র অন্ধ ও কালা, চোখেও তিনি কোন কিছু দেখতে পাননি, কানেও কোন শব্দ শুনতে পাননি। কিন্তু কুমারসাহেবের মত একজন ধনী গণ্যমান্য লোকের প্রাইভেট সেক্রেটারী যে কালা ও কানা ছিলেন এ কথাই বা বলা যায় কি করে! বলতে বলতে কিরীটী সহসা কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কী কুমারসাহেব, আপনিই বলুন না, আপনার সেক্রেটারী কি সত্যসত্যই অন্ধ আর কালা ছিলেন নাকি?

না। মৃদুস্বরে কুমারসাহেব জবাব দিলেন।

যাই হোক, বেচারীর যে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে, এ একেবার অবধারিত। ডাঃ চট্টরাজ বললেন।

আরও দেখুন, কিরীটী ডাঃ চট্টরাজকে আহ্বান করলেন, এই টেবিলের পাশের সোফাটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখুন। সোফার ওপরে এই বড় বড় বালিশগুলো দেখেছেন? এগুলো তুলে ধরছি দেখুন—এগুলোর গায়ে এখনও একটা লম্বালম্বি সরু চাপের দাগ রয়েছে। একটু ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে কষ্ট হবে না যে, এর তলাতেই তলোয়ারটা লুকানো ছিল। খুনী আগে থেকেই সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রেখেছিল এবং মনে হয় মিঃ মিত্র এ ঘরে ঢুকবার আগেই খুনী এখানে এসে অপেক্ষা করছিল। মনে হয় সে জানত মিঃ মিত্র নিশ্চয়ই এ ঘরে আসবেন। আর এমন লোক

খুন করেছে যে মিঃ মিত্রের বেশ পরিচিত। তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আপনার সন্দেহ অমূলক, স্যার দিগেন্দ্র মিঃ মিত্রের একেবারেই অপরিচিত, তা ছাড়া যে খুনী, তার এ বাড়িতে এবং কুমারসাহেবের এই প্রাইভেট-রুমে বিশেষ রকম যাতায়াত আছে এবং সে এ ঘরে এলে কেউ তাকে সন্দেহ করবে না—এক কথায় খুনী কোন অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি নয়। জানাশোনা বা পরিচিতের মধ্যেই কেউ, যার পক্ষে অনায়াসেই, মিঃ মিত্র যখন কোন কারণে দেওয়ালের এদিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন, সেই অবসরে বালিশের তলা থেকে লুকানো তলোয়ারটা টেনে বের করে মিঃ মিত্রের গলাটা এক কোপে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলতে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি।

কিন্তু বন্ধু, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, ডাক্তার বললেন, মৃতদেহের position দেখে মনে হয় না কি যে মিঃ মিত্র যেন কোপটা ঘাড়ে নেবার জন্যে ঝুঁকে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন?

হ্যাঁ, সেই তো হচ্ছে কথা, কিরীটী বলতে লাগল এবং ঐ point থেকেই ধরতে হবে খুনী কে? খুনী এখনও এই বাড়িতেই আছে। সে এখনও পর্যন্ত এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি, যদি অন্তত আমার সহকারীরা সজাগ থেকে থাকে।

হলঘরে যাবার ঐ দরজাটা খুলে যদি কেউ এ ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে ইতিমধ্যেই? আমি প্রশ্ন করলাম।

অসম্ভব। হরিচরণ সাড়ে নটা থেকেই হলঘরে আছে, যদি কেউ গিয়ে থাকতই, তার দৃষ্টিকে কোনমতেই ফাঁকি দিতে পারত না। জানো, কটার সময় আন্দাজ মিঃ মিত্র এই ঘরে এসে ঢুকেছিলেন?

এবারে জবাব দিলাম আমিই, হ্যাঁ, আমার মনে আছে রাত্রি তখন ঠিক সাড়ে নটা হবে, কেননা তখন আমি আমার হাতঘড়িটায় সময় দেখেছিলাম। কিরীটী এবার নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকাল, ঠিক রাত্রি দশটা এখন। ঠিক যে সময় খুন হয়েছিল, অপরাধী সেই সময়টা যে অন্য জায়গায় উপস্থিত ছিল, এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্য যদি সব কিছু আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে থেকে থাকে, তা হলেও সে এই ফাঁকি দিতে পারত না। কিরীটী একটা সিগার বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিম্নস্বরে বলতে লাগল, আশ্চর্য, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না! যতটুকু বুঝতে পারছি, কোন স্থিরমস্তিষ্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই কাজ করেছে, কিন্তু মাথাটা দেহ থেকে পৃথক হয়ে মেঝের ঠিক মাঝখানেই বা এল কি করে? আর ঐভাবেই বা ঠিক ঘাড়ের ওপর বসেছিল কি করে?

বাইরের হলঘর থেকে একটা মৃদু গানের সুরের রেশ তখনও ভেসে আসছিল। কিরীটী কুমারসাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি ও-ঘরে যান কুমারসাহেব, অতিথিরা বেশীক্ষণ আপনাকে না দেখলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হতে পারে।

আর গোলমাল! দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুমারসাহেব বললেন, আমার মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত সব গেল মিঃ রায়; উঃ, কী দুর্দৈব!...ভগবান, এ কি করলে প্রভু!

এমন অধীর হলে তো চলবে না কুমারসাহেব। ডাঃ চট্টরাজ বললেন।

উঃ, কাল সকালে আমি মুখ দেখাব কী করে?...কী লজ্জা!...চাপাস্বরে বলতে বলতে কুমারসাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কুমারসাহেবের গমনপথের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী বললে, আহা বেচারী, বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছেন!

সত্যি, মাথাটা কী ভাবে মেঝের মাঝখানে এল বল তো রায়? ডাক্তার বলতে লাগলেন, গড়িয়ে এসে তো আর ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না!

অনেক সময় অবিশ্যি এর চাইতে বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে। কিরীটী জবাব দিল, কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখুন ডাক্তার, মাথাটা যদি গড়িয়েই এই জায়গায় আসত, তাহলে দেহ থেকে মাথাটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই পর্যন্ত একটা রক্তের ধারা থাকত। তা নেই। তাতেই এক্ষেত্রে স্পষ্ট মনে হয় খুনী নিজেই দেহ থেকে মাথাটা কেটে ফেলবার পর মাথাটা ঐখানে বসিয়ে রেখে গেছে। আমার মনে হয় কী জানেন ডাক্তার?

একটা দানবীয় উল্লাসে এবং নিজের শক্তির ওপর একটা স্থির বিশ্বাসে খুনী মাথাটা ঐখানে রেখে গেছে—এই কথা বলতে চাও তো? জবাব দিলেন ডাক্তার।

সহসা নীচু হয়ে কিরীটী মৃত মিঃ মিত্রের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পকেটগুলো পরীক্ষা করতে করতে একটা পকেট থেকে কতকগুলো কাগজপত্র টেনে বের করল এবং সেগুলো টেবিলের ওপরে রাখবার সময় তার মুখে মৃদু এক টুকরো হাসি জেগে উঠল। চেয়ে দেখলাম কাগজপত্রের মধ্যে আছে অনেকগুলো খবরের কাগজের কাটিং, ফটোগ্রাফ, গোটা দুই হলুদ রংয়ের ভাঁজকরা পুরু অনেকটা তুলোট কাগজের মত কাগজ, একটা টর্চ, একটা পেনসিল ও ব্যাঙ্ক নোট এবং কিছু খুচরো টাকা-পয়সা। ফটোগুলো দেখতে দেখতে কিরীটী সহাস্যমুখে জবাব দিল, ফটোগুলো দেখছি ভদ্রলোকের নিজেরই। নানা কায়দায় নানা পোজে তোলা ফটো। কিন্তু এত ফটোই বা পকেটে কেন? আর আজকের রাত্রের এই উৎসবের পোশাকের পকেটেই বা এগুলো রাখার তাৎপর্য কী?

এতে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই রায়! ডাক্তার বললেন, যারা নিজেদের সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন বা এক কথায় সোজা ভাবে বলতে পার দাম্ভিক, তাদের পক্ষে নিজেদের ড্রাম পিটবার— নিজেকে প্রচার করবার এও একটা কাঠি বৈকি।

না বন্ধু না, ব্যাপারটা অত সামান্য নয়। এর মধ্যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। লক্ষ্য করেছেন, এর মধ্যে কিছু হারিয়েছে কিনা? কিরীটী ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

তার মানে? এ তোমার কোন্ দেশী প্রশ্ন কিরীটী? আমি কি আগে থেকে জানতাম নাকি মিঃ মিত্রের পকেটে কি আছে না আছে? আশ্চর্য! রাগতভাবে ডাক্তার জবাব দিলেন।

হ্যাঁ দেখুন, আমরা জানি ভদ্রলোক এখনও পর্যন্ত অবিবাহিত এবং এঁর নিজের ঘর-বাড়িও আছে। সেখানে নিশ্চয় চাকরবাকরও আছে—এখানে তো আর উনি দিবারাত্রই উপস্থিত থাকেন না! এ কথাও হয়তো বললে নেহাৎ ভুল হবে না, ঘরের যাবতীয় চাবিই চাকরবাকরদের হাতে দিয়ে তিনি আসেন না। অন্তত দু-চারটে প্রাইভেট ঘরের চাবিও ওঁর পকেটে থাকা উচিত, যা হয়তো চাকরবাকরের হাতে বিশ্বাস করে রেখে আসা চলে না। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, মিঃ মিত্রের পকেটে সে ধরনের কোন চাবিই পাওয়া

যাচ্ছে না। ওঁর পকেট থেকে কিছু হারিয়েছে কিনা বলতে আমি ঐ চাবির কথাই বলতে চাইছিলাম ডাক্তার!

তারপর সহসা কিরীটী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে, সুব্রত, অনুসন্ধানের ব্যাপারটা একটু চোখ মেলে সম্পন্ন করলেই অনেক কিছু গোলমাল চোখে পড়ে। একটা অনুসন্ধানের কাজে হাত দিলে সর্বদা চিন্তা করবে, কি থাকা উচিত ছিল, অথচ তা নেই বা পাওয়া যাচ্ছে না! এক্ষেত্রে আমার চাবির কথাটাই মনে হচ্ছে, সেটাই যেন চুরি গেছে। চাবি চুরি যাওয়াটা খুবই আশ্চর্যজনক। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্যজনক অথচ সহজ একটা জিনিস হারিয়েছে বা পাওয়া যাচ্ছে না, এখুনি তোমাদের সেটা দেখাব। অথচ তোমরা দুজনেই অর্থাৎ ডাঃ চট্টরাজ ও তুমি অসাবধানতাবশত লক্ষ্য করোনি, যা প্রত্যেক মানুষেরই পক্ষে, যাদের সামান্য একটু বুদ্ধি আছে এবং যারা সেটা খাটাবার চেষ্টা করে, এ ঘরে ঢোকামাত্রই লক্ষ্য করা উচিত ছিল, এমন একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না।

হত্যাকারীর সম্পর্কে কোন সূত্র কি? আমি প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, হত্যাকারী নিজে।

এমন সময় ক্যাঁচ্ করে দরজা খোলার একটা মৃদু শব্দে আমরা সকলে চমকে চোখ তুলে তাকালাম। এ ঘরের সঙ্গে হলঘরের যোগাযোগ করে যে দরজাটি, তার ফাঁক দিয়ে সাধারণ পোশাক পরা একজন লোকের মুখ ও দেহের অর্ধেকটা প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে এবং তাকে একপ্রকার এক পাশে ঠেলেই একটি যুবক ঘরে এসে প্রবেশ করল।

চোখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি দেখলেই মনে হয় যুবক ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েছে। যুবক ঘরে ঢুকেই থপ করে একটা গদিআঁটা চেয়ারে বসে পড়ল, এসব ব্যাপার কী? বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরুতে যাচ্ছি, গেটম্যান বললে, যেতে দেওয়া হবে না, পুলিশের অর্ডার! কুমারসাহেবের দেখা পেলাম না। তাঁর সেক্রেটারি মিঃ মিত্রই বা কোথায়?

সাধারণ পোশাক পরা যে লোকটি আমাদের সঙ্গেই গাড়িতে এসেছিল, সে যুবকের পিছু পিছু এই ঘরে এসে ঢুকল।

ইনি কে জান, কালী? কিরীটী লোকটিকে প্রশ্ন করল।

না মিঃ রায়, তবে এঁকে মিঃ মিত্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম। তখনই শুনেছিলাম এঁর নাম নাকি বিকাশ মল্লিক। এমন সময় আবার দরজার বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। পরক্ষণেই প্রফেসার কালিদাস শর্মা ঘরে প্রবেশ করলেন।

সহসা একটা অস্ফুট ভয়চকিত শব্দ প্রফেসারের কণ্ঠ থেকে বের হয়ে এল, উঃ কী ভয়ানক! এ কি? সমস্ত মুখ তাঁর ভয়ে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

হঠাৎ একটা ভারী বস্তুর পতনশব্দে সকলে সচকিত হয়ে উঠে দেখি—বিকাশ মল্লিক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।

এই অপদার্থটাকে বাইরে রেখে এস। প্রফেসার শর্মা কালীকে আদেশ দিলেন।

কিরীটী আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি ও ডাক্তার দুজনে জ্ঞানহীন বিকাশ মল্লিকের অসাড় দেহটা ধরাধরি করে কোনমতে পাশের ঘরে নিয়ে এলাম।

এ ঘরের মধ্যেও মৃত্যুর মতই স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

একটা সামান্য ছুঁচ পড়লেও বোধ হয় শব্দ শোনা যায়। কিছুক্ষণ চোখেমুখে জল

দিয়ে হাওয়া করতে করতে একসময় ধীরে ধীরে বিকাশ মল্লিক উঠে সোফার ওপরে হেলান দিয়ে বসল এবং ক্লান্তিভরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিল।

ডাক্তার বললে, এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি?

হ্যাঁ। মৃদু ক্লান্তস্বরে বিকাশবাবু জবাব দিলেন।

মিঃ শুভঙ্কর মিত্র বুঝি আপনার অনেক দিনের পরিচিত? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

না, খুব বেশী দিনের নয়, মাত্র কয়েক সপ্তাহ হবে। বিকাশ বলতে লাগল, ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অল্পদিনেই জমে ওঠে। মিঃ মিত্র একজন নামকরা স্পোর্টসম্যান ও শিকারী ছিলেন। প্রায় আমাদের দেশের বাড়ি ডায়মণ্ড হারবারে কি একটা কাজে যেতেন, সেখানেই প্রথম আলাপ হয়। তাছাড়া অনেক দিন থেকেই হিন্দীটাকে ভাল করে শিখবার আমার ইচ্ছা। শুভঙ্করবাবু চমৎকার হিন্দী বলতে ও লিখতে জানতেন। আমি ওঁর কাছেই একটু একটু করে হিন্দী শিখছিলাম। তারপর উনিই আমাকে এক দিন এখানে এনে কুমারসাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং কুমারসাহেবের দয়াতেই একটা অফিসে আজ দিন দশ হল একটা কাজ যোগাড় করেছি। তিনিই আজকের এই উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করে আনেন।

কিন্তু একটা সংবাদ বোধ হয় এখনও আপনি পাননি বিকাশবাবু! আমি বললাম।

কি? বিকাশ প্রশ্ন করলেন।

আপনার বন্ধু অর্থাৎ মিঃ শুভঙ্কর মিত্র খুন হয়েছেন!

সহসা যেন কথাটা শুনে বিকাশ মল্লিক আঁতকে উঠলেন, অ্যাঁ...তবে কি—তবে কি যে মৃতদেহটা দেখে এলাম একটু আগে...

হ্যাঁ, তাঁরই মৃতদেহ।

এমন সময় কিরীটী ও প্রফেসার শর্মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

আপনি তাহলে এখন যেতে পারেন বিকাশবাবু, আমার লোকের কাছে আপনার ঠিকানাটা শুধু দয়া করে রেখে যাবেন।

বিকাশ মল্লিক কিরীটীর কথা শুনে একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সে ঘরে তখন আর কোন লোকজনই ছিল না সে কথা আগেই বলেছি।

মাথার ওপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরখানি উদ্ভাসিত। একটু আগেও যে-ঘরটা কলহাস্যে মুখরিত ছিল, এখন সেটা শূন্য খাঁ খাঁ করছে।

কিরীটী প্রফেসার শর্মাকে একটা চেয়ারে উপবেশন করতে বলে নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের আপনিই সবচাইতে বড় বন্ধু ছিলেন শুনেছি। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার কাছে যতটা সাহায্য পাব, আর কারও কাছ থেকেই তা পাব না। অবিশ্যি এত রাত্রে আপনাকে বেশী বিরক্ত করব না। সামান্য দু-চারটে কথা—বুঝতেই পারছেন বিশেষ প্রয়োজনেই...

না না, সে কি, জিজ্ঞাসা করবেন বৈকি। বিশেষ করে এখানে যখন উপস্থিত আছি।

আচ্ছা, আজ কটার সময় ঠিক আপনি এখানে এসে পৌঁছান মিঃ শর্মা?

সঠিক আমার মনে পড়ছে না, তবে রাত্রি আটটা থেকে সোয়া-আটের মধ্যে।

বেশ, তারপর থেকে অর্থাৎ আপনার এখানে পৌঁছাবার পর থেকে এখানে আপনার চোখে যা যা দেখেছেন বা ঘটেছে সব খুলে সংক্ষেপে আমায় বলুন।

সে আর এমন বিশেষ কঠিন কি! আমার নিজের যে এখানে আসবার খুব ইচ্ছা ছিল তা নয়, একপ্রকার দীনতারণের ইচ্ছাতেই এখানে আজ রাত্রে আমায় আসতে হয়, অথচ সে এসেই চলে গেল, তাছাড়া—হঠাৎ কথার মাঝে যেন একটু থেমে প্রফেসার শর্মা আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, তাছাড়া আমার ধারণা ছিল দীনতারণের এখানে কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আগে থেকেই কথা ছিল।

কারও মানে কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে তো? কিরীটী বললে।

প্রফেসার শর্মা যেন একটু চমকে উঠলেন। পরক্ষণেই কিরীটীর চোখের ওপর চোখ রেখে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন।

না, আমি তা ঠিক জানি না। প্রফেসার শর্মা আবার বলতে লাগলেন, তাছাড়া এখানে পৌঁছেই আমি নিচের হলঘরে ঢুকি, সেইখানেই মিঃ মিত্রের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমরা দুজনে কথা বলতে বলতে একটা টেবিলের সামনে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসে দু গ্লাস 'জিনজার' খেতে লাগলাম। হঠাৎ এক সময় 'জিনজার' খেতে খেতে শুভঙ্কর হাসতে হাসতে গ্লাসের লাল রঙের তরল পদার্থের দিকে চেয়ে আমায় বললে, দেখছিস কালিদাস কী টুকটুকে লাল! সত্যি ভাই, আজ রাত্রে এই লাল রংটা যেন আমার মনে একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে! Oh red, it is simply charming! It is nice!

হঠাৎ কিরীটী মুখ ঘুরিয়ে আমাকে বললে, সুব্রত, বেল বাজিয়ে একটা বেয়ারাকে ডাক তো!

বেল বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে বেয়ারাটি প্রথম মৃতদেহ আবিষ্কার করে, সে এসে দাঁড়াল।

কিরীটী তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, আরে তুমিই তো প্রথম মৃতদেহ দেখ, না? তুমি কফি নিয়ে যাবার ঘণ্টা শোন কখন?

আজ্ঞে, রাত্রি সাড়ে-নটার সময়। কেননা আমি ঘড়ির দিকে নজর রেখেছিলাম।

তুমি তখন কোথায় ছিলে?

রান্নাঘরে হুজুর। রান্নাঘরের লাগোয়াই খাবারঘর, এবং রান্নাঘর ও খাবারঘর কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের ঠিক পিছনেই।

কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের মধ্যে যে তোমাদের ডাকবার জন্য বেল আছে সেই বেল বাজার দড়িটা কোথায়?

প্রাইভেট রুম থেকে হলঘরে আসবার দরজার গায়েই হুজুর।

বেশ, বেল শোনা মাত্রই তুমি কফি নিয়ে চলে এলে, না?

না। বাবুর্চি কফিটা তৈরী করতে একটু সময় নেয়। মিনিট দশেক বোধ করি দেরী হয়েছিল কফি নিয়ে আসতে।

কোন্ দরজা দিয়ে তুমি কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে ঢোক?

ওঘরে যাবার হলের মধ্যে দিয়ে যে দরজা আছে সেই দরজা দিয়ে। দরজার ঠিক সামনেই একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, বোধ হয় আপনারই লোক হবেন তিনি। আমি দরজায় শব্দ করলাম, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ ভেতর থেকে পেলাম না। এবার জোরে

দরজায় ধাক্কা দিলাম, কিন্তু তাতেও কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। তখন আমি সামনে দাঁড়ানো সেই ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করি, ঘরে কেউ আছেন কি? তাতে তিনি জবাব দেন, তার মানে? কারও ঐ ঘরে থাকবার কথা ছিল নাকি? আমি তাতে জবাব দিই, আজ্ঞে, সেক্রেটারী সাহেবের তো ঐ ঘরে থাকবার কথা! তাতে আমায় বললেন, তবে যাও। আমি তখন দরজা টেনে ভেতরে প্রবেশ করি। বেয়ারার গলার স্বর ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল; সে কথা বলতে বলতে ঘন ঘন আমাদের সকলের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল।

তারপর? কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

আজ্ঞে তারপর আমি কফি নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকে প্রথমে কিছু দেখতে পাইনি। ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ পায়ে বাধা পেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। পড়েই আমি চিৎকার করে উঠি ও তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে আপনাদের ঘরের দিকে ছুটে যাই। আমি আল্লার নামে শপথ করছি হুজুর, এর চাইতে বেশী কিছুই আমি জানি না। আমি খুন করিনি। বলতে বলতে লোকটা হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে কিরীটীর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল।

তোমার কোন ভয় নেই হে, তুমি উঠে বস। আমি জানি তুমি খুন করোনি।

কিরীটীর কথায় কতকটা আশ্বস্ত হয়েই যেন লোকটা চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল।

॥ ৬ ॥

কিরীটী সম্মুখে উপবিষ্ট প্রফেসার শর্মার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ প্রফেসার, আপনি যা বলছিলেন এবার বলুন।

প্রফেসর শর্মা বললেন, জিনজার খাবার পর সেক্রেটারী শুভঙ্করকে নিয়ে আমি খাবার ঘরে যাই। সেখানে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে শুভঙ্কর নীচে চলে যায়।

অনুমান তখন রাত্রি কটা?

প্রফেসার শর্মা মৃদু একটু হাসলেন, ক্ষমা করবেন মিঃ রায়, আগে তো বুঝি নি আজকের রাতের প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মিনিটের হিসেবনিকেশ কারও কাছে দিতে হবে, তাহলে না হয় ঘড়ি ধরে সব কাজগুলো করে রাখতাম। তবে যতদূর মনে হয় রাত্রি তখন প্রায় নটা হবে বা নটা বাজবার মিনিট চার-পাঁচ আগেও হতে পারে। তারপর হঠাৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো মিঃ রায়, গরীবকে ফাঁসাবার মতলবে জেরা করছেন না তো?

কিরীটী ও-কথার কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলে, আপনি তাহলে তারপর খাবারঘরেই রয়ে গেলেন?

হ্যাঁ, খাবারঘরে পরিষ্কার টেবিল চেয়ার পাতা ছিল, কেননা আজ খাবার আয়োজন হয়েছিল নীচে। হঠাৎ আমার নজরে পড়ে, টেবিলের ওপর একখানি হিন্দী ভাষায় অনূদিত ছোটদের রূপকথা 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে' পড়ে আছে। আমি হিন্দী ভাষা বেশ ভালোই জানি এবং হিন্দীতে অনূদিত ছোটদের একখানি রূপকথা দেখে লোভ সামলাতে

পারলাম না; তাছাড়া রূপকথা পড়তে চিরদিনই বড় ভালবাসি। বইখানি হাতে পেয়ে অন্যমনস্কভাবে একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়লাম। বেশী লোকের গোলমাল আমি কোন দিনই পছন্দ করি না, ভাবলাম বাঁচা গেল। হাতের কাছে বইটা পেয়ে তাতে মনোসংযোগ করলাম। বইটা সত্যই ভাল। রূপকথা পড়তে আপনার কেমন লাগে মিঃ রায়?

ব্রাভো! চমৎকার! কিরীটী চাপা উল্লাসভরা কণ্ঠে বলে উঠল, এ যে দেখছি একটা মজার রহস্য উপন্যাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে! চাবিদিকে উৎসবের কলোচ্ছ্বাস, একজন ছায়ার মত এসে স্নানের ঘরে মাটি কোপানোর খুরপি ফেলে গেলেন; আর একজন খাবার ঘরে এসে "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" রূপকথা কুড়িয়ে পেলেন এবং তখনি সেই রূপকথা পড়ায় মত্ত হয়ে উঠলেন! এমন সময় এক সাঙ্ঘাতিক খুনী রক্ত দেখবার নেশায় পাশের ঘরে হায়েনার মত হিংস্র হয়ে উঠেছে। সব কিছুর মধ্যেই একটা মানে থাকা দরকার। যদি এই পর পর ঘটনাগুলোর আদপে কোন মানেই না থাকে, তাহলে এই পৃথিবীতে কোন কিছুরই কোন মানে হয় না!

পরমুহূর্তেই যেন হঠাৎ কিরীটী আবার গম্ভীর হয়ে প্রফেসর শর্মাকে পুনঃপ্রশ্ন করল, খুব ভাল, ঘড়ির সময় নিয়ে আপনি একটু আগে আমাদের ঠাট্টা করছিলেন, আবার কিছু সময় সম্পর্কীয় অতি আবশ্যকীয় দু-চারটে কথা এসে যাচ্ছে। ক্ষমা করবেন প্রফেসার, আমি সিঁড়ির ও খাবারঘরের ঘড়ি মিলিয়ে দেখেছি। আমার ঘড়ি আর ওই দুটো ঘড়ি একই সময় দিচ্ছে—আপনার ঘড়িতে এখন কটা প্রফেসার?

প্রফেসার শর্মা পকেট থেকে একটা মূল্যবান রৌপ্য-নির্মিত ঘড়ি বের করে হাতের ওপরে নিয়ে দেখে বললেন, ঠিক দশটা বেজে বারো মিনিট হয়েছে।

আমারও ঠিক তাই, কিরীটী আপন হাতঘড়ি দেখে বললে, তোমার ঘড়িতে কত সুব্রত?

দশটা বেজে চব্বিশ মিনিট। আমার ঘড়ি দেখে বললাম।

বেশ। প্রফেসার, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে দয়া করে যদি বলেন, রাত্রি ঠিক সাড়ে নটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? কিরীটী প্রশ্ন করল প্রফেসারের মুখের দিকে চেয়ে, অর্থাৎ যখন মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট ঘরে ঢোকেন?

নিশ্চয়ই। বলে সহসা প্রফেসার হাঃ হাঃ করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। তারপর কোনমতে হাসি চাপতে চাপতে বললেন, সাড়ে নটার সময় হলঘরে দাঁড়িয়ে আমি আপনারই পাহারারত ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলছিলাম। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রায় আট-দশ মিনিট কথাবার্তা বলেছি। তারপর তাঁর সামনেই এই ঘরে এসে ঢুকি এবং কুমারসাহেব এইখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। আশা করি আমার মহামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি বন্ধুবর এত তাড়াতাড়ি সেকথা ভুলে যাননি!

কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম অসহ্য বিরক্তিতে সে এবার নিশ্চয়ই কোন কিছু বলে বসবে, কিন্তু হঠাৎ যেন সে নিজেকে সামলে নিয়ে সামনেই ঝুলানো ভৃত্যদের ডাকবার ঘণ্টার দড়িটায় ধীরে ধীরে একটা টান দিয়ে ছেড়ে দিল।

আমরা সকলে নির্বাক বিস্ময়ে কিরীটীর মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইলাম।

হরিচরণ ঘরে এসে ঢুকল।

প্রফেসারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কি ইঙ্গিত করতেই ঘাড় হেলিয়ে বললে, হ্যাঁ স্যার, ঐ ভদ্রলোক আমার কাছেই ছিলেন। এক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই, ঠিক এখন সময় কত বলতে পারেন? আমার মনে হচ্ছে আমার ঘড়িটা বোধ হয় একটু স্লো যাচ্ছে। আমি বললাম, আমার ঘড়ি ঠিকই আছে—সাড়ে নটা বেজেছে। আমরা দুজনে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ঘড়িটাও একবার দেখে নিজেদের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম। কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের ঠিক সামনাসামনি ওঠবার সিঁড়ি, আমরা দুজনেই সিঁড়ির মাথা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক আমার ঘড়িটা সিঁড়ির সঙ্গে একই টাইম দিচ্ছে দেখে নিজের ঘড়িটা মিলিয়ে নিতে নিতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কিরীটী বাধা দিল, তাহলে তুমি তখন ঠিক সিঁড়ির মাথায় ছিলে, যখন মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে প্রবেশ করেন!

হ্যাঁ, সেই সময় প্রায় পাঁচ মিনিট উনি আমার সঙ্গেই ছিলেন। তারপর তিনি এই ঘরে এসে প্রবেশ করেন।

ঐ সময় তুমি নিশ্চয়ই হলঘর থেকে প্রাইভেট রুমে যাবার দরজাটার প্রতি বেশ ভাল নজর রেখেছিলে হরিচরণ, কী বল?

খুব কঠিন দৃষ্টিতে নজর না রাখলেও, মোটামুটি ভাল করেই নজর রেখেছিলাম স্যার। এবং বেয়ারা যখন ঘরে ঢোকে আমি তখনও তার পিছনেই দাঁড়িয়ে এবং আমি ওর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের মধ্যে ঢুকে মৃতদেহ দেখতে পাই। আপনি না আসা পর্যন্ত আমি একবারের জন্যও এখান থেকে নড়িনি।

হঠাৎ প্রফেসার শর্মা বললেন, আচ্ছা এবারে আমি আসতে পারি কি মিঃ রায়? রাত্রি অনেক হল। এই আমার নামের কার্ড রইল, যখন ইচ্ছা ফোনে একটু খবর দিলেই আমার দেখা পাবেন। বলতে বলতে একটা সুদৃশ্য কার্ড কিরীটীর হাতের দিকে প্রফেসার এগিয়ে ধরলেন। কিন্তু কিরীটী তাঁর কথার কোন জবাবই দিল না, চুপচাপ বসেই রইল, যেন কথাগুলো কানেই যায়নি। তারপর নীরবে হাত বাড়িয়ে প্রফেসারের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ক্ষণেক ভাবল, তারপর মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, প্রফেসার শর্মা, আশা করি ও-ঘরের তলোয়ারটার কথা এর মধ্যেই একেবারে ভুলে যাননি!

সহসা প্রফেসারের চোখের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ ও উগ্র হয়ে উঠল। তিনি পলকহীন ভাবে কিরীটীর দিকে চাইলেন, কিরীটীও তার নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রফেসারের দিকে চেয়ে রইল।

চার জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ পরস্পর পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে রইল। দুজনেই ভয়ঙ্কর রকম যেন সজাগ হয়ে উঠেছে।

তারপর সহসা আবার প্রফেসার প্রবলভাবে হেসে উঠলেন এবং চিবিয়ে চিবিয়ে অদ্ভুতভাবে বলে উঠলেন, চমৎকার! তাহলে মান্যবর ডিটেকটিভ বন্ধু আমার—আমাকেই খুনী বলে সাব্যস্ত করলেন শেষটায়! ওয়ানডারফুল! অভাবনীয় চিন্তাশক্তি!

না। জলদগম্ভীর স্বরে কিরীটী বলে উঠল, অন্তত বর্তমানে আপনাকে খুনী বলে আমি সন্দেহ করিনি। কোন মানুষ আগে থেকে চিন্তা করে খুন করতে পারে, কিন্তু আগে থেকে চিন্তা করে শয়তান হতে পারে না! আমি শুধু কয়েকটা আবশ্যকীয় প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেছি মাত্র। ও-কথা যাক প্রফেসার, বলুন মিঃ মিত্র কি হিন্দী ভাষা বলতে ও কইতে পারতেন?

সত্যি কথা বলতে কি, প্রফেসার বলতে লাগলেন, মোটেই না। হিন্দী ভাষায় তার জ্ঞান, 'করেঙ্গা' 'খায়েঙ্গা' পর্যন্তই। শুভঙ্কর ছিল আমার ছোটবেলার বন্ধু, তার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে ছিল ও। লোকে জানত ও বিলাতফেরত, উচ্চশিক্ষিত, আসলে ওর পড়াশুনা তেমন ছিল না। ম্যাট্রিক পর্যন্ত বিদ্যার দৌড়। চেহারাটা ছিল সুন্দর আর common sense ছিল প্রচুর, যার ফলে কিছু না জেনেও অনেক কিছুই জানবার ভান করতে পারত। কিন্তু খেলাধূলায় ওর মত ওস্তাদ বড় একটা দেখা যেত না। টেনিস খেলতে, সাঁতার কাটতে, ঘোড়ায় চড়তে, তরবারি বা ছোরা খেলতে, বন্দুক ছুঁড়তে, বড় বড় জানোয়ার শিকার করতে ও ছিল একেবারে যাকে বলে অদ্বিতীয়। আচ্ছা এবারে Good Night জানাচ্ছি my friend! আশা করি ক্ষণিকের চেনা গরীব বন্ধুর কথাটা ভুলে যাবেন না।

নিশ্চয়ই না। বিশেষ করে না ভুলতে যখন আপনিই এত করে অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছেন! কিরীটী গম্ভীর স্বরে জবাব দিল।

ধীরে মন্থরপদে জুতোর শব্দ তুলে প্রফেসার কালিদাস শর্মা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।.

কিরীটী এক সময় বললে, দেখ হরিচরণ, তুমি একবার এখানে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত আছেন, প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে জানবার চেষ্টা কর, তাঁদের মধ্যে কে কে আজ রাত্রে এখানে প্রফেসার কালিদাস শর্মাকে দেখেছেন! আর খাবারঘরে গিয়ে একবার দেখ সেখানে "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" নামে বইখানা পাও নাকি! আর চেষ্টা কর জানতে, কে ঐ বইখানা এনেছিলেন সঙ্গে করে। হ্যাঁ, আর যাবার সময় কুমারসাহেবের ম্যানেজারটিকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিও তো!

হরিচরণ ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই কিরীটী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে. আমি যতদূর জানি, এই কালিদাস শর্মারই বছর তিন-চার আগে কী একটা ব্যাপার নিয়ে দুর্নাম রটে, ফলে কলেজের চাকরি যায়, তারপর থেকেই লোকটা সম্পূর্ণ বেকার; কিন্তু বর্তমানে বেকার অবস্থায় এত বাবুয়ানা ওর আসে কোথা থেকে? খুব সম্ভব কুমারসাহেবকে ও নেশার বস্তু যোগায়!

আমারও যেন তাই মনে হয়, ডাঃ চট্টরাজ চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, বোধ হয়ে সেইজন্যই কুমারসাহেব যখন আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে উঠে গিয়ে দ্বিতীয়বার ফিরে এলেন, তখন তাঁকে একরকম যেন অসুস্থের মত দেখাচ্ছিল! মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে শ্লথ মন্থর গতিতে হাঁটছিলেন। তখনই আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক বোধ হয় কোন একটা নেশাটেশায় অভ্যস্ত।

আপনি ঠিকই বলেছেন ডাক্তার, কিরীটী বলে উঠল, খুব সম্ভবত দ্বিতীয়বার তিনি যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন কোন একটা কিছু নেশা করে এসেছিলেন। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি।

আমি বাধা দিলাম, উনি না লক্ষ্য করলেও, আমার দৃষ্টিকে তুমি এড়াতে পারনি বন্ধু। কুমারসাহেব যখন আমাদের দেওয়া সিগারেট না খেয়ে নিজের সিগারেট খেয়ে উঠে যান, তখন তাঁর অ্যাস্‌ট্রের মধ্যে সেই নিক্ষিপ্ত নিঃশেষিত সিগারেটের টুকরোটা তুমি তুলে নিয়ে পকেটস্থ করেছ!

এতদিনে সত্যসত্যই সুব্রতর চোখ একটু সজাগ হতে আরম্ভ করেছে। কিরীটী হাসতে হাসতে বলতে লাগল, চেয়ে দেখুন ডাক্তার, কিরীটী পকেটে হাত চালিয়ে সিগারেটের টুকরোটা বের করে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল, একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, এ সিগারেট কেনা নয়, হাতে পাকিয়ে তৈরী করা, তাছাড়া সিগারেটের মসলা যেমন হয়, এর মধ্যকার মসলা ঠিক তেমন নয়, একটু মোটা এবং কোনমতে কাগজ দিয়ে জড়িয়ে সিগারেট বানানো হয়েছে। শুঁকে দেখুন।...বলতে বলতে কিরীটী সিগারেটটা খুলে ফেলল।

তাছাড়া দেখুন, মসলাটা কেমন ফিকে ব্রাউন রংয়ের 'মরিহুয়ানা' 'morihuanna', hashish, হাস্‌হিস ভাং সিদ্ধি বা গাঁজা জাতীয় জিনিস। তবে আসলে কোন্ জিনিসটা দিয়ে যে এই সিগারেটের মসলা তৈরি হয়েছে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষিত না হয়ে আসা পর্যন্ত সঠিক বলা চলছে না। তোমরা হয়তো জান না, ইজিপ্টের লোকেরা 'হাস্‌হিসে'র সবুজ বা কাঁচা পাতা খায়। তাতে নাকি নেশা হয়। ম্যাক্সিকোতে যে 'হ্যাস্‌হিস্' পাওয়া যায়, তার পাতা আরও তীব্র নেশা আনে। খুব সম্ভব প্রফেসার শর্মা এই ধরনের সিগারেট তৈরী করে কুমারসাহেবকে নেশায় পরিতুষ্ট করে থাকেন। প্রফেসার শর্মা উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন বলে ওঁর সিগারেটের ওপরে সর্বপ্রথম আমার সন্দেহ্ জাগে, যে মুহূর্তে উনি আমার দেওয়া সিগারেটের অফার ফিরিয়ে দিলেন, অথচ ঠিক সেই সময়ই নিজের কেস হতে সিগারেট বের করে ধূমপান শুরু করলেন। কোন সভায় বা দু-দশজন যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে কেউ সিগারেট কাউকে অফার করলে তাকে refuse করে পরমুহূর্তেই নিজের সিগারেট ব্যবহার করা এটিকেটের বিরুদ্ধ। একমাত্র সেই কারণেই আমি কুমারসাহেবের নিঃশেষিত ফ্যাগ-endটা অ্যাস্ট্রে হতে তুলে নিয়েছিলাম। তারপর একটু থেমে আবার বললে, হ্যাঁ ভাল কথা ডাক্তার, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে ভাং সিদ্ধি প্রভৃতির নেশা করলে কি কি লক্ষণ দেখা যায় বলে?

চোখের মণিতে অবস্থিত আলো প্রবেশের ছিদ্রপথ pupil সঙ্কুচিত (contractd) হয়ে যায়। জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করে, সামান্য একটু চলা-ফেরা করলেই exhaustion হয়ে গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কল্পনায় সব নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য চোখের ওপর ভাসতে থাকে, যাকে আমরা ডাক্তারী শাস্ত্রে hallucination বলি। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ রায়, কুমারসাহেব যে অদ্ভুত গল্প আমাদের শোনাচ্ছিলেন তা ঐ নেশারই প্রভাবে।

অদ্ভুত আর তাকে বলা চলে না ডাক্তার, আজকের রাতের ঘটনার কথা ভাবতে গেলে কিছুই আর আশ্চর্য বা অদ্ভুত লাগে না। আমি এখনও স্থিরনিশ্চিত নই, কুমারসাহেবের গল্পটা নেশা থেকেই উদ্ভূত বা কল্পনা মাত্র! আপনি যে জিনিসটার প্রভাবের কথা বলেছেন, সেটাও ঐ গাঁজা বা ভাং জাতীয় গাছের পাতা থেকে হয় বটে, কিন্তু সেও অধিক পরিমাণে খেলে তবে নেশা হয়, ঐ এক ধরনের নেশার বস্তু একটা সিগারেটের মধ্যে যতটুকু থাকে তাতে করে অমন নেশা হতে পারে বলে আমার কিন্তু মনে হয় না। সামান্য একটু উত্তেজকের কাজ করতে পারে মাত্র। আমার মনে হয় এ ধরনের নেশায় কুমারসাহেব অনেকদিন থেকেই বেশ অভ্যস্ত। নাহলে তিনি এ ধরনের নেশা করে নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন এবং সেটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া এই জাতীয়

নেশায় অভ্যস্ত যেসব নেশাখোর, তাদের এই সামান্য একটু নেশার দ্রব্য সেবন করলে আর যাই হোক অন্তত কল্পনায় স্বপ্ন যে দেখতে শুরু করবে না এটাও ঠিক। অর্থাৎ আমি বলতে চাই, আপনাদের ডাক্তারী শাস্ত্রের ঐ hallucination দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব না হওয়াটাই বেশী সম্ভব। আরও একটা কথা এই সঙ্গে আমাদের ভুললে চলবে না যে, এ জাতীয় জিনিসের লোককে মেরে ফেলবারও একটা ক্ষমতা আছে, তবে একটু দীর্ঘ সময় লাগে। যেমন ধরুন দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে নিয়মিতভাবে ঐ ধরনের নেশা করে আসলে অনবরত এগুলো slow poisoning-এর কাজ করতে পারে অনায়াসেই। এমনও হতে পারে যে ঐভাবে নেশার মধ্য দিয়ে slow poisoning করে করে কেউ ঐ উপায়ে অনেকদিন ধরেই ওঁকে সবার অলক্ষ্যে এ জগৎ থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল।

এমন সময় ম্যানেজারবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন।—এমন করে আর কুমারসাহেবের সর্বনাশ করবেন না স্যার, আপনার লোকদের আদেশ দিন যাতে করে তাঁরা এবার এখানে উপস্থিত সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতদের অন্তত চলে যেতে বাধা না দেন। একেই তো তাঁরা সব নানা অদ্ভুত প্রশ্ন করে করে আমাদের প্রায় পাগল করে তোলবার যোগাড় করেছেন, এমন কি এর মধ্যে কেমন করে না জানি প্রকাশও হয়ে গেছে যে কুমারসাহেবের সেক্রেটারীকে কে হত্যা করেছে। আমি যদিও তাঁদের বুঝিয়ে বলেছি, তিনি আত্মহত্যা করেছেন, কেউ তাঁকে হত্যা বা খুন করেনি, কিন্তু এ ধরনের কথা একবার রটলে কি কেউ আর কারও কথা বিশ্বাস করে বা করতে চায়?

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, বসুন। আপনার মনিবের সেক্রেটারী আত্মহত্যা করেছেন শুনলে নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর আত্মমর্যদা বেড়ে যাবে, কি বলেন ম্যানেজারবাবু? কিন্তু সেকথা যাক, ব্যস্ত হবেন না, এখন বলুন তো দেখি, আজ রাত্রে এই উৎসবে এমন কি কেউ এখানে এসেছেন, যাকে আপনি চেনেন না বা ইতিপূর্বে কোন দিন দেখেননি?

না, কই এমন কাউকে দেখেছি বলে তো আমার আজ মনে পড়ছে না। ম্যানেজারবাবু বলে উঠলেন, তাছাড়া এ উৎসবে আমন্ত্রিতদের প্রত্যেককেই নিমন্ত্রণ-লিপি দেওয়া হয়েছিল। এবং নিমন্ত্রণ-লিপি ছাড়া কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সেক্রেটারীবাবুর এ বিষয়ে কড়া নজর ছিল।

সহসা আবার কিরীটী প্রশ্ন করল, আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, বলতে পারেন, আপনাদের কুমারসাহেবের সেক্রেটারী মিঃ মিত্র কতদিন থেকে আফিং খাওয়াটা অভ্যাস করেছিলেন? দেখুন অস্বীকার করবেন না বা অস্বীকার করবার চেষ্টা করবেন না। আপনি নিশ্চয়ই তাঁর অনেক কথাই জানেন, কেননা বেশীর ভাগ সময়ই দুজনে আপনারা সহকর্মী হিসাবে এখানে কাজ করছিলেন। বলুন না মশাই, চুপ করে আছেন কেন? খেতেন নাকি তিনি?

আ—জ্ঞে!

বলুন! কঠিন আদেশের সুর কিরীটীর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ ম্যানেজারবাবু মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন, তারপর একসময় মৃদু স্বরে বললেন, আজ্ঞে মাসখানেক হবে, তিনি আফিং একটু একটু করে গরম কফির সঙ্গে খেতেন। বলতেন, অন্য কোন বদ নেশার থেকে আফিং খাওয়াটা নাকি ভাল। তাছাড়া তাঁর পেটের

গোলমাল আছে বলে ডাক্তার নাকি পরামর্শ দিয়েছিল প্রত্যহ একটু একটু করে আফিং খেতে। আফিং ধরবার পর উপকারও নাকি পাচ্ছিলেন।

ভাল কথা! খুব ভাল কথা! কিন্তু আপনাদের কুমারসাহেবও কি ঐ সঙ্গে কোন নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নাকি?

আজ্ঞে, তিনিও বোধ হয় ঐ একই সময় থেকে আফিং খাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হয় কুমারসাহেব আফিংয়ে অনেকদিন থেকে অভ্যস্ত।

বেশ। আচ্ছা আজ রাত্রে কুমারসাহেবকে আপনারা ভাং বা সিদ্ধি জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে সিগারেট তৈরী করে দিয়েছিলেন?

আজ্ঞে—

বলুন, জবাব দিন!

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেননা আমি ভেবেছিলাম সিদ্ধি খেলে তিন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। জানি না কেন যেন আজ চার-পাঁচ দিন একটা চিঠি পেয়ে অবধি তিনি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সর্বদাই মনমরা, যেন কেবলই কি ভাবছেন; তাই ভাবলাম, আজকের এই উৎসবের দিনে সাধারণ সিদ্ধির সরবৎ-টরবৎ দিলে হয়তো তিনি আপত্তি করতে পারেন, তাই সিগারেট তৈরী করে রেখেছিলাম। এ রকম মাঝে আরও দুবার সিগারেট করে খাইয়েছিলাম তাঁকে। সন্ধ্যার অল্প পরেই আমি তখন কুমারসাহেবের লাইব্রেরী ঘরে বসে কয়েকটা হিসাবপত্র মিলিয়ে নিচ্ছি, কুমারসাহেব যেন খুব উত্তেজিত হয়েছেন এমন অবস্থায় এসে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন; বললেন, এক কাপ গরম কফি খাওয়াতে পারেন ম্যানেজারবাবু? আর আপনার সেই সিগারেট কয়েকটা দিতে পারেন? তারপর তিনি আমাকে একটু আগে বাথরুমে কী দেখেছেন তাই বলতে লাগলেন। আমি নিজে তাঁকে কফি নিয়ে এসে দিলাম ও পকেট থেকে তৈরী করা গোটাপাঁচেক সিগারেটও দিলাম।

আজকেই আপনি তাহলে প্রথম তাঁকে ঐ ধরনের সিগারেট দিয়েছিলেন বোধ হয়?

আজ্ঞে না। দিন পাঁচেক আগে একবার গোটাপাঁচেক তৈরী করে দিয়েছিলাম।

তবে দেখুন ডাক্তার, ভাং বা সিদ্ধির প্রভাবে কুমারসাহেব কল্পনায় বিভীষিকা দেখেননি, সিগারেট পান করবার আগেই দেখেছেন। তারপর ম্যানেজারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, বেশ! আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, কুমারসাহেবের সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয় তখন ঠিক কত রাত্রি হবে বলতে পারেন? মানে রাত্রি তখন কটা বাজে?

আজ্ঞে রাত্রি নটা হবে।

আচ্ছা তারপর আপনি কী করলেন?

তারপর আরও কিছুক্ষণ আমি ঐখানেই ছিলাম, কেননা কুমারসাহেব সিগারেট নিয়েই ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন দ্রুতপদে। তারপর হিসাবপত্র দেখা হয়ে গেলে প্রায় রাত্রি সাড়ে নটার সময় আমি নীচে নেমে যাই।

এর পর ম্যানেজারবাবুকে কিরীটী বিদায় দিল।

ভদ্রলোকও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন; কেননা তিনি একপ্রকার দৌড়েই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ম্যানেজার ঘর থেকে চলে যাবার পর সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কিরীটীও বোধ করি কি ভাবছিল।

॥ ৭ ॥

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সর্বপ্রথম কিরীটীর দিকে চেয়ে এবারে আমিই প্রশ্ন করলাম, আজকের ব্যাপারে অনেক কিছুই যেন তুমি এখনও চেপে রাখছ বলে মনে হচ্ছে কিরীটী? একটা সূত্র অবিশ্যি পাওয়া যাচ্ছে, মিঃ শুভঙ্কর মিত্র নেশা করতেন!

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, সেটা এমন বিশেষ একটা সূত্র নয়। কিন্তু এই case সম্পর্কে আপাতত যতটা জানতে পেরেছ, তাতে করে তোমার মতামতটা কী সুব্রত? যতটুকু জেনেছ বা শুনেছ, এর মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা অবিশ্বাস্য মনে হয় কী?

একটা অসামঞ্জস্য খুব মোটা ভাবেই চোখে পড়ছে।

ডঃ চট্টরাজ বাধা দিলেন, এক মিনিট সুব্রতবাবু! বলে হঠাৎ কিরীটীর দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ একটা কথা রায়, তোমার ধারণা বোধ হয় স্যার দিগেন্দ্রই কারও ছদ্মবেশে আজ রাত্রের উৎসবে এসে যোগ দিয়েছিলেন?

যদি বলি ডাঃ চট্টরাজ, তাই! এমন কোন বিশেষ ব্যক্তির ছদ্মবেশ নিয়ে তিনি এখানে আজ হয়তো এসেছেন, যার সঙ্গে মিঃ মিত্রের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাছাড়া কোন নিমন্ত্রণ-বাড়ির একটা কার্ড যোগাড় করে এখানে আসাটা এমন বিশেষ কিছু একটা কঠিন ব্যাপার বলে কি মনে হয় ডাঃ চট্টরাজ?

না। কিন্তু তাহলে তুমি স্থিরনিশ্চিত যে, স্যার দিগেন্দ্রই কারও ছদ্মবেশে এসে আজ রাত্রে হতভাগ্য শুভঙ্কর মিত্রকে খুন করেছেন? কিন্তু—

মৃদু হেসে সহজ স্বাভাবিক স্বরে কিরীটী জবাব দিল, নিশ্চয়ই। এতে আমার দ্বিমত নেই।

কিন্তু বন্ধু, এক্ষেত্রে মিঃ মিত্রের মত একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে স্যার দিগেন্দ্রের খুন করবার কী এমন সার্থকতা থাকতে পারে সেটাই যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। অবিশ্যি কুমারসাহেবকে হত্যা করলেও না হয় বোঝা যেত, কেননা তাঁর মুখে শুনেছি, স্যার দিগেন্দ্র প্রায় তিন-চারখানা চিঠিতে একাধিকবার কুমারসাহেবকে শাসিয়েছেন তাঁর প্রাণ নেবেন বলে। এবং যে কারণেই হোক কুমারসাহেবের ওপরে তাঁর একটা আক্রোশও আছে।

কিরীটী এবার বলে, জানেন কিনা আপনারা জানি না—গতকাল রাত্রে কুমারসাহেব শেষ চিঠি পেয়েছেন স্যার দিগেন্দ্রের কাছ থেকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের সেক্রেটারী সাহেবও একখানি চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল, বলতে বলতে একখানা চিঠি পকেট থেকে টেনে বের করে কিরীটী চিঠিটা পড়তে শুরু করে : আমাদের সাত পুরুষের সঞ্চিত অর্থ নিয়ে তুমি যে এই দানধ্যানের ছেলেখেলায় মেতে উঠেছ, এর সকল ঋণ কালই তোমার আপন বুকের রক্ত দিয়ে কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করতে হবে। বুকের রক্ত ঢেলে অর্জিত এ অর্থ অপব্যবহার করে যে পাপ করেছ, তা বুকের রক্তেই শেষ হয়ে যাক! আঃ, তাজা টুকটুকে লাল রক্ত ফিনকি দিয়ে ঠাণ্ডা মাটির বুকের ওপর ঢেউ খেলে যাচ্ছে! কী আনন্দ!...লাল-লাল রক্ত...I love it! I like it!

ইতি
তোমার একান্ত শুভার্থী
কাকা দিগেন্দ্রনারায়ণ

তারপর এই হচ্ছে সেক্রেটারীবাবুকে যে চিঠি লেখা হয় সেখানা, পড়ি শুনুন ঃ পরের অর্থে পোদ্দারী করতে খুব আনন্দ, না? অন্যের বুকের রক্ত ঢেলে উপার্জন করা অর্থে হাসপাতাল গড়ে তুলতে চলেছ! Ideaটা চমৎকার বন্ধু! বোকা ভাইপোটির মাথায় হাত বোলাবার চমৎকার উপায় একটি বের করেছ তো! প্রস্তুত থেকো, কাল তোমারও তামাম শোধের দিন ধার্য করেছি—রক্তলোভী 'দিগেন্দ্রনারায়ণ'।

চিঠি দুখানা পড়া শেষ করে, আবার সে-দুটো ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে কিরীটী বলে, এখন বোধ হয় সুব্রত বুঝতে পারছ, এখানে আসবার সময় কেন লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম! এই চিঠি দুখানা আজ দুপুরেই কুমারসাহেব আমাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন।

বটে! এই ব্যাপার! ডাক্তার বলতে লাগলেন, ব্যাপারটা তো তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল রাত্রি সাড়ে নটায়। তারপর তিনি কফি চেয়ে পাঠান, এবং ঠিক রাত্রি সাড়ে নটায় তিনি কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে পূর্ববর্ণিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে গিয়ে উপস্থিত হন। কেমন তো?

হ্যাঁ, এবং তারই অল্পক্ষণ পরে ঘন্টা বেজে ওঠে, সে কথাটা ভুলবেন না যেন। কিরীটী বলে ওঠে ওঁর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে।

না, ঘন্টা বেজেছিল তা ভুলিনি। খুনী ঘন্টা বাজাবার আগে থেকেই সে ঘরে উপস্থিত ছিল এবং তলোয়ারটা খুন করবার জন্য তৈরী করেই বড় সোফাটার গদির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। Everything was kept ready— পূর্বপরিকল্পিত।

হ্যাঁ, কিন্তু এখন বলুন তো ডাক্তার, কোন্ দরজা দিয়ে খুনী তাহলে ঘরে গিয়ে ঢুকল?

কেন, দুটো দরজার যে কোনটা দিয়েই তো ঢুকতে পারে।...ভুলে যাচ্ছ কেন এ কথাটা যে, আমি বলেছি যে খুনী ঢের আগে থেকেই সে ঘরে উপস্থিত ছিল।

বেশ। কিন্তু এবার বলুন তো ডাক্তার, তাহলে ঘরের কোন্ দরজা দিয়ে খুনী খুন করে বেরিয়ে গেল? কারণ যখন দেখতে পাচ্ছি খুনের ঠিক পরই আমরা কেউ তাকে সে ঘরে গিয়ে খুঁজে পেলাম না!

কিরীটীর প্রশ্নে সহসা ডাক্তার চুপ করে গেলেন। মনে হল যেন তিনি অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাঁর এই বিব্রত ভাব দেখে আমি বললাম, ডাঃ চট্টরাজ, আমি এই কথাটাই আপনাকে তখন বলতে চাইছিলাম কিন্তু।

দাঁড়ান! দাঁড়ান! ডাক্তার অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন, খুনী হলঘরের সঙ্গে ওই ঘরে যাতায়াত করবার জন্য যে দরজা আছে, সে দরজা দিয়ে বের হয়নি; কারণ সেখানে আপনার নিযুক্ত লোক প্রহরায় ছিল এবং সেখান থেকেই সে সর্বদা হলঘরের দরজায় নজর রেখেছিল, কেমন এই তো আপনার যুক্তি?

খুনী এই ঘর অর্থাৎ এই ড্রয়িংরুমের দরজা দিয়েও বাইরে যায়নি। কারণ যেহেতু এ দরজার ওপর আমি নজর রেখেছিলাম, ঠিক যে মুহূর্তে আমি শুভঙ্কর মিত্রকে ঘরে ঢুকতে দেখি তার পর থেকেই সর্বক্ষণ, কেমন তো? আচ্ছা, তাহলে ডাক্তার এমন কি হতে পারে না যে, এই ব্যাপারটার মধ্যেই অর্থাৎ দরজার ওপর আমাদের নজর থাকা সত্ত্বেও একটা রীতিমত গোলমাল বা রহস্য লুকিয়ে আছে যা আপাতত আমাদের

কারও দৃষ্টিতে আসছে না! কিন্তু আমি সত্যই আশ্চর্য হচ্ছি—এমন সহজ গোলমালটা আপনার বা সুব্রতর চোখে পড়ছে না কেন? কেন আপনাদের ধরতে বা বুঝতে এত কষ্ট হচ্ছে?

আমরা কিরীটীর কথার কোন জবাবই দিলাম না।

হাসতে হাসতে কিরীটী বলতে লাগল, তবে শুনুন। আপনারা জানেন ঐ ঘরে যাতায়াত করবার দু ঘর দিয়ে দুটি দরজা আছে। একটি হলঘর দিয়ে, অন্যটি এই ঘর অর্থাৎ এই ড্রয়িংরুম দিয়ে, কেমন তো? এখন একটা দরজায় পাহারা দিচ্ছিল হরিচরণ, অন্যটায় আমি নিজে। নিজেকে আমি যতটা বিশ্বাস করি, আমার সহকারী হরিচরণকে বা তার কথাও ঠিক ততখানিই আমি বিশ্বাস করি। ঐ দুটো দরজার কোনটি দিয়েই কেউ বের হয়ে গেলে, আমার বা হরিচরণের চোখকে ফাঁকি দেবার তার সাধ্য ছিল না। তাছাড়া ঐ প্রাইভেট ঘরের একটি মাত্র জানালাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি খুব ভাল করে। নীচেই তার ট্রাম রাস্তা, এখনও হয়তো সে পথে লোকজন যাতায়াত করছে, তখন তো করছিলই। জানালার নীচে যে ধূলার পরত জমে আছে, তাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। কোন সামান্য এতটুকু দাগ বা চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে দেখতে পাইনি। আর বিশেষ করে জানালা থেকে ঘরের মাঝের ব্যবধান প্রায় চল্লিশ ফিট হবে বলে মনে হয়। মানুষ তো দূরের কথা, কোন বানরের পক্ষেও এই পথ দিয়ে যাতায়াত করা একেবারেই দুঃসাধ্য। অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং ঘরেও কেউ লুকিয়ে ছিল না, সে তো আমরা নিজ চক্ষেই পরীক্ষা করে দেখেছি। অথচ সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে, খুনী অন্যের অলক্ষ্যে ঘরে প্রবেশ করে, তারপর খুন করে আবার অন্যের অলক্ষেই বেমালুম গা-ঢাকা দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল, ঠিক যেমন আজ সন্ধ্যায় কুমারসাহেবকে আবছা ছায়ার মত ভয় দেখিয়েই স্যার দিগেন্দ্র হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেলেন—অনেকটা সেই রকম। এর পরেও কি ডাক্তার আপনি বলবেন বা আপনার স্থিরবিশ্বাস যে এই ব্যাপারটা একটা কল্পনাপ্রসূত ছায়াছবি মাত্র অর্থাৎ আপনাদের ডাক্তারী ভাষায় hallucination!

উঃ অসহ্য, ক্ষোভে দুঃখে ডাক্তার বলে উঠলেন, অসহ্য! কিন্তু আমিও নিশ্চয় করে বলছি রায়, খুনী নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। এবং আপনার অগাধ বিশ্বাসের পাত্র হরিচরণ হয় আসল ব্যাপার দেখতে পায়নি বা মিথ্যা বলেছে, আর তা যদি না হয় বা আপনি তা মেনে নিতে না চান, তবে I must say, ঐ ঘরে নিশ্চয়ই কোন গুপ্তদ্বার আছে যে পথ দিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে খুন করে চলে গেছে!

না, উত্তেজিত হবেন না ডাক্তার। ধীর গম্ভীর অচঞ্চল স্বরে কিরীটী বললে, খুনী লুকায়নি আদপেই। আমি যা দেখছি তা যেমন মিথ্যা নয়, হরিচরণের কথাও মিথ্যা নয়; এবং ঐ ঘরে কোন গুপ্তদ্বার থাকাও একেবারে সম্ভবপর নয়। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়ে ভাল করে দেখে আসতে পারেন আর একবার। ঘরের একদিকে রাস্তা, আর একদিকে হলঘর, ওপরে তিনতলার ঘর, তার ওপরে খোলা ছাদ। এদিকে এই ড্রয়িংরুম, অন্যদিকে খাবার ও রান্নাঘর। তবে এর মধ্যে ভেবে দেখুন কোন গুপ্তপথ থাকা সম্ভব কিনা। এক কথায় ঘরের মধ্যে কোন গুপ্তপথ নেই। এবং সে জানালাপথেও পালায়নি, হলঘরের দরজা বা এই ড্রয়িংরুমের কোনটা দিয়েই বের হয়ে যায় নি। এবং এখনও সেই ঘরের মধ্যে খুনী লুকিয়ে নেই। আসল কথা কি জানেন?

কিরীটীর মুখের দিকে সোৎসুকভাবে চেয়ে একই সঙ্গে আমরা দুজনেই উদগ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কী?

তবে শুনুন। আমরা যখন এখানে আসি তার ঢের আগেই খুনী তার কাজ শেষ করে গা-ঢাকা দিয়ে চলে গেছে। তাই আমরা কেউ তাকে দেখতে পাইনি ও-ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে। এবং দেহ ও মুণ্ডুর positionটা দেখে এটাও বুঝতে পারা কঠিন নয় যে, ব্যাপারটা আদৌ আত্মহত্যা নয়। সহজ ও প্রাঞ্জল খুন—a murder!... হ্যাঁ, খুন!

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম কিরীটীর কথাটা কতখানি সত্য।...এবং কত কঠিন সত্য।

কিন্তু এ কি নিদারুণ বিস্ময়! চোখের ওপর যেন ভাসতে থাকে একটা অশরীরী ছায়া, যে ছায়া এ বাড়ির প্রতিটি লোকের কাছে সুপরিচিত, যাকে তিলমাত্র কেউ সন্দেহ করে না। সে যেন মুখে একটা মুখোস এঁটে এই হৃদয়হীন কাজটা করে গেল। দয়া নেই, মায়া নেই। নেই এতটুকু বিবেক বিবেচনা। নির্মম খুন। পাশবিক লালসা। কে, কে? অথচ এই সমস্ত পরিচিতের মধ্যেই সেও একজন। কিরীটী বলেছে সকলেরই পরিচিত সে। তবে সে কে? আমি? কিরীটী? ডাঃ চট্টরাজ? কুমারসাহেব নিজে? ম্যানেজারবাবু? বিকাশ মল্লিক? দীনতারণ চৌধুরী? না প্রফেসার শর্মা? কে? কে? কে?

এমন সময় হরিচরণ ঘরে এসে প্রবেশ করল। কয়েকটা খোলা কাগজ ও একটা বই তার হাতের মধ্যে ধরা আছে। হরিচরণ বলল, এই নিন স্যার, এখানে আজ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলেরই জবানবন্দি এই কাগজে টুকে এনেছি, এমন কি চাকরবাকরদেরও। আর এই নিন সেই বই। বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সেও বলতে পারল না কে এই বইটা সেখানে ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু একথা সে বললে হলফ করে যে বিকালে এই বই সে ঘরে দেখেনি। আমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের এবারে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন স্যার। আমার মনে হয় তাঁদের কাছ থেকে আর বিশেষ কোন খবর পাওয়া যাবে না।

হুঁ, আশ্চর্য! কিরীটী গম্ভীরভাবে বলতে লাগল, কিন্তু এই ছোটদের একটা 'রূপকথা' কে এখানে নিয়ে এল? ভাল কথা হরিচরণ, এই বইটা যাঁরা এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন তাঁদের কারও কিনা জিজ্ঞাসা করে একবার দেখেছিলে কি?

হ্যাঁ, তাও করেছিলাম স্যার। কেউই বললেন না যে, এটা তাঁর বই বা বইটা কেউ সঙ্গে সরে এখানে নিয়ে এসেছেন!

অন্যমনস্কভাবে কিরীটী বইয়ের পাতাগুলি উল্টাতে লাগল; কলকাতার ৫ নং কলেজ স্কোয়ারের আশুতোষ লাইব্রেরী কর্তৃক ছাপা বইয়ের প্রথম পাতায় যেন কার নাম হিন্দীতে লেখা ছিল; কিন্তু তারপর রবার দিয়ে ঘষে ঘষে আবার সেটা যেন বেশ যত্নসহকারেই মুছে ফেলা হয়েছে।

সহসা ডাক্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিরীটী বললে, ডাক্তার, আপনি তো হিন্দী জানেন? দেখুন তো, কি নাম লেখা ছিল বইটাতে? ইতিমধ্যে হরিচরণের জবানবন্দী নেওয়া কাগজগুলো একটু আমি উল্টেপাল্টে দেখে নিই।

কিরীটী হরিচরণের হাত থেকে কাগজগুলো নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগল এবং মাঝে মাঝে নোট-বুকটা বের করে কী সব তাতে নোট করে নিতে লাগল। ডাক্তারের দিকে চেয়ে দেখলাম, ডাক্তার গম্ভীর হয়ে চশমার ভিতর দিয়ে বইয়ের প্রথম পাতায়

মুছে দেওয়া অস্পষ্ট নামের লেখাটাকে উদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টা করছেন। ক্রমে যেন মনে হচ্ছিল একটা বিস্ময়ের ভাব তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠছে একটু একটু করে। তারপর সেই পাতাটা উল্টে কী যেন মনোযোগের সঙ্গে পাতার অপর দিকে দেখতে লাগলেন।

কিরীটীর কাগজটা দেখা হয়ে গিয়েছিল, হরিচরণের দিকে চেয়ে বললে, হরিচরণ, আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের উপরেই একজন করে লোক যেন আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নজর রাখে আর এখুনি একজন লোকের বন্দোবস্ত কর, টালায় শুভঙ্কর মিত্রের বাড়িতে পাহারা দেবার জন্য। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকবে। কোনক্রমেই কোন লোককে সে বাড়িতে যেন ঢুকতে বা বাড়ি থেকে বের হতে দেওয়া না হয়। কেউ যদি ঢুকতে চায় বা বের হয়ে আসতে চায় বাধা দেবে। বাধা না শুনলে গ্রেপ্তার করবে।

হরিচরণ মাথা হেলিয়ে বললে, তাই হবে স্যার।

এইবার কিরীটী তার এতক্ষণ লেখা নোটটা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল, তাতে এইরূপ লেখা আছে।

৮-১৫ মিনিট—রাত্রি—মিঃ শুভঙ্কর মিত্র, কুমারসাহেব, প্রফেসার কালিদাস শর্মা, দীনতারণ চৌধুরী এঁরা সকলে কুমারসাহেবের শয়নঘরে কী একটা পরামর্শ করছিলেন। বয় কফি দিয়ে আসতে গিয়ে দেখেছিল ওঁদের সকলকেই ও-ঘরে।

৮-২০ মিঃ—রাত্রি—দীনতারণ চৌধুরী এখান থেকে চলে যান; ম্যানেজারবাবু ও দারোয়ান তাঁকে দেখেছে।

৮-২৫ মিঃ—৮-৫৫ মিঃ—মিঃ শুভঙ্কর মিত্র ও প্রফেসার কালিদাস শর্মা দুজনে খাবার ঘরে বসে গোপনে কি সব কথাবার্তা বলছিলেন, বাবুর্চি তাঁদের দেখেছিল। কারণ সে সময় বেয়ারা না থাকায় বাবুর্চিই নিজে তাদের গরম কফি দিতে গিয়েছিল।

৮-৫০ কি ৫২ মিঃ—কুমারসাহেবের সঙ্গে সিঁড়িতে ম্যানেজারবাবুর দেখা হয়। ম্যানেজারবাবুই একথা বলেছেন আমাদের।

৮-৫০ মি—৯-২৫ মিঃ—ম্যানেজারবাবু একাই ওপরের সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন —ম্যানেজারবাবুর স্বীকারোক্তি থেকে জানতে পারা যায়।

৮-৫৫ মিঃ—৯-৫৫ মিঃ—মিঃ মিত্র খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। সাক্ষী—বাবুর্চি ও প্রফেসার শর্মা।

৮-৫৫ মিঃ ৯-৩০ মিঃ—প্রফেসার শর্মা খাবারঘরে উপস্থিত ছিলেন, সাক্ষী— প্রফেসার শর্মা নিজে। তাছাড়া একজন বয়ও সেকথা বলেছে।

৯-১৫ মিঃ সময়ে নাকি এক কাপ কফি বয় নিজে গিয়ে প্রফেসার শর্মাকে দিয়ে আসে।

৯-১৮ মিঃ রাত্রি—কুমারসাহেব নিজে আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষী —আমরা সকলে।

৯-৩০ মি রাত্রি—মিঃ মিত্র কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে ঢোকেন আমাদের সকলেরই চোখের সামনে দিয়ে।

৯-৩০ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মা হরিচরণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এবং প্রফেসার শর্মা যখন হরিচরণকে সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, হরিচরণ জবাব দেয় এবং তারই কিছু আগে সে ঐখানে আমার আগেকার নির্দেশমত পাহারা দিতে উপস্থিত হয়। সাক্ষী

—হরিচরণ ও ম্যানেজারবাবু, কেননা উনি ঐ সময় সিঁড়ির ওপরেই দাঁড়িয়েছিলেন।

৯-৩০—৯-৩৬ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মার সঙ্গে প্রাইভেট-রুমের দরজার সামনে হরিচরণের দেখা ও কথাবার্তা হয়।

৯-৩৭ মিঃ রাত্রি—প্রফেসার শর্মা ড্রয়িংরুমে আমাদের সঙ্গে এসে আলাপ করেন।

৯-৪০ মিঃ রাত্রি—খুনের ব্যাপারটা বেয়ারার চিৎকার শুনে এ ঘরের সবাই আমরা জানতে পারি।

মতামত বা টীকা ১নং—এমন কোন লোকই পাওয়া যাচ্ছে না যিনি অন্তত স্মরণ করে বলতে পারেন যে, ঐ উপরিউক্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে কাউকেও ৮-২০ মিঃ থেকে ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ এই এক ঘণ্টারও বেশী সময়ের মধ্যে ওপরের হলঘরে দেখেছেন কিনা। আশ্চর্য!

২নং—এ বাড়িতে উপস্থিত যাঁরা আছেন তাঁদের কেউ বলতে পারছেন না যে, তাঁরা কেউ মিঃ শুভঙ্কর মিত্রকে রাত্রি ৮-৫৫ মিঃ (যখন তিনি খাবারঘর থেকে প্রফেসার শর্মার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসেন তখন) কিংবা ৯-৩০ মিনিটের মধ্যে প্রাইভেট-রুমে ঢুকতে দেখেছেন কিনা। এটাও আশ্চর্য!

৩নং—এটা হয়তো খুবই সম্ভব যে, এ বাড়ির পিছনদিকে অর্থাৎ ট্রাম রাস্তার দিকে এ বাড়িতে প্রবেশের কোন গুপ্তপথ আছে, এবং সেই প্রবেশপথের কথা আমার নিযুক্ত লোক খুনের আগে পর্যন্ত অবগত না হওয়ার জন্য পাহারা দিতে পারেনি সেখানে।

কিরীটী হাসতে হাসতে নোট-খাতাটা ডাঃ চট্টরাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললে, এবারে বের করুন ডাক্তার, হত্যাকারী কে? যা কিছু জানবার বা বুঝবার সব এর মধ্যেই আছে।

এমন সময় একজন পুলিস এসে জানাল, পুলিস সার্জেন্ট এসেছেন। আমরা সকলে হলঘরের দিকে অগ্রসর হলাম।

॥ ৮ ॥

হলঘরে ঢুকেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম।

সমগ্র হলঘরটি তখন আমন্ত্রিত অভ্যাগতের কলগুঞ্জনে মুখরিত। কিরীটী একজন পুলিস অফিসারকে ডেকে তখনি আদেশ দিল, এদের সকলকে এবার ছেড়ে দিন।

আদেশ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতা যেন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত উন্মুক্ত দ্বারপথের দিকে হুড়মুড় করে অগ্রসর হল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই জনস্রোত মিলিয়ে গেল।

সিঁড়ির মুখে প্রকাণ্ড ওয়ালক্লকটা ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল। এখন হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি, কিরীটী, ডাক্তার চট্টরাজ, থানার পুলিস অফিসাররা, কুমারসাহেব, পুলিশ সার্জেন্ট, খানসামা ও বেয়ারা-বাবুর্চির দল।

পুলিস সার্জেন্টই প্রথম ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন, বললেন, চলুন মিঃ রায়, মৃতদেহটা আগে দেখে আসি।

সকলে আবার এসে কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমে প্রবেশ করলাম। জমাট বাঁধা

রক্তস্রোতের মধ্যে একইভাবে বীভৎস মুণ্ডহীন মৃতদেহটা তখনও পড়ে আছে। এবং পাশেই মুণ্ডুটা।

পুলিস সার্জেন্ট মোটামুটি সব শুনে ও মৃতদেহ পরীক্ষা করে সঙ্গের একজন কর্মচারীকে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবার আদেশ দিলেন।

পুলিশ সার্জেন্ট বললেন, এবারে মিঃ রায় আমাকে ব্যাপারটা একটু বলুন তো?

কিরীটী তখন পুলিস সার্জেন্টকে মোটামুটি সব ব্যাপারটাই সংক্ষেপে আবার বললে তাঁর জ্ঞাতার্থে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, সুব্রত, তুমি তেতলায় গিয়ে ঠিক এই ঘরের ওপরের ঘরটা একবার ভাল করে দেখে এস তো দেখি। আর হরিচরণ, তুমি এর নিচের ঘরটা পরীক্ষা করে এস। হ্যাঁ দেখ সুব্রত, তুমি এই ঘরের ঠিক ওপরের তলার ঘরে গিয়ে ঘরের মেঝেতে কোন কিছু দিয়ে ঠুকে শব্দ করবে, তাহলেই এই ঘরে দাঁড়িয়ে সে শব্দ আমরা শুনতে পাব। আর তুমি নিজেও ঘরের মেঝেতে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করবে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাও কিনা। ঘরের দেয়ালে ঘা দিয়ে দেখবে কোথাও ফাঁপা-টাপা কিছু টের পাও কিনা। হরিচরণ, তুমিও ঐ একইভাবে নীচের ঘরটা পরীক্ষা করে দেখবে। আমি ততক্ষণ এই ঘরটা আবার একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে সন্দেহ ভেঙে দিই সবার। যিনি যাই বলুন, আমার নিশ্চিত ধারণা, ঘরের মধ্যে কোথাও কোন গুপ্তদ্বার নেই। শুধুই নিষ্ফল চেষ্টা এ, তবু আর একবার দেখব। প্রত্যেকটি ঘটনা যদি ভাল করে বিচার করা যায় তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির দ্বারা এভাবে খুন করা সম্ভবপর নয়।

ধীরে ধীরে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম।

কুমারসাহেবের আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই এ সংসারে। তিনতলার ঘরগুলো তাই খালিই পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে কোন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় এলে তেতলায় থাকেন। তা সেও ক্বচিৎ কখনও।

তিনতলার হলঘরে ঢুকবার মাথায়ই সিঁড়ি। সিঁড়ির দরজাটা ভেজানো। দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঠেলতেই নিঃশব্দে দরজার কপাট দুটো ফাঁক হয়ে গিয়ে খানিকটা জমাট-বাঁধা অন্ধকার চোখকে যেন অন্ধ করে দিল মুহূর্তের জন্য।

হাতের টর্চ জ্বালিয়ে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলাম—এ হলঘরখানিও অবিকল নীচের হলঘরেরই অনুরূপ।

নিঃশব্দে একাকী সেই অন্ধকার নির্জন হলঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। চারদিক হতে জমাট বাঁধা অন্ধকার যেন অদৃশ্য হাতে আমাকে এসে বেষ্টন করে ধরছে, অনুভব করছি অন্ধকারের হিমশীতল স্পর্শ। আশপাশে কোথাও এতটুকু গোলমাল বা শব্দ পর্যন্ত নেই। যেন যুগযুগান্তরের তন্দ্রাচ্ছন্নতা এইখানে এসে জমাট বেঁধে আছে অতলান্ত অন্ধকারের মধ্যে।

নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যায়।

এরপর কতকটা আন্দাজে ভর করে, যে ঘরটা ঠিক প্রাইভেট রুমের ওপরে হবে বলে মনে হল, সেই ঘরের দরজাটার হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম। নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল।

ঘরে ঢুকেই ওপরের দিকে তাকাতে স্কাই-লাইটের কাচের স্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে তাবায় ভরা শীতের আকাশের একটুকরো চোখে পড়ল। যেন একটুকরো স্বপ্ন!—দূরদূরান্তের মায়ায় ঘেরা। নাগালের বাইরে।

সহসা একটা মৃদু নিঃশ্বাসের চাপা শব্দ আমার সজাগ কানে এসে যেন আঘাত দিল। দেহের সমগ্র লোমকূপ পর্যন্ত যেন অভাবনীয় একটা পরিস্থিতির জন্য হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল।

হাতে ধরা টর্চটার বোতাম আবার টিপলাম; সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের বুকে সেই টর্চের আলোয় যে অভাবনীয় দৃশ্য সহসা আমার চোখে পড়ল তার জন্য ক্ষণপূর্বেও এতটুকু আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সত্যিই চমকে উঠেছিলাম।

দেখলাম ঘরের এক কোণে একটা সোফায় মুখ নীচু করে নিঃশব্দে একটি অল্পবয়সী যুবক বসে আছে।

আমার মত সেও বোধ হয় আমার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে চমকে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

কে? কে আপনি? কী চান এ ঘরে? বলতে বলতে ভীতত্রস্তভাবে যুবকটি উঠে দাঁড়াল।

ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে এ ঘরে আসিনি। তা ছাড়া আমি ভাবতেও পারিনি এই নির্জন অন্ধকার ঘরে এমনি করে ভূতের মত চুপটি করে কেউ বসে থাকতে পারে। সত্যিই আমি একান্ত লজ্জিত। দুঃখিত মিঃ...। আমি কেবল এ ঘরের মেঝেটা একবার পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এসেছিলাম। মানে...

কিন্তু কে আপনি? হঠাৎ এ ঘরের মেঝেটাই বা আপনি দেখতে এসেছেন কেন?

বর্তমানে আমি একজন পুলিসের সহকারী। আমি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম।

পুলিস! পুলিসের সহকারী! কিন্তু এখানে কেন? সে কী মরে গেছে নাকি?

যুবকের অসংলগ্ন কথায় মুহূর্তে সমগ্র ইন্দ্রিয় আমার যেন সজাগ হয়ে উঠল। কোনমতে নিজেকে সংযত করে বললাম, কার কথা বলছেন? কে মরেছে?

কে আবার, কুমারসাহেবের সেক্রেটারী মিঃ শুভঙ্কর মিত্র! একটু যেন দ্বিধাগ্রস্তভাবে কতকটা থেমে থেমে যুবক কথাগুলো বললে।

হ্যাঁ, মারা গেছেন তিনি সত্যি। কিন্তু আপনি যখন এতটা জানেনই, আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা না করে সুস্থির হতে পারছি না যে!

আমি কথাটা বলতে বলতে আলোটা আবার নিভিয়ে দিলাম! ঘর পূর্বের মত অন্ধকারে জমাট বেঁধে উঠল। অন্ধকারে সোফার ওপর নড়েচড়ে বসবার খস খস আওয়াজ কানে এল।

কী জিজ্ঞাসা করবেন শুনি? কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার অসহিষ্ণুতার আভাস যেন ঝরে পড়ল, কে আপনাদের খুন হয়েছে বা মারা গেছে সেই সম্পর্কেই আপনি আমাকে আবোলতাবোল কতকগুলো অবান্তর প্রশ্ন করবেন তো? কিন্তু কেন বলুন তো? আমাকে একা একা এই অন্ধকার ঘরে বসে থাকতে দেখে নিশ্চয়ই আপনার মনে ঐ জঘন্য ইচ্ছা জেগেছে, না?

রাগ করবেন না।...যদিও আপনি রাগলেও আমার কথার জবাব আপনাকে দিতেই হবে।

দিতে হবে কথার জবাব? কেন শুনি? জোর নাকি?

আপনাকে তো আগেই আমি বলেছি, আমি একজন পুলিসের লোক, কাজেই...

যুবক যেন কি ভাবলে, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, বেশ, জবাব দেব। করুন কি জিজ্ঞাসা করবার আছে আপনার!...চট্‌পট জিজ্ঞাসা করে ফেলুন। তারপর আবার একটু থেমে হঠাৎ বললে, আসুন না, চলুন ঐ জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যাক্; বলতে বলতে যুবক উঠে দাঁড়ায়। একটা মৃদু অথচ মিষ্টি গন্ধ সহসা আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যেন আলোড়িত করে তুলল। যুবক নিজেই এগিয়ে গিয়ে পথের ধারের জানালার কপাটটা খুলে দিল ধাক্কা দিয়ে।

মধ্যরাত্রির বর্ষণক্লান্ত শীতের আকাশ। অস্পষ্ট আলোছায়ার মধ্যে পার্শ্বের দণ্ডায়মান যুবকের দিকে ফিরে তাকালাম। আধুনিক বেশভূষায় সজ্জিত, অত্যন্ত ফিট্‌ফাট, বয়স বোধ করি বাইশ-তেইশের মধ্যে হবে।

যুবকটিই প্রথমে কথা বললে, অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে একা একা চুপ করে বসে থাকতে আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক পুলিসের লোকের মত লাগছে না। পুলিস আবার এরকম ভদ্র ও সভ্য দেখতে হয় নাকি? সত্যি চমৎকার চেহারা আপনার, যেন ঠিক গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর প্রতিমূর্তি। বাঙালীদের মধ্যে এত সুন্দর চেহারা বড় একটা আমি দেখিনি।—সত্যি বলুন তো, কে আপনি? কি আপনার সত্য পরিচয়?

বলেছি তো আমি পুলিসের লোক। কিন্তু এখন আমার চেহারার বর্ণনা স্থগিত রেখে আপনার কথাগুলো বলবেন কি?—আপনি এখানে কেন বসেছিলেন এমনি করে ভূতের মত একা একা? নিশ্চয়ই কারও জন্যে বসে অপেক্ষা করছিলেন, না?

বলছি। কিন্তু সত্যি বলছেন মিঃ মিত্র মারা গেছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বললাম তো মারা গেছেন। মিথ্যে কথা আজ পর্যন্ত জীবনে একটাও বলিনি। মিথ্যাকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।—এখন বলুন আপনার কথা।

আমিও জানি এবং টের পেয়েছি সে মারা গেছে। মৃদুস্বরে যুবকটি বললে।

কিন্তু তিনি যে মারা গেছেন, আপনি সেকথা জানলেন কি করে?

আমি যে অনুভব করছি সে মারা গেছে, হ্যাঁ, সমগ্র চেতনা দিয়ে অনুভব করছি সে মারা গেছে। আর তা না হলে—সে মারা না গেলে আমি পাগল হয়ে যাব। উঃ, কী ভালটাই তাকে একদিন আমি বেসেছি, নিজের ভাইয়ের মত অগাধ শ্রদ্ধা করেছি। —যাক, সে মরেছে। অতবড় একজন স্পোর্টসম্যান', সে কিনা তার সব সম্মান প্রভুত্ব ছেড়ে দিয়ে শেষটায় কুমারসাহেবের মত একজন লোকের কাছে যেচে চাকরি নিল! কুমারসাহেব আমাকে দু চোখেও দেখতে পারেন না, অথচ তার কী একটা জরুরী কাজ নাকি আমার সঙ্গে আছে, তাই চুপে চুপে রাত্রি নটায় আমাকে এখানে আসতে বলেছিল। তাকে আমার বড় ভাল লাগত একদিন। অত চমৎকার আবৃত্তি করতে জীবনে আর কাউকে শুনিনি। বাংলা কবিতা কী চমৎকারই না আবৃত্তি করত, কিন্তু সেই সব আবৃত্তির মধ্যে সহসা যখন এক এক সময় এক একটা হিন্দী কবিতা থেকে আবার আবৃত্তি শুরু

করত, শুধু তখনই আমার বিশ্রী লাগত। যাক সেকথা, আজ যখন সকালে আমাদের বাড়িতে সে এখানে আসবার জন্য আমাকে বলতে যায়, তার মুখের ওপরে যেন অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখেছিলাম—যেন মনে হচ্ছিল তার মুখের দিকে চেয়ে, সে বুঝি পাগল হয়ে উঠেছে। তার কথামত ঠিক রাত্রি নটা বাজবার কিছু আগেই এখানে এসে আমি তার অপেক্ষায় বসে আছি। এমন সময় যেন মনে হল আমারই ঠিক নীচের ঘরে কিসের একটা গোলমাল—

তারপর? রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম।

তারপর—তারপর আমার ঠিক মনে নেই! একসময় আস্তে আস্তে এই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। স্পষ্ট বুঝলাম, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে যেন অন্ধকারেই এই ঘরে এসে ঢুকেছে। একটা অজানিত ভয়ে সমস্ত শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পদশব্দেই বুঝেছিলাম, আমি যার অপেক্ষায় এখানে বসে আছি এ সেই শুভঙ্করদা নয়। অথচ ঘন অন্ধকারে বন্য পশুর মত আগন্তুক তখন ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। বরাবর আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই খপ্ করে সে আমার ডান হাতটা হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল; তারপর চাপা স্বরে উত্তেজিতভাবে বললে, বন্ধু, বৃথা এত রাত্রে এখানে এখনও বসে আছ। তোমার শুভঙ্করদার সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না; কেননা তোমার সঙ্গে দেখা করবার চাইতেও তার ঢের বড় কাজ "কালো ভ্রমরে"র সঙ্গে আছে।...তারপরই যেমন সে এসেছিল তেমনই চলে গেল।

কী, কী বললেন? তীব্র উৎকণ্ঠায় যেন আমার কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়ল।

হ্যাঁ, বললে কালো ভ্রমরের সঙ্গে কাজ আছে। চেনেন নাকি?

কালো ভ্রমর! কালো ভ্রমর!...এ কি ভয়ানক আশ্চর্য! নিজের হাতে যার মৃতদেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম, সত্যই কী সে তাহলে সেদিন মরেনি? আমার মনের মধ্যে যেন ঝড় বইতে শুরু করল। পাঁচ-ছয় বছর আগেকার কতকগুলো ঘটনা ছায়াছবির মতই মানসপটে বার বার ভেসে মিলিয়ে যেতে লাগল পর পর।...

তারপরই সে চলে গেল? আবার প্রশ্ন করলাম যুবকটিকে।

হ্যাঁ, আর দ্বিতীয় কথাটি সে বলেনি। এদিকে সে চলে যাবার পর মনে হল, যে হাতটা সে আমার চেপে ধরেছিল সেটা যেন কেমন ভিজে ভিজে লাগছে। ব্যাপার কী দেখবার জন্য পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালালাম। কিন্তু টর্চের আলোয় হাতের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আতঙ্কে মুহূর্তে যেন সর্বশরীর আমার ঝিম্ ঝিম করে উঠল। তাজা লাল রক্তে আমার হাতের কবজী ও আমার আস্তিনটা রাঙা টুকটুকে হয়ে গেছে। উঃ, মাথার মধ্যে এখনও আমার কেমন করছে!

বলতে বলতে সহসা আমার সামনে তার হাত দুটো প্রসারিত করে বললে, এই দেখুন, এখনও সেই রক্তমাখা হাতের স্পর্শটুকু আমার জামায় আস্তিনে সুস্পষ্টভাবেই বর্তমান।

আমি টর্চের আলো ফেলে দেখলাম, যুবকের দুধ-গরদের পাঞ্জাবির আস্তিনে রক্তের দাগ দারুণ বিভীষিকায় এখনও সুস্পষ্ট।

আচ্ছা আপনি সেই লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন?

না, তাকে আমি জীবনে আর কোন দিনও দেখিনি। তাছাড়া ঘর অন্ধকার ছিল।

গলার স্বর আপনার কি পরিচিত বলে মনে হয়েছিল সেই লোকটার?

না, অমন অস্বাভাবিক স্বর আমি জীবনেও শুনিনি। চাপা অথচ গমগম্ করছে, মনে হচ্ছিল যেন বহুদূর থেকে সমুদ্রের ক্রুদ্ধ অস্পষ্ট গর্জনের মত।

কাউকে সন্দেহও করেন না?

না, না, না। আপনাকে তো আমি বলেছি তাকে আমি চিনি না।

এতক্ষণে আমি আমার গলার স্বর কোমল থেকে কঠিন করলাম, দৃঢ়ভাবে বললাম, শুনুন, আপনার কোন ভয় নেই। আপনি যা জানেন সব কিছু কথা গোপন না করে আমাকে খুলে বলুন। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, কেউ আপনাকে আঘাত করতে পারবে না। আপনার সমস্ত বিপদে আমরা বুক পেতে দাঁড়াব। আপনার কোন ভয় নেই।

দয়া করুন। অনুগ্রহ করে আমায় যেতে দিন। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। এরপর মামার বাসায় গেলে যদি ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতে পারেন যে আমি এতক্ষণ বাইরে ছিলাম তবে জুতো মারতে মারতে আমাকে তাঁর বাসা থেকে দূর করে দেবেন চিরদিনের মত। আর তাছাড়া বর্তমানে কথা বলবার মত আমার দেহ ও মনের অবস্থা এতটুকুও নয়। এখন আমায় যেতে দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি যখনই ডাকবেন তখুনি আমি আপনার কাছে গিয়ে হাজির হব। আমার নাম অরুণ কর। ...নং গ্রে স্ট্রীটে আমি থাকি। আমায় ছেড়ে দিন। আমি এখুনি পিছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে বাগান দিয়ে চলে যাব, কেউ দেখতে পাবে না; বাগানে আমার সাইকেল রয়েছে।

হ্যাঁ, আমি আপনাকে যেতে দিলেও পুলিস আপনাকে জেরা করতে ছাড়বে না। তারা আপনার জবানবন্দী নেবে, তবে ছাড়বে।

দুর্ভাগ্যক্রমে যখন এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিই, জবানবন্দি আমার পুলিসকে দিতে হবে বৈকি, আর না দিলেই বা শুনছে কে? কিন্তু আজকের রাতের মত আমায় যেতে দিন।

বেশ, তাহলে আপনি এখন যেতে পারেন।

যুবক আমার নির্দেশ পাওয়া মাত্র নিঃশব্দে ঘর থেকে নিক্রান্ত হয়ে গেল। কতক্ষণ সেই অন্ধকার হলঘরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই, সহসা কার মৃদু স্পর্শে চমকে ফিরে চাইলাম, কে?

ভয় নেই, আমি কিরীটী। নীচে চল, রাত অনেক হয়েছে।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম।

কিরীটী বললে, এই বুঝি তোমার কর্তব্যজ্ঞান সুব্রত! যে কাজের জন্য তোমাকে পাঠালাম তা একবার দেখতেও বেমালুম ভুলে গেলে? যাকগে, গুপ্তদ্বার যে নেই ওঘরে সে বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চিত হয়েছি। সেই ঘরটায় আপাতত তালা দিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু যুবকটি কে?

কিরীটীর কথা শেষ হবার পূর্বেই বললাম, যুবকটিকে আমার এভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি, এই কথাই তো এখন তুমি বলবে কিরীটী?

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; কিন্তু যাক, তুমি তার ঠিকানা তো রেখে দিয়েছ, সেই যথেষ্ট; যদিও ঠিকানা তার জানবার তেমন দরকার ছিল না।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, তার মানে?

ছেলেটির এক সময় প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ও নগদ টাকাকড়ি ছিল এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দু-চারজনে যা নিয়েছে, তা গিয়ে এখনও হয়তো যা ব্যাঙ্কে আছে অনেকেরই তা নেই। কিন্তু ছেলেটি এর মধ্যেই দশজনের কৃপায় জাহান্নমে গেছে। আমার চিন্তাশক্তির যদি গলদ না থাকে, তবে নিশ্চয়ই ছেলেটি আমাদের নবলব্ধ বন্ধুবর কালিদাস শর্মার বর্তমান "মণিব্যাগ"। অর্থাৎ ওরই ঘাড় ভেঙে বর্তমানে বেকার প্রফেসার বন্ধুটির আমাদের খাওয়া, থাকা ও বিলাস-ব্যসনের সমস্ত খরচ চলেছে।

অ্যাঁ, বল কি?

তাই।

* * *

সে রাতের মত মার্বেল প্যালেস থেকে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে গাড়িতে এসে উঠে বসলাম।

রাত্রি শেষ হতে বড় বেশী দেরি নেই। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া ঝিরঝির করে বইছে। বর্ষণক্লান্ত মেঘমুক্ত আকাশটা যেন তারার মৃদু আলোয় ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

॥ ৯ ॥

নিঃশব্দ গতিতে জনহীন রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ি হু-হু করে ছুটে চলল। গাড়িতে বসে আনমনে ভাবছিলাম। আজ রাত্রের সমগ্র ব্যাপারগুলো একটার পর একটা এখনও চোখের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে ছায়াছবির মত। এবং আমার সমস্ত চিন্তাকে আবর্তিত করে একটা দৃশ্য মানসপটে কেবলই ভেসে উঠতে লাগল—লাল রক্তস্রোতের যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর সেই রক্তের ঢেউয়ের মধ্যে কালো অক্ষরে একটা নাম মাথা তুলে জেগে উঠছে, আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যাচ্ছে।...কালো ভ্রমর! কালো ভ্রমর!

আজ দীর্ঘ আট বছর ধরে একটা বিভীষিকার মতই ঐ নামটা যেন আমাদের পিছনে পিছনে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

কিরীটী আনমনে কি ভাবছে তা সে-ই জানে।

আমাকে আমহার্স্ট স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে কিরীটী চলে গেল।

নিজেকে কেন জানি না বড় ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগছিল। কোনমতে গায়ের পোশাকগুলো খুলে সোজা এসে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলাম, রাজু বোধ হয় জেগেই ছিল, আমার পদশব্দে সে শয্যায় পাশ ফিরে শুতে শুতে বললে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি রে সুব্রত?

বিছানার ওপরে গা-টা এলিয়ে দিতে দিতে বললাম, বন্ধু, আমাদের পুরনো বন্ধু শ্রীযুক্ত কালো ভ্রমর আবার যে আবির্ভূত হলেন নাটমঞ্চে!

কে? চমকে রাজু শয্যার ওপরে উঠে বসল।—কে আবির্ভূত হয়েছে?

কালো ভ্রমর। কেন, এর মধ্যেই নামটা ভুলে গেলে নাকি?

রাজু আবার শয্যার ওপর গা এলিয়ে দিল, ঠাট্টা করবার আর সময় পেলি না! এই শেষরাত্রে এসে...যা বাথরুম থেকে মাথায় চোখে মুখে ভাল করে ঠাণ্ডা জল দিয়ে

আয়। কোথায় ঘুরিস এত রাত পর্যন্ত? বলতে বলতে রাজু বেশ ভাল করে পালঙ্কের লেপটা টেনে পাশ ফিরে বোধ করি চোখ বুজল।

আমিও আর কোন কথা না বলে খোলা জানালার দিকে ফিরে শুলাম। চোখের পাতায় যেন ঘুম আসছে না।

খোলা জানালাপথে শীতের অন্ধকার রাতের একটুকরো আকাশ চোখে পড়ল শুকতারাটা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে।

ঝিরঝির করে রাত্রিশেষের শীতের হাওয়া ঘরে এসে ঢুকছে।

ঢং ঢং ঢং—দালানের ওয়াল-ক্লকটা রাত্রি তিনটে ঘোষণা করল।

উঃ, রাত্রি তিনটে বাজে!

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, পরদিন—

এই সুব্রত, ওঠ ওঠ! কিরীটীর ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল।

কখন এলে কিরীটী? লজ্জিত স্বরে বললাম।

* * *

আকাশে বাতাসে নাকি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক মহাযুদ্ধের কালো ইশারা জেগে উঠেছে। ইংলন্ড, জার্মান ও রাশিয়ার যে যুদ্ধ আজ সমগ্র ইউরোপকে তোলপাড় করছে, শীঘ্রই নাকি সারা পৃথিবীতে সেই যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়বে। রাজু আর সনৎদা তাই ব্যবসায় নেমেছে। এতবড় সুবর্ণ সুযোগ!

বড়বাজারের মোড়ে প্রকাণ্ড লোহার কারবার—রায় অ্যান্ড রায় কোম্পানী। দিবারাত্র ওরা দুজন তাই নিয়েই ব্যস্ত।

আমার ওসব ব্যবসা-ট্যবসা ভাল লাগে না, আনন্দও পাই না ওতে, তাই কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরি।

বসবার ঘরে এসে আমি আর কিরীটী দু কাপ চা ঢেলে নিলাম। চা-পানের পর কিরীটী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, চল সুব্রত, আমার সঙ্গে একটু বেরুতে হবে।

কোথায়?

চলই না, দেখবে'খন। আচ্ছা সুব্রত, গতরাত্রের ঘটনা সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতামত কী?

গতরাত্রের ঘটনাটা যে আমি তেমন বুঝে উঠতে পেরেছি একথা বললে সম্পূর্ণ মিথ্যে কথাই বলা হবে কিরীটী। তাছাড়া আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়, গতরাত্রের ঘটনার মধ্যে এমন কোন একটা ব্যাপার সত্যিই লুকিয়েছিল বা হয়তো আমাদের কারও নজরে পড়েনি এবং অনেক ঘটনাই থাকা সম্ভব যা কারও নজরে পড়ছে না আপাতত

তাহলে নিশ্চয়ই এমন ধরনের কোন একটা ব্যাপার তোমার মনে উঁকি দিয়েছে সুব্রত কালকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, বল না—বলছ না কেন?

কাল রাত্রে মিঃ মিত্রের হত্যা সম্পর্কে যাদের জেরা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে দুজন বলেছেন—একজন বিকাশ মল্লিক, আর একজন অরুণ কর, যে মিঃ শুভঙ্কর মিত্র হিন্দী ভাষা জানতেন; লিখতে, পড়তে, বলতে তাঁর আটকাত না। প্রফেসার কালিদাস শর্মাকেও তুমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে, কিন্তু তিনি স্পষ্টই বললেন, শুভঙ্করবাবুর

হিন্দী-জ্ঞান 'করেঙ্গা' 'খায়েঙ্গা'র বেশী নয়। অর্থাৎ তাঁর মতে মিঃ মিত্রের হিন্দী-জ্ঞান আমাদেরই মত। এঁদের মধ্যে হয় অরুণ ও বিকাশবাবু, নয় প্রফেসার শর্মা মিথ্যে কথা বলেছেন নিশ্চয়ই!

চমৎকার! বা সুব্রত, সত্যি আমি দেখে সুখী হয়েছি যে দিন দিন তোমার দেখবার ও বোঝবার শক্তি প্রখর হয়ে উঠছে। তুমি একদিন সত্যিকারের রহস্যভেদী হতে পারবে বন্ধু—কিন্তু এবার বল তো বন্ধু আমার, সত্যি যদি তোমার মতে ওদের মধ্যে কেউ একজন মিথ্যা কথাই বলে থাকে—কেন, কী কারণে সে মিথ্যা বললে? উদ্দেশ্য কী ছিল তার?

কী জানি ভাই, তা তো বলতে পারছি না! সত্যি সত্যি একজন ভদ্র ব্যক্তি কি করে যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন তা সহজ বুদ্ধির বাইরে। তবে আমার যা মনে হয়েছে তাই বললাম।

কিন্তু তোমার মনে হয় কি, কে এদের মধ্যে মিথ্যে কথা বলতে পারে বন্ধু?

মনে হয় প্রফেসারই যেন মিথ্যা বলেছেন। তারপর ধর হিন্দী ভাষায় অনূদিত "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" বইখানা...

চমৎকার! সত্যসত্যই যে সুব্রত তুমি ভাবতে শিখেছ! বল বল! কিরীটী উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

দেখ আমার অনুমান হয়, কুমারসাহেবের বাড়ির খাবার ঘরটায় গতরাত্রে আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে বলতে গেলে কেউই একপ্রকার ঢোকেননি। কেননা খাবার বন্দোবস্ত গতরাত্রে নীচের হলঘরেই হয়েছিল এবং সে অবস্থায় দু-একজন কেউ সে ঘরে ঢুকলেও পাশের ঘরেই যে বাবুর্চি ছিল তার নজরে পড়ত, আর হয়েছিলও তাই। শুভঙ্করবাবু যখন খাবার ঘর থেকে বের হয়ে যান, বাবুর্চি দেখেছিল। সেখানে এমন বেশী লোক থাকতে পারে না যারা হিন্দীতে অনূদিত বই পড়তে সক্ষম। তাছাড়া সকলেই একবাক্যে অস্বীকার করেছেন, ও বইটা সম্পর্কে কেউ কিছু জানেন না। অথচ প্রফেসার ও শুভঙ্করবাবু দুই বন্ধু খাবারঘরে অনেকক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। আমার যতদূর মনে হয়, শুভঙ্করবাবুই নিজে ঐ বইখানা খাবারঘরে একটা চেয়ারের ওপর ভুলে ফেলে আসেন এবং অরুণ করের সঙ্গে দেখা করবার সময় ঐ বইখানা নিয়ে যেতেন, অরুণ করকে উত্তেজিত করে মজা দেখবার জন্য, কেননা অরুণ কর হিন্দী ভাষা মোটেই পছন্দ করে না। সে যাই হোক, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, সত্যি ব্যাপারটা যদি আমার অনুমান মতই হয়ে থাকে তবে প্রফেসার শর্মা কেন বললেন না যে, মিঃ শুভঙ্কর মিত্রই বইখানা ঐ ঘরে ফেলে গিয়েছিলেন!

তাছাড়া আরও ভেবে দেখ, সত্যিই যদি মিঃ মিত্রই বইখানা সে ঘরে ফেলে গিয়ে থাকেন, প্রফেসার শর্মা নিশ্চয় তা জানতেন, কিন্তু তিনি তা স্বীকার করলেন না, কিংবা এমনও হতে পারে প্রফেসার শর্মা নিজেই বইখানা ফেলে গিয়েছিলেন!

কিরীটী কোন জবাব দিল না। চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, দেখ সুব্রত, আমরা যতদূর জানি ও শুনেছি, শুভঙ্করবাবু একটুও ঘোরপ্যাঁচের লোক ছিলেন না। কিন্তু ঘটনাগুলো পর পর এমনভাবে দাঁড়াচ্ছে যে লোকটা অত্যন্ত প্যাঁচোয়া ছিলেন বলে মনে হচ্ছে। আপাতত চল একবার দীনতারণ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

বেশ চল।

দুজনে আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

॥ ১০ ॥

টালিগঞ্জেই দীনতারণ চৌধুরীর বাড়ি।

ফটকওয়ালা একটা দোতলা বাড়ি। সামনেই গেটে কালো পাথরের ওপর সোনার জলে দীনতারণ চৌধুরীর নাম লেখা।

Mr. D. C. Chowdhury

M. A. Bar-at-law

ছোটখাটো একটা ফুলের বাগান, তার পরই বৈঠকখানা। দীনতারণবাবু বৈঠকখানা ঘরেই টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একরাশ কাগজপত্র চারপাশে ছড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে যেন কী সব দেখছিলেন। মাঝারি গোছের দোহারা চেহারা, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মাথাভর্তি সুবিস্তীর্ণ টাক চকচক করছে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

আমাদের পদশব্দে চোখ তুলে চাইলেন, কী চাই? কে আপনারা?

সুপ্রভাত। আমরা বোধ হয় মিঃ চৌধুরীর সঙ্গেই কথা বলছি! কিরীটী বললে।

হ্যাঁ বসুন। আপনারা?

আমার নাম কিরীটী রায়, আর ইনি আমার বন্ধু ও সহকারী সুব্রত রায়। আমরা গতরাত্রে কুমারসাহেবের সেক্রেটারীর হত্যার ব্যাপারে প্রাইভেট তদন্তভার নিয়েছি।

ও বেশ, নমস্কার। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম। আজ সকালের কাগজেই কুমারসাহেবের সেক্রেটারীর নিষ্ঠুর হত্যার ব্যাপার সম্পর্কে পড়েছি, ভাবছিলাম আর একটু বেলায় কুমারসাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আপনারা মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের হত্যা-সংক্রান্ত কোন কিছুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আমার এখানে এসেছেন মিঃ রায়!

হ্যাঁ। আমিই জবাব দিই।

কিরীটী বলে, আপনার সঙ্গে মিঃ মিত্রের অনেকদিন থেকেই আলাপ পরিচয় ছিল, তাই না মিঃ চৌধুরী?

আজ্ঞে ঠিক তা নয়, তবে শুভঙ্করের বাপ ছিলেন আমার পরম বন্ধু। বরানগরে এক সময় তাঁর মত ধনী দ্বিতীয় আর ছিল না। তাঁর বিষয়-সম্পত্তির লিগাল অ্যাডভাইসার আমিই ছিলাম। শুভঙ্করের পিতার মৃত্যুর পর থেকে আমি শুভঙ্করেরও লিগাল অ্যাডভাইসার ছিলাম বটে, কিন্তু ইদানীং তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আমার বড় একটা হত না, কারণ আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়েছিল। তবে কানাঘুষায় শুনেছিলাম, কয়েক বছর ধরে সে অত্যন্ত যা-তা ভাবে টাকা-কড়ি খরচ করতে শুরু করায় সম্পত্তি নীলামে ওঠে এবং সে প্রায় পথের ফকির হয়ে পড়ে। অবিশ্যি এ সংবাদ সঠিক কিনা তা জানি না।

আচ্ছা সেদিন সন্ধ্যায় আপনার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কুমারসাহেবের বাড়িতে?

হয়েছিল, মানে সে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিল, আর কী সব জুরুরী কথাবার্তা বলবে বলেছিল।

কথাবার্তা কী হল তাঁর সঙ্গে?

সে বলেছিল ভবিষ্যতে আর যাতে তাকে দুঃখ পেতে না হয় সেই বন্দোবস্তই এবার সে করবে মনস্থ করেছে। সেই সব কারণেই তার হাজার দশেক টাকার দরকার। সে একটা ব্যবসায় শুরু করবে। সে ব্যবসায় নাকি এই যুদ্ধের বাজারে খুবই লাভের সম্ভাবনা। সেই টাকাটা আমি তাকে কারও কাছ থেকে ধার করে দিতে পারি কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছিল।

কিন্তু আপনিই তো একটু আগে বলেছিলেন, বর্তমানে নাকি তাঁর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল! কিন্তু আপনি কি জবাব দিলেন?

বলেছিলাম চেষ্টা করে দেখতে পারি, কারণ বরানগরে তার পৈতৃক আমলের যে ঘরবাড়ি এখনও আছে তা বাঁধা রেখে হাজার দশেক কেন হাজার কুড়ি টাকা পাওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হত না মিঃ রায়।

মিঃ চৌধুরী, আপনি জানেন মিঃ মিত্রের বাগানের শখ ছিল কিনা?

না তো! হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মিঃ রায়?

জানেন গত সন্ধ্যায় কুমারসাহেবের বাথরুমে একটা ধারালো মাটি কোপানো খুরপি পাওয়া গেছে!

তবে একটা কথা মিঃ রায়—মাস পাঁচ-ছয় আগে শুভঙ্কর তখন সবে কুমারসাহেবের বাড়িতে চাকরি নিয়েছে, সেই চাকরি উপলক্ষেই সে একদিন রাত্রে তার বাড়িতে বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এক বিরাট ভোজ দেয়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলেই প্রায় তখন চলে গেছেন। যাইনি শুধু আমি ও শুভঙ্করের শিশু বয়েসের বন্ধু প্রফেসর কালিদাস শর্মা। এখানে চাকরি নেবার আগে শুভঙ্কর বছরখানেক প্রায় দেশভ্রমণ করে বেড়ায়। সে রাত্রে আমাদের কাছে শুভঙ্কর তার ভ্রমণ-কাহিনী বলছিল তার শয়নঘরে বসে বসেই এবং কথায় কথায় সাহিত্যও এসে পড়ল। কালিদাস একসময় বললে, আগে থেকেই চিন্তা করে চমৎকার উপায়ে যে-সব খুনী খুন করে তাদের খুনের ধারটা পরীক্ষা করে দেখলে মনে হয় যেন একটা রহস্যপূর্ণ উপন্যাস পড়ছি। বলে সে হাসতে লাগল।

সামনেই বসে শুভঙ্কর বরফ দিয়ে জিনজার খাচ্ছিল, মনে হল সে যেন একবার কেঁপে উঠল কথাটা শুনে। কথায় কথায় ক্রমে ইতিহাস ও রহস্যময় উপন্যাসের কথা উঠল। বক্তা প্রফেসারের বলবার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে, সে বলতে লাগল, বিখ্যাত লেখক পোয়ের মত কল্পনা-শক্তি আমি কোন বাংলাসাহিত্যিক কেন, ইংরাজ সাহিত্যিকদের মধ্যেও পাইনি। 'অ্যামনটিলাভো'র গল্পটা হয়তো পড়েননি আপনি মিঃ চৌধুরী। যখনই পোয়ের সেই গল্পটা আমার মনে পড়ে, কল্পনায় দৃশ্যটা আমার চোখের ওপর ভাসতে থাকে— সেখানে 'মনট্রেসর' 'ফরচুনেটো'কে নিয়ে মাটির নীচে কবরঘরের দেওয়ালের তলায় সমাধি দিতে চলেছে চিরজন্মের মত। শুভঙ্কর সে গল্পটা তো একদিন তোমাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম, মনে নেই? সেই যেখানে হতভাগ্য 'ফরচুনেটো' তার অবশ্যম্ভাবী ভয়ঙ্কর বিপদের কথা ঘুণাক্ষরেও টের না পেয়ে তার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করছে,

বল না, সত্যিসত্যিই কি তুমি ম্যামকের মাতৃসঙ্ঘের একজন মেম্বার? তার জবাবে মনট্রেসর বললে, হ্যাঁ। এবং তাতে ফরচুনেটো প্রশ্ন করলে, সেই সঙ্ঘের চিহ্ন কি বল তো? জবাবে মনট্রেসর বিদ্যুৎগতিতে তার জামার ভিতর থেকে একটা 'খুরপি' চট্ করে বের করে দেখাল।

বলতে বলতে সে সহসা শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে, কি, এর মধ্যেই সে গল্পটা ভুলে গেলে? শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে দেখি যেন একটা ভয়ঙ্কর উদ্বেগে তার সমস্ত মুখটা কালো হয়ে উঠেছে। সহসা এমন সময় শুভঙ্কর টলতে টলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে টলে পড়ে গেল। পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপরে যে ল্যাম্পটা জ্বলছিল সেটা গড়িয়ে পড়ে ভেঙে গেল। একটা বিশ্রী ঝন্ ঝন শব্দ হয়ে ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে শুভঙ্করকে তুলতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে শুভঙ্কর নিজেই কোনমতে আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাইরের খানিকটা চাঁদের আলো যেন একান্ত অনাহূত ভাবেই এসে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে। সেই আলোছায়াচ্ছন্ন ঘরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুভঙ্কর আর কালিদাস দুজনেই দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে যেন পরস্পরের অন্তর পর্যন্ত দেখছে।...

মিনিট দু-তিন এরকম কাটবার পর দুজনে আবার স্থির হয়ে যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

মিঃ চৌধুরী চুপ করলেন। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তখনকার মত আমরা মিঃ চৌধুরীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

* * *

সন্ধ্যার অল্প পরেই কিরীটী, আমি ও ডাঃ চট্টরাজ বরানগরে শুভঙ্কর মিত্রের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।

বাজার ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড চকমিলানো প্রাসাদতুল্য বাড়ি। লোহার গেটটা ভেজানোই ছিল। মৃদু একটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

সামনেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা নানাজাতীয় দেশী-বিদেশী মরসুমী ফুলের বাগান।

বাড়ির কোথাও একটা আলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অন্ধকারে নিঃশব্দে ভূতের মতই যেন বাড়িটা একটা বিভীষিকার মত স্তূপ বেঁধে আছে। ভয় করে। গায়ের মধ্যে ছম ছম্ করে ওঠে।

দরজার কড়া নাড়তেই দরজাটা খুলে গেল। সামনেই আধাবয়েসী একটি ছোকরা দাঁড়িয়ে।

কিরীটীই জিজ্ঞাসা করল, কি রে, তোর নাম কি?

আজ্ঞে মাধব, বাবু।

এ বাড়িতে কতদিন চাকরি করছিস?

মাত্র কয়েক সপ্তাহ হল বাবু আমাকে তাঁর কাজে বহাল করেছিলেন। আমি তাঁর বেয়ারার কাজ করতাম।

বেশ, বাড়ির আর সব চাকরেরা কোথায় মাধব?

আজ্ঞে, অন্য চাকরবাকর তো কেউ আর নেই। কর্তা অনেক দিন আগেই তাদের ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

কেন?

তিনি বলেছিলেন মাস চার-পাঁচেকের জন্য তিনি নাকি কুমারসাহেবের সঙ্গে সিঙ্গাপুর যাবেন কী একটা কাজে।

ও, তাহলে তুই তাঁর খাস-চাকর ছিলি বল?

আজ্ঞে সাধ্যমত তাঁর সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে কোনদিনই আমি কসুর করিনি কর্তা। আমারও আপাতত চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার কথা কিছুদিনের মত। তারপর তিনি বলেছিলেন, সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে আবার আমাকে সংবাদ দেবেন।

কাল রাত্রে তুই তাহলে এখানেই ছিলি মাধব?

আজ্ঞে। এত বড় একটা বাড়িতে একা একা—শেষে রাত্রি একটার সময় ফোনে খবর পাই—আমাদের বাবু মারা গেছেন। বড় ভাল লোক ছিলেন কর্তা ...কিন্তু বাবু, আশ্চর্য তারই ঠিক কিছুক্ষণ আগে যেন মনে হল শব্দ পেলাম সদর দরজায় চাবি দিয়ে কে যেন দরজা খুলছে...বাবু কখনও কখনও অনেক রাত্রে বাসায় ফিরতেন বলে আর একটা চাবি তাঁর কাছে থাকত। রাত্রে তিনি সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেন। আমি তাড়াতাড়ি নীচে গেলাম, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। ভাবলাম আমার শুনবারই ভুল হবে হয়তো।

ডাক্তার একবার মাথাটা দোলালেন কথাগুলো শুনে।

কটা চাবি তোর কর্তার সঙ্গে থাকত মাধব?

আজ্ঞে তাঁর শোবার ঘরের, লাইব্রেরী ঘরের, বাইরের দরজার, অন্যান্য ঘরের ও সিন্দুকের কয়েকটা চাবি একটা রিংয়ে ভরা সর্বদাই কর্তার কাছে থাকত বাবু। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বাবু?

কাল দুপুরে যখন তিনি বাড়ি থেকে যান, তখনও তাঁর কাছে চাবির সেই রিংটা ছিল কিনা তুই জানিস মাধব?

আজ্ঞে জামা-কাপড় পরার পর আমিই তাঁর অন্য একটা কোটের পকেট থেকে চাবির রিংটা এনে তাঁর হাতে দিই।

কাল কত রাত্রে তোর মনে হয়েছিল তোর বাবু ফিরে এসেছেন? ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

রাত প্রায় দেড়টা হবে বাবু বোধ করি।

আচ্ছা তুই যে বলছিলি বাবুর সিন্দুক আছে, কোন ঘরে সেটা?

আজ্ঞে দোতলায় বাবুর শোবার ঘরে।

একবার দেখাতে পারিস সে ঘরটা?

চলুন না।

আমরা সকলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এলাম। লম্বা একটা টানা বারান্দা, তার উত্তর দিকে এক কোণে শুভঙ্করবাবুর শয়নঘর। কিন্তু ঘরের সামনে এসে আমরা সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলাম। দরজার গা-তালায় তখনও একটা চাবিসমেত চাবির রিং ঝুলছে।

মাধব বললে, তাই তো বাবু! ঐ কর্তার চাবির রিং, কিন্তু এটা দরজার গা-তালায় ঝুলছে দেখছি! এখানে কী করে এল ওটা, আশ্চর্য!...তবে কি...সত্যিই বাবু ফিরে এসেছিলেন রাত্রে?

তুই সকালে আর ওপরে আসিসনি মাধব, না? কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

আজ্ঞে না।

তোর অনুমান ভুল হয়নি মাধব। এখন বোঝা যাচ্ছে সত্যই কাল রাত্রে কেউ এ বাড়িতে এসেছিল।

কিরীটী চাবি ঘুরিয়ে ধাক্কা দিয়ে শয়নঘরের দরজাটা খুলে ফেলল এবং মৃদুস্বরে বলতে লাগল, সুব্রত, ডাক্তার, এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয় কেন কাল রাত্রে মৃত শুভঙ্কর মিত্রের পকেট সার্চ করে আমার সন্দেহ হয়েছিল! একজন অবিবাহিত অল্পবয়স্ক যুবকের কাছে অন্তত তার প্রাইভেট চাবিটা থাকা দরকার, কিন্তু সেটা নেই! এখন বুঝতে পারছেন সবার অলক্ষ্যে কেমন করে খুনী মৃত-ব্যক্তির পকেট থেকে চাবি চুরি করে সরে পড়েছিল এবং চাবি নিয়ে সে যখন বরাবর এখানেই এসেছে নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিল। কিন্তু সেটা কী...সেটা কী?

মিঃ মিত্রের শয়নঘরটি বেশ প্রশস্ত। দামী মেহগনী কাঠের তৈরী একটা খাটে পাতা বিছানা চমৎকার একটি লাল রংয়ের বেডকবার দিয়ে ঢাকা। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের তেমন বিশেষ কোন বাহুল্য নেই।

ঘরের দেওয়ালে বড় বড় সব অয়েল পেন্টিং টাঙানো। দরজার সামনেই শিকারীর সুট পরা মিঃ মিত্রের কয়েক বছর আগেকার তোলা বোধ হয় একটি ফটো। মিঃ মিত্র যেমন একজন পাকা শিকারী ছিলেন, তাঁর শিকারের শখও ছিল তেমনি ভয়ানক প্রবল। কিরীটী কিছুক্ষণ ফটোটার কাছে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফটোটা দেখতে লাগল। তারপর একসময় আবার মাধবের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলে, ওই ঘরের দরজার ওদিকে একটা ঘর আছে, না রে মাধব?

আজ্ঞে বাবু। ওই ঘরেই বাবুর লেখাপড়া করবার টেবিল ও সিন্দুকটা আছে। চলুন।

আমরা সেই দরজা দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। অল্পপরিসর একখানি ঘর। এক পাশে একটা মাঝারি সাইজের সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও গোটাদুই গদিমোড়া চেয়ার। অন্যদিকে একটা প্রকাণ্ড বহুদিনের পুরনো লোহার সিন্দুক। চাবির রিংয়ের মধ্যে সিন্দুকের চাবি ছিল। কিরীটী আলগোছে অতি সন্তর্পণে চাবি দিয়ে সিন্দুকটা খুলে ফেললে; কিন্তু আশ্চর্য, সিন্দুক একদম খালি, একটি কাগজের টুকরো পর্যন্ত নেই তার মধ্যে।

কিরীটী বললে, তোর বাবুর সিন্দুক যে একেবারে খালি দেখছি মাধব! ব্যাপার কি, এর মধ্যে কি কিছু থাকত না?

আজ্ঞে সে কি বাবু—সিন্দুকের মধ্যে যে অনেক দরকারী দলিলপত্র ছিল, কালও বাবু যাবার আগে আমার সামনে সিন্দুক খুলে কী একটা কাগজ নিয়ে আবার সিন্দুক আটকে রাখলেন।...বাবু, আর সন্দেহ নেই আমার, নিশ্চয়ই কাল রাত্রে কেউ এসেছিল এ বাড়িতে! তা না হলে—, আর বাকী কথাগুলো সে শেষ করে না।

খুব সম্ভব।...দেখ, এই সিন্দুকের গায়ে হাত দিস না। আচ্ছা মাধব, দেখ্ তো, এই

চাবির রিংয়ের মধ্যে তোর মনে পড়ে এমন কোন চাবি খোয়া গেছে কিনা? মানে সব চাবিই ঠিক আছে কিনা?

চাবির রিংটা মাধব হাতে নিয়ে মনে মনে এক-একটা চাবি দেখে কী যেন হিসাব করতে করতেই সহসা সবিস্ময়ে বলে উঠল, বাবু, অস্ত্রঘরের সেই বড় পিতলের চাবিটা তো এর মধ্যে কই দেখছি না!

অস্ত্রঘর! এ বাড়িতে আবার অস্ত্রঘরও আছে নাকি?

আজ্ঞে। মাটির নীচে এ বাড়িতে একটা ঘর আছে বাবু, সেখানে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র সব দেওয়ালে সাজানো আছে। কত সব পুরনো দিনের অস্ত্র! কী অদ্ভুত সব দেখতে এক-একটা অস্ত্র! কর্তা আমাদের একদিন সবাইকে ডেকে নিয়ে দেখিয়েছিলেন। বাবুদের পূর্ব-পুরুষের মধ্যে নাকি কে একজন অত্যাচারী জমিদার ছিলেন, তিনিই ঐ ঘরটায় দুষ্ট প্রজাদের কয়েদ করে রেখে শাস্তি দেবার জন্য বানিয়েছিলেন বলেছিলেন, পরে আমাদের বাবু সেটাকে অস্ত্রঘর করেছিলেন। শুধু যে সে ঘরে অস্ত্রই আছে বাবু তা নয়, নানারকম পশুপক্ষীর হাড়-চামড়া, কত কী! দেখবেন চলুন না!

চল।

আমরা সকলে অগ্রসর হলাম।

* * *

মাধবই আমাদের অস্ত্রঘর দেখাবার জন্য নীচের তলায় নিয়ে চলল। জমিদারি আমলের বাড়ি। এর গঠন-কৌশল সম্পূর্ণ আলাদা। বাড়ির একটা রান্নাঘর এবং রান্নাঘরের পাশ দিয়েই একটা দরজা। সেই দরজা খুললেই একটা সিঁড়ি, সেখানে কোন আলোর বন্দোবস্ত নেই। ওপরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে যতটুকু আলোর প্রবেশাধিকার দিয়েছে তাও অতি সামান্য। এবং সেই আধো-আঁধারে আধো-আলোয় বহুকালের তৈরী মাটির নীচের কুঠরীর সন্ধানে আমরা সিঁড়ি বেয়ে চললাম। সুদূর এক অতীতে এই নির্জন কুঠরীতে কত হতভাগ্যের মর্মন্তুদ কান্নার অশ্রুত বিলাপধ্বনি হয়তো আজিও নিশীথ রাতের আঁধার বায়ুলেশহীন মাটির তলায় এই গুপ্তকক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে নিরুপায় আছাড়ি-পিছাড়ি করে মরে। কত খুনখারাপি, কত নির্মম অত্যাচার এই নির্জন অন্ধ কুঠরীতে একদিন অবাধে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গোটাকুড়ি সিঁড়ি ডিঙিয়ে একটা ছোট বারান্দার মত জায়গায় এসে সকলে আমরা দাঁড়ালাম। সামনেই প্রকাণ্ড একটা লোহার দরজা, দরজার গায়ে দেখা গেল একটা ভারি জার্মান তালা ঝুলছে। কিরীটী সামনের দেওয়ালে টর্চের আলো ফেলল, মনে হল বারান্দার এক পাশের দেওয়ালে যেন খুব শীঘ্র চুনকাম করা হয়েছে।

অস্ত্রঘর দেখে আবার আমরা সকলে এক সময় ফিরে এলাম ওপরে।

কিরীটী ও ডাক্তার আবার ওপরে চলে গেল। আমি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। রান্নাঘরের পিছনদিককার দরজাটা খোলা দেখে সেইদিকে এগিয়ে গেলাম।

সামনেই প্রকাণ্ড একটা আম, কাঁঠাল, জাম, জামরুল ও অন্যান্য ফল ও ফুলের বাগান। বহুকালের অব্যবহারে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে খুব সামান্যই সূর্যের আলো বাগানে প্রবেশলাভ করেছে। এক পাশে একটা প্রকাণ্ড

দীঘি—প্রকাণ্ড পাথরের বাঁধানো রাণা। একটা বকুল গাছ তার ডালপালার একটা অংশ রাণার দিকে হেলিয়ে দিয়েছে।

বাঁধানো রাণার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু ও কি! রাণার ওপর ডান হাতের ওপরে চিবুক রেখে গভীর চিন্তামগ্ন কে ও?

চিনতে কষ্ট হয় না, গতরাত্রে কুমারসাহেবের বাড়িতে স্বল্প-পরিচিত সেই ভীতকাতর যুবক অরুণ কর।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম, এ কি, অরুণবাবু যে! নমস্কার।

অরুণবাবু একান্ত নির্লিপ্তভাবে আমার দিকে চোখ তুলে একবার তাকালেন। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর পাশেই রাণার ওপর বসে বড়লাম। তিনি আমাকে প্রতি-নমস্কারও জানালেন না, যেমন চুপ করে বসেছিলেন তেমনিই রইলেন।

আজ দিনের আলোয় ভাল করে ভদ্রলোককে দেখলাম আবার।

সত্যিই অতি সুন্দর আভিজাত্যপূর্ণ চেহারা। আজও পরনে একটা দামী শান্তিপুরী ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি। মাথার চুল এলোমেলো বিস্রস্ত। মুখে সুস্পষ্ট একটা বিষণ্ণ চিন্তার ছায়া যেন ফুটে উঠেছে।

অরুণবাবু! আবার ডাকলাম।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে রীতিমত রুক্ষগলায় ভদ্রলোক বলে ওঠেন, যান যান মশাই, খুব আপনার কথার ঠিক! বললাম আমাকে চুপি চুপি যেতে দিন, সারাটা পথ দুজন লোক আমার পিছু পিছু ছায়ার মত আমার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে গেছে—ভাবেন আমি কিছু টের পাইনি! কেন মশাই, আমি কী খুন করেছি নাকি যে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন?

ও, এই কথা! আমি হাসতে লাগলাম, তা ওরা তো আমার লোক নয় অরুণবাবু। বোধ হয় পুলিসের লোক কেউ আপনাকে অনুসরণ করে দেখছিল সত্যই আপনি আপনার বাড়ির যে ঠিকানাটা তাদের দিয়েছেন সেটাই আপনার আসল ঠিকানা কিনা। কিন্তু সে কথা যেতে দিন। পুলিসের লোকগুলোই অমনি ধরনের, কিন্তু বলুন তো, এ সময়ে এ-বাড়িতে এমন জায়গায় আপনি এমনি করে ভূতের মত একা একা চুপচাপ বসে কি এত ভাবছিলেন?

কি আর ভাবব! মনটা খারাপ লাগছিল শুভঙ্করদার মৃত্যুর কথা ভেবে ভেবে। বাসায় মন বসল না, তাই কখন এক সময় হাঁটতে হাঁটতে এখানে চলে এসেছি। ভদ্রলোকের চোখের কোণ দুটো সহসা যেন উপচীয়মান অশ্রুধারায় সজল হয়ে এল, মনে পড়ছিল কতদিন এই নির্জন পুকুরের রাণায় আমরা দুজনে বসে তাঁর জীবনের কত সব রোমাঞ্চকর অদ্ভুত গল্প শুনেছি। কত ভালবাসতেন আমাকে শুভঙ্করদা! বলতে বলতে হঠাৎ অরুণ কর চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর একসময় আবার বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা, জানেন আজ সকালের দিকে আমি একবার কুমারসাহেবের ওখানে গিয়েছিলাম, কথায় কথায় ওঁর সঙ্গে মিঃ মিত্রের কথা উঠতে কুমারসাহেব কী বললেন জানেন?

কী? আমি প্রশ্ন করলাম।

কুমারসাহেব বলছিলেন, শুভঙ্করদার পক্ষে নাকি মরণই মঙ্গল হয়েছে। কি নিষ্ঠুর অথচ কি আশ্চর্য দেখুন! যে লোকটা কুমারসাহেবের জন্য এত করল, তার মৃত্যুতে

তাঁর চোখে একটু জল পর্যন্ত নেই! অথচ আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, এক মুহূর্ত তাঁর শুভঙ্করদাকে না হলে চলত না, প্রতি কাজে তাকে তাঁর প্রয়োজন হত। এরপর অরুণ কর কিছুক্ষণ আবার একেবারে চুপচাপ বসে রইলেন; বোধ হয় অতীত স্মৃতির বেদনায় মনটা ওঁর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল খুব বেশীই। আমিও নীরবে ওঁর পাশে চুপচাপ বসে রইলাম। এমন সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আচ্ছা এখন চললাম—সেই সকালে বের হয়েছি। যাবেন না আজ রাত্রে আমার বাসায়?...কেউ নেই, মামা-মামী পরশু মধুপুর গেছেন, একদম খালি বাড়ি; সেইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। আসবেন কিন্তু, আসবেন তো?

যাব। মৃদু স্বরে জবাব দিলাম।

অরুণবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমিও উঠলাম।

॥ ১১ ॥

গাড়িতে বসে ফিরবার পথে কিরীটীকে একসময় প্রশ্ন করলাম, অনুসন্ধানের মত কিছু পেলে?

না। একটা হাতের লেখার মত কিছু খুঁজছিলাম, কিন্তু পেলাম না। লোকটা দারুণ চালাক, আগে থেকেই সাবধান হয়ে যা কিছু প্রয়োজনীয় সব সরিয়ে ফেলেছে; তবু দুটো জিনিস পাওয়া গেছে।

কি? কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

একটুকরো কাগজ আর এইচ. এইচ. এইচ মার্কা একটা জন ফেবারের 'লেড' পেনসিল। বলে গভীর আনন্দে কিরীটী তার বুকপকেটের গায়ে হাত বুলিয়ে নিল—যেন বহুমূল্য কোন একটা দ্রব্য সেখানে সে বহুযত্নে লুকিয়ে রেখেছে।

ডাক্তার আগেই চলে গিয়েছিলেন। কথা ছিল তিনি পুলিস সার্জেনের ময়নাতদন্তের রিপোর্টটা নিয়ে তাঁর বাসাতেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

তাই গোটা তিনেকের সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা একবার লালবাজার থানায় পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

বর্তমান কেস সম্পর্কেই কমিশনার সাহেবের সঙ্গে কিরীটীর নানা কথাবার্তা হল। কিরীটীর সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের খুব বেশী বন্ধুত্ব, অন্যান্য কথাবার্তার পর সাহেব একসময়ে বললেন, কুমারসাহেব এ ব্যাপারে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছেন মিঃ রায়। তিনি গভর্নমেন্টকে দশ হাজার টাকার একটা চেক দিয়ে গেছেন—যে খুনীকে ধরিয়ে দিতে পারবে সে-ই ঐ পুরস্কার লাভ করবে।

তা বৈকি, কিরীটী বললো, তাঁর মত একজন সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে এ বড় কম সম্মানকর কথা নয়। আজ সংবাদপত্রে দেখছিলাম, বর্তমানে শ্রীপুরে যে টি-বি হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে গঙ্গার ধারে লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং যার সব কিছু ব্যয়ভার তিনিই নিয়েছেন —সেটা নাকি তাঁর কাকা স্যার দিগেন্দ্রের নামেই 'দিগেন্দ্র স্যানাটোরিয়াম' নাম দেওয়া হবে।—তিনি ঘোষণা করেছেন।

পুলিস কমিশনারের ওখান হতে বিদায় নিয়ে আমরা ডাঃ চট্টরাজের বাসায় গিয়ে

দেখি, তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। তাঁকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এবং সকলে আমরা বরাবর কুমারসাহেবের ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। কথায় কথায় একসময় কিরীটী প্রশ্ন করল কুমারসাহেবকে, আচ্ছা প্রফেসার শর্মা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন বলুন তো কুমারসাহেব?

প্রফেসার শর্মার নামে কুমারসাহেবের সমস্ত শরীরটা যেন সহসা একবার কেঁপে উঠল মনে হল। পরক্ষণেই উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, প্রফেসার শর্মা মানুষের দেহে একটি শয়তান মিঃ রায়! He is a dirty snake! Blood-sucking Vampire!

প্রফেসার শর্মা আপনার মৃত সেক্রেটারী শুভঙ্কর মিত্রের পরম বন্ধু ছিলেন তা জানেন বোধ হয় কুমারসাহেব?

ভগবানকে ধন্যবাদ যে সে বন্ধুত্বের অবসান হয়েছে। ভয়ঙ্কর লোক। লোকটা নাকি কি একটা নাটক লিখেছে এবং চেষ্টা করছিল নিরীহ শুভঙ্করকে দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে একটা থিয়েটার-পার্টি খুলতে।

শুনলাম ওরা দুজনে পরস্পর পরস্পকে নাকি চিনতেন?

একটা মৃদু হাসি কুমারসাহেবের ওষ্ঠপ্রান্তে জেগেই মিলিয়ে গেল, বুঝতে পেরেছি মিঃ রায়, আপনি কি সন্দেহ করছেন—প্রফেসার শর্মাই ছদ্মবেশী আমার কাকা স্যার দিগেন্দ্র কিনা, না? কিন্তু আমি বলছি তা নয়, তবে সে একজন ভয়ঙ্কর শয়তান বটে। তারপর যেন একটু থেমে হঠাৎ আবার আত্মগতভাবে বললেন, কিন্তু কাকার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না মিঃ রায়। মনে হচ্ছে এ বাড়ির কোথাও না কোথাও তিনি এখনও মৃত্যু-তৃষ্ণায় ওঁত পেতে বসে আছেন। হ্যাঁ, he is somewhere here! Somewhere here!

কুমারসাহেব আবার বলতে লাগলেন, এখন আর অবিশ্যি আমার বলতে বাধা নেই মিঃ রায়—কাল সন্ধ্যায় আমার সেক্রেটারী শুভঙ্কর আমাকে বলছিল, শীঘ্রই নাকি সে কোথায় টাকা পাচ্ছে। আর সেই টাকা দিয়ে সে নাকি শীঘ্রই একটা থিয়েটার খুলবে, plan-ও প্রায় তৈরী।

আচ্ছা সন্ধ্যার পরে প্রফেসার শর্মার বাসায় গেলে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে বলে আপনার কি মনে হয় কুমারসাহেব?

তা ঠিক বলতে পারি না, তবে শুনেছি দমদমার একটা বাগানবাড়িতে 'তলোয়ার সঙ্ঘ' নামে একটা নাকি গুপ্তসঙ্ঘ আছে, সেইখানে সে ও আমার মৃত সেক্রেটারী প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তলোয়ার খেলতে যেত। সন্ধ্যার পর তার বাসায় না পেলেও সেখানেই হয়তো পেলেও পেতে পারেন। ঠিকানা দিতে পারি যদি চান।

আমাদের অনুরোধে কুমারসাহেব ঠিকানাটা দিয়ে দিলেন।

কুমারসাহেব, আপনি অরুণ কর বলে কাউকে চেনেন?

আমার মৃত সেক্রেটারীর একজন পরম ভক্ত ছিল শুনেছি। বেশ ছেলেটি। তেমন বিশেষ কিছু নয়, সামান্য একটু-আধটু জানাশোনা হয়েছিল একবার।

দেখুন কুমারসাহেব, কিরীটী বলতে লাগল, একটা খুনের মামলার তদন্ত করতে গেলে অনেক অপ্রিয় ব্যাপারের সামনে আমাদের যেতে হয়; সেই জন্যই আগে বলে দিচ্ছি, যদি কোন সময়ে কোন অপ্রিয় কিছু বলি তো মনে কিছু করবেন না যেন। আচ্ছা

এমন কী হতে পারে না যে, আপনার কাকা এমন কারও ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন, যিনি হয়তো মিঃ শুভঙ্কর মিত্রের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন? এমন কি হয়তো আপনার সঙ্গেও পরিচয় ছিল সেই লোকটির?

না, সম্ভব নয়।

অবিশ্যি একথা খুবই সত্যি যে, আপনার নিজের কাকাকে আপনি যতটা চেনেন, আর কারও পক্ষে ততটা চেনা একেবারেই সম্ভবপর নয়। আচ্ছা, আপনার মনে কি হয় এমনভাবে কোন পরিচিত ব্যক্তির ছদ্মবেশে আপনার কাকা স্যার দিগেন্দ্র এখানে আসতে পারেন বলে?

না, বললাম তো, একেবারেই তা অসম্ভব। তাছাড়া আমার চোখকে তাঁর পক্ষে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর নয় মিঃ রায়। এ চিন্তাও বাতুলতা।

যা হোক, কুমারসাহেবের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরই দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী আমরা দমদমায় 'তলোয়ার সঙ্ঘ' অভিমুখে যাত্রা করলাম।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপর সিঁথির কাছাকাছি এক পুরাতন বাগানবাড়িতে ঐ সঙ্ঘ।

লোহার গেটের মাথায় একটা কেরোসিনের বাতি টিম্ টিম করে জ্বলছে। বাগানের মধ্যে বড় বড় সব আম ও ঝাউ গাছ। অন্ধকারে সোঁ সোঁ করে ঝাউপাতার একঘেয়ে কান্না শোনা যায়।

সঙ্ঘের কর্তা রাম সিং একজন যুদ্ধ-ফেরতা পাঞ্জাবী হাবিলদার সৈন্য।

কিরীটী ভৃত্যকে দিয়ে তাঁর কাছে কার্ড পাঠাতেই রাম সিং পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দানবের মতই উঁচু লম্বা চেহারা, অন্ধকারে যেন মূর্তিমান বিভীষিকার মতই প্রতীয়মান হয়।

রাম সিং আমাদের নিয়ে গিয়ে একটা ছোট্ট কামরার মধ্যে বসালেন। তারপর আমাদের পরিচয় জেনে বললেন, আমিও মিঃ মিত্রের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি বাবু। বাঙালীর মধ্যে অমন চমৎকার তলোয়ার খেলতে আজ পর্যন্ত বড় একটা রাম সিংয়ের চোখে পড়েনি বাবু। মনটা আমার বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। বহুৎ আচ্ছা আদমি থা।

আমি আপনার যে ঘরে খেলা হয় সে ঘরটা একবার গোপনে দেখতে চাই রাম সিংজী।

আসুন না।

পাশের বারান্দা দিয়ে আমরা একটা প্রকাণ্ড হলঘরে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরের আলো বারান্দায় এসেও খানিকটা পড়েছে।

ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে তীক্ষ্ণ সব তলোয়ার টাঙানো।

ঘরের মেঝেতে প্রফেসার শর্মা দাঁড়িয়ে। পরিধানে দামী কালো সার্জের লংস্ ও ঝোলা একটা জামা গায়ে। মাথার চুলগুলো ব্যাক্‌ব্রাস্ করা। দেহের প্রতিটি মাংসপেশী যেন সজাগ শক্তির অহমিকায় সুস্পষ্ট। ঘরের পরিবেশে আজ প্রফেসার শর্মাকে যেন চমৎকার মানিয়েছে।

হাতে একটা তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে তিনি চারপাশে বন্ বন শব্দে ঘুরাচ্ছেন। হঠাৎ এদিকে চোখ পড়তেই আমাদের সকল গোপনতা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কিন্তু তিনি কোন ইঙ্গিত দিলেন না।

এমন সময় একজন ভৃত্য একটা থালায় করে বড় বড় সব কাচের গ্লাসে বাদামের সরবৎ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

উপস্থিত যাঁরা ছিলেন সকলেই এক এক গ্লাস থালার ওপর থেকে তুলে নিলেন।

প্রফেসার শর্মা একটা সরবতের গ্লাস হাতে নিয়ে, সেটা মাথার ওপর তুলে ধরে আনন্দ-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, এস, যে বন্ধু আমাদের মারা গেল তার আত্মার কল্যাণে ও যে এর পরে মরবে তার শুভ কামনায় এই সরবৎ আমরা প্রাণভরে পান করি। হুররে।

সমস্ত সরবতটা এক চুমুকে পান করে শূন্য গ্লাসটা সামনের একটা টেবিলের ওপরে শর্মা নামিয়ে রাখলেন সশব্দে। তারপর এক পাক ঘুরে আবার বললেন, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমার কথা আপনারা অবিশ্বাস করবেন না, শীঘ্রই আর একজনের মৃত্যু আসন্ন হয়ে এসেছে আমি স্পষ্ট সেটা যেন অনুভব করছি। বলতে বলতে প্রফেসার শর্মা হস্তধৃত তলোয়ারটার বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরলেন, বন্ধু সকল, আপনাদের মধ্যে কেউ আজ আমার সঙ্গে অসিমুখে শক্তির পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত?—আসুন তবে। এক দিন তলোয়ার না খেললে যেন শরীর আমার ঝিমিয়ে আসে।

প্রফেসার শর্মার চোখে যখন আমরা পড়েই গেছি, তখন আর গোপনতার প্রয়োজন নেই, তাই আমরা সকলে ঘরের মধ্যে গিয়েই প্রবেশ করলাম।

ওর বুকে একটা সত্যিকারের শক্তি ঘুমিয়ে আছে বাবু। ও সত্যি বীর। সাবাস বেটা। রাম সিং বললে।

যাক্ গে, আপনাদের মধ্যে আমার সঙ্গে অসি খেলতে কারও সাহস নেই দেখছি। এই যে আমার নূতন বন্ধু মিঃ কিরীটী রায় এখানে উপস্থিত রয়েছেন, আসুন না, আপনার সঙ্গেই এক হাত খেলা যাক। অবিশ্যি আপনাকে যথেষ্ট সুযোগ দেব।

অশেষ ধন্যবাদ প্রফেসার শর্মা। ওটায় আমি তেমন রপ্ত নই। কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দিল।

তাহলে আর কি হবে, হতাশ হতে হল। আজ তবে আসি সর্দার। গ্রে স্ট্রীটের দিকে একটা জরুরী কাজ আছে...এখুনি যেতে হবে একবার। প্রফেসার শর্মা বলে ওঠেন।

আরে তাই নাকি, আমার বন্ধুরও তো রাত্রে আজ ও পাড়াতেই নিমন্ত্রণ। কি হে সুব্রত, অরুণ করের বাড়িতে আজ তোমার নিমন্ত্রণ না? কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললে।

কিরীটীর কথায় প্রফেসার শর্মার চোখ দুটো সহসা একবার তীক্ষ্ণ হয়েই আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

এরপর আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাম সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে এসে উঠে বসলাম। রাত্রির অন্ধকারে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলল।

কিরীটী এক সময় হীরা সিংকে ডেকে আদেশ দিল, হীরা সিং, পথে মেছুয়াবাজারে একবার ডাঃ রুদ্রের ল্যাবরেটারীর সামনে থেমো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললে,

আচ্ছা সুব্রত, এককালে তো তুমি কলেজ-জীবনে শুনেছি একজন খুব নামকরা 'অ্যাথলেট' ছিলে?

কেন বল তো হঠাৎ এ প্রশ্ন?

আচ্ছা তোমরা যখন কোন জায়গায় শো দেখাতে যেতে, তোমাদের সঙ্গে সব বড় বড় লাগেজ থাকত, না?

তা থাকত বৈকি। আমি জবাব দিলাম।

কিরীটী মৃদুস্বরে বললে, হুঁ, এক্কেবারে পাকা বন্দোবস্ত। সন্দেহ হবার জোটি নেই। কিরীটী অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভাবতে লাগল এর পর।

যথাসময়ে আমাদের গাড়ি ডাঃ রুদ্রের ল্যাবরেটরীর দরজার সামনে এসে দাড়াল।

ডাঃ রুদ্র ল্যাবরেটরীতে ছিলেন না। তাঁরএকজন সহকারী আমাদের এসে অভ্যর্থনা করে সমাদরের সঙ্গে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল, বললে, বসুন, ডাক্তার একটা জরুরী কাজে বের হয়েছেন, ফিরতে একটু দেরি হবে।

সহকারীর হাতে কিরীটী পকেট থেকে একটা লেড পেন্সিল বের করে দিয়ে বলল, ডাঃ রুদ্রকে এই পেনসিলটা একটিবার পরীক্ষা করে দেখতে বলবেন তো অমিয়বাবু। আমি শুধু জানতে চাই, পেনসিলটা কোন গ্রুপের? হ্যাঁ ভাল কথা, যে বইটা দিয়ে গিয়েছিলাম, তার থেকে ফটো নিয়ে ডেভলাপ করে দেখবার কথা ছিল সেটা করা হয়েছে কি?

আজ্ঞে ফটোর নেগেটিভটা শুকোচ্ছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, সাধারণ লেখবার কালি দিয়েই বইয়ের ওপর নামটা লেখা হয়েছিল। বইয়ের ওপর নামটা পড়া গেছে পরিষ্কার।

খুব সুখবর। প্লেটটা এখনি দেখব'খন। হ্যাঁ, পুলিসের রিপোর্টটা কি সার্জেন দিয়ে যায়নি?

হ্যাঁ, ডাক্তার বলেছিলেন মৃত মিঃ মিত্রের রক্ত ও হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তিনি আফিংয়ের নেশায় নাকি অভ্যস্ত ছিলেন প্রায় অন্ততঃ বছরখানেক ধরে।

হুঁ। কুমারসাহেবের প্রাইভেট রুমের জানলার কাছে যে আঙুলের ছাপের ফটো তোলা হয়েছিল, সেটার রিপোর্ট কী?

হুবহু স্যার দিগেন্দ্রের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে গেছে স্যার।

বেশ। যে তলোয়ারটা সেই ঘরে পাওয়া গিয়েছিল তার গায়ে কোন আঙুলের ছাপ পাননি, না?

আজ্ঞে না।

সবই আপনারা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন তো অমিয়বাবু?

হ্যাঁ স্যার, সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখেছি।

এবারে কিরীটী আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, আমাদের কথাবার্তা শুনে সুব্রত বোধ হয় খুব আশ্চর্য হয়ে গেছ, না? ডাক্তারও হয়তো হয়েছেন। কিন্তু একটা কথা কি জানেন? একটা ক্রাইমকে অনুসন্ধান করে তার গোপন কথা জানতে হলে অনেক ছোটখাটো ব্যাপারেরও সাহায্য নিতে হয়। কারণ অনেক সামান্য ব্যাপারের মধ্যে কত সময় যে আমরা প্রয়োজনীয় সূত্রের সন্ধান পাই ভাবলেই বিস্মিত হতে হয়। একজন

খুনী বা দোষীকে খুঁজে বের করতে হলেই যে টনটনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে তার কোন মানে নেই— সামান্য বিচার-বুদ্ধি ও common sense থাকলেই যে কেউ খুনীকে অনায়াসেই খুঁজে বের করতে পারেন।...অন্তত আমার বিশ্বাস তো তাই।

এরপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে, জানি জীবনে শত পরাজয় আছে এবং সেই জন্যই হঠাৎ পাওয়া একটি দিনের জয়ের আনন্দ অতীতের সমস্ত পরাজয়ের বেদনায় যেন শান্তিবারি ছিটিয়ে দেয়। ঐ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও সহজ বিচার-বুদ্ধি আছে বলেই জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কখনও হতাশ হইনি। যে কোন রহস্যই আমার কাছে বিচার ও বিশ্লেষণে অল্প সময়ের মধ্যে সহজ হয়ে গেছে। যা হোক, এবার আমাদের উঠতে হয়, রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হল। বলতে বলতে কিরীটী আমার ও ডাক্তারের চোখের সামনে একটা টাইপ করা কাগজ মেলে ধরল, তাতে এই কটা কথা লেখা:

"প্রফেসার কালিদাস শর্মা,—খোঁজ নিয়ে দেখলাম লোকটার বাড়ি ও জন্মস্থান কাশীতে। ওখানেই এবং পরে পাটনায় ও কাশীতেই ওঁর জীবনের চব্বিশটা বছর কাটিয়েছেন। ওঁর পিতার নাম স্বর্গীয় জ্ঞানদাস শর্মা। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী নেন। তারপর কলকাতায় ১৯৩৬ সন থেকে প্রফেসারী শুরু করেন। কিন্তু একটি বৎসর না যেতেই ১৯৩৭ সালে কলেজ-সংক্রান্ত কতকগুলো কী ব্যাপার নিয়ে চাকরি যায়। বর্তমানে তিনি কোথাও কোন কাজ করেন না, তবে প্রায়ই দেখা গেছে অরুণ করের নাম সই করা চেক ব্যাঙ্ক থেকে উনি ভাঙিয়ে নিয়েছেন।"

কিরীটী আমাদের দিকে একবার চেয়ে অদ্ভুত একটু হেসে কাগজটা মুড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াল।—চল, আশা করি এর পর আর রহস্যের মূল সূত্রটি খুঁজে পেতে তোমাদের কারও কষ্ট হবে না।

গাড়িতে বসে কিরীটী বললে, তাহলে সুব্রত, তুমি তো অরুণ করের বাড়িতেই যাবে, না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা আমার একটা জরুরী কাজ আছে অন্য জায়গায়, আমি আপাতত সেইখানেই যাব।

॥ ১২ ॥

আমার গাড়িটা আজ কদিন হতে বিগড়ে আছে, অগত্যা বাসে চেপেই অরুণ করের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললাম। রাত্রি তখন সাড়ে আটটা হবে, গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে বাস থেকে নামলাম। অরুণ করের দেওয়া ঠিকানামত তাঁর বাড়িটা খুঁজে নিতে আমার বিশেষ কোন বেগ পেতে হল না। ট্রাম রাস্তার পিছনে একটা গলির মধ্য দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই অরুণ করের বাড়ি।—চমৎকার আধুনিক প্যাটার্নের কংক্রিটের তৈরী মাঝারি গোছের একখানা দ্বিতল বাড়ি; লোহার গেট পার হলেই সামনেই একটা 'লন'—লাল সুরকি ঢালা রাস্তা বরাবর দরজা পর্যন্ত গেছে; দু পাশে কেয়ারী করা মেহেদির বেড়া ও নানাজাতীয় প্রচুর মরসুমী ফুলের সৌন্দর্যের সমারোহ। তারপরই সাদা ধবধবে বাড়িখানি একটা সুমিষ্ট ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়ে আনে।

করিডোরের সামনেই বোধ করি ড্রয়িংরুম। সূক্ষ্ম সিল্কের নেটের সবুজ পর্দা ভেদ করে ঘরের আলোর আভাস এদিকে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

ড্রয়িংরুমে নিশ্চয় কারা বসে আছে মনে হল আমার, কারণ মৃদু কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

সহসা একটা তীক্ষ্ণ গলার স্বর শোনা গেল, না না—এ আমি সহ্য করব না, কিছুতেই সহ্য করব না। বুঝে দেখ তুমি অরুণ, ভেবে দেখ।

চমকে উঠলাম। প্রফেসার শর্মার গলা। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

ম্রিয়মাণ কণ্ঠস্বরে অতি কষ্টে অরুণবাবু যেন জবাব দিলেন, কেন এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন মিঃ শর্মা? এর চাইতে একটুও বেশী আমি জানি না। আর জানতামও না।

তাহলে এই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, কর?

হ্যাঁ। কিন্তু প্রফেসার, এবারে আপনাকে যেতে হবে। আমার একজন বন্ধুর এখানে আজ রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে। হয়তো এখনি তিনি এসে পৌঁছবেন!

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

ভিতর থেকে আহ্বান এল, আসুন ভিতরে।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, চমৎকার আধুনিক কেতায় সুসজ্জিত একখানি ড্রয়িংরুম, চারিদিকে সোফা কাউচ। মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের টেবিলে প্রকাণ্ড একটা জয়পুরী ফ্লাওয়ার ভাসে এক থোকা শুভ্র রজনীগন্ধা। বাতাসে তার মিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আসুন আসুন সুব্রতবাবু। অরুণবাবু বললেন, এঁকে চেনেন তো? প্রফেসর কালিদাস শর্মা—আমার বিশেষ বন্ধু।

হ্যাঁ চিনি বৈকি।

নমস্কার সুব্রতবাবু। তারপর প্রফেসর নিঃশব্দে টুপিটা হাতে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আচ্ছা শুভরাত্রি অরুণ, শুভরাত্রি সুব্রতবাবু! আমার গাড়ি গলির মুখেই আছে, আমি পিছনের দরজা দিয়েই চললাম।

প্রফেসর নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ অরুণবাবু চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর হঠাৎ এক সময় বললেন, চা আনতে বলি সুব্রতবাবু?

না থাক। এত রাত্রে আর চা খাব না।

আপনিও একজন ডিটেকটিভ, না সুব্রতবাবু?

না।

ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোকগুলোকে আমার চিরকালই খুব ভাল লাগে, জানেন সুব্রতবাবু! কেন বলুন তো?

আমার কথার কোন জবাব দিলেন না অরুণবাবু, চুপচাপ বসে রইলেন; তারপর সহসা একসময় বললেন, চলুন, পিছনের বাগানে আমাদের খাবার আয়োজন করেছি। বাগানের মধ্যে টেবিল চেয়ার পাতা, মাথার উপরে চীনালণ্ঠনের পীতাভ আলো। চলুন। চমৎকার আইডিয়া, না?

আমরা দুজনেই উঠলাম।

বাড়ির পিছনে ছোটখাটো একটি ফুলের ও ফলের বাগান আছে। একটা কামিনী গাছের তলায় টেবিল চেয়ার পেতে খাবার আয়োজন করা হয়েছে।

শীতের রাত্রে এই খোলা বাগানে বসে খাওয়া...হাসি পাচ্ছিল। মাথার ওপরে গাছের ডালে ঝুলছে গোটাচারেক চীনা-লণ্ঠন। একটা পীতাভ আলোয় চারিদিক যেন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে।

এও এক অভিজ্ঞতা।

বাবুর্চি এসে টেবিলে খাবার দিয়ে গেল। গল্প করতে করতে আমরা খাওয়া শুরু করলাম। কথায় কথায় সাহিত্য নিয়ে তর্ক উঠল।

অরুণবাবু বলতে লাগলেন, রূপকথা পড়তে আমার বড় ভাল লাগে সুব্রতবাবু, একজন বন্ধুর মুখে একদিন আমি "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" রূপকথাটা শুনেছিলাম, বন্ধু আমাকে বইখানা এনে দেবেও বলেছিল। এনেও দিয়েছিল, অথচ বইখানা হিন্দিতে অনূদিত। উঃ, কি বিচ্ছিরি ঐ হিন্দী ভাষাটা! আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। শেষটা আমি নিজেই একটা বাংলায় লেখা বই কিনি।

অরুণ করের কথায় আমার সহসা যেন তর তর করে দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে উঠেছে বলে মনে হতে লাগল। তারপর আবার এক সময় আত্মগতভাবেই তিনি বলতে লাগলেন, মানুষ মরেই, তার জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু আমি গোলমাল ভালবাসি না। শান্তি চাই। সম্পূর্ণ শান্তি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর আমরা দুজনে বাগানে নানা গল্প করতে করতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মাথার উপরে নিঃশব্দ শীতের রাত্রি। রাতের চোরা হাওয়ায় বাগানের গাছপালার পাতায় পাতায় মাঝে মাঝে সিপ সিপ্ শব্দ জাগে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব।

বাগানের এক দিকে একটা কৃত্রিম ফোয়ারা থেকে ঝির ঝির করে জল পড়ছে ফোয়ারার চারপাশ শ্বেতপাথরে গোল করে বাঁধানো।

ক্ষীণ অষ্টমীর চাঁদ মৃদু আলো বিকীরণ করছে শীতের আকাশের গায়ে। একটা বড় শিশু গাছের তলায় আসতেই সহসা অরুণবাবু পায়ে কি লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে 'উঃ' বলে নিজেকে যেন কোনমতে সামলে নিলেন।

আমি শশব্যস্তে তাঁকে ধরে সামলাতে গিয়ে মৃদু চাঁদের আলোয় সামনের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গেলাম। রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ বাগানের মধ্যে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। গলাটা ধড় থেকে প্রায় দু ভাগ হয়ে এসেছে, সামান্যর জন্য একেবারে পৃথক হয়নি।

সেই অস্পষ্ট আলো-আঁধারিতে চিনতে আমাদের কষ্ট হয়নি মৃতদেহটি কার। মৃতদেহটি প্রফেসার কালিদাস শর্মার।

একটা আর্ত চিৎকার করে হঠাৎ অরুণবাবু অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

অদৃশ্য আততায়ীর মরণ পরশ আবার নিঃশব্দে একজনকে গ্রাস করল।

উঃ, কী ভয়ানক দৃশ্য! কি নিষ্ঠুর হত্যা! কি দানবীয় কাণ্ড!

একটা অশরীরী আতঙ্ক যেন মৃদু পদবিক্ষেপে বাগানের গাছের আড়ালে অন্ধকারে এগিয়ে আসছে। প্রথমটায় বেশ একটু যেন হকচকিয়েই গিয়েছিলাম, তারপর ঝরণা থেকে জল এনে জ্ঞানহীন অরুণবাবুর চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে অরুণবাবুর জ্ঞান ফিরে এল। তারপর অরুণবাবু খানিকটা সময় গুম হয়ে বসে

থেকে একসময় হঠাৎ পাগলের মতই হাঃ হাঃ করে অদ্ভুতভাবে হাসতে শুরু করলেন।

উঃ, সে কী তীব্র হাসি!.. কবর ভেঙে যেন অশরীরী প্রেতাত্মা এসে এখানে উন্মাদের মত হাসছে।

আমি অরুণবাবুর হাত ধরে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, কী হাসছেন পাগলের মত! থামুন থামুন অরুণবাবু!... অরুণবাবু! শুনছেন? আপনি কি পাগল হলেন?

অরুণবাবু পূর্বের মতই উন্মাদহাসি হাসতে হাসতে অদূরে একটা ঝোপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলেন, আমি দেখেছি তাকে সন্ধ্যাবেলা ঐ ঝোপের ধারে। আমি দেখেছি। জানি সে কে। সে মরে গিয়েও আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!

হাঃ হাঃ হাঃ!

আঃ অরুণবাবু! থামাবেন আপনার হাসি?

এবারে যেন অরুণ কর হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেললে।

থেমেছি। আর হাসব না। কিন্তু আমি জানতাম যে সে মরবে। কিন্তু আমার বাড়িতেই বাগানের মধ্যে এমনি করে নিজেকে নিজে হত্যা করল?

কী পাগলের মত বকছেন যা-তা? আত্মহত্যা করলে মাথা ওরকম দেহ থেকে প্রায় পৃথক হয়ে আসতে পারে নাকি?

সহসা যেন অরুণবাবু আমার কথায় চমকে উঠলেন। কী বললেন সুব্রতবাবু...তবে সত্যি কি সে আত্মহত্যা করেনি? তবে কি তাকে এত রাত্রে খুন করে গেল অমন করে? সে নিজে নিজেকে তবে হত্যা করেনি? খুন করেছে ওকে? না, না, আত্মহত্যা করেছে ও, হ্যাঁ, আত্মহত্যাই করেছে, আপনি জানেন না।

না, আত্মহত্যা নয়—কেউ খুনই করেছে। ভাল করে দেখুন না।

তবে কে হত্যা করলে তাকে অমন করে? কে? কে?

তা কী করে জানব? নিশ্চয়ই কেউ করেছে!

সহসা যেন অরুণবাবুর সমস্ত মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। অর্থহীন দৃষ্টিতে অদূর অন্ধকারে ঝোপের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অদূরে ঝোপের অন্ধকারে হঠাৎ একটা যেন সিগারেটের লাল আগুন দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দও শুনতে পেলাম যেন। তারপরই পরিচিত গলার আওয়াজ কানে এল।

সুব্রত, এখানে উপস্থিত থেকেও তুমি এমন করে খুন হতে দিলে? একটু বাধা দিতে পারলে না?

কালো সার্জের সুট পরা, সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে ঝোপের আড়াল থেকে ধীরপদে কিরীটী বের হয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

কিরীটী তুমি এখানে! অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, হত্যাকারীকে তাহলে তুমি দেখতে পেয়েছ নিশ্চয়ই?

না, দেখিনি। কিন্তু অরুণবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আগে ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও। তারপর বলছি কেমন করে এখানে এলাম।

আমি অরুণবাবুকে তখন চাকরদের সাহায্যে তাঁর শোবার ঘরে পৌঁছে দিলাম।

কিরীটীও পিছনে পিছনে এসে ঘরে ঢুকল, বেচারী অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পাশের ঘরে ফোন আছে, একজন ডাক্তারকে ফোন করে দাও আগে সুব্রত। ইতিমধ্যে আমি একবার বাইরেটা ঘুরে আসি। ওঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে রকম ভাবে পড়ছে, এখুনি একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।

কিরীটী ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। আমি অরুণবাবুর পাশেই বসে রইলাম।

একসময় চেয়ে দেখি অরুণবাবু ক্লান্তিভরে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পাশের ঘরেই টেলিফোন ছিল, গাইড দেখে একজন ডাক্তারকে কল দিলাম, তারপর কিরীটীর খোঁজে বাইরে গেলাম।

বাগানে ঢুকে দেখি অন্ধকারে টর্চের আলো ফেলে ফেলে কিরীটী বাগানের মধ্যে কিসের সন্ধানে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পদশব্দে কিরীটী আমার সামনে এসে দাঁড়াল। অস্থির অসংযত চাপা স্বরে বললে, উঃ সুব্রত, আমি একটা আস্ত গাধা! সত্যি বলছি আমি একটা গাধা! আমি ভুল লোককে পাহারা দিচ্ছিলাম এতক্ষণ! সত্যি এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কিন্তু কাল রাত্রেও আমি জানতাম না, সত্যিকারের খুনী কে? আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি সুব্রত, কাল রাত্রের আগেই খুনীকে আমি ধরিয়ে দেব। আর তা যদি না পারি, আমি কিরীটী রায়ই নই। এস। উত্তেজনায় কিরীটীর কণ্ঠস্বর শেষের দিকে যেন কাঁপছিল।

কিছু বুঝতে পারলে? আমি প্রশ্ন করলাম।

এস তোমাকে দেখাই।

চল।

আমরা দুজনে মৃতদেহের কাছে দাঁড়ালাম বাগানে।

কিরীটী বলতে লাগল, ভাল করে চেয়ে দেখ, অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে এঁকে খুন করা হয়নি। প্রথমে কেউ প্রফেসারকে দুবার ছোরা মেরেছে, একবার পিছনদিকে পিঠে, আর একবার পাশের পাঁজরায়। তারপর কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে দেহ থেকে মাথাটা পৃথক করে ফেলেছে। চেয়ে দেখ, দুইটি কশেরুকার (vertibra) মধ্যবর্তী তরুণাস্থির (cartilage) মধ্য দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। সাধারণ লোক এভাবে আঘাত করতে পারে না। যে আঘাত করেছে, মানবদেহের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। অস্ত্রবিদ্যায় (surgery) সুপণ্ডিত না হলে এভাবে হত্যা করা একেবারেই অসম্ভব। আর wound দেখে মনে হয়, এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া কোন ভারী অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। অনেকটা বর্মার একপ্রকার অস্ত্রের মত। তারপর কিরীটী টর্চের আলো ফেলে দেখাল, ঐ যে সরু রাস্তাটা বরাবর বাগানের মধ্য দিয়ে বাগানের পিছনের দরজা পর্যন্ত গেছে, দেখ ওখানে রক্তের দাগ রয়েছে। খুব সম্ভব দরজার কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে জানলা-পথে প্রফেসার তোমাদের লক্ষ্য করছিলেন, এমন সময় হত্যাকারী পিছনের দরজা দিয়ে এসে পিছন থেকে প্রফেসারকে ছোরা বসায় পিঠে। ছোরার আঘাত খেয়ে প্রফেসার সামনের দিকে চলে আসেন। সেই সময় পিছন থেকে হত্যাকারী হতভাগ্যের গলা কেটে ফেলবার চেষ্টা করে।

উঃ, আর কয়েক সেকেন্ড আগেও যদি বাগানে আসতাম কিরীটী, তবে হত্যাটা হত না! কিন্তু আশ্চর্য, কোন চিৎকার বা শব্দও তো শুনতে পাইনি! দুঃখিত স্বরে বললাম।

পাওনি তার কারণ আহত ব্যক্তি চিৎকার করবারও সময় পায়নি—it was so sudden!—কিন্তু সে কথা থাক্। যা হয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই। চল আর একবার সব ঘুরে ভাল করে দেখা যাক।

বাগানের পিছনের দরজা দিয়ে গলিপথে এসে দাঁড়ালাম দুজনে।

সামনেই একটা পোড়ো মাঠ। তার ওদিকে কতকগুলো খোলার বস্তি।

অনেক দূরে দূরে এক-একটা কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। সাধারণত এই অপ্রশস্ত পথটা কুলি-কামিন ছাড়া আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হয় না।

গতরাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই এই গলিপথের কাদা এখনও শুকায়নি। ঐ দেখ, অন্ধকারে এখনও প্রফেসারের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানতাম খুনী আজ এখানে আসবে, কিন্তু কেন? খুনী এখানে নিশ্চয়ই কোন ট্যাক্সিতে চেপে এসেছে কিন্তু বাগানের দরজা পর্যন্ত আসেনি, পাছে তার ড্রাইভারের মনে কোন প্রকার সন্দেহ জাগে। চল, এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক কতদূর পর্যন্ত ট্যাক্সি এগিয়েছিল।

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর আমরা গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেলাম ভিজে রাস্তার ওপর। তাহলে কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়!

কিরীটী আবার বলতে লাগল, আজ রাত্রে খুনী যখন এখানে আসে তখন সে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল ; কিন্তু যে অস্ত্র দিয়ে সে হত্যা করেছে সেটা রক্তাক্ত অবস্থায় সঙ্গে নিয়ে যায়নি, পাছে ড্রাইভারের মনে সন্দেহ জাগে। ফেলে রেখে গেছে সে সেটা নিশ্চয়ই, কিন্তু কোথায়?...চল, বাগানটা খুঁজে দেখি।...থানায় খোঁজ নিলেই ট্যাক্সি অ্যাসোশিয়েশন থেকে আজ এমন সময় কোন ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছিল কিনা অনায়াসেই জানতে পারব।

সত্যিই বাগানে খুঁজতে খুঁজতে একটা বকুল গাছের গোড়ায় ছুরিটা পাওয়া গেল।

কিরীটী বললে, থাক্, ছুরিটা ধরো না; চল অরুণবাবুর ঘরে যাই। এখুনি থানায় গিয়ে আমি হরিচরণকে এখানে পাঠাব। ভিজা মাটির বুকে অপরাধীর পায়ের দাগ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কেননা ট্যাক্সি থেকে নেমে বাকী পথটা সে হেঁটেই বাগানে এসেছিল। এবারে চল,—ভিতরে যাওয়া যাক।

ঘরে ঢুকে দেখি একজন ডাক্তার এসেছে; অরুণবাবুকে পরীক্ষা করে ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে তিনি বিদায় নিলে আমরা চলে এলাম।

* * *

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে কিরীটী ফোনে আমায় একবার ডাকল, এখুনি তার ওখানে একবার যেতে হবে, খুব জরুরী। ডাঃ চট্টরাজও তার ওখানেই অপেক্ষা করছেন।

কিরীটীর ওখানে গিয়ে তার গাড়িতেই আমরা সোজা কুমারসাহেবের বাড়িতে গেলাম। দরজার গোড়াতেই ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি বললেন, কুমারসাহেব বাড়ি নেই, আজ দুপুরের ট্রেনে নাকি মধুপুর গেছেন কী একটা জরুরী কাজে। কাল রাত্রের ট্রেনেই ফিরবেন।

একসময় কিরীটী বললে, শুনেছেন ম্যানেজারবাবু, প্রফেসার শর্মা কাল রাত্রে খুন হয়েছেন?

অ্যাঁ সে কি—কেন? কেন খুন হলেন? লোক তা খারাপ ছিলেন না নেহাত,

তবে—; তারপর হঠাৎ কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে বললেন, খুনীকে নিশ্চয় ধরেছেন, মিঃ রায়!

হ্যাঁ। আচ্ছা প্রফেসার শর্মা সম্পর্কে আপনাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই—আশা করি সঠিক জবাব পাব।

মৃদু হেসে ম্যানেজারবাবু জবাব দিলেন, কিরীটীবাবু কি মনে করেন, প্রফেসার শর্মার হত্যা সম্পর্কে কোন কিছু আমি জানি!

না, সেজন্য নয়, তাঁর সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানা প্রয়োজন, তাই। আচ্ছা শুনেছি নাকি ভদ্রলোকের জন্ম ও জন্মাবার পর অনেক দিন তাঁর কাশীতেই কেটেছিল। অথচ তিনি বলতেন, তিনি বহুকাল বাংলা দেশেই আছেন, এবং জন্মও নাকি তাঁর এই দেশেই। তাছাড়া অরুণবাবু যে সমস্ত চেক শর্মাকে দিতেন, আপনি নাকি সেগুলো আপনার অ্যাকাউন্টেই ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে দিতেন, একথা কি সত্য ম্যানেজারবাবু?

সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা মশাই। আমার নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কারও চেক আমি কোনদিনই ভাঙাইনি।

বেশ। শুনেছি তিনি একটা নাটক লিখেছিলেন এবং সেই নাটক নিয়ে থিয়েটার খুলবার জন্য কুমারসাহেবের কাছ থেকে শুভঙ্করবাবুর সাহায্যে টাকা আদায় করবার চেষ্টায় ছিলেন, এ কথা কি সত্য?

হ্যাঁ, আমিও তা শুনেছি বটে।

* * *

আমরা 'মার্বেল হাউস' থেকে বের হয়ে গাড়িতে চেপে বিকাশ মল্লিকের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম।

বিকাশবাবু তখন বের হবার আয়োজন করছেন, আমাদের দেখে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন।

তারপর কিরীটীবাবু, কি মনে করে? আপনার 'কেস' কতদূর এগুলো?

আপনি প্রফেসার শর্মাকে চিনতেন বিকাশবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করল।

সামান্যই চেনা-পরিচয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে প্রায়ই আমি অনেক কথা শুনতাম। উনি বেশ চমৎকার 'হিন্দী' বলতে কইতে পারতেন। শুভঙ্করবাবুর বাড়িতেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নেহাত মন্দ লোক বলে তাঁকে আমার কোনদিন তো মনে হয়নি। ... তবে একটু যেন 'হামবড়া' গোছের লোক ছিলেন। এরপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা বিদায় নিলাম।

* * *

গাড়ি কালীঘাট ব্রিজ পার হতেই কিরীটী হীরা সিংকে বললে, টালিগঞ্জে ব্যারিস্টার চৌধুরীর বাড়ি।

মিঃ চৌধুরীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আমাদের গাড়ি বরাবর কলকাতা পুলিসের ময়না ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

পুলিস সার্জেন ও একটা ডোম আমাদের জন্যে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিল।

পুলিস সার্জেন আমাদের আহ্বান জানালেন, শুভসন্ধ্যা মিঃ রায়।

আপনার মৃতদেহগুলো কোন ঘরে থাকে? কিরীটী প্রশ্ন করল।

ঠাণ্ডি ঘরে।

শুভঙ্কর মিত্রের মৃতদেহটাও বোধ হয় সেইখানেই?

হ্যাঁ, চলুন।...এই কাল্লু, পরশুকার সেই গলাকাটা দেহটা ও মাথাটা স্ট্রেচারে করে বাইরে নামা।

কাল্লু চলে গেল।

সার্জেনের পিছু পিছু আমরা একটা অল্পপরিসর ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলাম। একটা বিশ্রী উৎকট গন্ধে নাড়ি পাক দেয়। সামনেই একটা সেলফের মত আলমারিতে পর পর কতগুলো মৃতদেহ সাজানো। কাল্লু স্ট্রেচারে করে শুভঙ্কর মিত্রের মৃতদেহটা সামনে এনে নামাল আর একজন ডোমের সাহায্যে।

কিরীটী মৃতদেহটার আপাদমস্তক বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বললে, না, ঠিক আছে। দেহটা lock up করে রাখুন। এই নিন পুলিশ কমিশনারের অর্ডার। একটা বেলে রঙের ছাপানো কাগজ সার্জেনের হাতে কিরীটী এগিয়ে দিল।

* * *

ময়নাঘর থেকে বের হয়ে আমরা সকলে সোজা বরানগরে মিঃ মিত্রের বাড়িতে এসে হাজির হলাম।

কড়া নাড়তেই মাধব এসে দরজা খুলে দিল।

ভিতরে চল মাধব। একটা শাবল যোগাড় করে আনতে পার মাধব এখুনি? কিরীটী বললে।

হ্যাঁ, কেন পারব না বাবু! চলুন।

শাবল? শাবল দিয়ে কী হবে মশাই? বিস্মিত চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

দরকার আছে, চলুন না। এস সুব্রত। হ্যাঁ, আর একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে এস মাধব।

॥ ১৩ ॥

আমিও ভেবে পেলাম না কিরীটী হঠাৎ শাবল আনতে বললে কেন আর শাবল দিয়ে কী এমন কাজ হবে! যা হোক একটু পরেই মাধব একটা শাবল ও একটা লণ্ঠন নিয়ে সেই ঘরের মধ্যে ফিরে এল। শাবলটা হাতে নিয়ে একটা টর্চ হাতে আমরা কিরীটীর পিছু পিছু রান্নাঘরের দিকে চললাম।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে শুভঙ্কর মিত্রের অস্ত্রঘরের দিকে চললাম। ব্যাপার কি? কিরীটী কোথায় চলেছে? সে বলেছিল আজ সন্ধ্যার আগেই খুনীকে ধরিয়ে দেবে, কিন্তু এখানে কোথায় চলেছে? তবে কি খুনী ঐ বন্ধঘরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নাকি কোথাও?

ঘরের সামনে এসে কিরীটী সদ্য চুনকাম করা দেওয়ালটার দিকে এগিয়ে গেল। আলো উঁচু করে ধর সুব্রত, এই দেওয়ালটা খুঁড়তে হবে।

দেওয়ালটা সত্যসত্যই সে শাবল দিয়ে খুঁড়তে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই কতকগুলো ইট ঝুরঝুর করে পড়ে গেল। পাগলের মত শাবল দিয়ে কিরীটী চারপাশের ইট খুলতে লাগল। দেওয়ালের খানিকটা ভেঙে একটা গর্ত মত দেখা গেল।

সেই গর্তের মধ্যে পা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কিরীটী শাবল দিয়ে কিসের ওপরে আঘাত করল। ঠক্ করে একটা শব্দ হল। শাবলের সাহায্যেই চাড় দিয়ে কি যেন ভেঙে ফেলল। তারপর পকেট থেকে টর্চটা বের করে সেই গর্তের মুখে ফেলে আমাদের ডাকল, আসুন মিঃ চৌধুরী, চেয়ে দেখুন ঐ কাঠের বাক্সের মধ্যে। চেয়ে দেখুন তো, আপনার মক্কেল সত্যিকারের শুভঙ্কর মিত্রকে চিনতে পারেন কিনা? ঐ—ঐ হচ্ছে সত্যিকারের শুভঙ্কর মিত্র। আর একটু আগে ময়নাঘরে যাকে দেখে এলাম সে কে জানেন? কিরীটী আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের কাকা—রাঁচি পাগলাগারদের পলাতক স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণ।

মিঃ চৌধুরী একপ্রকার চিৎকার করে উঠলেন, অসম্ভব! আপনি কি পাগল হলেন মিঃ রায়?

না, পাগল আমি হইনি।

একটা ভীষণ দুর্গন্ধে সেখানকার সমস্ত বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। একটা পচা গলা মৃতদেহ বাক্সের মধ্যে বীভৎস আকারে পড়ে আছে। কিন্তু বিকৃত হলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে, একটু আগে যে দেহটা ময়নাঘরে দেখে এলাম তার সঙ্গে এই মৃতদেহের খুব সামান্যই পার্থক্য আছে। হুবহু একেবারে মিল, যেন দুটি যমজ ভাই।

এ কি তবে বিশ্বাস করতে বলেন মিঃ রায় যে, মিঃ চৌধুরী বলতে লাগলেন, স্যার দিগেন্দ্র আসল শুভঙ্করকে হত্যা করে এইখানে তার মৃতদেহ লুকিয়ে রেখে এত দিন ধরে শুভঙ্কর সেজে বেড়াচ্ছিল?

আমারও যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, আমি বললাম, তাহলে অন্য কেউ স্যার দিগেন্দ্রকে খুন করেছে এবং তারপর প্রফেসার শর্মাকে সে-ই খুন করেছে?

কিরীটী মৃদু হেসে বলল, চলুন, সব কথা এবারে খুলে বলব, ওপরে চলুন।

আমরা সকলে ওপরে এসে শুভঙ্কর মিত্রের শয়নঘরে বসলাম। মাধব একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে গেল।

কিরীটী মাধবকে বললে, গাড়িতে আমার একটি অ্যাটাচি-কেস আছে, ড্রাইভারের কাছ থেকে সেটা নিয়ে এস তো মাধব।

মাধব কিরীটীর নির্দেশ পালন করতে চলে গেল।

এবারে কিরীটী বলতে লাগল, আপনারা সকলে খুব আশ্চর্য হয়েছেন, না? প্রথম থেকেই হত্যার ব্যাপারে আপনারা ভুলপথে ছুটে চলেছিলেন, কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারতেন।

স্যার দিগেন্দ্র কোন একটা কারণে শুভঙ্কর মিত্রের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। পাটনায় যখন আসল স্পোর্টসম্যান মিঃ শুভঙ্কর মিত্র ছিলেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে স্যার দিগেন্দ্রের কোন সূত্রে হয়তো আলাপ হয়। স্যার দিগেন্দ্র অত্যন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অবিকল তাঁর মত দেখতে এমন একটি লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় মিঃ মিত্রের সঙ্গে তাঁর বোধ হয় আলাপ-পরিচয় হয় এবং স্যার দিগেন্দ্র লক্ষ্য করলেন মিঃ মিত্র অবিকল তাঁরই মত দেখতে, শুধু তাঁর নিজের নাকটা একটু ভোঁতা আর মিঃ মিত্রের নাকটা চোখা।...স্যার দিগেন্দ্রের ফ্রেঞ্চকাট কালো দাড়ি আছে, মিঃ মিত্রের তা নেই। ...নাকের খুঁতটা স্যার দিগেন্দ্র ডাঃ রুদ্রের সাহায্যে অপারেশন করে ঠিক করে

নিলেন এবং চেহারা বদলাবার আগে স্যার দিগেন্দ্রের পক্ষে মিঃ মিত্রের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাঁর স্বভাবচরিত্র, ভাবগুলো অনুকরণ করে নিতে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু এত করেও একটা জিনিস স্যার দিগেন্দ্রের চোখে ধরা পড়েনি, সেটা হচ্ছে মিঃ মিত্রের ডান কানের কাছে ছোট্ট সিকি ইঞ্চি পরিমাণ লাল জড়ুল চিহ্ন। এই ঘরে মিঃ মিত্রের ফটো দেখে সেইটা আমার নজরে পড়ে, আমি তখনি মিলিয়ে দেখবার জন্য ময়নাঘরে ছুটে যাই। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ডান কানের নীচে কোন জড়ুল-চিহ্ন পাই না। এতেই বুঝলাম যে কুমারসাহেবের বাড়িতে যে খুন হয়েছে সে মিঃ মিত্র নিশ্চয়ই নয়, জম্মের দাগ কখনও মিলায় না। তখন ভাবতে লাগলাম, মৃত ব্যক্তি যদি মিঃ মিত্র না-ই হয় তবে আসল মিঃ মিত্রই বা কোথায় এবং এই মৃত ব্যক্তিই বা কে? এদিকে এই বাড়ির অস্ত্রঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম, একটা দেওয়ালে নতুন চুনকাম করা হয়েছে... সন্দেহ হল সমস্ত দেওয়াল বাদ দিয়ে এক জায়গায় মাত্র চুনকাম করা হয়েছে কেন? তবে কি ঐ চুনকাম করা দেওয়ালের আড়ালে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে?

ভাবতে লাগলাম। এদিকে মিঃ মিত্র খুব ভাল হিন্দী জানতেন। অথচ স্যার দিগেন্দ্র হিন্দী জানতেন না। তিনি কয়েকমাস হয়তো পাটনায় থেকে কোন একজন মাস্টার রেখে হিন্দীটা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু তাতে করে কাজ চললেও ছদ্মবেশের কাজ চালানো যায় না।

তবে কি হিন্দী ভাষায় অনূদিত "সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে" বইখানা তাঁরই? আমি এবারে উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ। কিরীটী আবার বলতে লাগল, এসব ছাড়াও তিনি নতুন করে আফিং খেতে শুরু করেছিলেন, কেননা মিঃ মিত্রের নাকি আফিংয়ের নেশা ছিল। তা ছাড়া এই ঘটনা ঘটবার আগের দিন নকল মিঃ মিত্র ও কুমারসাহেব স্যার দিগেন্দ্রের বেনামীতে দুজনে দুখানা চিঠি পান। সে হাতের লেখাও মিলিয়ে দেখিছি, সেই লেখা স্যার দিগেন্দ্রের হাতের লেখার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। পুলিসের ফাইলে স্যার দিগেন্দ্রের হাতের লেখার নমুনা ছিল। সেই চিঠিগুলো একপ্রকার সবুজ কাগজে পেনসিল দিয়ে লেখা। পেনসিল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পেনসিল সাধারণত চার শ্রেণীর হয়। 'কারবন' 'সিলিকেট' ও 'লোহা' দিয়ে মিশিয়ে যে পেনসিলের সীস্ তৈরী হয় তার লেখা সাধারণত ধূসর কালো রংয়ের হয়। 'গ্রাফাইট' 'সিলিকেট' ও 'লোহা' দিয়ে যে পেনসিলের সীস্ তৈরী হয় তার লেখা সাধারণত বেশ ঘন কালো রংয়ের হয়। রংয়ের পেনসিলগুলো সাধারণত ওর সঙ্গে রং মিশিয়ে তৈরী হয়। আর কপিং পেনসিল তৈরী হয় 'অ্যানিলিন রং', 'গ্রাফাইট' ও 'কেওলিন' দিয়ে। পেনসিল দিয়ে লেখা সেই চিঠিটার গায়ে 'অ্যাসিটিক অ্যাসিডের' ও ফেরোসায়োনাইডের একটা সলুশন ঢেলে দেওয়া হয়—তার ফলে লেখাগুলো একটা রাসায়নিক ক্রিয়ায় রঙিন হয়ে যায়। মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝতে পারা গেছে, ঐভাবে লেখা সাধারণত রঙীন হওয়া উচিত নয় ঐ সলুশন দিলে। এবং ঐ রং দেখেই আমবা ধরতে পেরেছি কোন শ্রেণীর পেনসিল দিয়ে চিঠিটা লেখা হয়েছিল। বোঝা যায় লেখাটা কপিং পেনসিল দিয়েই লেখা হয়েছিল এবং সাধারণত এইচ. এইচ. কপিং পেনসিল দিয়ে লিখলে ঐ ধরনের লেখা হয়। সুব্রত, বোধ হয় মনে আছে, ঐ ধরনের একটা পেনসিল এ বাড়িতেই আমি পেয়েছি ডেস্কে, গতকাল

বলেছিলাম। এখন বুঝতে পারছ, সেই পেনসিলটা দিয়েই ওই দুখানা চিঠি লেখা হয়েছিল!

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী মাধবের আনীত অ্যাটাচি-কেস থেকে 'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে' বইখানা বের করল। এই বইখানা নিয়ে মিঃ মিত্র প্রায়ই অরুণ করের সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং এই বইখানা কুমারসাহেবের খাবার ঘরে চেয়ারের ওপর পাওয়া যায়। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রথম পাতায় একটা নাম লেখা ছিল, তারপর রবার দিয়ে ঘষে সেটা তুলে ফেলা হয়েছে। আমরা এটারও ফটোগ্রাফ নিয়ে পরীক্ষা করেছি। ফটো নেওয়া হয়েছিল 'অরথোক্রোম্যাটিক' প্লেটে, একটা নেগেটিভ তোলা হয় এবং তাকে ছোট করে 'পারক্লোরাইড অফ মারকরি' দিয়ে জোরালো করা হয়। তারপর সেটা শুকোলে ফ্রেমে বসিয়ে তার সঙ্গে লাগিয়ে একটা প্লেটে ফটো নেওয়া হয়। এইভাবে প্রায় ছ-সাত বার ফটো নেওয়া—ফটোয় কি নাম পাওয়া গেছে দেখুন!

আমরা সকলে নেগেটিভের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলাম। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাতে লেখা—দিগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। এরপরও অবিশ্বাস করা চলে না যে, স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণই স্বয়ং আমাদের ছদ্মবেশী মৃত মিঃ শুভঙ্কর মিত্র! তবে এখন প্রশ্ন ওঠে, আসল শুভঙ্কর মিত্র কোথায়? স্যার দিগেন্দ্র তাঁকে খুন করেন। কিন্তু কোথায় তবে মিঃ মিত্র খুন হলেন? বিকাশবাবু গত ডিসেম্বর মাসে পাটনা থেকে মিঃ শুভঙ্কর মিত্রকে পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে ফিরে আসতে দেখেছিলেন। এবং পাটনা থেকে ফিরে এসেই কিছুদিন পরে মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র কুমারসাহেবের কাছে চাকরি নেন। তাহলে বোধ হয় ট্রেনের মধ্যেই স্যার দিগেন্দ্র কাজ সারেন এবং আসল মিঃ মিত্রের মৃতদেহটা খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম রাখবার বড় বাক্সর মধ্যে ভরে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

বিখ্যাত শিকারী ও স্পোর্টসম্যান হিসাবে মিঃ মিত্র সর্বত্রই সুপরিচিত। অতএব বিনা হাঙ্গামায় বাক্সবন্ধ হতভাগ্য মিত্রের মৃতদেহটা নিয়ে আসতে তাঁকে এতটুকুও বেগ পেতে হয়নি। মৃতদেহ রাস্তায় ফেলতে পারেননি পাছে তাঁর প্ল্যান ভেস্তে যায়। মৃতদেহ সঙ্গে করেই এনেছেন। কিন্তু কোথায় রাখবেন—এই হল তাঁর সমস্যা। এইখানেই তিনি সব চাইতে বুদ্ধির খেলা দেখালেন, মিঃ মিত্রের মৃতদেহ মিঃ মিত্রের বাড়িতেই লুকিয়ে রাখলেন। এখানে এসেই আগে তিনি পুরাতন চাকরদের বিদায় করে মাধবকে রাখলেন, পাছে তাঁকে কেউ সন্দেহ করে। তারপর এখানে এসে যখন তিনি মিঃ মিত্রের বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে গেলেন তখন তিনি দেখলেন—সেদিনকার ঘটনা আমরা মিঃ চৌধুরীর মুখেই শুনেছি, কেননা উনি নিজেও সেদিন উপস্থিত ছিলেন,এবং সেরাত্রে প্রফেসার শর্মার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ মিঃ মিত্র কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যান তাও আমরা জানি। মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র নিমেষে বুঝতে পারলেন, সেরাত্রে অসাধারণ চতুর আসল মিঃ মিত্রের শিশুকালের বন্ধু প্রফেসার শর্মার চোখে তিনি ধুলো দিতে পারেননি। তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছেন। এখানে এসে অরুণ করের সঙ্গে আলাপ হলে স্যার দিগেন্দ্র ঠিক করেন অরুণের মাথায় হাত বুলিয়ে বেচারীর টাকা কয়টা বাগাতে হবে, কেননা মিঃ মিত্রের অনুসন্ধান নিয়ে দেখলেন মিঃ মিত্রের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। খুনের রাত্রে বোধকরি টাকার কথা বলবার জন্যই তাকে লুকিয়ে ওপরের ঘরে এসে দেখা করতে বলেন এবং টাকা ধারের কথা মিঃ চৌধুরীকেও বলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আর

একটা কোন জায়গা থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে এবং অরুণ কর ও হতভাগ্য মিঃ মিত্রের ঘরবাড়ি বন্ধক রেখে প্রভূত অর্থ নিয়ে এদেশ ছেড়ে চিরতরে চম্পট দেবেন।

মিঃ চৌধুরী কিরীটীর কথায় কেঁপে উঠলেন।

কিরীটী বলতে লাগল, কিন্তু এর মধ্যে তার চাইতেও চতুর আর এক চতুর চড়ামণি এসে দেখা দিলেন। তিনি হচ্ছেন আমাদের হতভাগ্য প্রফেসার শর্মা।

সেইজন্য প্রায়ই প্রফেসার শর্মা এখানে আসতে লাগলেন মৃতদেহের খোঁজে। কেননা তখনও তিনি বুঝতে পারেননি যে স্যার দিগেন্দ্র মৃতদেহ কোথায় কীভাবে লুকিয়ে রাখতে পারেন। একটু ভাবলেই বোঝা যায় এবং তাই ভেবেই হয়তো মিঃ শর্মা অনুমান করেছিলেন নিশ্চয়ই, এ বাড়িরই কোথাও তাঁর মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কেননা সেটাই হবে সবচাইতে বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু কোথায়? বাগানে? না, তাতে লোক-জানাজানি হবে। সবচাইতে ভাল হবে অস্ত্রাগারে।...কেননা সেটা সবচাইতে নির্জন।

মিঃ মিত্র যে আসল নয় জাল এবং খুঁজতে খুঁজতে অস্ত্রঘরেই যে সে লুকানো আছে প্রফেসার শর্মা এই ঠিক করলেন এবং দেখলেন এ মজাই হল— তিনি কোন কিছু না ভেঙে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন, কেননা তাঁরও অবস্থা তখন চাকরিবাকরি না থাকার দরুন 'অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ! তা ছাড়া অরুণ করের টাকায় তার মত একজন অতি বিলাসী লোকের চলাও সম্ভবপর ছিল না।

॥ ১৪ ॥

কিরীটী অল্পক্ষণের জন্য এবারে একটু থামল। তারপর সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে হাসতে হাসতে বললে, এবার চলুন বন্ধুরা, কুমারসাহেবের মার্বেল প্যালেসের দিকে যাওয়া যাক। অকুস্থানে বসেই আমার রহস্যের ওপর যবনিকা টানব।

তখুনি আমারা গাড়িতে চেপে রওনা হলাম। এবং রাত্রি প্রায় সোয়া বারোটায় আমরা সকলে বেহালায় কুমারসাহেবের মার্বেল প্যালেসের সামনে এসে নামলাম। একটা সুমধুর হাওইন গিটারে সুরের আলাপ কানে ভেসে এল। চকিতে অতীতের অন্ধকারে যেন আলোর রশ্মি এসে পড়ল। এই সুর কোথায় শুনেছি! এ যে বহুকালের চেনা! আশ্চর্য, এত রাত্রেও নীচের হলঘরে আলো জ্বলছে দেখতে পেলাম!

ঘরে ঢুকে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

কুমারসাহেব!

অথচ শুনেছিলাম আজই বিকালে যে, তিনি আজ দুপুরে মধুপুর চলে গেছেন। একটা সোফার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে কুমারসাহেব হাওইন গিটার বাজাচ্ছেন। কিরীটী ঘরে ঢুকেই উল্লাসভরা কণ্ঠে বললে, শুভরাত্রি ডাঃ সান্যাল।

আমাদের এতগুলো লোককে এত রাত্রে ঘরে ঢুকতে দেখে বাজনাটা হাতেই কুমারসাহেব সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর সহসা কিরীটীর হাতের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন যেন।

হাত তুলুন! কিরীটীর গলা শুনে তার হাতের দিকে চেয়ে দেখি কিরীটীর হাতে ঝকচক করছে একটা রিভালবার।

সুব্রত, এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের পকেট থেকে রিভালবার বের করে নাও। আ
এই নাও, এই সিল্ক-কর্ডটা দিয়ে ওঁর হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে ফেলো।

আমি এগিয়ে গিয়ে কুমারসাহেবের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে হাত দুটো কিরীটীর দেওয়া সিল্ক কর্ড দিয়ে বেঁধে ফেললাম।

এসবের মানে কি কিরীটীবাবু? ক্ষুণ্নস্বরে কুমারসাহেব বললেন।

বসুন আপনারা সবাই। শুনুন ডাক্তার সান্যাল ওরফে কালো ভ্রমর, ওরফে ছদ্মবেশী কুমারসাহেব! স্যার দিগেন্দ্রনারায়ণ ও প্রফেসার শর্মার হত্যাপরাধে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম। কিন্তু ডাক্তার, এতখানি জঘন্যতা আপনার কাছে আমি আশা করিনি কোন দিনও। বরাবর একটা শ্রদ্ধা আপনার ওপরে আমার ছিল। আপনারা হয়তো ভাবছেন ওঁকে আমি চিনলাম কী করে, না? মাত্র দুটি কারণে, এক নম্বর ওঁর হাতের লেখা দেখে যার নমুনা এখনও আমার কাছে আছে। মনে পড়ে তোমাদের, মৃত স্যার দিগেন্দ্রের পকেটে হলদে রংয়ের তুলট কাগজ গোটা দুই পাওয়া গিয়েছিল? এই দেখ সেই কাগজ আর এই দেখ এতে ভ্রমর আঁকা। এই চিঠি পেয়েই গতরাত্রে মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র ওঁকে চিনতে পারেন যে উনি কালো ভ্রমর।

উনি যে কুমার দীপেন্দ্র নন, স্যার দিগেন্দ্র প্রথম দর্শনেই তা টের পেয়েছিলেন পাঁচ বছর আগে প্রথম যেদিন উনি ভাইপোর পরিচয়ে তাঁর কাছে আসেন। কিন্তু তখন তিনি কোন কথা প্রকাশ করেননি। ইচ্ছা ছিল গোপনে একদিন তিনি এঁকে শেষ করবেন কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা নিষ্ফল হয় এবং পাগলা-গারদে তাঁকে যেতে হয় এঁরই প্রচেষ্টায় সেই থেকে তিনি উপায় খুঁজছিলেন কেমন করে সে অপমানের প্রতিশোধ নেবেন! তাঁর ইচ্ছা ছিল এঁকে সরিয়ে টাকা হাতিয়ে সরে পড়বেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, যে পরিচয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন, আমাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অসাধারণ চতুর ও কৌশলী কালো ভ্রমরের চোখে তা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু প্রফেসার শর্মাও এঁর আসল পরিচয় পাননি। তার ফলে তিনি এঁকে উৎসাহিত করেছিলন মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্রকে হত্যা করবার জন্য তিনি স্যার দিগেন্দ্রর আসল পরিচয় এঁর কাছে বলেছিলেন; এবং এও তাঁর ধারণা ছিল ইনি অর্থাৎ কুমারসাহেব নিজেও আসল কুমারসাহেব নন। এবং সেকথা এক দিগেন্দ্র ও প্রফেসার শর্মা ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু কেউই জানতেন না যে ইনি ছদ্মবেশী স্বয়ং কালো ভ্রমর! তাহলে হয়ত কেউ এতটা উৎসাহিত বোধ করতেন না ভেবেছিলেন ইনি সামান্য একজন প্রতারক মাত্র। প্রফেসারের ইচ্ছা ছিল এঁকে দিয়ে স্যার দিগেন্দ্রকে খুন করিয়ে এঁকে হাতে রেখে যখন তখন blackmail করে প্রচুর অর্থলাভ করবেন, অথচ নিজে এর মধ্যে জড়াবেন না।

প্রথম থেকেই আমি জানতাম খুনী স্বয়ং কালো ভ্রমর। এবং তিনিই ছদ্মবেশী কুমারসাহেব। *কিন্তু সেই চিঠি থেকে প্রমাণ হল কী করে ইনি স্বয়ং কালো ভ্রমর।* এঁর হাতের লেখা এঁদের স্টেটের ফাইলে পেয়েছি, তা ছাড়া গতকাল উনি যে কমিশনার সাহেবকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে ফর্ম সই করে এসেছেন, সেই লেখার সঙ্গে কালো ভ্রমরের চিঠি হুবহু মিল হয়ে গেছে। উনি বর্মায় থাকতেই hashish সিগারেট খেতেন তা আমি জানতাম।

দু নম্বর কারণ সেই ছুরিটা, যেটা আমরা অরুণ করের বাগানে দেখি। সেটা বর্মী

অস্ত্র। সেখানকার লোকেরা ঐ ধরনের অস্ত্র খুন-খারাপি করতে ব্যবহার করে। কিন্তু কথা হচ্ছে এঁকে অপরাধী বলে মনে হল কেন? মনে আছে তোমাদের, মৃত স্যার দিগেন্দ্রের আঙুলের নখে একটা জিনিস পাওয়া গিয়েছিল, সে হচ্ছে কালো রংয়ের সার্জের প্যান্টের সুতো। সেই সুতো এঁর প্যান্টের কাপড়ের সুতোর সঙ্গে অবিকল মিলে গেছে। গতকাল উনি যখন প্রফেসার শর্মাকে খুন করে রক্তাক্ত জামা-কাপড়ে এখানে ফিরে আসেন, সেই কোটপ্যান্ট উনি সরিয়ে ফেলবার অবকাশ পান নি। হরিচরণ ওঁর শয়নঘরের সোফার নীচে পেয়ে নিয়ে গেছে ওঁর অবর্তমানে ম্যানেজারকে ঘুষ দিয়ে আজ দ্বিপ্রহরে এখানে এসে। সেই প্যান্টের সুতোর সঙ্গে মৃত স্যার দিগেন্দ্রের নখের মধ্যে আটকে ছিল যে সুতো দুটো অবিকল মিলে গেছে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ধরে জানা গেছে সে এই বাড়িতে একজনকে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল কাল রাত্রে। তা ছাড়া সেই বাগানে ছুরিটার হাতলে যে আঙুলের ছাপ ছিল এবং এঁর আঙুলের ও কালো ভ্রমরের আঙুলের যে ছাপ আমার কাছে আছে, তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে। তাছাড়া তোমার মনে পড়ে সুব্রত, প্রফেসার শর্মাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, সে সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, ডাক্তার বলেই ওভাবে হত্যা করা এর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। স্যার দিগেন্দ্র যে মুহূর্তে চিনতে পেরেছিলেন তাঁর ভাইপো আসলে কে, তখনই তিনি প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ইনিও তখন বুঝতে পেরেছেন, জীবনে যে জঘন্য কাজ কোন দিনও করেননি আজ তাই তাঁকে করতে হবে। স্যার দিগেন্দ্র যদি একবার হাতের বাইরে চলে যান তবে তাঁর পক্ষে এই ছদ্মপরিচয়ে বাঁচা আর সম্ভব হবে না। তাই চিরজীবনের মত স্যার দিগেন্দ্রকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার মনস্থ করেছিলেন। এইবার ডাক্তার সান্যাল দয়া করে বলুন, মিঃ মিত্রকে কিভাবে খুন করেছিলেন সে রাত্রে? কেননা ও ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। এখনও বুঝে উঠতে পারছি না!

ডাঃ সান্যাল মৃদু হাসলেন, চমৎকার বুদ্ধি আপনার মিঃ রায়! সম্পূর্ণ হার মানলাম আপনার বুদ্ধির কাছে! সত্যই আমি কালো ভ্রমর, ডাঃ এস. সান্যাল। কুমারসাহেব আমি নই, কোনদিন ছিলামও না। আপনি অনেক কিছু জানেন বা জানতে পেরেছেন, কিন্তু একটা কথা এখনও জানেন না। সেটা হচ্ছে এই, স্যার দিগেন্দ্রের অতীত ইতিহাস। এই দিগেন্দ্র এতকাল এই কলকাতায় থেকে আমারই দলে কাজ করত। সে ছিল আমার কলকাতার দলের প্রতিভূ। সেবারে আপনাদের যখন আমি বর্মায় নিয়ে যাই, দিগেন্দ্র তখন সেখানে। সেই বনমালী বসু* নাম নিয়ে সনৎবাবুকে তাঁদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসা থেকে চুরি করে আনে। 'মৃত্যুগুহায়' সেরাত্রে আমি একজাতীয় বুনো গাছের রসে তৈরী ঔষধ শরীরে ফুটিয়ে পাঁচ ঘণ্টার জন্য অজ্ঞান থেকে আপনার হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা পাই এবং আপনারা আমাকে ইরাবতীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসেন। আমার অন্যতম বিশ্বস্থ অনুচর রামু ইরাবতীর মধ্যেই খানিকটা দূরে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল, আমায় তুলে বাঁচায় সে। আমার পরিধানে তখন ছিল রবারের পোশাক। তাই জলে ভেসে ছিলাম, ডুবিনি। আর ঐ ঔষধটার এমন গুণ ছিল যে, জল মুখে ঢুকলে তার কাজ নষ্ট হয়ে

---

* 'কালো ভ্রমর' দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।—লেখক

যায়। আমি সব রকম কিছু ভেবে আগে থেকেই সে রাত্রে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম, সবই pre-arranged.

কয়েক দিন পরে একটু সুস্থ হয়ে ধনাগারে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি ধনাগার শূন্য, একটা কপর্দকও নেই। বর্মায় ফিরে এসে দেখি দিগেন্দ্র উধাও। ব্যাপার সব বুঝলাম। প্রতিশোধের হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগলাম। তারপর সেখান থেকেই দিগেন্দ্রকে একটা চিঠি দিই, ওই চিঠিটা এইজন্য দিয়েছিলাম, যাতে দিগেন্দ্র জানতে পারে আমি বেঁচে উঠেছি এবং ভয়ে ধনরত্নগুলো ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু he was clever, তাই চুপচাপ রয়ে গেল, আমার চিঠির কোন জবাবই দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, আমরা পরের দিন ধনাগারে ধনরত্ন আনতে গিয়ে দেখি ধনাগার শূন্য কিছুই নেই। কিরীটী বললে।

তখন ডাক্তার আবার বলতে লাগলেন, কিন্তু মূর্খ সে, তাই আমার কথায় কান দিল না। ওর সব ইতিহাস আমি জানতাম, সুতরাং ওর মৃত ভাইপোর পরিচয়ে এখানে এসে ঢুকলাম। বুঝলাম ও আমায় সন্দেহ করেছে, এবং পরে টের পেলাম ও আমাকে মারবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু মারতে এসে একদিন সে ধরা পড়ে গেল ও নিজেকে সাফাই করবার জন্য পাগলের ভান করলে। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

ধরা পড়ল এবং ওকে গারদে পাঠালাম। কিন্তু আবার গারদ ভেঙে ও পালাল। খুন করা আমি চিরদিন ঘৃণা করি। কিন্তু নরাধম আমাকে বাধ্য করলে ওকে খুন করতে। কিন্তু প্রফেসার শর্মা একদিন আমাকে এসে বললে মিঃ মিত্রের আসল পরিচয় কী। কিন্তু নির্বোধ জানত না, এ সংবাদ তার ঢের আগেই আমার জানা হয়ে গেছে। আমিও দেখলাম ও এখন জেনেছে তখন ওকে বাদ দিয়ে কাজ করা তো চলবে না! এইখানেই আমার সবচাইতে বড় ভুল হল। মূর্খ আমাকে পেয়ে বসল। আমিও নিরুপায় হয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করতে লাগলাম। প্রায়ই ও আমার কাছ থেকে টাকা নিত। কেননা আমি যে আসল কুমার নই সে ও টের পেয়েছিল। আসল কাজ হবে না ভয়ে ওকে টাকা দিয়ে আমি নিরস্ত রেখেছিলাম, ভবিষ্যতে একদিন ওর পাওনা মেটাব বলে। প্রফেসর যখনই জানতে পারে আসল মিঃ মিত্র আমার সেক্রেটারী নয় এবং আসলে সে স্যার দিগেন্দ্র, তখন থেকেই সে উল্লাসে নাচতে লাগল। আমার জন্মোৎসবের রাত্রে সকলেই এখানে আমরা উপস্থিত, ছদ্মবেশী স্যার দিগেন্দ্র, আমি, প্রফেসার শর্মা।

এবার হয়েছে, আমাকে বলতে দিন ডাক্তার। কিরীটী সহসা বলে উঠল।

বলুন। ডাক্তার মৃদু হেসে জবাব দিলেন, কিন্তু হাতের বাঁধনটা খুলে দিতে বলুন। ভয় নেই, পালিয়ে বাঁচবার ইচ্ছা আমার নেই। পর পর দু-দুটো খুন করে এ জীবনে আমার ঘৃণা হয়ে গেছে। কুমারসাহেব ও আমার নিজের উপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি আমি গতকালই উইল করে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দান করে দিয়েছি, আর তার অছি নিযুক্ত করেছি কাকে জানেন?

কিরীটী অধীর স্বরে বললে, কাকে?

আমার জীবনের সবচাইতে বড় শত্রু ও সবার বড় বন্ধু আপনাকে ও সুব্রতবাবুকে।

ধন্যবাদ ডাক্তার। কিরীটী বললে।

এর পর ডাক্তারের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। মুহূর্তকাল কিরীটী চুপ করে রইল। তারপর আবার ধীরস্বরে বলতে লাগল, তাহলে এঁদের কৌতূহলটা মিটিয়ে দিই। হ্যাঁ শুনুন, আপনার সেক্রেটারী অর্থাৎ স্যার দিগেন্দ্র ৮.৫৫ মিনিট পর্যন্ত আপনার খাবার ঘরেই ছিলেন। তারপর সেখান থেকে তিনি বের হয়ে আসেন। বোধ করি ঠিক ৮.৫৫ মিনিট এবং সাড়ে নটার সময় আমাদের ধারণা ও দেখা অনুসারে তিনি প্রাইভেট রুমে ঢোকেন। এই যে ৩৫ মিনিট সময়—এই সময়টা কেউ তাঁকে দেখতে পায়নি। এই সময় তিনি খাবার ঘর, ড্রইংরুম, হলঘর, শোবার ঘর, লাইব্রেরী ঘর বা নীচে বা সিঁড়িতে কোথাও ছিলেন না। তবে নিশ্চয়ই তিনি ঐ সময় আপনার প্রাইভেট রুমে ছিলেন এবং খাবার ঘর থেকে বের হয়ে সোজা তিনি ঐখানেই গিয়ে ঢুকেছিলেন।

এটাও ঠিক ডাক্তার যে ৮.৫০—৮.৫২ মিনিটের সময় আপনার ম্যানেজারের সঙ্গে দোতলার সিঁড়িতে আপনার দেখা হয়। তাহলে নিশ্চয়ই ধরা যায় ঠিক ঐ সময়ই মিঃ মিত্ররূপী স্যার দিগেন্দ্র যখন আপনার খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসেন, দোতলার হলঘরে আপনাদের দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কেমন কিনা, am I right?

হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক মিঃ রায়। আমি সন্ধ্যার সময়েই ঠিক করেছিলাম মনে মনে, স্যার দিগেন্দ্রকে আজ শেষ করব। কেননা ও যা ভয়ানক লোক, সুযোগ পেলেই আমাকে অনায়াসে খুন করবে। তাই সন্ধ্যার অল্প পরেই আমার নিজ স্বাক্ষরে ওকে চিঠি দিলাম: তোমার সময় উপস্থিত, আজই—প্রস্তুত থাক,—ইতি 'কালো ভ্রমর'। সারা বাড়িতে তখন উৎসবের হুল্লোড়; নটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে ম্যানেজারের কাছ থেকে এসে hashish দিয়ে তৈরী কয়েকটা সিগারেট চেয়ে নিই। কেননা আপনি জানেন আমি বাড়িতে মরফিয়া ইন্‌জেকশন নিতাম। এখানেও ওটা অভ্যাস করেছিলাম। কিন্তু মাঝে মাঝে মরফিয়া বন্ধ করবার জন্য অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হত। রাতে ভাল ঘুম হত না। প্রফেসার শর্মাকে এ কাজে নিয়েছিলাম, কেননা দুজনে না হলে এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। শর্মা আমায় বলে গেল, ওকে নিয়ে আমি খাবার ঘরে যাচ্ছি। তুমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর। যখন সে খাবার ঘর থেকে বের হয়ে আসবে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু সাবধান, তোমাকে যেন কেউ লক্ষ্য না করে।

৮.৫৫ মিঃ কি ৯টার সময় দিগেন্দ্র খাবার ঘর থেকে বের হয়ে এল। ওপরের হলঘরে তখন বড় একটা কেউ ছিল না। যে দু-চারজন ছিল তারা তখন তাস খেলায় মত্ত। বাকী অভ্যাগতরা নীচের হলঘরে গান-বাজনায় জমে উঠেছে। প্রফেসার যখন খাবার ঘরে দিগেন্দ্রকে নিয়ে যায়, আমি সেই ফাঁকে এক সময় প্রাইভেট রুমে ঢুকে দেওয়াল থেকে তলোয়ারটাকে নামিয়ে সোফার ওপর গদির তলায় রেখে আসি। হলঘরে দাঁড়িয়ে আছি সিঁড়ির কোণায়। দিগেন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই ওকে ইশারায় ডেকে প্রাইভেট রুমে গিয়ে ঢুকি, কেউ দেখেনি। আমার মুখে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ছিল। একসময় দুজনে কথা বলতে বলতে টুপ্ করে সেটা মেঝেয় ফেলে দিই ইচ্ছা করে। দিগেন্দ্র সেটা যেমন কুড়িয়ে নিতে নীচু হয়েছে, চক্ষের নিমেষে গদির তলা থেকে ভারী তলোয়ারটা টেনে নিয়ে তার গলা দু ভাগ করে দিই। তারপর মাথাটা নিয়ে মাঝখানে রেখে দিই। এখন বুঝতে পারছেন আপনারা, মৃতদেহের position ওরকম ছিল কেন!

তারপর ৯.১০ মিনিটের সময় আমি একটা চাদর জড়িয়ে ওঘর থেকে বের হয়ে

সোজা শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকি। সেখানে দেড় থেকে দু মিনিটের মধ্যে পোশাক বদলে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। আমি আগেই আপনাকে দিগেন্দ্রর লেখা চিঠি পাঠিয়ে এখানে এনেছিলাম। অত্যধিক অহঙ্কারেই ঐ কাজ করতে গিয়ে এইভাবে ধরা পড়লাম। নাহলে এ জগতে কারও সাধ্য ছিল না আমাকে ধরে। কিন্তু শর্মাকে যখন বললাম সে ভয়ে শিউরে উঠল। মনে মনে আমি হাসলাম এবং আমাদের পরামর্শমত ঠিক রাত্রি সাড়ে নটায় আমাদের চোখের সামনে দিয়েই শর্মা প্রাইভেট রুমে গিয়ে ঢুকল। এবং ঠিক যখন প্রায় সে অদৃশ্য হয়েছে, তখন আপনার দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করলাম। এদিকে শর্মা ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার সময়ে খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চাকরদের ডাকার ঘণ্টার দড়িটা টেনে, চকিতে খাবার ঘরের দরজার সামনে দিয়ে ঘুরে একেবারে আপনার হরিচরণের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। বেয়ারাকে আগে থেকেই শর্মা ওঘরে যাবার জন্য বলে রেখেছিল।

কিন্তু মিঃ মিত্রের পকেট থেকে চাবিটা চুরি করেছিল কে?

আমি। আমিই খুন করে আসবার সময় নিয়ে আসি। শর্মা আমাকে ওগুলো নিয়ে আসতে বলেছিল।

তারপর কী হয়েছিল সে চাবি নিয়ে জানেন?

হ্যাঁ জানি। শর্মা ঐ রাত্রেই মিঃ মিত্রের ওখানে গিয়ে তার সমস্ত কাগজপত্র সরিয়ে ফেলে; আর তার ধারণা ছিল অস্ত্রঘরে আসল মিঃ মিত্রের মৃতদেহ লুকানো আছে, তাই সে অস্ত্রঘরের চাবি চুরি করে রেখেছিল।

প্রফেসারকে কেন সন্দেহ করেছিলাম সর্বপ্রথম জানেন ডাক্তার? উনি আমার লোক হরিচরণের কাছে সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন বলে। হরিচরণকে জিজ্ঞাসা করবার মানেই তার কাজের মিথ্যে সাফাই একটা রেখে দেওয়া। তাছাড়া আপনিই নিজে গিয়ে তিনতলায় অরুণের সঙ্গে ঐভাবে দেখা করেছিলেন।

হ্যাঁ আমিই। আমার ইচ্ছা ছিল এতে যদি ভয়ে পেয়েও শর্মার মত লোকদের পাকচক্রে আর না ভোলে। বড় ভাল ছেলেটি, দেখলে মায়া হয়।

হলঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করল। এক ঝলক হাওয়া খোলা জানালা-পথে ঘরে এসে যেন সবার চোখে-মুখে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

আমরা সকলে নিঃশব্দে বসে রইলাম।

হতভাগ্য শর্মাকে হয়তো আমি খুন করতাম না, কিন্তু ও আস্ফালন দেখালে আমায় নাকি টিপে মারতে পারে! সে বিনিময়ে চার লক্ষ টাকা চায়। তার টাকার সাধ চিরতরে কাল অরুণ করের বাড়িতে মিটিয়ে এসেছি। ওদের মত জঘন্যপ্রবৃত্তির লোক এ দুনিয়ায় যত কম থাকে ততই ভাল, তার জন্য আমি এতটুকুও অনুতপ্ত নই।

ডাক্তার সান্যাল চুপ করলেন।

হলঘরের গড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি পাঁচটা ঘোষণা করল।

চতুর্থ পর্ব

॥ ১ ॥

ঢং.. ঢং...ঢং!...

শেষ ঘণ্টাধ্বনিটা মধ্যরাত্রির অখণ্ড স্তব্ধতায় মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেল, ঘরের একটিমাত্র বৈদ্যুতিক বাতিটা দপ্ করে নিভে গেল এবং মুহূর্তে সমগ্র ঘরটি নিশ্ছিদ্র আঁধারে যেন কোথায় ক্ষণেকের জন্য মিলিয়ে গেল।

ঘটনার দ্রুত সংঘাত ও আকস্মিকতায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সব কয়টি প্রাণীই যেন সহসা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে যায়।

কয়েক সেকেন্ড কারও মুখেই কোন কথা নেই।

হঠাৎ কিরীটী যেন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং মুহূর্তে নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠে পকেটে রক্ষিত লোডেড পিস্তলটি বের করবার জন্য সচেষ্ট হতেই অন্ধকারে ডাঃ সান্যালের মৃদু কোমল শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এ কি! হঠাৎ আলোটা এভাবে নিভে গেল কেন?

পকেটের মধ্যে পিস্তল অন্বেষণেচ্ছুক হাতটা কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গেই আপনা হতেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যেন গুটিয়ে এল।

আবার ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুব্রতবাবু, অনুগ্রহ করে দেখুন তো আপনার ঠিক পেছনেই দেওয়ালের গায়ে সুইচ্ বোর্ডটা আছে, দেখবেন একটা সুইচ্ আবার কাবেন্ট দেয়। আচ্ছা দাঁড়ান, আমিই দেখছি।

বলতে বলতে বোধ হয় ডাক্তার সান্যাল উদ্দিষ্ট দেওয়ালের গায়ে সুইচ্ বোর্ডের দিকে এগিয়ে আসেন। ডাক্তারের পদশব্দ পাওয়া গেল অন্ধকারে।

সকলেই যে যার জায়গায় তখনও স্থাণুর মতই দাঁড়িয়ে নির্বাক।

কিরীটীই একা কেবল অন্ধকারে ডাক্তারের পদশব্দকে লক্ষ্য করে তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী খরদৃষ্টিকে অন্ধকারে যতদূর সম্ভব সজাগ করে অস্পষ্ট ডাক্তারের আবছা মূর্তিটাকে দেখবার চেষ্টা করে। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে সুইচ্ বোর্ডের কাছে দাঁড়ালেন, আপনাদের কারও কাছে টর্চ আছে?

কিরীটী ও সুব্রত দুজনারই কাছে টর্চ বাতি ছিল। ডাক্তারের প্রশ্নে সুব্রত সর্বাগ্রে তার পকেট হতে বের করে বলে, এই যে—

কই দেখি!

ডাক্তারের গলা আবার সকলের শ্রুতিগোচর হল।

ডাক্তারের হাতের টর্চ জ্বলে উঠল এবং দেওয়ালের গায়ে আলো ছড়িয়ে পড়ল গোলাকার হয়ে খানিকটা জায়গায়।

ডাক্তার হাতের টর্চের আলোর সাহায্যে সুইচ্‌টা খুঁজে দেখতে লাগলেন।

সকলেই উদ্‌গ্রীব ব্যাকুল দৃষ্টিতে ঐদিকেই তাকিয়ে।

কয়েক মিনিট।

সময়ের সামান্য ব্যবধান।

সুইচ্ বোর্ডের পাশেই খোলা দরজা, সহসা ডাক্তার হাতের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এক লাফে দরজা-পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চোখের পলকে যেন ব্যাপারটা ঘটে গেল।

হতচকিত বিমূঢ় সকলে।

কিন্তু সেও কয়েকটি মুহূর্ত। পরক্ষণেই সুব্রতর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, চট্টরাজ, কুইক!

সুব্রত খোলা দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিল, কিন্তু সহসা তাকে বাধা দিল কিরীটী।

কিরীটীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মিথ্যে পরিশ্রম করে কোন লাভ নেই সুব্রত। ভুলো না ও কালো ভ্রমর! এ ঘর থেকে একবার যখন সে আমাদের এতগুলো লোককে স্রেফ বোকা বানিয়ে বাইরে পা বাড়াতে পেরেছে, অত সহজে ওকে আজ আর ধরা যাবে না। যেতে দাও ওকে। Better luck next time.

শেষের দিকে কিরীটী যেন কথাগুলো কতকটা আত্মগত খেদোক্তির সঙ্গেই সনিঃশ্বাসে উচ্চারণ করলে।

সুব্রত কিরীটীর নির্দেশে নিজের গতিকে রোধ করেছিল।

বুঝতে পারছ না সুব্রত, সে কৌশলে কোন গুপ্ত সুইচের সাহায্যেই চমৎকার একটা অভিনয় করতে করতে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আমাদের এতগুলো লোককে ফাঁকি দিয়ে গেল। বোকা বানিয়ে গেল। একবার তো সে আমাদের সকলকে বোকা বানিয়েছেই, এখন আবার তাকে অন্ধকারে অনির্দিষ্ট ভাবে ফলো করতে গেলে দ্বিতীয়বার বোকা বনতে হবে। তাছাড়া এটা তার নিজের বাড়ি—নিজের এলাকা তো বটেই, বাইরে আবার রাতটা অন্ধকার। অতএব ও চেষ্টা না করে চল বাড়ি ফেরা যাক এবারের মত।

বাড়ি ফিরে যাব! বলেন কি মিঃ রায়? প্রশ্নটা করলেন মিঃ চৌধুরীই।

হ্যাঁ, বাকী শীতের রাতটুকু ঘুমোলে কাজ দেবে।

কিন্তু তাই বলে স্কাউন্ড্রেল ঐ ডাক্তারকে এইভাবে পালিয়ে যেতে দেবেন মিঃ রায়? আবার প্রতিবাদ জানালেন ব্যারিস্টার চৌধুরী।

পালিয়ে কি আর সত্যিই কিরীটী রায় তাকে যেতে দেবে মিঃ চৌধুরী! তবে for the time being (এই সময়ের জন্য) লোকটা আপাতত পালাবার চেষ্টা করলে। তা করুক।

তা করুক মানে?

মৃদু হাস্যধ্বনি কিরীটীর কণ্ঠ হতে নির্গত হল।

মানে আর কি মিঃ চৌধুরী, আপনি জনেন না কিন্তু কিরীটী জানে সে কালো ভ্রমর, তাই মিথ্যে এখন ছোটাছুটি করে বিশেষ কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে বরং বাকী রাতটুকু ঘুমোতে পারলে কাজ দেবে; চল সুব্রত, আর এ অন্ধকার ঘরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভটাই বা কি!

চল।

কিরীটীর চাইতেও মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় সুব্রত।

॥ ২ ॥

পরের দিন রাত্রে।

কিরীটী তার নিজস্ব স্টাডিতে বসে আবার তার আত্মজীবনী লিখছে।

বিচিত্র অদ্ভুত এই ডঃ সান্যাল ওরফে কালো ভ্রমর। লোকটা দস্যু, খুনী—না পাগল!

ডাক্তারী শাস্ত্রে যাদের 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক' বলেছে, এরা কি তাই!

লোকটা সত্যিকারের উচ্চশিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন, বিনয়ী, উদার—অথচ হীন, জঘন্য একটা প্রবৃত্তি যেন লোকটার মনের মধ্যে ঘুমন্ত। মধ্যে মধ্যে নখর বিস্তার করে জেগে ওঠে। রক্তলোলুপ হিংস্র হায়নার মত কুৎসিত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

সেই রাত্রেই—

ব্যারিস্টার দীনতারণ চৌধুরীর বাড়িতে। চৌধুরী সাহেব রাত জেগে তাঁর দোতলার শয়নঘরে একটা রিভলবিং চেয়ারে বসে একটা টেবিলের ওপর সামনে একটা হত্যা-মামলার ব্রীফ মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি গায়ে লম্বা ঝুল কালো রঙের কোট, মাথায় মানকি-ক্যাপ ও মুখের নিম্নাংশে একটা কালো রুমাল টেনে বাঁধা—দুটি হাত দু পাশের পকেটের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে কক্ষমধ্যে পশ্চাতের ভেজানো দ্বার ঠেলে প্রবেশ করলে।

ব্রীফের বিষয়বস্তুর মধ্যে একান্তভাবে নিবিষ্ট ব্যরিস্টার চৌধুরী ঘুণাক্ষরেও দ্বিতীয় ব্যক্তির কক্ষমধ্যে পদার্পণটা টের পেলেন না।

আগন্তুক অতি সন্তর্পণে পা টিপেটিপে উপবিষ্ট চৌধুরীর পশ্চাতের দিকে অগ্রসর হয়। কাছে—আরও কাছে।

একান্ত সন্নিকটে—দুজনার মধ্যে মাত্র হাতখানেক ব্যবধান।

পশ্চাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তি ইচ্ছামাত্রেই হাত বাড়িয়ে উপবিষ্ট চৌধুরীকে স্পর্শ করতে পারে। ধীরে অতি ধীরে চৌধুরীর অজ্ঞাতে পশ্চাতে দণ্ডায়মান আগন্তুকের ডান হাতটি কোটের পকেট হতে বের হয়ে এল।

এবারে স্পষ্ট দেখা গেল, আগন্তুকের ধৃত লৌহমুষ্টি-মধ্যে একটা ধারালো ছোরা। ইস্পাতের তৈরী ধারালো ছোরার ফলাটা কক্ষের অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় যেন ঝিক ঝিক করে ওঠে, বুঝিবা মৃত্যু-ক্ষুধাতেই। বুঝিবা রক্ত-পিপাসাতেই।

ডান হাতটি উত্তোলিত হল ঈষৎ ঊর্ধ্বে এবং বাম হাতটিও ঐ সঙ্গে কোটের পকেট হতে বহির্গত হয়ে এল—বাম হাতের মুষ্টিমধ্যে ধৃত একটা লাল সিল্কের রুমাল।

আগন্তুকের দুই হাতই একসঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

রাত্রির স্তব্ধতাকে ভেদ করে সহসা একটা অস্ফুট বেদনার্ত চিৎকার জেগে উঠতে গিয়েই মুখে রুমাল চাপা পড়ে অর্ধপথেই থেমে যায়।

বাইরে জনহীন রাস্তায় শীতের হিমরাত্রির অন্ধকরে একটা কুকুর 'উ' 'উ' করে ককিয়ে কেঁদে ওঠে।

রাত্রি প্রভাত হল।

এবং দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই গতরাত্রের দানবীয় ঘটনাটা লোকচক্ষুর সামনে উদ্‌ঘাটিত হল। পৃষ্ঠে একটা নিদারুণ ক্ষতচিহ্ন। ক্ষতমুখের চতুষ্পার্শ্বে কালো রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

গায়ের নাইট-গাউনটা রক্তে একেবারে লাল। রক্তাক্ত সেই গাউনের সঙ্গে সেপটিপিন দিয়ে আঁটা একটি ছোট্ট চৌকো হলুদবর্ণের তুলোট কাগজ। কাগজের ওপর কালো কালিতে একটি ভ্রমর অঙ্কিত। ভ্রমরের প্রসারিত পাখায় একটি ছোরা বিদ্ধ। নীচে লেখা বাংলায় 'এক'। নিষ্প্রাণ দেহটি।

বলা বাহুল্য মৃতদেহটি ব্যারিস্টার দীনতারণ চৌধুরীর।

পুলিস এল, তদন্তও হল।

মৃতদেহ অনাবশ্যক ময়না তদন্তের জন্য লাস-কাটা ঘরে প্রেরিত হল।

সংবাদ পেয়ে কিরীটীও এল। নিঃশব্দে সে একবার শুধু মাথাটা নাড়ল।

আবার কালো ভ্রমর! লোকটা সত্যসত্যই এতদিনে রক্তপাগল খুনী হয়ে উঠেছে!

পুলিস ইন্সপেক্টর শচীন গুপ্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন কিরীটীবাবু?

হ্যাঁ, গতরাত্রের আগের রাত্রে মার্বেল প্যালেসে অসমাপ্ত কাহিনীর আর একটি ক্রমশ প্রকাশ্য পরিচ্ছেদ।

তার মানে? সবিস্ময়ে তাকালেন শচীন গুপ্ত কিরীটীর মুখের দিকে।

মানে, যে রোমাঞ্চকর কাহিনী টালিগঞ্জে কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের মার্বেল প্যালেসে কিছুদিন আগে হতভাগ্য শুভঙ্করের হত্যা দিয়ে শুরু হয়েছিল, এ তারই একটি অংশবিশেষ বলতে পারেন। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না, খুনী আজ খুনের নেশায় সত্যিই ক্ষেপে উঠেছে, আর তাকে এইভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করতে দেওয়া যেতে পারে না।

আপনার কথা যে কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ রায়, দয়া করে যদি সব খুলে বলেন! আমি মাসচারেক ছুটিতে কলকাতার বাইরে কাটিয়ে কালই সবেমাত্র এসে কাজে জয়েন করেছি।

লালবাজারে ইন্‌টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চে আপনাদের কমিশনার রায়বাহাদুর ঘোষের কাছে গিয়ে 'মার্বেল প্যালেসে'র হত্যারহস্য সম্পর্কে খোঁজ নিলেই সব জানতে পারবেন মিঃ গুপ্ত। এটা আপনার কাছে একটা নতুন ঘটনা হলেও আসলে এটার যোগসূত্র গত কয়েকদিনের একটা হত্যা-ব্যাপারের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

প্রত্যুত্তরে শচীন গুপ্ত বললেন, আচ্ছা, আমি তাহলে এখন চলি মিঃ গুপ্ত।

কিরীটী দরজার দিকে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে যায়।

আমি আজ সন্ধ্যাবেলাতেই হোক বা কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করব কিন্তু মিঃ রায়। রায়বাহাদুর এ কেসটা আমার ওপরই সম্পূর্ণভাবে investigation-এর ভার দিয়েছেন। কিন্তু আমি আপনার সাহায্য চাই। আশা করি নিরাশ করবেন না।

নিশ্চয়ই না, আমি এই ব্যাপারে বিশেষ Interested তো বটেই এবং আপনার সাহায্যেরও আমার বিশেষ প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া জানেন তো, আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।

শচীন গুপ্ত হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, জানি এবং এও জানি, যদিও আপনার সঙ্গে আজই প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়, আপনার ক্ষমতার কথা ও আপনার তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণের কথা—

কিরীটী হাসতে হাসতে প্রত্যুত্তর দেয়, বিশ্বাস করবেন না মিঃ গুপ্ত— একদম বিশ্বাস করবেন না। আমার প্রতি সকলের অন্ধ স্নেহই অতিশয়োক্তির সৃষ্টি করে। যা শোনেন বা ভবিষ্যতে শুনবেন কিছুই না ওসব। অতিরঞ্জিত স্তুতিবাদ।

তা আপনি যাই বলুন, লোকে যা বলে বা রটায় তার কিছুটা সত্যি চিরদিনই হয় —প্রবাদ যখন আছে।

হাসতে হাসতে জবাবে বলেন শচীন গুপ্ত।

প্রবাদই বটে! তা হোক গে, আসবেন সন্ধ্যার দিকে, আর কিছু না হোক গল্প করে কিছুটা সময় আনন্দে অন্তত অতিবাহিতও তো করা যাবে। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

কিরীটী বিদায় নিয়ে কক্ষ হতে বের হয়ে এল।

॥ ৩ ॥

কিরীটী গাড়িতে উঠে হীরা সিংকে বললে সুব্রতদের বাড়িতে যাবার জন্য।

যুদ্ধের বাজারে লৌহ-ব্যবসা কি রকম অসম্ভব লাভজনক ব্যবসায়ে দাঁড়াচ্ছে রাজু ও নীতীশ সুব্রতর সঙ্গে সেই আলোচনাই জোর গলাতে চালাচ্ছিল।

কিরীটীকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে দেখে সুব্রত বললে, এই যে কিরীটী, এসেছ ভাই! বাঁচাও, ঐ নীরস লৌহ-ব্যবসায়ীদের লৌহবেষ্টনী হতে আমাকে বাঁচাও।

কিরীটী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে স্মিতভাবে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি?

সুব্রত বলতে চায়, যুদ্ধের বাজারে লৌহের ব্যবসা মানেই ব্ল্যাক-মার্কেটিং —চোরা কারবার। নীতীশ সরোষে বললে।

অ্যাবনরম্যাল সময়ে লাভজনক ব্যবসা মানেই অল্পবিস্তর অসদুপায় গ্রহণ। আলঙ্কারিক ভাবে বলতে গেলে তাকেই ব্ল্যাক মার্কেটিং বলা চলে। এবং সেক্ষেত্রে সুব্রতর উক্তিকে একেবারেই মিথ্যা এমন কথা বলা চলে না। আপাতত তর্ক থাক। সুব্রত তোর সঙ্গে বিশেষ কয়েকটা কথা আছে।

চল। সুব্রত বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় এবং সুব্রত ও কিরীটী কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

তারপর এদিককার সংবাদ শুনেছিস?

কি? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

ব্যারিস্টার দীনতারণ চৌধুরী নিহত!

বলিস কি রে? চমকে ওঠে সুব্রত।

হ্যাঁ। এবং কালো ভ্রমর!

কালো ভ্রমর?

হ্যাঁ, তাঁর রক্তাক্ত জামার সঙ্গে কালো ভ্রমরের বিখ্যাত সেই ভ্রমর-আঁকা চিঠি পিন দিয়ে আঁটা ছিল।

সুব্রত যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। কোন শব্দই তার কণ্ঠ হতে ফুটে বের হয় না।

কিরীটী পকেট হতে একটা বর্মা সিগার বের করে অগ্নিসংযোগ করে খানিকটা পীতাভ ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করলে।

এই শেষ নয় সুব্রত, বাঘে একবার রক্তের আস্বাদ পেলে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে এবং একমাত্র তার সেই জিঘাংসাকে নিবারণ করতে প্রয়োজন হয়—

বুলেটের তো? কথাটা শেষ করে সুব্রত।

ঠিক তাই। এবং এক্ষেত্রে কালো ভ্রমর আর যে মানুষের পর্যায়ে নেই এখন—রক্তের আস্বাদ পেয়ে বাঘের পর্যায়েই গিয়ে দাঁড়িয়েছে ; অতএব—

বুঝলাম, কিন্তু তাকে ধরবি কি করে?

ধরব কি করে সেটাই বড় কথা নয়। ধরতে হবে সেটাই বড় কথা। এবং ধরবও তাকে নিশ্চয়ই। তবে question of time!

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় এবং ঘরের মধ্যে অস্থিরপদে পায়চারি করতে করতে কতকটা যেন স্বগত অনুচ্চারিত স্বরেই বলে, তার শেষ অপকীর্তির এইটাই শেষ কীর্তি নয়। নরখাদক বাঘের মত আবার গৃহস্থের ঘরে হানা দেবে।

কিছু বললি কিরীটী? সুব্রত প্রশ্ন করে।

কিরীটী সুব্রতর কথায় যেন একটু চমকে ওঠে এবং মৃদুকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, না কিছু না।

কিরীটীর সন্দেহ যে মিথ্যা নয়, প্রমাণিত হতে খুব বেশী দেরি হল না।

ডাঃ চট্টরাজ।

মধ্য কলিকাতায় ডাঃ রণধীর চট্টরাজ তাঁর পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করেন।

চট্টরাজ একজন প্রথিতযশা ও বিশিষ্ট সমাজের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি।

কেবল যে তিনি একজন সুচিকিৎসক তাই নয়, অত্যন্ত রহস্যপ্রিয় ও সামাজিক।

সংসারে লোকজনের মধ্যে একমাত্র পিতৃমাতৃহীনা ভাগিনেয়ী সুচিতা ভিন্ন আপনার বলতে আর কেউ নেই। স্ত্রী বিবাহের বৎসর দুই বাদেই মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর বিকৃত-মস্তিষ্কা থাকবার পর মারা যান।

ডাক্তার চট্টরাজ আর বিবাহ করেননি।

একমাত্র ভগিনীকে তাঁর পিতাই তাঁর জীবিতবস্থায় বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন বনেদী এক জমিদার বংশে এবং ভগিনীটি বিবাহের বৎসর দুই বাদেই ছয় মাসের একমাত্র শিশুকন্যা সুচিতাকে রেখে মারা যান।

সুচিতার পিতা আবার বিবাহ করায় রণধীর সুচিতাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন!

সেও আজ দীর্ঘ চব্বিশ বছর আগেকার কথা।

সেই হতে সুচিতা মামার কাছেই কন্যাস্নেহে প্রতিপালিতা। সুচিতাকে চট্টরাজ অত্যধিক ভালবাসেন, বর্তমানে সুচিতা বি. এ. পাশ করে পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। এবং সাধারণ আর্টসের দিকে না গিয়ে সুচিতা ম্যাট্রিকের পর আই. এস-সি., বি. এস-সি. পাস করে পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এস-সি পড়ছে।

মামার অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত চলবার সুযোগ পেয়ে ও গৃহে

একমাত্র সহচর মামাকে পেয়ে সুচিতার মানসিক বৃত্তিগুলোও সহজাত নারীসুলভ না হয়ে ক্রমে হয়ে উঠেছিল কতকটা পৌরুষযুক্ত ও বহির্মুখী।

নারীপ্রকৃতির যে সরম বা লজ্জা নারীর সহজ বিকাশ ও বৃত্তি, ক্রমে সেগুলো সুচিতার মধ্য হতে একেবারেই লোপ পেয়েছিল। দুর্জয় সাহস ও পুরুষজনোচিত সহজ ও নিরঙ্কুশ অকৃত্রিমতা সুচিতার ব্যবহার ও চালচলনে প্রকাশ পেত। সুচিতার গড়নও যেন কতকটা তার মনোবৃত্তির পরিপোষক ছিল।

প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি লম্বা, কৃশও নয় আবার শরীবের কোথাও নেই এতটুকু মেদবাহুল্য। সরল সতেজ বৃক্ষের মতই যেন সে বেড়ে উঠেছিল।

গায়ের বর্ণ শ্যাম—চোখেমুখে একটা ধারালো স্পষ্টতা। মাথার চুল বব্ করা—কাঁধের ওপর গুচ্ছে গুচ্ছে দোল খায়। আঁটসাঁট করে শাড়ি পরা। প্রসাধন ও অলঙ্কারের এতটুকু বাহুল্য ও অপচয় নেই। দু হাতে মাত্র একগাছি করে সরু সোনার চুড়ি, তাও মামার একান্ত অনুরোধে সুচিতা ব্যবহার করত। কালোপাড় সাদা শাড়ি ভিন্ন রঙিন শাড়ি সুচিতা কখনও ব্যবহার করত না।

বাড়ির গাড়ি থাকা সত্ত্বেও সুচিতা বরাবর বাসে বা ট্রামেই একা একা যাতায়াত করত। বাসে-ট্রামে লেডিস্ সীটের জন্য যেমন অহেতুক দৌর্বল্য ছিল না, তেমনি যে-কোন লোকের পাশে বসে যেতেও এতটুকু সঙ্কোচের বালাই ছিল না।

পথে-ঘাটে, স্কুলে-কলেজে, ট্রামে-বাসে, থিয়েটার-সিনেমায় বোধ হয় ঐ কারণেই সমবয়সী পুরুষের দল সুচিতাকে সযতনে পরিহার করে চলত।

ভয় অথচ ভয় নয়, সঙ্কোচও নয়, আবার সম্মানও নয়—তাদের ব্যবহারে এমন একটা কিছুই বরাবর সুচিতার সম্পর্কে প্রকাশ পেত।

ডিবেটিং বা বিতর্ক সভায় সুচিতা গলা উঁচিয়ে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বিতর্ক করতে যেমন পশ্চাৎপদ হত না, তেমনি কলেজের কোন সভা সমিতি বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে দল বেঁধে ছেলেদের সঙ্গে হুজুগে মাততে ও হৈ-হল্লা করতেও তার সমকক্ষ কেউ ছিল না।

অনেক তরুণ আড়ালে সুতিচাকে লক্ষ্য করে বলত, সুচিতা ঘোষাল মেয়ে নয় —পুরুষ!

ডাঃ চট্টরাজের প্র্যাকটিস নেহাত মন্দ ছিল না। অবসর সময়টা তাঁর নানাবিধ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের পুস্তক পাঠ করে ও সুচিতার সঙ্গে তর্ক ও হৈ-হল্লা করে কাটত। রাত্রে খাবার টেবিল ও শয়নের পূর্বে ঘণ্টাখানেক নানা প্রকারের আলোচনা করাটা মামা ও ভাগ্নীর নিত্যকারের একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

তর্কের বা আলোচনার সময় মনে হত ওরা যেন পরস্পরের বন্ধু, সমবয়সী।

যে রাত্রের কথা বলছি—রাত্রি প্রায় এগারোটা বেজেছে।

আহারাদি শেষ করে দ্বিতলে বসবার ঘরে মামা-ভাগ্নীতে যে আলোচনা চলছিল, সেটা কয়েকদিন আগেকার চট্টরাজের কালো ভ্রমরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কেই।

তুমি যতই বল মামা, যতই তোমরা প্রশংসা কর তোমাদের কিরীটী রায়ের বুদ্ধিকে, আমি কিন্তু ঠিক তা করতে পারছি না। অমন একটা ক্রিমিন্যালকে কেউ ওভাবে চান্স্ দেয়? It was—

কথাটা সুচিতাকে শেষ করতে দেন না ডাঃ চট্টরাজ, মৃদু হেসে বললেন, ব্যাপারটা

এত আকস্মিক ও দ্রুত ঘটে গেল, যেন কারও পক্ষেই আগে থাকতে সতর্ক হয়ে থাকা—

কি যে বল তুমি মামা! যে লোক অমনভাবে cold-blood মার্ডার করতে পারে, তোমাদের আগে হতেই তাকে পুরোদস্তুর গার্ড করা উচিত। পড়ত বাছাধন আমার পাল্লায়, অ্যাইসা এক যুযুৎসুর প্যাঁচে ফেলতাম যে জারিজুরী বের হয়ে যেত।

কালো ভ্রমর যে কি চিজ, জানিস নে তো! False personification-এ একটা পরিচিত লোকের ছদ্মবেশ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে অতগুলো লোকের চোখে যে ধুলো দিতে পারে—তাছাড়া কিরীটীবাবুর মুখে শুনেছি তো, অমন বুদ্ধি, অমন ক্ষিপ্রতা, অমন চাতুরী কালো ভ্রমরের মত হাজারে নাকি একটা দেখা যায় না। ভেবে দেখ্ তো একবার, শুভঙ্কর মিত্রের মত একজন নামজাদা অ্যাথলেটকে যে লোকটা অমনভাবে খুন করে যায় এবং তার মৃতদেহটা পর্যন্ত লোপাট করে কিভাবে শুভঙ্কর মিত্রের roll play করে গেছে—এ পর্যন্ত কার চোখে ধুলো দিতে পারলে না? ভাবতে পারিস একবার কতখানি brain matter থাকলে লোকে এভাবে কাজ করতে পারে?

হুঁ, বাহাদুরি লোকটার তো আছেই, আর এও ঠিক তোমাদের তথাকথিত অদ্ভুত করিৎকর্মা শ্রীযুক্ত কিরীটী রায়ের থেকে বেশি বুদ্ধিই সে মাথায় ধরে।

না রে না! বুদ্ধি লোকটা রাখে স্বীকার করি, কিন্তু কিরীটীবাবুকেও তুই জানিস না! দেখবি কিরীটী রায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে বাঁচতে পারে না। তা সে কালো ভ্রমরই হোক আর যেই হোক।

হ্যাঁ, আর তার পাত্তা পেয়েছ! ব্যারিস্টার চৌধুরীকে পর্যন্ত কিভাবে খুন করে গেল! না মামা, I must give the devil's due, I take my hat off! যদিও I hate him—ঘৃণা করি এবং লোকটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেলে—

সুচিতার কথা শেষ হল না, ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা ঘোষণা করলে।

উঃ, অনেক রাত হয়ে গেল মামা, এবার শুতে যাও।

মামা-ভাগ্নী উভয়ে উভয়ের নিকট হতে বিদায় নিয়ে যে যার শয়নকক্ষের দিকে পা বাড়াল। বলতে গেলে দুজনার শয়নকক্ষ পাশাপাশিই।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করে নীল আলোটা জ্বেলে দিয়ে টেবিল হতে একটা মেডিকেল জার্নাল টেনে নিয়ে চট্টরাজ আরাম-কেদারাটার ওপরে এসে বসে সামনে ডুমে ঢাকা রিডিং-ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলেন।

শুতে যত রাতই হোক, শয়নের পূর্বে আধঘণ্টাটাক পড়াশুনা না করলে চট্টরাজের চোখে ঘুম কোন দিনই আসে না। চট্টরাজ মেডিকেল জার্নালটার পাতায় মনোনিবেশ করলেন।

সুচিতাও তার ঘরে প্রবেশ করে প্রথমেই দরজা ভিতর হতে বন্ধ করে দিল। আলো আর জ্বাললে না সুচিতা। অন্ধকার সুচিতার বড় ভাল লাগে।

একটা স্নিগ্ধ কোমল আবেষ্টনী—যেন ধরা যায় না, স্পর্শও করা যায় না, কিন্তু অন্তরের সমস্তটুকু উপলব্ধি দিয়ে নিবিড় করে পাওয়া যায়।

অন্ধকারেই সুচিতা বেশ পরিবর্তন করে নিল, একটা মোটা চিরুনি দিয়ে চুলটা একবার আঁচড়িয়ে নিল।

দোলনা-চেয়ারটা জানলার সামনে টেনে এনে তার মধ্যে আয়েস করে গা-টা এলিয়ে দিল। দোলন-চেয়ারটার ওপর বসে সমস্ত শরীরটাকে মৃদু মৃদু দোলাতে ওর বড় ভাল লাগে। খোলা জানলা-পথে খানিকটা আকাশ চোখে পড়ে।

রাত্রির আকাশ। কালো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহুদূরের নক্ষত্রগুলি মিটিমিটি জ্বলছে।

তিমিরতীর্থের তোরণের ওরা যেন দ্বারী, সারাটা রাত্রি জেগে ওরা এমনি করে নিত্য প্রহরা দেয়। নিদ্রাহারা চক্ষু মেলে চেয়ে থাকে অমনি করে নির্নিমেষে। যুগযুগান্তর কল্পান্তকাল ধরে নিত্য ওরা অমনি করে প্রহরা দিয়ে আসছে। সৌরমণ্ডলীর দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেন কবে কোন্ অনাদি যুগে যাত্রা সুরু করেছিল, যাত্রা তাদের আজও শেষ হল না।

ডাঃ চট্টরাজের শয়নকক্ষে বড় বড় গোটাতিনেক পুস্তকে ঠাসা আলমারি দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি দাঁড় করানো। সেই আলমারিরই অপরিসর পশ্চাৎভাগ হতে নিঃশব্দে বের হয়ে আসছে একটি ছায়ামূর্তি। দীর্ঘকায় মূর্তি।

গায়ে কালো রঙের লম্বা গলাবন্ধ ঝুল কোট। মাথায় কালো পশমের মানকিক্যাপ ও মুখের নিম্নাংশে একটা কালো রঙের রেশমী রুমাল টেনে বাঁধা।—দুটি হাত দুদিকে ঝুল কোটের দু পকেটে প্রবিষ্ট।

মূর্তি নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে ধীরে, অতি ধীরে চট্টরাজের ঠিক পশ্চাতে।

মেডিকেল জার্নালের বিষয়বস্তুতে একান্তভাবে নিবিষ্ট ডাঃ চট্টরাজ ঘুণাক্ষরেও কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির পশ্চাৎভাগে অগ্রসর টের পান না।

আগন্তুক ধীর সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে।

কাছে, আরও কাছে।

একান্ত সন্নিকটে দুজনার মধ্যে মাত্র হাতখানেকের ব্যবধান।

পশ্চাতের দণ্ডায়মান মূর্তি ইচ্ছামাত্রেই এখন হাত বাড়িয়ে সম্মুখে উপবিষ্ট পুস্তকপাঠে নিবিষ্ট ডাঃ চট্টরাজকে স্পর্শ করতে পারে।

ধীরে অতি ধীরে চট্টরাজের অজ্ঞাতেই পশ্চাতে দণ্ডায়মান আগন্তুকের ডান হাতটি কোটের পকেট হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এল।

এবারে স্পষ্ট দেখা গেল আগন্তুকের ধৃত লৌহমুষ্টির মধ্যে ধারালো একটা ছোরা। ইস্পাতের তৈরী ধারালো ছোরার ফলাটা কক্ষের আলোয় যেন ঝিক্‌মিক করে ওঠে, বুঝিবা মৃত্যু-ক্ষুধাতেই। বুঝিবা রক্ত-পিপাসাতেই।

আগন্তুকের ডান হাতটা ছোরাসমেত সহসা যেমন উত্তোলিত হল, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতটিও পকেট হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একটা রুমালসমেত এগিয়ে এল।

আগন্তুকের দুটি হাতই যেন একই সঙ্গে মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

রাত্রির ঘন স্তব্ধতাকে ভেদ করে সহসা একটা আর্ত চিৎকার জেগে উঠেই মধ্যপথে চাপা পড়ে যায়।

একটা ক্ষণিক অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ।

শব্দটা পাশের ঘরে জাগরিত সুচিতারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। চমকে উঠে বসে সুচিতা। কিসের শব্দ! পাশেই মামার শোবার ঘর থেকেই শব্দটা এল না?

একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ কতকটা চাপা অবরুদ্ধ আর্তনাদের মতই যেন মনে হল। সন্দিগ্ধচিত্তে সুচিতা উঠে দাঁড়াল। এবং কোনরূপ আর চিন্তা না করে দরজা খুলে

সামনেই মামার ঘরের ভেজানো দ্বার ঠেলতেই যে দৃশ্য ওর চোখে পড়ল, তাতে একটা আর্ত অস্ফুট শব্দ ওর কণ্ঠ হতে বের হয়ে এল শুধু।

টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় সুচিতা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল মামার চেয়ারটার ঠিক পশ্চাতে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় এক আগন্তুক পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটা কালো রুমালে একটা ছোরার ফলা মুছছে।

সুচিতার অস্ফুট আর্তনাদে আগন্তুক ততক্ষণে ফিরে দাঁড়িয়েছে।

কে? সুচিতার কণ্ঠ হতে আপনা হতেই স্বর নির্গত হয়ে এল—যেন একাক্ষরেব প্রশ্নটা।

আগন্তুক ততক্ষণে ছোরাটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চেয়ারের পশ্চাৎভাগে মামার দেহটা সম্পূর্ণ আড়ালে ঢাকা পড়ায় সুচিতা মামার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারে না।

নাম বললে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন মিস ঘোষাল, কারণ একটু আগেই আপনাদেব মামা-ভাগ্নীর কথা overhear করেছি, যদিচ একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও—আমিই কালো ভ্রমর।

সুচিতার কণ্ঠ ভেদ করে দ্বিতীয়বার বিস্ময়সূচক একটা শব্দ যেন বের হয়ে এল।

হ্যাঁ, আদি ও অকৃত্রিম! কথার শেষে বোধ হয় একটা মৃদু হাস্যধ্বনি জেগে উঠল।

সুচিতার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বোধ-বিচার-শক্তি যেন কেমন শিথিল অবসন্ন হয়ে গিয়েছে। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। কিছুই যেন অনুভব করতে পারছে না। একটা অর্থহীন ভীষণ শূন্য যেন সম্মুখে পশ্চাতে ডানে বামে ঊর্ধ্বে নিম্নে তাকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছে।

Though unexpected মিস ঘোষাল, believe me—সত্যিই আমি কালো ভ্রমর।

কালো ভ্রমর!

হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো, মাত্র ঘন্টাখানেক আগেও পাশের ঘরে বসে বসে যে আস্ফালন করছিলেন, সব গেল কোথায়? আপনার বাগ্মিতা সত্যিই একটু আগে রীতিমত যে আমায় মুগ্ধ আকৃষ্ট করেছিল। ভাবছিলাম বাংলা দেশে তাহলে এমন মেয়েও আছেন। ভীষণ ইচ্ছা করছিল একটিবার আপনাকে দেখবার জন্য, তা really, what a meeting! কিন্তু মিস ঘোষাল, I am in hurry. —আলাপ করবার ইচ্ছা থাকলেও আপাতত আজকের মত আমাকে বিদায় নিতেই হচ্ছে—Good Night! By-By!

দৃঢ় সংযত পদবিক্ষেপে দীর্ঘ দেহকে আজও উন্নত ও ঋজু করে কালো ভ্রমর কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঠিক একেবারে সুচিতার পাশ ঘেঁষেই যেন।

এতকুটু সঙ্কোচ বা দ্বিধামাত্রও যেন লোকটার চালচলন কথাবার্তার মধ্যে নেই, নিরঙ্কুশ বেপরোয়া।

কালো ভ্রমর চলে গেল।

আরও দু-চার মিনিট স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে ঐ একই জায়গায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে সুচিতা কি যেন কি ভেবে মামার চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল।

এবং টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় মামার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই আর্তব্যাকুল কণ্ঠে সুচিতা সহসা যেন চিৎকার করে ডেকে ওঠে, মামা!

॥ ৪ ॥

আকস্মিক বিপদে কিছু সময়ের জন্য হতচকিত ও বিমূঢ় হলেও একেবারে উপস্থিত বুদ্ধি ও নার্ভ হারাবার মত ধাতু বা প্রকৃতিতে গড়া সাধারণ মেয়ে নয় সুচিতা।

রক্তাক্ত অবস্থায় জ্ঞানহীন ঢলে পড়া মামার দেহটার দিকে তাকিয়ে প্রথমে সুচিতা ছুটে গিয়ে ফোনে মামার এক বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ বর্ধনকে শীঘ্র চলে আসতে বললে।

ডাঃ বর্ধন সুচিতার মুখে সংক্ষেপে সব শুনে বললেন, Don't worry! এক্ষুনি আমি আসছি মা। ততক্ষণ তুমি মামার ব্যাগ হতে একটা কোরামিন নিয়ে কোরামিন injection দিয়ে দাও, আর একটা কম্বল দিয়ে মামার দেহটা ঢেকে দাও। পার তো একটা ১/১০০ অ্যাট্রোপিন ও কোয়ার্টার গ্রেন মরফিনও inject করে দাও।

ডাঃ বর্ধনকে ফোন করেই ছুটে এল সুচিতা মামার জ্ঞানহীন দেহটার কাছে আবার। প্রথমে নাকে হাত দিয়ে দেখলে—খুব ধীরে তখনও শ্বাস বইছে। সুচিতা মামার কাছেই পালস দেখতে শিক্ষা করেছিল, পালস ধরে দেখলে পালস অত্যন্ত ফিবল ও স্লো।

ডাঃ বর্ধনের নির্দেশমত সুচিতা তখুনি মামার ইমারজেন্সি ব্যাগটা খুলে কম্পিত হস্তে কোরামিন অ্যাট্রোপিন মরফিনটাও দিয়ে দিল।

মিনিট পঁচিশের মধ্যেই ডাঃ বর্ধন চলে এলেন তাঁর গাড়িতে।

চাকরদের ডেকে তুলে সুচিতা ততক্ষণে গরম জল প্রভৃতির ব্যবস্থাও করে ফেলেছে।

ডাঃ বর্ধন ঘরে ঢুকে প্রথমেই চট্টরাজের নাড়ির অবস্থা দেখলেন, তারপর পিঠের উন্ডটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

সৌভাগ্যক্রমে উন্ডটা অত্যন্ত ডিপ ও গেপিং হলেও, যতদূর মনে হচ্ছে কোন ভাইট্যাল অরগ্যানকে ইনজিওর করেনি। তবে রক্তক্ষরণটা খুব বেশীই হয়েছে, ফলে শকও হয়েছে।

যাহোক ডাঃ বর্ধন আর দেরি না করে তখুনি চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। সমস্ত শেষ করতে করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।

আশ্চর্য নার্ভ সুচিতার! প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সুচিতা ডাঃ বর্ধনের নির্দেশমত সহকারীর কাজ করে গেল। প্রথমে তার যেটুকু চাঞ্চল্য এসেছিল, শেষের দিকে সেটুকুও আর ছিল না।

বাথরুমে ডাঃ বর্ধন হাত সাবান দিয়ে ধুচ্ছিলেন, হাতে জল ঢেলে দিতে দিতে সুচিতা এতক্ষণ পরে প্রথম প্রশ্ন করলে, বর্ধনকাকা?

কেন মা?

মামাবাবু—বাকী কথাটা সুচিতা আর শেষ করতে পারে না, অশ্রুভারে যেন বুজে আসে কণ্ঠ তার।

তুমি বুদ্ধিমতী মা, তোমার কাছে লুকিয়ে কোন লাভ নেই। আশা খুবই কম। অত্যন্ত heavy bleeding হয়েছে—আমি এখুনি হাসপাতালে যাচ্ছি, 'প্লাজমা' দিতে হবে।

কোন আশাই কি নেই বর্ধনকাকা?

ডাক্তার আমরা, আশা কি আমরা ছাড়তে পারি মা? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই আমাদের আশা।

ডাঃ বর্ধন তক্ষুনি নিজের গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন 'ব্লাড প্লাজমা' আনতে হাসপাতালে।

সুচিতা এসে মামার শিয়রে বসল।

চোখ বোজা।

ধীরে অতি ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। জীবনের অত্যন্ত ক্ষীণ মন্থর সঙ্কেত যেন।

খোলা জানলা-পথে রাত্রিশেষের তরল অন্ধকার গলে গলে নিঃশব্দে যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে।

অস্পষ্ট একটা আলোছায়ার লুকোচুরি ভয় ও শঙ্কা জড়ানো যেন।

পূর্বাশার প্রান্তে বিদায়ী বিবাগী শুকতারাটা যাই যাই করছে।

জ্যোতির্ময়ের তোরণদ্বারে রাত্রিশেষের আলপনা এঁকে চলেছে বুঝি দিগ্‌বধূরা।

আরও দুটো দিন কেটে গেল জীবন-মরণের যুদ্ধে।

ডাঃ বর্ধনের অক্লান্ত চিকিৎসা ও সুচিতার প্রাণঢালা সেবা ডাঃ চট্টরাজের অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ঘটায়।

সামান্যই আশার ক্ষীণ আলোকরেখা যেন দেখা দেয়।

যদিও আরও দুজন শিক্ষিতা নার্সের নিয়োগ হয়েছে, সুচিতা কিন্তু মামার শয্যার পাশটি ছেড়ে এখনও নড়েনি।

সামান্যক্ষণের জন্য শয্যাপার্শ্ব হতে উঠে গিয়ে কোনমতে একবার দিনে স্নানাহার ও রাত্রে কেবল আহারপর্বটা সেরে নিয়ে আবার ফিরে আসে সুচিতা। ত্রিসংসারে আপনার জন বলতে তো তার কেউ নেই আর।

যদিও জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং মধ্যে মধ্যে দু-একটা কথাও চট্টরাজ বলছেন —চিকিৎসকদের সম্পূর্ণ নিষেধ এখনও বলবৎ রয়েছে বেশী কথা বলা বা কোন প্রকার উত্তেজনার কারণ ঘটতে দেওয়ায়।

রাত্রি প্রায় দেড়টা হবে। বাড়ির সকলেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে, কেবল সুচিতার চোখে ঘুম নেই। ক্লান্তি নেই তার মনে বা শরীরে।

রাত্রে সুচিতা মামার সেবার ভার কারও হাতেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

যদিও একজন বহুদর্শী নার্স সারাটা রাত্রির জন্য উপস্থিত থাকে, তথাপি সুচিতা সারাটা রাতই মামার শিয়রে জেগে বসে থাকে।

নার্স পাশের ঘরেই থাকে, প্রয়োজন হলে সুচিতা নার্সকে ডেকে আনে।

ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা স্ট্যান্ডের ওপর সবুজ ডোমে ঢাকা একটা মৃদু বিদ্যুৎবাতি জ্বলছে। আবছা আলোয় সমগ্র কক্ষখানি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নাতুর মনে হয়। আলোর নীচেই টাইমপিসটা একঘেয়ে টিক্‌টিক্ আওয়াজ তুলে চলেছে। অখণ্ড নৈশ স্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দটা যেন মৃদু ও প্রাণস্পন্দন এই ঘন কালো রাত্রির।

মৃদু একটা শব্দ হল। এবং সামান্য সেই মৃদু শব্দ অতি সজাগ সুচিতার শ্রবণেন্দ্রিয়কে

এড়াতে পারলে না। চমকে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাতেই সুচিতা যেন সহসা পাষাণে পরিণত হল।

সেই দীর্ঘ মূর্তি। ঘরের দরজাটা নিঃশব্দে ভিতর হতে বন্ধ করে দিচ্ছে খিল তুলে। গায়ে সেই কালো ঝুল কোট। মাথায় মাংকি-ক্যাপ, তবে পার্থক্যের মধ্যে এই, মুখে সেদিনকার মত কালো রুমালটা কেবল বাঁধা নেই আজ।

কালো ভ্রমর!

ভয়ে বিস্ময়ে ও উত্তেজনায় সুচিতা উঠে দাঁড়ায় নিজের অজ্ঞাতেই।

কালো ভ্রমর তার ডান হাতের লম্বা তর্জনীটা সংবদ্ধ ওষ্ঠের ওপর স্থাপন করে নিঃশব্দে সতর্ক সঙ্কেতে যেন জানিয়ে দেয়, কথা নয়!

গভীর উত্তেজনায় সুচিতার সর্বশরীর তার অজ্ঞাতেই কাঁপতে শুরু করেছে তখন।

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত!

ঘড়ির একটানা টিক্‌টিক্ শব্দ কেবল শোনা যাচ্ছে।

চাপা কণ্ঠে কালো ভ্রমরই প্রথমে কথা বলে, ভয় নেই মিস্ ঘোষাল। একবার যখন লক্ষ্য আমার ব্যর্থ হয়েছে, দ্বিতীয়বার আর কালো ভ্রমর তার হাত তুলবে না এ জীবনে ওর ওপর। বন্দুক, রিভলভার বা ছোরা কখনও বড় একটা কালো ভ্রমরের হাতে লক্ষ্যচ্যুত হয়নি।

এতক্ষণে চাপা কণ্ঠে তর্জন করে ওঠে সুচিতা কালো ভ্রমরকে লক্ষ্য করে, Get out! I say off! প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেন মূর্ত হয়ে ওঠে সুচিতার কণ্ঠস্বরে।

উত্তেজিত হবেন না দেবী। এখুনি চলে যাব। যাবার আগে কেবল ছোট একটা অনুরোধ!

ঘৃণা ও বিদ্বেষপুর্ণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সুচিতা কালো ভ্রমরের দিকে।

কি স্পর্ধা! কি ভয়ঙ্কর দুঃসাহস শয়তানটার!

আমার খুনী ও ডাকাত ছাড়াও আরও একটা পরিচয় আছে—আমি একজন ডাক্তার। আপনি হয়তো জানেন না—ডাক্তারী বিদ্যাটা নেহাত আমার খারাপ জানা নেই। অন্তত বর্মা দেশের লোকদের ধারণা ছিল আমি নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। তাই, if you please permit me—একবার ডাঃ চট্টরাজকে দেখতে চাই!

বেরিয়ে যাও! যাও বলছি! আবার চাপা অস্ফুট কণ্ঠে তর্জন করে ওঠে সুচিতা।

ঠিক এমন সময় ডাঃ চট্টরাজের তন্দ্রাটা ভেঙে যায় এবং ঘরের মধ্যে অদূরে দণ্ডায়মান কালো ভ্রমরকে দেখে উত্তেজনায় অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন, কে! কে! কে ওখানে—কে?

সুচিতা চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে মামার শয্যার পার্শ্বে ছুটে আসে, মামা! মামা!

উত্তেজনায় চট্টরাজ শয্যার ওপর বসবার চেষ্টা করেন এবং সুচিতা ছুটে এসে মামাকে ধরবার আগেই চট্টরাজের জ্ঞানহীন দেহটা এলিয়ে ধপ্ করে শয্যার ওপরেই আবার পড়ে গেল।

মামা! মামা!

সুচিতা কান্নাঝরা সুরে ডেকে শয্যার ওপর মামার এলায়িত দেহটার ওপরে ঝুঁকে পড়ল।

সরুন, দেখি!

জোর করেই একপ্রকার সুচিতাকে সরিয়ে দিয়ে কালো ভ্রমর নিঃসঙ্কোচে ডাঃ চট্টরাজের জ্ঞানহীন দেহটা পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ইস, এ যে উন্ড থেকে ব্লিডিং হচ্ছে! পরক্ষণেই মুখ তুলে অদূরে টেবিলের ওপর রক্ষিত ডাক্তারের সার্জিক্যাল ব্যাগটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় অনেকটা যেন হুকুমের সুরেই কালো ভ্রমর সুচিতাকে আদেশ দেয়, Hurry up! যান ঐ ব্যাগটা নিয়ে আসুন।

প্রথম দিনের মতই সুচিতা যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

কালো ভ্রমরের নির্দেশ পালন করতে বিন্দুমাত্রও আর দ্বিধা করে না, ত্বরিৎপদে এগিয়ে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে এল।

প্রাথমিক চিকিৎসাটা তাড়াতাড়ি করতে করতে কালো ভ্রমর আবার বললে, ইলেকট্রিক স্টোভে একটু জল চাপিয়ে দিন।

ব্যান্ডেজটা খুলতে দেখা গেল, গোটা দুই সেলাই কেটে গেছে এবং সেই পথ দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে সামান্য।

রক্ত বন্ধ করার একটা সাময়িক ব্যবস্থা করে নতুন ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে কালো ভ্রমর সুচিতাকে লক্ষ্য করে বললে, আপাতত রক্ত বন্ধ করে দিয়ে গেলাম। আমি ফিজিসিয়ান, সার্জেন নই। আপনি এখুনি একবার ডাঃ বর্ধনকে রিং করে আসতে বলুন। তাঁর এসে এখুনি একবার ভাল করে উন্ডটা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

কালো ভ্রমর কক্ষ ত্যাগ করবার জন্য উদ্যত হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

সুচিতা এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি, নিঃশব্দে কালো ভ্রমরের আদেশ পালন করে গিয়েছে, তার চিকিৎসায় সহকারিত্ব করেছে। ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত সব দিক বিবেচনা করে দেখবার মত মানসিক ধৈর্য বা স্থিরতা কোনটাই তার এতক্ষণ ছিল না। না থাকলেও উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা সৃষ্টি করার মত শিক্ষাও সুচিতার নয়।

কালো ভ্রমরের সত্যিকারের পরিচয় যাই হোক, যত নীচ বা শয়তানই সে হোক না কেন, যে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সে সমস্ত বিপদটাকে মুহূর্ত আগে একান্ত সুষ্ঠুভাবেই অতিক্রান্ত হবার সাহস পরোক্ষভাবে সুচিতাকে দিয়েছিল, কতকটা সেই কৃতজ্ঞতা তো বটেই, তাছাড়া নারীমনের সহজাত স্নেহ, শঙ্কিত মনোবৃত্তির তাগিদেও কালো ভ্রমরকে কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত দেখে সহসা মুখ তুলে ডাকলে, শুনুন!

॥ ৫ ॥

কালো ভ্রমর সুচিতার আহ্বানে সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াল, আমাকে ডাকলেন?

হ্যাঁ,—মানে—একটা কুণ্ঠাভরা সলজ্জ ভীরু ভাব যেন সুচিতাকে সামান্য আড়ষ্ট করে ফেলে।

দেখুন, আমার ঐ কুখ্যাত 'কালো ভ্রমর' নামটি ছাড়াও আরও একটা পরিচয় আছে, ডাক্তার সান্যাল বলেও লোকে আমায় জানে—

আপনি চলে যাচ্ছেন ডাঃ সান্যাল?

সমস্ত কুণ্ঠা ও আড়ষ্টতা কাটিয়ে, একপাশে ঠেলে রেখেই যেন কথাটা কোনমতে বলে ফেলে সুচিতা।

ডাঃ সান্যাল যেন বেশ একটু অবাকই হয়ে গেছে, মৃদু হাস্যসহকারে বলে, হ্যাঁ যাচ্ছি—

কিন্তু মামার জ্ঞান এখনও ফিরে এল না!

ভয় পাবেন না, নাড়ির গতি ভালই আছে—আপাতত ভয়ের কোন তেমন বিশেষ কারণ আছে বলে তো মনে হয় না।

তা হোক, আপনি—আপনি যাবেন না, অন্তত ডাঃ বর্ধন যতক্ষণ না এসে পৌঁছান!

সুচিতার কণ্ঠে একটা নম্র মিনতি যেন ঝরে পড়ে।

বিশেষ কৌতুক অনুভব করেন ডাঃ সান্যাল। অপূর্ব স্মিত হাস্যে সমগ্র মুখখানি তার যেন ভরে ওঠে।

কেন বলুন তো, ধরিয়ে দিতে চান নাকি মুঠোর মধ্যে পেয়ে?

ধরিয়ে দেব!

হ্যাঁ, সেটাই তো স্বাভাবিক, আপনার মামাকে হত্যা করার চেষ্টা তো আমিই করেছিলাম। শুধু তাই নয়, আরও তিন-চারটি হত্যার অভিযোগও তো আমার এই কণ্ঠটিকে বেষ্টন করে সগৌরবে ঝুলছে। হন্যে কুকুরের মত কিরীটী রায় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কোনমতে একটিবার কুখ্যাত এই হত্যাকারী কালো ভ্রমরকে ধরতে পারলে, বুঝতেই তো পারছেন, চকচকে মোম আর চর্বিমাখানো ফাঁসির দড়িটি গলায় পরিয়ে দেবে মহানন্দে।

চাপা হাসির প্রাবল্য ডাঃ সান্যালের সমগ্র চোখে-মুখে যেন ঝিকমিকিয়ে ওঠে।

ভাবছেন লোকটা কি নির্লজ্জ আর বেহায়া, না! জঘন্য কু-কাজ করেও হাসছে! কিন্তু আর না, কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি চট করে একবার আগে ডাঃ বর্ধনকে ফোনটা করে দিন তো, সেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কই যান!

সুচিতা কতকটা যেন মোহগ্রস্তের মতই পাশের ঘরে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিল কালো ভ্রমরের নির্দেশে।

ফোন করে ফিরে এসে দেখলে ডাঃ সান্যাল ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দে প্রস্থান করেছেন।

অদ্ভুত একটা নিষ্ক্রিয় আলস্যে সুচিতার মনটা যেন সহসা কেমন বিহ্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে এসে সুচিতা আবার মামার শিয়রে বসল।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেল, ডাঃ চট্টরাজ সহসা একটা অস্ফুট কাতরোক্তির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুরুন্মিলন করলেন, আঃ!

সুচিতা মামার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে মৃদু কোমল স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ডাকে, মামা?

কে?

মামা আমি সুচি।

সুচি! হঠাৎ যেন ডাক্তার চট্টরাজের ক্ষণপূর্বের সমস্ত কথা মনে পড়ে যায়। ঘরের মধ্যে আবছা আলো-আঁধারিতে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ ছায়ামূর্তি!

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, সেই লোকটা! চলে গেছে?

কে? কার কথা বলছ? কে চলে গেছে?

সেই সে! সেই—আমি, আমি তাকে চিনি!

কাকে তুমি চেন? কার কথা বলছ মামা? কেউ তো এ-ঘরে আসেনি! সারাক্ষণই তো আমি জেগে তোমার শিয়রে বসে আছি।

কেউ আসেনি?

না। কই কেউ তো আসেনি!

আমি—আমি যে স্পষ্ট দেখলাম। সে—সে এসেছিল সুচি! সে এসেছিল!

না, কেউ আসেনি। তুমি হয়তো ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছ।

কোমল কণ্ঠে সান্ত্বনা দেয় সুচিতা ডাঃ চট্টরাজকে।

কেউ আসেনি? স্বপ্ন?

হ্যাঁ, স্বপ্ন। এবারে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর তো মামা।

হ্যাঁ ঘুমোব। তারপর একটু থেমে আবার ক্লান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকেন, সুচি মা!

কেন মামা?

তুই যা মা, শুগে যা। আমি তো এখন একটু ভালই।

তুমি ঘুমোও, আমি যাব'খন।

না, না—তুই যা মা। রাতের পর রাত জাগছিস, অসুখ হলে তোকে কে দেখবে মা! তুই যা!

ডাঃ বর্ধনের গাড়ি থামবার শব্দ পাওয়া গেল নীচে।

সুচিতা কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তিই বোধ কবে।

ডাঃ বর্ধন এত রাত্রে এলে মামা যদি প্রশ্ন করেন—হঠাৎ তিনি এলেন কেন এই সময়ে?

কি জবাব দেবে সে?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ডাঃ বর্ধন আসছেন।

মুহূর্তে পরিস্থিতিটা ভেবে নিয়ে নিজ কর্তব্য সম্পর্কে স্থির করে নেয় সুচিতা।

শয্যার পাশ হতে উঠে সোজা সিঁড়ির মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

ত্বরিৎপদে দুটো করে সিঁড়ি অতিক্রম করতে করতে ডাঃ বর্ধন উঠে আসছেন। মুখে চিন্তার সুস্পষ্ট ছায়া।

সিঁড়ির মাথাতেই সুচিতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, এই যে মা, তোমার মামা কেমন আছেন?

ভাল একটু—

বাকী সিঁড়ি কটা অতিক্রম করে সুচিতার পাশে এসে দাঁড়াতেই মৃদুস্বরে সুচিতা ডাকে, বর্ধন কাকা!

কেন মা?

গমনোদ্যত ডাঃ বর্ধন ফিরে দাঁড়ালেন সুচিতার ডাকে।

একটা কথা বর্ধন কাকা!

বল মা।

মামা যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনাকে, কিছু বলবেন না। শুধু বলবেন যে, এদিক

দিয়ে আপনি যাচ্ছিলেন, তাই সংবাদটা নিতে এসেছেন। আমি যে আপনাকে ফোন করেছি—

তোমার কথা যে কিছুই বুঝতে পারছি না মা।

কাল একসময় আপনাকে সব খুলে বলব। যান আপনি, মামার woundটা একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখবেন, ব্লিডিং হয়েছিল একটু আগে।

চট্টরাজ জেগেই ছিলেন, কেবল ক্লান্তিতে চোখের পাতা দুটো ছিল মুদ্রিত।

পদশব্দে চক্ষু মেলে তাকাতেই ডাঃ বর্ধনকে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, অবিনাশ! তুমি এত রাত্রে?

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম—সুচি কই?

এই তো এতক্ষণ আমার শিয়রের ধারে বসে ছিল। আমার জন্য কি যে ও করছে! এমন যত্ন এমন সেবা নিজের মেয়েও করে না অবু!

তা তো করবেই। একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সে তোমার যে কন্যারও অধিক।

পরীক্ষান্তে ডাঃ চট্টরাজের নিকট বিদায় নিয়ে বাইরের বারান্দায় আসতেই ডাঃ বর্ধন দেখতে পেলেন, অস্পষ্ট অন্ধকারে টানা বারান্দার একপাশে রেলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সুচিতা।

পদশব্দে সুচিতা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, দেখলেন কাকাবাবু?

হ্যাঁ মা, ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু মা, অমন সুন্দর করে dress করলে কে? মনে হল dressটা দেখে, বহুদর্শী কোন শিক্ষিত হাতের dressing।

আজ নয় কাকাবাবু, আপনাকে সব বলব অন্য একদিন।

মিনতি-করুণ কণ্ঠ সুচিতার।

বিস্মিত ডাক্তার বর্ধন কি যেন বলতে গিয়েও আর বললেন না।

বিদায় নিয়ে সিঁড়ির পথে অগ্রসর হলেন।

আশ্চর্য মানুষের মন!

সুচিতা ভাবছিল, ডাঃ সান্যাল—কালো ভ্রমরের কথাই।

যার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষের একটু পূর্বেও অন্ত ছিল না, তারই কথা এখন ভাবতে গিয়ে মনের কোথাও সেই ক্ষণপুর্বের বিদ্বেষ ও ঘৃণার অবশিষ্টমাত্রও যেন আর নেই।

হত্যাকারী শয়তান!

যার খোঁজে আজ পুলিসের লোকেরা সর্বত্র চষে বেড়াচ্ছে বললেও অত্যুক্তি হয় না, তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও সুচিতা কেন কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিল না? সমাজের অহিতকারী শত্রু—কেন তাকে সে মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিল?

অন্যায়—অন্যায় হয়েছে সুচিতার। পাপের প্রশ্রয় যে জেনেশুনেও দেয়, তার পাপের কি ক্ষমা আছে?

এবং যার চাইতে জগতে প্রিয় ও আপনার জন আর তার নেই, তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল যে, কোন্ যুক্তিতে সে তাকে অনায়াসে করায়ত্ত করেও এমনি করে যেতে দিল!

তীব্র অনুশোচনায় সুচিতার সমস্ত অন্তর যেন বিষের জ্বালায় জ্বলতে থাকে। নিদারুণ অন্তর্দাহে সুচিতা যেন বৃশ্চিকদংশন অনুভব করতে থাকে।

এ সে কি করলে? দুই চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে অশ্রু নেমে এল দরবিগলিত ধারায়। সুচিতা আকুলভাবে কাঁদতে থাকে।

॥ ৬ ॥

কোথায় এসে আজ দাঁড়িয়েছি?

পশ্চাতে ও সম্মুখে নিকষ কালো অন্ধকার। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ যা কিছু সবই আজ আমার কাছে মিথ্যা ও সংশয়ে ভরা। শঠতা, জালিয়াতি, জোচ্চুরি, রাহাজানি, জখম ও হত্যা কোন কিছুই আজ আর আমার বাকী নেই। শিক্ষা ও নীতিকে দিয়েছি বিসর্জন। বিবেককে গলা টিপে হত্যা করেছি। চক্ষুলজ্জাকে চিরতরে দিয়েছি নির্বাসন। বেঁচে আছে শুধু আজ জৈবিক প্রয়োজনটুকু।

জীবনের দীর্ঘ পথটাও তো প্রায় সমাপ্ত করে এনেছিলাম, তবে হঠাৎ আজ মনের মধ্যে অকারণ সংশয়ের দোলা জাগল কেন? যে অতীতকে নিঃসংশয়ে জীবনের পাতা হতে একেবারে মুছে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছি বলে জানতাম, আজ সেই হারানো বিস্মৃতপ্রায় অতীত কেন সামনে এসে দাঁড়াতে চাইছে বার বার?

এ কি দুর্বলতা, না বার্ধক্য?

রাত্রি গভীর। চারিদিকে গাঢ় স্তব্ধতা যেন কালো ডানা মেলে দিয়েছে আপনাকে বিস্তার করে।

ডাঃ সান্যাল একাকী তার নিভৃত শয়নকক্ষে একটা ছোট্ট টুলের ওপরে বসে সামনের টেবিলের ওপর রক্ষিত একটা বাঁধানো খাতায় বোধ হয় তার নিজের আত্মজীবনীই লিখে চলেছে।

হত্যা আজ আমার নেশা! রক্ত দেখে আমি তৃপ্তি পাই!

অথচ আশ্চর্য একদিন প্রথম যৌবনে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করব বলে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম।

সেবা! মানুষের সেবা!

মানুষ কোথায়? একদল মানুষের বিকৃত শব! স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা—পরস্পর পরস্পরের মধ্যে করে চলেছে রক্তারক্তি, হানাহানি। জঘন্য কুৎসিত লালসায় বাঁকানো নখর বিস্তার করে মানুষ মানুষের বুকের রক্তে মদির বিহ্বল।

বাবা—আমার বাবার কথা মনে পড়ছে। অতি ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, বাবার বুকেই মানুষ হয়েছি।

বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি একদিন আমায় বলেছিলেন, সুরো, সর্বভূতে ঈশ্বর। সকল মানুষের বুকে ঈশ্বরের আসন পাতা। তাদেরই সেবা তুমি করবে। ঈশ্বরের প্রতিভূ তুমি।

ডাক্তার বা চিকিৎসক কথাটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক।

পীড়িতের বেদনার্তের মুখে তোমরা ফুটিয়ে তুলবে হাসি। আশ্বাস দেবে তাদের প্রাণে।

এর তুলনা কোথায়?

সত্যিই তো, এর তুলনা কোথায়? কত আশা, কত স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘকাল পরে আবার যেদিন ইউরোপ হতে ফিরে এলাম—এসে দেখি আমার বাবা, স্নেহময় বাবা আর নেই!

বন্ধুরূপী শয়তানের দল সুযোগ নিয়ে তিল তিল করে তাঁকে হত্যা করেছে। বঞ্চনা ও শঠতার বিষে জর্জরিত করে তাঁকে ধ্বংস করেছে।

সেই যে আগুন জ্বলল আমার বুকে, প্রতিহিংসার আগুন—কই আজও তো নিভল না! নিভবে না জানি কোন দিনই, চিতাভস্মে যতদিন না সব শেষ হয়ে যায়। ধ্বংস করেছি তাদের প্রত্যেককে। যে শঠতা ও বঞ্চনা দিয়ে তারা আমার দেবতুল্য পিতাকে ধ্বংস করেছিল, যে মরণাধিক যন্ত্রণা দিয়ে তারা তিল তিল করে তাঁকে জীর্ণ করেছিল, তার চাইতেও সহস্রগুণে কঠোর যন্ত্রণা দিয়ে একে একে তাদের আমি শেষ করেছি। হত্যা করেছি।

ধ্বংস তাদের করেছি সত্য, কিন্তু আমিও তো কই রেহাই পাইনি!

প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে আমার ওপর।

পাপের বিষ আমারও দেহে সংক্রামিত হয়েছে, আমাকেও জীর্ণ ধ্বংস করেছে সেই তীব্র বিষ! দেহের প্রতি শিরায় শিরায়, রক্তের প্রতি কণায় কণায় সেই বিষ আজ ছড়িয়ে গিয়েছে।

মুক্তি নেই।

নিষ্ঠুর প্রকৃতি নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে।

নীতি আজ আমার কাছে মিথ্যাচার। বিবেক সংশয়ে ভরা। ন্যায়-অন্যায় দুর্বলের অক্ষমতা। হত্যা আজ আমার প্রাণে নেশা জাগায়। রক্ত আনে আত্মোন্মাদনা। শেষ অসহায় যন্ত্রণাকাতর আর্ত চিৎকার সর্বদেহে আজ আমার আনে অপূর্ব শিহরণ রোমাঞ্চ আত্মতৃপ্তি।

কোন অনুশোচনা নেই। কোন খেদ নেই। নির্বিকার মূক বধির।

পৃথিবীর কাউকে আজ আর আমি বিশ্বাস করি না।

যারা আমার সুখের কল্পনায় আগুন জ্বেলে দিয়েছে, সেই মানুষের সমাজ, সংসার ও সুখের মূলে বার বার হানব আমি তীক্ষ্ণ কুঠারের আঘাত। পরশুরামের মত আমার ক্ষমতা যদি থাকত, মানুষহীন নির্মূল করতাম এই ধরিত্রী আমি। এই শঠতা ও যুগ-বঞ্চনার অবসান ঘটাতাম আমি। মানুষের রক্তে মানুষের যুগ-সঞ্চিত এই পাপ ও গ্লানি ধুয়ে মুছে দিতাম। হে ঈশ্বর, আমায় ক্ষমতা দাও, দাও আমায় সেই পরশুরামের কঠোর কুঠার!

রাত্রি আরও গভীর হয়েছে।

ডাঃ সান্যালের চোখে তবু নিদ্রা নেই।

তার দীর্ঘদিনের নীতির মূলে মাটি যেন সহসা কেমন আলগা হয়ে গিয়েছে।

এ কি সংশয় না ভয়—না দুর্বলতা?

ডাঃ সান্যাল এগিয়ে এসে ঘরের দেওয়ালে প্রলম্বিত প্রমাণ আরশিটার সম্মুখে দাঁড়াল।

ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর প্রভা মসৃণ আরশির গা বেয়ে যেন পিছলে পড়ছে। দীর্ঘ ঋজু প্রতিবিম্ব।

রগের দু পাশের চুলে পাক ধরেছে। মুখাবয়বে দু-একটি বলিরেখাও যেন দেখা দিয়েছে। পঞ্চাশটি শীত-বসন্তের ছায়া পড়েছে যেন কপালে, চোখের কোলে, কপোলে, ওষ্ঠে ও চিবুকে।

পেশীবহুল দক্ষিণ হস্তটি তুলে ধরল ডাঃ সান্যাল। সুগঠিত বাইসেপ্স্ ও ট্রাইসেপ্স্ পেশী। ইচ্ছামাত্রেই ইস্পাতের তৈরী স্প্রিংয়ের মত এখনও মুহূর্তে সক্রিয় হয়ে উঠছে।

ঘুমন্ত সরীসৃপ ইচ্ছামাত্রেই তো এখনও জেগে উঠছে। তবে? কেন এ ভীরু সংশয় আজ মনের কোণে দেখা দিল?

বাইরের দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

মৃদু! অতি মৃদু!

কে?

বাবু আমি রামু।

ডাঃ সান্যাল এগিয়ে গিয়ে ঘরের বন্ধ দরজাটা খুলে দিল।

কি?

অরুণবাবু এসেছেন।

কে, অরুণ কর?

আজ্ঞে।

যা, এই ঘরে ডেকে নিয়ে আয়। আর দেখ্, সামান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে কাল রাত বারোটায় আমরা গাড়ি নিয়ে বের হব।

যে আজ্ঞে।

বিশ্বস্ত অনুচর রামু আজ্ঞা পালনের জন্য নীচে চলে গেল।

একটু পরেই অরুণ কর এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

প্রফেসার শর্মার আকস্মিক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর হতেই অরুণ করের মাথার মধ্যে কেমন যেন একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে।

বিষাদের একটা ক্লিষ্ট ছায়া যেন ওকে গ্রাস করেছে।

সদাপ্রফুল্ল তেজোদৃপ্ত পূর্বের যে অরুণ কর এ যেন আজ আর নয়, তার প্রাণহীন শব মাত্র।

ডাঃ সান্যাল সাদর আহ্বান জানাল, আসুন অরুণবাবু!

আপনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন ডাঃ সান্যাল?

অরুণ কর কক্ষে প্রবেশ করতে করতে প্রশ্ন করে।

আপনি তো আমার অবস্থা জানেনই। পলাতক। পালিয়ে চোরের মত আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছি। হাতে যা অর্থ ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে এল প্রায়। আবার আমার কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছে। অবশ্য এবারেও এমনিই আপনার কাছ হতে আমি টাকা চাই না। কতকগুলো দামী জুয়েল দেব, তার পরিবর্তে আপনি আমাকে টাকা দেবেন। আর একমাত্র এ ব্যাপারে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আশা করি আপনার যে উপকার আমি প্রফেসার কালিদাস শর্মাকে হত্যা করে করেছি, তার বিনিময়ে এ উপকারটুকু আপনি আমার করবেন।

উপকারের কথা থাক ডাঃ সান্যাল, টাকা আমি দেব, কিন্তু এবারে কত টাকা চাই আপনার বলুন?

হাজার দশেক হলেই চলবে, তবে দশ টাকার নোটে। নম্বরী নোট হলে চলবে না।

কবে চাই বলুন?

যদি বলি কালই চারটের মধ্যে এই ঘরে এসে টাকাটা দিয়ে যেতে হবে?

ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনা ছাড়া তো আর আমার উপায় নেই। তাও সব দশ টাকার নোট পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ অত কম সময়ের মধ্যে।

চেষ্টা করুন। চেষ্টা করলেই হবে। আচ্ছা আপনি এখন তাহলে যেতে পারেন অরুণবাবু!

কতকটা যেন ধাক্কা দিয়েই ডাঃ সান্যাল অরুণ করকে কক্ষ হতে বের করে দিল।

দুর্বল ভীরু প্রকৃতির লোক অরুণ কর।

একসময় সে ছিল প্রফেসার কালিদাস শর্মার মুঠোর মধ্যে। কালিদাস শর্মা তার ইচ্ছামত অরুণ করকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। এখন কিছুদিন যাবৎ হল পড়েছে কালো ভ্রমরের মুঠোর মধ্যে।

প্রফেসার শর্মার চাইতে কালো ভ্রমর আরও বেশী শক্তিশালী লোক। ক্ষমতা তার ঢের বেশী। অরুণ করকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনা ছাড়া কালো ভ্রমরের দ্বিতীয় আর কোন পন্থাও ছিল না। বাঁচতে হলে এই মুহূর্তে টাকার প্রয়োজন। কতকগুলো দামী দামী জুয়েল ছাড়া কালো ভ্রমর 'মার্বেল প্যালেস' অতর্কিত ছেড়ে আসবার পূর্বে নগদ টাকাকড়ি হাতিয়ে আনতে পারেনি। কিরীটীর চোখে ধুলো দিয়ে টাকাকড়ি ব্যাঙ্ক বা অন্য কোথাও হতে ঐসব জুয়েল বিক্রী করে যোগাড় করাও দুঃসাধ্য। অনেক চিন্তা করেই ডাঃ সান্যাল অরুণ করকে ভয় দেখিয়ে নিজের মুঠোর মধ্যে এনেছিল।

প্রফেসার শর্মার ব্যাপারেই কালো ভ্রমর বুঝতে পেরেছিল, প্রাণ দেবে তবু মুখ খুলবে না অরুণ কর। বিশেষ এক প্রকৃতি ঐসব লোকের।

অরুণ করকে বিদায় দিয়ে ডাঃ সান্যাল কক্ষের মধ্যে পায়চারি করতে করতে চিন্তা করতে থাকে। কিছুদিনের জন্য কলকাতা শহর ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে হবে।

দীর্ঘদিনের জন্য না হলেও অন্তত বৎসরখানেকের জন্য আপাতত একটা অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন। বিশেষ করে কিরীটীর সদা-সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতা শহরে এখন অবাধ বিচরণ শুধু দুঃসাহসই নয়, নির্বুদ্ধিতারও পরিচায়ক।

সকলের চোখকে ফাঁকি দিলেও কিরীটীর শ্যেন-দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়াটা খুব সহজ হবে না।

অভাবনীয় একটা সুযোগ মিলে গিয়েছে এবং মনে মনে সান্যালের প্ল্যানও একটা ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন অর্থের কিছু প্রয়োজন, সেই কারণেই সকালবেলা রামুকে পাঠিয়ে অরুণ করকে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল, কারণ ইতিপূর্বে আর একবার অরুণ করই টাকা দিয়েছিল।

॥ ৭ ॥

শচীন গুপ্ত আর কিরীটী তার বসবার ঘরে দোতলায় বসে কালো ভ্রমর সম্পর্কেই আলোচনা করছিল। শচীন গুপ্তর বিশেষ অনুরোধে কিরীটী কালো ভ্রমরের দীর্ঘ পূর্ব ইতিহাসটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করে বললে, এখন বুঝতে পারছেন মিঃ গুপ্ত, কালো ভ্রমরের আসল স্বরূপটি! শিক্ষায় ও কালচারে ডাঃ সান্যালের মত লোক সত্যই দুর্লভ। সাধারণ ছিঁচকে চোর ডাকাত বা খুনে হলে কথা ছিল, অত্যন্ত ক্ষিপ্র, কৌশলী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকটা—আপনাদের তদন্তের সাধারণ ফরমুলায় ফেলে ওকে ঘায়েল করতে পারবেন না।

আপনি যা বললেন লোকটা সম্পর্কে মিঃ রায়, তাতে তো আশ্চর্যই লাগছে। এত বড় শিক্ষিত ও সদ্বংশজাত হয়েও—

ওইখানেই আপনি ভুল করছেন শচীনবাবু, মদ্যপান করতে শুরু করেই লোকে মাতাল হয় না। আবার মাতাল যখন হয় তখন আর সে মানুষ থাকে না। ডাঃ সান্যালের বেলাতেও ঠিক তাই হয়েছে। এইজন্যই যে পথে পতনের সম্ভাবনা সে পথকে পরিহার করে না চললে পতনটা অবশ্যম্ভাবীই হয়ে পড়ে একদিন। বিবেক বলুন বা কৃষ্টি ও শিক্ষাই বলুন, আসলে সব কিছুই তো মানুষের মনে এবং আসলে সেই মনকেই যখন কোন বদভ্যাস বা আসক্তি আচ্ছন্ন করে, তখন ঐ সব কিছুই তো নিঃশেষে লোপ পায়!

কিন্তু ডাঃ সান্যালের মত প্রতিভাবান, উচ্চশিক্ষিত ইউরোপ-প্রত্যাগত একজন চিকিৎসক—

ঐ কারণেই অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার কোন দিনই সম্ভবপর হয় না, তাতে করে অন্যায়ের মধ্যেই জড়িয়ে পড়তে হয় আরও বেশি করে। বিশেষ করে এইসব ক্ষেত্রে পরিমাণটা বড় মর্মন্তুদ হয়। আপনি শুনলে হয় তো আশ্চর্যই হবেন, কালো ভ্রমর ধরা পড়ুক ও সাধারণ বিচারালয়ে বিচার হয়ে তার সাধারণ খুনীর মত ফাঁসি হোক, সত্যি মনেপ্রাণে সেটা আমি চাই না। প্রকৃতির দেওয়া অভিশাপের আগুনে সে তিল তিল করে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হোক, যে শাস্তির চাইতে বড় ও নির্মম শাস্তি আর নেই—অনুশোচনার তীব্র দাহে তার অগ্নিসংস্কার হোক এই আমি চাই। ফাঁসি দিলে কয়েক মুহূর্তেই তো সব ফুরিয়ে গেল, কিন্তু এত বড় দুষ্কৃতির যোগ্য তো তা নয়। এটা জানবেন শচীনবাবু, প্রকৃতির নিয়মকানুন যদি সত্যি হয়, তাহলে কালো ভ্রমরও নিষ্কৃতি পাবে না। এ পাপের গুরুদণ্ড তাকে মাথা পেতে নিতেই হবে। হ্যাঁ নিতেই হবে। এ অনিবার্য ও সুনিশ্চিত।

॥ ৮ ॥

ইউ পি'র ছোটখাটো একটি শহর।

ঠিক শহর বললেও ভুল হবে, বলা উচিত উপ-শহর বা ছোট একটি শহরের উপাংশ বিশেষ।

কিছু চাষাভুষা ও দু-এক ঘর গৃহস্থ নিয়ে জায়গাটির লোক-সমাবেশ।

বেশির ভাগই চাষের জমি—ভুট্টা, জনার ও গমের চাষ হয়।

উপকণ্ঠে একটি মিশনারীদের বহু পুরাতন মিশন বা প্রতিষ্ঠান আছে।

বৃদ্ধ ফাদার জোন্স সর্বাধ্যক্ষ ও আরও দুজন পাদ্রী আছেন—এব্রাহাম চ্যাটার্জী ও রবার্ট ঘোষ। আর আছেন এক ফ্রেঞ্চ মহিলা সিস্টার রিটা। বিঘাখানেক জমি নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি। ছোট একটি চার্চ, একটি স্কুল ও একটি বোর্ডিং।

অনাথ নামগোত্রহীন ছেলেমেয়েরা এখানে মানুষ হয়। রক্ষণাবেক্ষণ করেন সিস্টার রিটা ও শিক্ষা দেন ফাদার জোন্স, ঘোষ ও চ্যাটার্জী।

আশ্রমে প্রায় নানাবয়েসী নানাজাতের পঞ্চাশ-ষাটটি বালক-বালিকা আছে।

জোন্সের মা ছিলেন মাদ্রাজী এক সিভিলিয়ানের স্ত্রী। জোন্সের ধর্মাসক্তিটা এসেছিল মায়ের দিক থেকে, মা ছিলেন এক পাদ্রীর কন্যা।

দুই মাসাবধিকাল ফাদার জোন্স বাতব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী আছেন।

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন।

ফাদারের বয়সও কম হয়নি, সত্তরের কাছাকাছি।

ইদানীং প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত অর্থাভাব ঘটেছে এবং নিজেও অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে যাবার জন্য কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারেননি।

সংবাদপত্রে দীর্ঘদিন ধরে ডোনেশনের জন্য অনেক আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু কোন সুফলই এতকাল হয়নি। তবে দিন পনেরো হল এক সহৃদয় ব্যক্তি হঠাৎ সংবাদপত্রের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। তিনি মিশনের ভার নিতে তো রাজী হয়েছেনই, সেই সঙ্গে তাঁর বাকী জীবনটা মিশনের সেবার জন্য এর মধ্যে থেকেই অতিবাহিত করবেন জানিয়েছেন।

জোন্স এতটা আশা করেননি কোনদিন, তাই ভদ্রলোকের পত্রের জবাবে আনন্দে তাকে মিশনে আহ্বান জানিয়েছেন।

ভদ্রলোকও প্রত্যুত্তরে জানিয়েছেন, শীঘ্রই মিশনে এসে যোগ দেবেন।

তবে কবে আসবেন দিনটা এখনও সঠিক জানাননি।

শুধু ফাদারই নয়, আশ্রমের অন্যান্য সকলেও পরিচিত সেই ব্যক্তির আগমনের দিন আকুল আগ্রহে গুনছেন।

ফাদার জোন্স তাঁর রোগশয্যার ওপর শুয়ে চ্যাটার্জী ও সিসটার রিটার সঙ্গে সেই সম্পর্কেই আলোচনা করছিলেন।

ফাদার জোন্স বলছিলেন, অপরিচিত ঐ ভদ্রলোক যেভাবে তাঁর অযাচিত স্নেহ অনুকম্পার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, সবই সেই পরম পিতার ইচ্ছা। রোগশয্যায় শুয়ে গত মাসাবধি আমার সমস্ত জীবন দিয়ে গড়ে তোলা এই প্রতিষ্ঠানটি, আমার অভাবের দুর্দিনের কথা ভেবে ভেবে কি যন্ত্রণা যে ভোগ করেছি, একমাত্র পরম পিতা সেই ঈশ্বরই জানেন।

চ্যাটার্জী বললেন, কিন্তু ফাদার, এই অজ্ঞাতকুলশীলকে কেবলমাত্র অর্থসাহায্য করছেন বলেই আশ্রমে স্থান দেওয়াটা ঠিক উচিত হবে কিনা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না!

না চ্যাটার্জী, এ পরমপিতারই অদৃশ্য আশীর্বাদ। এর মধ্যে দ্বিধা বা সঙ্কোচ রেখো

না। এতদিন ধরে বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্ত্বেও কেউ সাড়া দিল না, অথচ ঐ ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছেন। না, না—অন্তরের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করো।

ফাদার জোন্সের কথার জবাব দিলেন সিস্টার রিটা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ফাদার। পরমপিতা কখনও আমাদের ওপর অমন বিরূপ হবেন না। যিনি আসছেন তিনি আমাদের বন্ধুই হবেন।

আমিও তাই মনে করি সিস্টার। হ্যাঁ ভাল কথা, তিনি যখনই এসে পৌঁছান, আগে হতেই তাঁর থাকবার সব ব্যবস্থা করে রেখো সিস্টার।

হ্যাঁ ফাদার, আপনি ব্যস্ত হবেন না। তাঁর থাকবার সমস্ত ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি।

আচ্ছা এবারে তাহলে তোমরা যাও। আমি একটু একা থাকতে চাই।

সিস্টার রিটা ও চ্যাটার্জী বিদায় নিলেন।

রাত্রি প্রায় পৌনে নয়টা।

ডাঃ সান্যাল একাকী তার কক্ষের মধ্যে অরুণ করের প্রতীক্ষায় অধীরভাবে পায়চারি করছে।

অরুণ কর প্রস্তাবমত টাকা নিয়ে এখনও এল না।

রাত্রি বারোটায় বের হতে হবে।

রাতারাতি বর্ধমানে পৌঁছাতে হবে এবং কাল সকাল দশটায় বর্ধমান থেকে মেলট্রেন ধরতে হবে। রাতারাতি বর্ধমান পৌঁছতে হবে এইজন্য যে, অন্ধকার থাকতে থাকতেই গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে, নচেৎ দিনের আলোয় নানা অসুবিধা।

অরুণ কর যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না এ স্থির বিশ্বাস ডাঃ সান্যালের আছে। টাকা নিয়ে সে আসবেই। আর একান্তই যদি টাকার যোগাড় না সম্পূর্ণ করে উঠতে পারে, একটা সংবাদ যে সে দেবেই সে সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই ডাঃ সান্যালের।

কালো ভ্রমর অরুণ কর সম্পর্কে ভুল করেনি, নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই ঐদিন দ্বিপ্রহরে যে দুর্ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল, কেবল সেটাই ছিল ধারণা ও তার চিন্তার বাইরে।

নিয়মিত সময়েই অরুণ কর ব্যাঙ্কে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, কালো ভ্রমরের নির্দেশমত টাকা ড্র করবার জন্য।

এবং অরুণ করের স্বভাবসিদ্ধ অন্যমনস্ক স্বভাবের জন্য সে লক্ষ্য করেনি—ঠিক তখন অল্প একটু দূরেই কিরীটী দাঁড়িয়ে ছিল।

কিরীটী ব্যাঙ্কে এসেছিল তার নিজের কাজে।

সহসা অদূরে অরুণ করকে দণ্ডায়মান দেখে কিরীটীর অরুণ করকে চিনতে কষ্ট হয়নি। প্রথমটায় অরুণ করকে ব্যাঙ্কে দেখে কিরীটীর মনে কোনরূপ প্রশ্ন জাগেনি, কিন্তু সহসা কাউন্টারে যে ভদ্রলোক টাকা দিচ্ছিলেন, তাঁর একটা কথা কানে যেতেই কিরীটীর শ্রবণেন্দ্রিয় যেন আপনা হতেই সজাগ হয়ে উঠল।

এই তো মাত্র দিনদশেক আগে পাঁচ হাজার টাকা তুললেন অরুণবাবু, হঠাৎ আজ আবার দশ হাজার ক্যাশ টাকা তুলছেন—ব্যবসা নতুন কিছু শুরু করলেন নাকি মিঃ কর? দেখবেন, যুদ্ধের বাজারে অনেকেই কিন্তু নানা স্পেকুলেশনে টাকা খুইয়েছে—

না, তেমন কিছু নয় সুনীলবাবু। একটা সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে, তাই ভাবলাম কিনে রাখি।

অরুণ কর প্রত্যুত্তর দেয় কতকটা যেন দ্বিধাগ্রস্তভাবেই।

ওঃ! কিন্তু সবই দশ টাকার নোট চান—একটু যে মুশকিলে ফেললেন স্যার!

হ্যাঁ, পার্টিটা বড় ছ্যাঁচড়া, দশ টাকার নোটই সব চায়।

দাঁড়ান। একটু অপেক্ষা করুন। দশ হাজার টাকার দশ টাকার নোট বোধ হয় হবে না, তবু একবার ক্যাশটা দেখি।

দেখুন না সুনীলবাবু, আপনি একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে।

দেখি।

সুনীলবাবু অল্প একটু হেসে ক্যাশিয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিরীটীর মনটা কিন্তু কেমন যেন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

অরুণ কর সম্পত্তি কিনছে!

একা মানুষ—কলকাতা শহরে তার এত সম্পত্তি—আবার তার সম্পত্তির কি প্রয়োজন?

তাও আবার সবই দশ হাজার টাকা দশ টাকার নোটে প্রয়োজন!

ব্যাপারটা যেন কেমন সন্দেহের সৃষ্টি করে।

কিরীটী ব্যাঙ্ক হতে বের হয়ে ঠিক গেটের কাছাকাছি লাইট-পোস্টটার নীচে অরুণ করের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। যে কাজের জন্য ব্যাঙ্কে এসেছিল সে কাজ আর হয় না। এত টাকা নিয়ে অরুণ কর কি করবে? আবার কি কেউ তাকে ব্ল্যাক-মেইলিং শুরু করল? প্রফেসার কালিদাস শর্মার মত আবার কোন শনিগ্রহ কি ওর কাঁধে ভর করল?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাদে অরুণ কর বোধ হয় টাকা নিয়েই ব্যাঙ্ক হতে বের হয়ে এল।

অরুণ কর এসেই একটা ট্যাক্সিতে উঠে ট্যাক্সিওয়ালাকে নিম্নস্বরে কি যেন নির্দেশ দিল।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল।

কিরীটীও কালবিলম্ব না করে নিজের গাড়িতে উঠে বসে বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখে গাড়ি চালাতে লাগল নিজেই। হীরা সিং পাশে বসে রইল।

বাস-ট্রামে এখনও অফিস-যাত্রীদের অসম্ভব ভিড়। বাদুড়ের মত বাস ও ট্রামের ফুটবোর্ডে ও রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে কোনমতে দিনগত পাপক্ষয় করতে চলেছে।

সমস্ত রাস্তাগুলোই যানবাহন ও লোকচলাচলে যেন গম্‌গম্‌ করছে। সর্বত্রই একটা যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ততা। খরপ্রবাহী জীবনধারা সহস্রমুখী। নানাবিধ শব্দের একটা একটানা কল্লোল।

গ্রে স্ট্রীটে বাড়ির সামনে গলিটার কাছাকাছি এসে অরুণ কর ট্যাক্সি হতে নেমে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গলির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

রাস্তায় গাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কিরীটী গাড়ি হতে নেমে গলির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই একজন ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল, কাকে চান বাবু?

লোকটা নতুন নিযুক্ত হয়েছে।

অরুণবাবু আছেন?

হ্যাঁ।

তাঁকে একটু খবর দাও, বল কিরীটীবাবু দেখা করতে চান।

ভৃত্য দরজাটা খোলা রেখেই ভিতরের দিকে অদৃশ্য হল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ভৃত্য নয় স্বয়ং অরুণবাবুই ফিরে এল, এ কি কিরীটীবাবু! আসুন আসুন! কি সৌভাগ্য আমার!

সজ্জিত বৈঠখখানায় দুজনে এসে প্রবেশ করল। অরুণ করের নির্দেশে কিরীটী একটা চেয়ারের ওপর উপবেশন করল।

চা আনতে বলি কিরীটীবাবু?

না, এত বেলাতে আর চা থাক, আপনি বসুন অরুণবাবু, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

অরুণ কর উপবেশন করল সামনেরই একটা সোফায়।

কিরীটী ইতিপূর্বে অরুণকে অনুসরণ করে গাড়ি চালাতে চালাতেই মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল কথাটা ঠিক কিভাবে কোথা হতে শুরু করবে।

একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করে মৃদু একটা টান দিয়ে কিরীটী তার বক্তব্য পেশ করলে, অরুণবাবু, আপনি আবার অনাবশ্যক পথের বিপদকে ঘরে ডেকে আনছেন!

বিস্ময়ভরা সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকাল অরুণ কর কিরীটীর মুখের দিকে।

আপনি যে ঠিক কি বলতে চাইছেন কিরীটীবাবু—

একবার শুভঙ্কর মিত্রের সঙ্গে মেলামেশা করে এই কিছুদিন আগে বিশ্রীভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, আবার—

কি বলছেন মিঃ রায়?

আপনি জানেন অরুণবাবু ডাঃ সান্যাল কোথায়?

তীক্ষ্ণ সোজা প্রশ্ন।

অতর্কিত প্রশ্নটা যেন অরুণ করকে সোজা এসে একেবারে বিদ্ধ করেছে। করের মুখের সমস্ত রক্ত যেন কে শুষে নিয়েছে। সমস্ত মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করেছে।

দুই চক্ষুর বিহ্বল বোবা-দৃষ্টি—ওষ্ঠের অতি মৃদু কম্পনটুকুও কিরীটীর দৃষ্টিকে এড়ায় না। বাণবিদ্ধ পক্ষীর মত একটা অসহায় যন্ত্রণা যেন অরুণ করের চোখে-মুখে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিরীটী বলে, ময়াল সাপের চাইতেও ভয়ঙ্কর ডাঃ সান্যালের প্রকৃতি। মনুষ্যত্ব বলতে লোকটার আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। ওর গ্রাসে একবার পড়লে আর রক্ষা থাকবে না, ক্রমে ক্রমে আপনাকে ও সম্পূর্ণভাবে উদরস্থ করবে, তারপর ধীরে ধীরে উদরস্থিত ভয়ঙ্কর বিষাক্ত জারকরসে জীর্ণ করে ফেলবে!

শেষের দিকে কিরীটীর কণ্ঠস্বর যেন আবেগে ও উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

সহসা অরুণ কর দু হাতে মুখ ঢেকে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে।

আমি বুঝতে পারছি অরুণবাবু, আপনি সেই শয়তানের আবেষ্টনীর মধ্যে ধরা পড়েছেন!

আমাকে বাঁচান কিরীটীবাবু, আমাকে বাঁচান। আর্ত-করুণকণ্ঠে অরুণ কর যেন একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

আপনি আমাকে সব খুলে বলুন মিঃ কর। আপনি জানেন, তার বিরুদ্ধে তিন-চারটে খুনের অভিযোগ ঝুলছে? পুলিসের লোক তাকে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে?

কিন্তু সে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে আমি বিশ্বাসভঙ্গ করেছি, সে নিশ্চয়ই আমাকে হত্যা করবে! গলা টিপে হত্যা করবে!

সে দায়িত্ব আমার। আমার ওপর আপনি বিশ্বাস রাখুন—সব ব্যবস্থা আমি করব। সব কথা আমাকে খুলে বলুন।

সে তো এক ঠিকানায় থাকে না, তিন-চারটে তার ঠিকানা। কখন সে কোন্ ঠিকানায় থাকে তাও সঠিক কেউ বলতে পারে না, তবে—বলতে বলতে সহসা অরুণ কর চুপ করে যায়।

বলুন!

আজ সন্ধ্যায় তার সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা আছে।

কি রকম? কিরীটী উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

অরুণ কর সংক্ষেপে সমস্ত কথা তখন কিরীটীকে বলতে শুরু করে।

দিন কুড়ি আগে হঠাৎ একদিন রাত্রে, আমি বিছানায় শুয়ে আছি, কালো ভ্রমর এসে আমার ঘরে ঢুকল।

॥ ৯ ॥

সে রাত্রের স্মৃতিটা অরুণ করের মানসপটে এখনও জ্বলজ্বল করছে।

জীবনে সে-রাত্রের কথা কখনও কি সে ভুলতে পারবে?

কালিদাস শর্মার নৃশংস মৃত্যুর পর হতেই মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল। ঘটনাটা শুধু আকস্মিকই নয় অরুণ করের পক্ষে, তার সমগ্র স্নায়ুতে এতবড় আঘাত হেনেছিল যে মনের মধ্যে অরুণ কর যেন একটা নির্ভরযোগ্য সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিল না। মনের যখন এরূপ অবস্থা, অন্তর্দ্বন্দ্বে সমস্ত মনটা প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে, দিনের বেলায় তো নয়ই, রাত্রেও নিদ্রা চোখে আসতে চায় না, রাতের পর রাত বিনিদ্র কেটে যাচ্ছে, ডাঃ সান্যাল এসে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল।

শয্যার ওপর শুয়ে কক্ষের মৃদু আলোয় অরুণ কর চিন্তিত বিনিদ্র নিশিযাপন করছিল, কালো ভ্রমরের কক্ষমধ্যে প্রবেশ আদপেই টের পায়নি।

অরুণবাবু?

কালো ভ্রমরের মৃদু আহ্বানে সচকিতে শয্যার ওপর উঠে বসল অরুণ কর।

স্বল্পালোকে সমগ্র কক্ষখানি জুড়ে একটা আবছা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে,

বাইরে শীতের রাত্রি ঘন অন্ধকার ও শৈত্যে যেন পাথরের মত জমাট বেঁধে আছে নিঃশব্দতায়।

বিহ্বল হতচকিত অরুণ কর। দু-চোখে আর্ত বিহ্বল অসহায় দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

চিনতে পারছেন না আমাকে?

আপনি, মানে—

ডাঃ সান্যাল! কালো ভ্রমর।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। ঘটনা-পরিস্থিতি যেন শ্বাসরোধ করতে চায়।

ভয়ের কোন কারণ নেই আপনার অরুণবাবু। কারণ শত্রুভাবে আপনার গৃহে এখন আমি আসিনি, বরং আপনার সাহায্যের প্রার্থী হয়েই এসেছি। তাছাড়া একদিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে আমি আপনার বন্ধুও তো বটে।

বন্ধু? এতক্ষণে ক্ষীণকণ্ঠে অরুণ কর প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, বন্ধু। ছদ্মবেশী শুভঙ্কর বা শুভঙ্কর মিত্র-বেশী শয়তান স্যার দিগেন্দ্রকে হত্যা করে ও ব্ল্যাক-মেইলার প্রফেসার কালিদাস শর্মাকে হত্যা করে আপনার জীবন আমিই নিষ্কণ্টক করেছি। সেদিক দিয়েও আমার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত নয় কি? কিন্তু থাক সেসব কথা। তাদের হত্যা করবার মধ্যে স্বার্থ ষোল আনা আমারও ছিল, কারণ তারা আমার অহিত করবারই চেষ্টা করেছিল। আমি যে সাহায্যের প্রার্থী হয়ে আপনার কাছে এসেছি সেটা এমন কিছুই কঠিন নয়, আপনার পক্ষে অত্যন্ত সহজ।

কি আপনার প্রার্থনা জানতে পারি কি?

সামান্য বিনিময়। কিছুকাল এখন আমাকে একান্ত বাধ্য হয়েই অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। এবং সে সময় আমার অর্থের প্রয়োজন, আর আপনি অনুগ্রহ করে সেই অর্থের যোগান দেবেন।

অর্থের যোগান দেব আমি?

হ্যাঁ, বললাম তো বিনিময়ে। আমি আপনাকে জুয়েলস দেব আর তার বিনিময়ে মূল্য হিসেবে আপনি আমাকে টাকা দেবেন। কেমন রাজী আছেন তো?

না, ডাঃ সান্যাল—দেখুন, ব্যাপারটা বড় রিস্কি!

রিস্কি তা একটু বৈকি।

এরপর উভয় পক্ষ হতেই নানা যুক্তি ও তর্কের অবতারণা; শেষ পর্যন্ত ডাঃ সান্যাল বেশ যেন একটু রুক্ষকণ্ঠেই জবাব দেয়, দেখুন অরুণবাবু, আমাকে আপনি বেশ ভাল ভাবেই চেনবার সুযোগ পেয়েছেন। বন্ধুভাবে আমাকে না গ্রহণ করতে পারলে আপনার দুর্ভাগ্যের সীমা থাকবে না জানবেন। একবার আমার শত্রু হিসাবে যদি দাঁড়ান, দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই আমার এই দুটো হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারে। এই শেষবার আপনাকে আমি বলছি, আমার ভিতরের শয়তানকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আপনার অনিবার্য সর্বনাশকে ডেকে আনবেন না! বলুন আপনি, আমার শত্রুতাই চান, না বন্ধুত্ব চান?

শেষের দিকে কালো ভ্রমরের কণ্ঠস্বরে এমন একটা অনিবার্য ভয়ঙ্কর সঙ্কেত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিজের অজ্ঞাতেই অরুণ করের বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

বলুন, কালো ভ্রমরকে শত্রু হিসাবে চান, না মিত্র হিসাবে চান? আজ আমার প্রার্থনা

যদি আপনি পূরণ করেন—জীবনে এমন একজন অন্তত আপনার রইল যে তার জীবন দিয়েও প্রয়োজন হলে আপনার তার কাছে আজকের এ ঋণ পরিশোধ করবে।

কিছুক্ষণ অরুণ কর কি যেন ভাবে, তারপর মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, বেশ আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী আছি ডাঃ সান্যাল, কবে আপনার টাকা চাই বলুন?

কাল এমনি সময় আসব, হাজার পাঁচেক হলেই আপাতত চলবে।

আসবেন।

ধন্যবাদ, তবে এবারে আমি চলি অরুণবাবু। দরজার খিলটা খুলে বাইরে পা বাড়াতে উদ্যত ডাঃ সান্যাল হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, হ্যাঁ, আর একটা কথা অরুণবাবু, আজকের এ চুক্তি মৌখিক হলেও সম্পূর্ণ আপনার ও আমার মধ্যে থাকল এবং ঘুণাক্ষরেও তৃতীয় কোন প্রাণীর যেন কর্ণগোচর না হয়। যদি হয়, জানবেন এমন শাস্তি আমি দেব, যা আপনি আপনার বাকী জীবন দিয়ে শোধ করবেন। আচ্ছা Good Night।

সমস্ত ঘটনাটা অরুণ করের মুখে শুনে কিরীটী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আপনমনে কি যেন ভাবে; তারপর বললে, আমার কাজের মধ্যে আপনাকে আমি জড়াব না অরুণবাবু। কারণ কালো ভ্রমরকে আমি খুব ভাল ভাবেই চিনি। বাক্যাড়ম্বর বা আস্ফালন সে বৃথা করে না। কেবল আজ আপনার কোন্ ঠিকানায় রাত্রে কালো ভ্রমরের সঙ্গে দেখা করবার কথা এইটুকুই বলে দিন।

আপনি কি সেই বাড়ি raid করবেন নাকি কিরীটীবাবু?

অরুণ করের কণ্ঠস্বরের উদ্বেগ লক্ষ্য করে মৃদু হাস্যে কিরীটী শান্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়, ভয় নেই অরুণবাবু, আপনার কাজ আপনি করে যান, আমার কাজ আমি করব। আপনার যে সময় যেখানে টাকা নিয়ে যাবার কথা আপনি যাবেন, আমি মাত্র ঠিকানাটিই চাই।

অরুণ কর এরপর আর আপত্তি না করে কালো ভ্রমরের ঠিকানাটা বলে দেয়।

কিরীটীও ঠিকানাটা পেয়ে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রস্থান করে।

॥ ১০ ॥

রাত্রি ঠিক দশটার মধ্যে অরুণ করের টাকা নিয়ে আসবার কথা, অথচ এখনও তার দেখা নেই, রাত্রি পৌনে এগারোটা বাজল!

তবে কি অরুণ কর টাকার যোগাড় করতে পারেনি? না পারলেও তো তার সংবাদ দেওয়ার কথা!

রাত্রি ঠিক বারোটায় রওনা না হতে পারলে বর্ধমান পৌঁছনো ও গাড়িটার একটা ব্যবস্থা অন্ধকার থাকতে থাকতেই করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

অকারণ একটা উদ্বেগ মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। পদবিক্ষেপ একটু চঞ্চল ও দ্রুত হয়ে ওঠে যেন। অরুণ কর শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো!

না, এতদূর সাহস তার হবে না। কালো ভ্রমরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার মত দুঃসাহস তার হবে না, তার বুকের পাটা এতখানি হবে না।

কিন্তু এখনও সে আসছেই না বা কেন?

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। দ্রুত পদবিক্ষেপে কে যেন সিঁড়ি অতিক্রম করে উপরে উঠে আসছে।

উৎকর্ণ হয়ে ওঠে কালো ভ্রমর। কক্ষের ভেজানো দরজাটার দিকে তাকায় অধীর আগ্রহে। দরজার গায়ে মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

আসুন, দরজা খোলাই আছে।

অরুণ কর কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করল। কালো রঙের একটা লংকোট পরিধানে, মাথায় একটা কালো উলের চওড়া মাফলার জড়ানো। দুটি হাত কোটের দুটো পকেটে প্রবিষ্ট।

তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল ডাঃ সান্যাল কক্ষে প্রবিষ্ট অরুণ করের মুখের দিকে।

অরুণ করের সমগ্র চোখে-মুখে একটা আশঙ্কা, একটা অসহায় ভীতি-বিহ্বলতার ভীরু প্রকাশ।

আসুন অরুণবাবু, এত দেরি হল যে!

হ্যাঁ, একটু দেরি হয়ে গেল। একটু থেমে থেমে ক্লান্ত স্বরে প্রত্যুত্তর দেয় অরুণ কর।

টাকা এনেছেন?

হ্যাঁ। বলতে বলতে ডান হাতটি পকেট হতে বের হয়ে এল। মুষ্টিমধ্যে ধৃত বেশ মোটা একটা নোটের বান্ডিল।

নোটের বান্ডিলটা এগিয়ে দিতে দিতে অরুণ কর বলে, দশ-টাকার নোট সব হল না। পাঁচ হাজার আছে দশটাকার নোট, বাকী সব একশত টাকার নোট।

অরুণ করের প্রসারিত হস্ত হতে নোটের বান্ডিলটা নিয়ে ডাঃ সান্যাল বললে, পাননি যখন, এতেই আপাতত কাজ চালাতে হবে।

নোটের বান্ডিলটা লংকোটের ভিতরকার পকেটে রেখে, অন্য একটা পকেট হতে ছোট একটা রুমালে বাঁধা পুঁটলি বের করলে ডাক্তার এবং বললে, এর মধ্যে বারোটা ছোট সাইজের হীরা আছে। আসল দাম এর কুড়ি-বাইশ হাজারের কম নয়।

এগিয়ে দিল পুঁটলিটা অরুণ করের দিকে ডাক্তার।

ডাক্তারও যেমন নোটগুলি গণনা করে দেখলে না, সোজা পকেটের মধ্যে রেখে দিল, অরুণ করও তেমনি হীরাগুলো না দেখে যাচাই না করে পুঁটলিসমেতই পকেটের মধ্যে রেখে দিল।

আচ্ছা এবারে আপনি আসতে পারেন অরুণবাবু!

ডাক্তারের কথাগুলো যেন অমোঘ ও কঠোর নির্দেশের মতই উচ্চারিত হল।

বিনা বাক্যব্যয়ে অরুণ কর কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

বাঘ যেমন শিকারের গন্ধ পায়, ডাক্তারও অরুণ করের আজকের ব্যবহারে ও বাক্যে যেন কেমন একটা গন্ধ পেয়েছে। সমস্ত মনটাই তার যেন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। অকারণ একটা অস্বোয়াস্তিতে সমস্ত মনটাই কেমন যেন ছমছম করছে।

হাতঘড়ির দিকে ডাক্তার তাকিয়ে দেখল রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটা।

রামুকে ডাক্তার ডাকতে যাবে, সহসা এমন সময় মনে হল যেন একটা অতি সতর্ক পদশব্দ ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠে আসছে।

ডাক্তার ঠিক সতর্ক হয়ে ওঠবার আগেই ভেজানো দরজাটা সহসা খুলে গেল এবং খোলা দরজার ওপরে দেখা দিল দীর্ঘকায় একটি মনুষ্যমূর্তি।

নমস্কার ডাঃ সান্যাল!

আসুন আসুন মিঃ রায়। আশ্চর্য, এই মুহূর্তে ঠিক আপনাকে না হলেও এই রকমই একটা কিছু হবে মন যেন বলছিল!

বিচিত্র একটা হাসির রেখা ডাক্তারের দৃঢ় প্রসারিত ওষ্ঠপ্রান্তে মেঘাবৃত্ত আকাশে বিদ্যুৎচমকের মতই জেগে উঠে যেন মিলিয়ে গেল।

কিরীটী আরও এগিয়ে কক্ষমধ্যে এসে দাঁড়াল।

অরুণ কর তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনারই শরণাপন্ন হলেন! বেশ বেশ!

অরুণ কর? তার সঙ্গে আমার এই মুহূর্তে এখানে আসবার কোন যোগাযোগ নেই, এই কথাটা বিশ্বাস করুন ডাক্তার সান্যাল।

কিরীটীবাবু, দুটো ধারালো ইস্পাতের তলোয়ার যখন পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করে—

বিশ্বাস করবেন না আপনি জানি, তবু বলছি অরুণ কর—

মিথ্যা উপন্যাস রচনা করছেন কিরীটীবাবু, কালো ভ্রমরের খরচের খাতায় কালির দাগ যখন পড়েছে তখন সেটা আর মুছে যাবে না, কিন্তু যাক্‌গে সেসব কথা, এখন বলুন এখানে হঠাৎ এ সময় আপনার আগমনের হেতুটা কি শুনি?

হেতু?

আজ্ঞে!

ইস্পাতের তলোয়ার কি ইস্পাতের তৈরী তলোয়ারকে স্পর্শ করেনি?

ডাক্তার সান্যাল স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলে, তারপর সহসা দৃষ্টি তুলে তাকাল কিরীটীর দিকে। এবং মৃদু কঠিন কণ্ঠে বললে, তাহলে আপনি আমাকে ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছেন বলুন?

বলাটাই কি বাহুল্য নয় ডাক্তার?

বাহুল্য সত্যি কিনা জানি না, তবে একটা ব্যাপার এমন আশ্চর্য ঠেকছে মিঃ রায় যে, বলতে আমারও সঙ্কোচ বোধ করা উচিত! ঠিক এই সময়টিতে এই অকারণ কোলাহল ও বিপর্যয়টা আমি আশা করিনি। একটা বোঝাপড়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে একান্তভাবেই হওয়া প্রয়োজন, যদিও কোন সম্ভাবনাই আপাতত তার দেখছি না।

ডাক্তার, সমস্ত বাড়িটাই পুলিসে ঘেরাও করেছে এবং প্রত্যেকেই সশস্ত্র ও অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে আছে। আপনার লক্ষ্যভেদের কথাটা যেমন আমার অবিদিত নেই, আমারটাও নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই আশা করি। আর যাই হোক সেবারের মত কেলেঙ্কারি এবারে যে আমি হতে দেব না, এটা নিশ্চয়ই আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির বুঝতে কষ্ট হবে না।

ডাঃ সান্যালের ওষ্ঠপ্রান্তে আবার বিচিত্র হাসি জেগে উঠল পূর্বের মতই। ডাক্তারের ওষ্ঠপ্রান্ত হতে সেই হাসির রেখাটা মুছে যাবার আগেই ডাক্তারের কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গোক্তিতে

প্রকাশ পেল, এত রাত্রে আপনি যখন কষ্ট করে এসেছেন তখন প্রস্তুত হয়েই যে এসেছেন সেটা বুঝতে পেরেছি বৈকি! অবান্তর কথা ছেড়ে একটা কথা আপনাকে আমি বলতে চাই মিঃ রায়!

বলুন?

আপনি কি খগোল বিদ্যা জানেন?

খগোল?

হ্যাঁ, জ্যোতিষীবিদ্যার একটা শাখা। যার সাহায্যে নির্ভুলভাবে আকাশে কটি নক্ষত্র অনায়াসেই গণনা না করেও বলা যেতে পারে। বিক্রমাদিত্যের সভাজ্যোতিষী পণ্ডিত বরাহ তাঁর পুত্রবধূ খনার নিকট হতে ঐ খগোল বিদ্যার সাহায্যেই জেনেছিলেন বিনা গণনায় আকাশের কয়টি নক্ষত্র—

কালো ভ্রমরের মুখের কথা শেষ হল না, সহসা অস্ফুট একটা শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে কালো ভ্রমর যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঘরের সেইখানকার মেঝে দু-ফাঁক হয়ে যেন চক্ষের পলকে কালো ভ্রমরকে গ্রাস করলে।

কেবল একটা অস্পষ্ট হাসির শব্দ শোনা গেল।

কিরীটী এক লাফ দিয়ে সামনে এসে যেখানে দাঁড়াল, সেখানে মেঝেতে একটা কালো অন্ধকার গহ্বর কেবল মুখব্যাদান করে আছে।

এবারেও কালো ভ্রমর কিরীটীকে ফাঁকি দিয়ে অদৃশ্য হল!

রোমাঞ্চকর অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি!

কিরীটী পকেট হতে টর্চ বের করে বোতাম টিপল, তীব্র অনুসন্ধানী একটা আলোর রশ্মি অন্ধকার গহ্বরটাকে দৃষ্টির সামনে কেবল উদ্ঘাটিত করলে।

নিরালম্ব শূন্য গহ্বর একটা। আলো ফেলে ফেলে কোন কিছুই কিরীটীর দৃষ্টিগোচর হল না।

হতভম্ব কিরীটী নিঃশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে মাত্র।

ঝুপ করে দাঁড়ানো অবস্থাতেই সোজা ডাঃ সান্যাল নীচের কক্ষের মেঝেতে এসে পড়ল।

মেঝেতে মাটি কোপানো থাকায় এবং পতনের কৌশলে তার শরীরের কোথাও এতটুকু আঘাত লাগেনি।

টালিগঞ্জে মার্বেল প্যালেসে কুমার দীপেন্দ্রনারায়ণের ছদ্মবেশে থাকাকালীন টালিগঞ্জের একপ্রান্তে পুরাতন এই দ্বিতল বাটীটিই ছিল ডাঃ সান্যালের গোপন আর একটি আশ্রয়।

অর্থব্যয় করে প্রয়োজনমত ডাঃ সান্যাল বাড়িটা সুসংস্কৃত করে নিয়েছিল কেবলমাত্র অন্দরের অংশটুকু। বাইরে থেকে কারো পক্ষে জানবার বা বুঝবারও উপায় ছিল না এ বাড়িতে লোকের যাতায়াত আছে বা থাকতে পারে। বহুদিনের পুরাতন পড়ো ভগ্ন একটি দ্বিতল বাটী বলেই জনসাধারণ জানত এবং কেউ কেউ বাড়িটাকে ভূতুড়ে ও হানাবাড়ি বলেও প্রকাশ করত। মার্বেল প্যালেস হতে পালিয়ে সেই রাত্রে সোজা ডাঃ সান্যাল এই বাড়িতেই এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

মার্বেল প্যালেসের নিকটবর্তী বললেও অত্যুক্তি হয় না ঐ বাড়িটা।

বাড়িটার পশ্চাৎভাগে একটা আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতির বাগান, দীর্ঘদিনের অব্যবহারে ও সংস্কারের অভাবে ঘনজঙ্গল ও আগাছায় আকীর্ণ ও অগম্য।

বাগানটার পরেই একটা শ্যাওলা কচুরিপানাভর্তি পচা পুকুর। তারপর গ্রাম্য সরু পায়ে-চলা রাস্তা।

বাগানের ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আত্মগোপন করে নিঃশব্দে ডাঃ সান্যাল বাড়ি হতে বের হয়ে সেই সরু পায়ে-চলা কাঁচা সড়কের ওপর এসে দাঁড়াল এবং ক্ষণমাত্রও বিলম্ব না করে সেই অন্ধকার পথ ধরে দৌড়তে লাগল। ভবিষ্যৎ ভেবে আগে হতেই প্রত্যেক ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা অভ্যাস, আজকের রাত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বাড়ি হতে অনেকটা দূরে রাস্তার ওপর একটা বড় গাছের নীচে অন্ধকারে রামুকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিল আগে হতেই।

কিরীটী যখন সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে সন্ধানী আলোর সাহায্যে সমস্ত বাড়িটা ও পশ্চাতে বাগান ও আশপাশ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে ফিরছে, ডাঃ সান্যালের গাড়ি তখন জোরালো হেডলাইটা জ্বালিয়ে চল্লিশ মাইল বেগে বড়রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে। শেষ মুহূর্তে কিরীটী এসে তার প্ল্যানে বাধা দেবে এতটা কিছুক্ষণ আগেও ভাবেনি ডাঃ সান্যাল।

কিন্তু একটা ব্যাপার ডাঃ সান্যালের মনে কেমন যেন একটা বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। অরুণ করই কিরীটী রায়কে সংবাদ দিয়েছে সত্য, কিন্তু সংবাদই যদি কিরীটী রায়কে অরুণ কর দিল, তবে টাকা নিয়ে এল কেন?

নাঃ এও একটা কিরীটী রায়েরই চাল!

যাই হোক, আপাতত কিরীটী রায়ের নাগালের বাইরে সে।

আজ না হলেও একদিন একটা শেষ বোঝাপড়া কিরীটী রায়ের সঙ্গে আছেই।

বার বার তিনবার। একবার রেঙ্গুনে মিয়াংয়ে মৃত্যুগুহায়। দ্বিতীয়বার মার্বেল প্যালেসে। আর এই তৃতীয়বার হানাবড়িতে।

ডাঃ সান্যাল অ্যাকসিলারেটারে পায়ের একটু বেশী চাপ দিল, গাড়ির গতি দ্রুত হল।

॥ ১১ ॥

ডিহিরিঅনশোন ও মোগলসরাইয়ের মধ্যবর্তী ইউ. পি-র ছোট্ট একটি রেলওয়ে স্টেশন। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়া কোন ডাকগাড়ি এখানে দিনে-রাত্রে কখনও থামে না।

গ্রেনাইট্ পাথরের তৈরী ছোট স্টেশন-ঘরটি। পাথরে বাঁধানো লাল কাঁকর ছড়ানো। দু পাশে উঁচু প্ল্যাট্ফরম। স্টেশনের আশেপাশে দু-একটি মাটির ঘর ছাড়া লোকজনের বসতি বড় একটা চোখে পড়ে না। তবে স্টেশন হতে রশিটাক পথ দূরে খানকতক পাকা দালান চোখে পড়ে বটে। কাঁচা মাটির ধূলিকীর্ণ অপ্রশস্ত সড়ক।

সড়কের দক্ষিণ দিকে অড়হর ও কলাইয়ের ক্ষেত, শীতের শস্য। সাদা আর বেগুনী ফুলের অফুরন্ত সৌন্দর্যসমারোহ দিনের আলোয় চোখের দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ করে।

শীতের মধ্যরাত্রি। কনকনে হাড়-কাঁপানো শীত ছুঁচ বেঁধার মতই যন্ত্রণাদায়ক।

ঝিম্ ঝিম্ করছে চারিদিকে শীতরাত্রির জমাটবাঁধা কালো অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তর হতে হাড়কাঁপানো হিমকণাবাহী উত্তরে বায়ু বয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগে যে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি মোগলসরাইয়ের দিকে চলে গেল সেই ট্রেনেরই একমেবাদ্বিতীয়ম্ যাত্রীটি স্টেশন-মাস্টারের হাতে টিকিটটি কোনমতে গুঁজে দিয়ে উঁচু প্ল্যাট্‌ফরম অতিক্রম করে স্টেশনের লোহার গেট পার হয়ে বাইরের কাঁচা সড়কের উপরে এসে দাঁড়াল।

যাত্রীর পরিধানে গরম কালো সার্জের সুট—তার উপরে একটি নেভি-ব্লু রঙের মোটা লং কোট। কোটের কলারটা ঘাড়ের কাছে উল্টে দেওয়া। মাথায় একটা কালো উলের মাংকি ক্যাপ, কেবল মুখের সম্মুখভাগটি দৃষ্টিগোচর হয়। দুটি হাত লংকোটের দু পাশের পকেটের মধ্যে প্রবিষ্ট। কাঁধের উপর একটা হ্যাভারসাক ঝুলছে।

যাত্রী কাঁচা সড়ক ধরে ধীরে মন্থর পদে ইতস্তত অন্ধকারে দৃষ্টিপাত করতে করতে এগিয়ে চলে।

দূরবর্তী প্রান্তরে কুয়াশার একটা ঝাপসা যবনিকা যেন ঘন হয়ে ঝুলছে।

হিমেল রাত্রির জমাট স্তব্ধতাকে দীর্ণ করে কোথায় কোন দূরে গ্রামপ্রান্তে একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়। ডাকটা দীর্ঘায়ত হতে হতে ক্রমে অন্ধকার প্রান্তরের শূন্যতায় যেন হারিয়ে গেল।

যাত্রী এগিয়ে চলে।

একটা ক্ষীণ টুংটাং ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে। অন্ধকার রাত্রির শীতের কুয়াশার সমুদ্র পার হয়ে একটা সংকেত যেন মৃদু ক্ষীণভাবে ভেসে আসছে দূর—বহুদূর হতে।

টুং টাং টুং টুং।...

যাত্রী তার শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ করে রাস্তার উপরে দাঁড়াল।

ঘণ্টাধ্বনিটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমে। একটা টাঙ্গা আসছে এইদিকে, তারই ঘোড়ার গলার ঘণ্টাধ্বনি। ক্রমে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দ।

কদমে ঘোড়াটা ছুটে আসছে, ছোটার তালে তালে গলায় দোদুল্যমান ঘণ্টাটা বাজছে যেন তালে তালে টুং টাং টুং!...

তারপর দেখা গেল দুটো আলোর আভাস অন্ধকারের বুকে। টাঙ্গার দু পাশের আলো।

যাত্রী সড়কের একপাশে সরে দাঁড়াল।

সহসা জোরালো একটা টর্চের আলো সামনের অন্ধকারকে ভেদ করে সামনের দিকে পরিব্যাপ্ত হল ও আলোর রশ্মিটা চারপাশে একবার ঘুরতেই যাত্রীর উপরে পতিত হয়ে স্থির হল।

টাঙ্গা আরও এগিয়ে এল, আলোটা নিভে গিয়েছে।

টাঙ্গাটা একেবারে যাত্রীর নিকটে এসে দাঁড়াল।

টাঙ্গাচালক টাঙ্গা হতে রাস্তায় লাফিয়ে নামল।

কিধার যানা সাব?—টাঙ্গাচালক পরিষ্কার হিন্দীতে প্রশ্ন করে।

মিশান কুঠী—যাত্রী প্রত্যুত্তর দেয়।

আইয়ে সাব্। টাঙ্গাপর বৈঠিয়ে।

যাত্রী টাঙ্গার উপরে উঠে বসল।

টাঙ্গা ঘুরিয়ে লোকটা টাঙ্গা চালিয়ে দিল।

টাঙ্গা অন্ধকারে ছুটে চলল তার গন্তব্যস্থানের দিকে এবারে।

কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি স্তব্ধ নিঃসঙ্গ।

ঘোড়ার গলার দোদুল্যমান ঘণ্টাধ্বনি একটানা শব্দ-তরঙ্গ তুলে চলেছে টুং টাং টুং!...অতলান্ত নিঃসীম অন্ধকারের বক্ষে যেন একটানা একটা হৃদয়স্পন্দন।

দ্রুত-ধাবমান টাঙ্গার চক্রের ঘর্ষণে কাঁচা ধুলো উড়ছে, একটা ধুলোর গন্ধ নাকে আসছে।

কেয়া, তোমারা নাম কি?

মিশনমে সবকোই হামে মিশিরজী বোলতা হ্যায় সাব।

আচ্ছা মিশিরজী, মিশন-কোঠি কেতনা দূর হোগা?

থোড়া দূর হ্যায় সাব।

দীর্ঘ সোয়া এক ঘণ্টা দ্রুত একটানা চলবার পর টাঙ্গা এসে প্রাচীরবেষ্ঠিত একটি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করল।

নাতিপ্রশস্ত লাল সুরকি ছড়ানো পথ, দুপাশে অজস্র পাতাবাহার ও শীতের মরসুমী ফুলের নয়নাভিরাম সমারোহ আবছা অন্ধকারেও বুঝতে কষ্ট হয় না।

টাঙ্গা সেই পথ ধরে একটা টানা রেলিং দেওয়া খোলা বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রথমে মিশিরজী টাঙ্গা হতে অবতরণ করে পরে যাত্রীকে মৃদু আহ্বান জানায়: উতারিয়ে সাব্। এহি কোঠি।

যাত্রী মিশিরজীর আহ্বানে টাঙ্গা হতে অবতরণ করে।

মিশিরজী বারান্দায় উঠে দরজার গায়ে একটা দড়ির প্রান্ত ধরে গোটা দুই টান দেয়। বাটীর অভ্যন্তরে কোথায় ঘণ্টাধ্বনি ওঠে।

অল্পক্ষণ পরেই বন্ধ দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার উপরেই দাঁড়িয়ে রেভারেণ্ড চ্যাটার্জী, হাতে তাঁর একটি লণ্ঠন।

রেভারেন্ড চ্যাটার্জী যাত্রীকে দরজার একপাশে দণ্ডায়মান দেখে আহ্বান জানালেন, আসুন!

যাত্রী কক্ষমধ্যে পা বাড়ায়।

আপনার জিনিসপত্র মিঃ সান্যাল?

মিশনে বাকী জীবনটা অতিবাহিত করতে এলাম, অতীতকে কেন আর আঁকড়ে থাকি, পিছনের যা কিছু পিছনেই ফেলে এসেছি—

আমাকে সকলেই এখানে রেভারেন্ড চ্যাটার্জী বলেই ডাকেন।

আগে আগে রেভারেন্ড চ্যাটার্জী ও পশ্চাতে সান্যাল তাঁকে অনুসরণ করে।

ফাদার জোন্সের ঘরেই আমরা যাচ্ছি—রেভারেন্ড চ্যাটার্জী বললেন।

ফাদার জোন্স! এত রাত্রে তিনি আমার অপেক্ষায় জেগে আছেন নাকি? বিস্মিত সান্যাল প্রশ্ন না করে পারে না।

তিনি অসুস্থ দীর্ঘদিন ধরে। রাত্রে অনেকদিন থেকেই তাঁর সুনিদ্রা হয় না। তাছাড়া আজ আপনার আসবার কথা, তিনি পূর্বাহ্নেই বলে রেখেছেন আমাকে, আপনি যখনি আসেন সর্বপ্রথমে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখা করাতে।

ও, বেশ চলুন!

টানা বারান্দার শেষে একটি বাঁধানো প্রশস্ত আঙ্গিনা।

আঙ্গিনা অতিক্রম করে উভয়ে এসে দ্বিতীয় বারান্দায় উঠলেন, সেই বারান্দারই শেষপ্রান্তে একটি বন্ধ কাচের দরজার ওপাশ হতে ঈষৎ আলোর আভাস পাওয়া গেল।

দুজনে এসে বন্ধ কাচের দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

কাচের দরজার ওদিকে ভারী একটি পর্দা ঝুলছে, পর্দার পাশ দিয়েই প্রজ্বলিত আলোকধারা হতে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল।

কাচের দরজার গায়ে মৃদু শব্দ করতেই সঙ্গেসঙ্গেই প্রায় দরজাটা খুলে গেল।

দরজাটা খুলে দিয়েছেন সিস্টার রিটা।

সান্যাল রেভারেন্ড চ্যাটার্জীকে অনুসরণ করে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করলে।

প্রশস্ত কক্ষখানি।

মেঝেতে পুরু কার্পেট বিস্তৃত।

ঘরে প্রবেশের সঙ্গেসঙ্গেই সান্যালের নজরে পড়ে, দক্ষিণ-কোণে একটি নেয়ারের খাটের উপরে দু-তিনটি উপাধান উঁচু করে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় আছেন এক বৃদ্ধ। আবক্ষলম্বিত শ্বেত-শুভ্র দাড়ি। বক্ষ পর্যন্ত একটি লাল কম্বলে আবৃত।

খাটের পাশেই একটি ত্রিকোণাকার টেবিলের উপরে একটি শ্বেতপাথরের তৈরী ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের মূর্তি কাঠের ফ্রেমে সংযুক্ত। তার পাশে একটি সুদৃশ্য টাইম-পিস ও একটি পুষ্পাধারে কয়েকটি ঘোর রক্তবর্ণের প্রস্ফুটিত গোলাপ। ঘড়ির সামনেই একটি ধূপাধার—ধূপাধারে জ্বলছে তখনও কয়েকটি সুগন্ধী ধূপকাঠি। ধূপাধারের পাশে চামড়ায় বাঁধানো একটি ছোট্ট বই—বোধ হয় বাইবেল।

কক্ষের অন্য কোণে একটি কাঠের আলমারি। আলমারির একপাশে একটি লোহার সিন্দুক ও অন্যপাশে একটি পুস্তকের সেলফ।

জানলাগুলো বন্ধ এবং প্রত্যেকটি জানলাতেই সুদৃশ্য সবুজ রংয়ের পর্দা খাটানো।

শিয়রের কাছেই একটি উঁচু ত্রিপয়ের উপরে সুদৃশ্য ডোমে ঢাকা একটি প্রজ্বলিত বাতিদান। বাতির আলো খানিকটা শায়িত বৃদ্ধের রুগ্ণ-ক্লিষ্ট মুখের একাংশে ছড়িয়ে পড়েছে। কক্ষে প্রবেশের সঙ্গেসঙ্গেই বৃদ্ধ ফাদার জোন্স ক্লান্তস্বরে মৃদু প্রশ্ন করলেন, কে?

প্রত্যুত্তর দিলেন রেভারেন্ড চ্যাটার্জীই, মিঃ সান্যাল এসেছেন।

আসুন মিঃ সান্যাল! ফাদার জোন্স সাগ্রহ আহ্বান জানালেন।

॥ ১২ ॥

সান্যাল ধীরপদে গেল রুগ্‌ণ ফাদার জোন্সের শয্যার দিকে।

সিস্টার রিটা একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলেন ফাদার জোন্সের শয্যার পাশে এবং সান্যালকে উপবেশন করতে অনুরোধ জানালেন।

বসুন, মিঃ সান্যাল।

সান্যাল চেয়ারের উপরে উপবেশন করল।

স্নিগ্ধ ধূপের সৌরভ ও গোলাপের ঘন মিষ্টি সুবাস কক্ষের বায়ুতে যেন মিশিয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে। সমগ্র কক্ষখানি জুড়ে শুচি-স্নিগ্ধ শান্ত নিঃশব্দ একটি গম্ভীর পরিবেশ।

চ্যাটার্জীর সঙ্গে আপনার নিশ্চয়ই আলাপ হয়েছে, আর একজনও আছেন—কাল তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হবে, আর ইনি সিস্টার রিটা...সকলে মিশনে সিস্টার বলেই ওঁকে ডাকে। মিশনের ইনিই যত অনাথ সর্বহারাদের মা ভগ্নী।

সান্যাল একবার চোখ ফিরিয়ে তাকাল সামনেই দণ্ডায়মান সিস্টার রিটার দিকে।

শুভ্রবেশ পরিহিতা সিস্টার রিটা একটু নীচু হয়ে জোন্সের উপাধানটা একটু গুছিয়ে দিতে ব্যস্ত।

আপনার নিশ্চয়ই আহারাদি হয়নি! সন্তোষ?

বলুন ফাদার! সন্তোষ চ্যাটার্জী এগিয়ে আসেন, কিন্তু সান্যাল বাধা দেন, না—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। এত রাত্রে আমি আর কিছু খাব না।

তা কি হয়? পথশ্রমের ক্লান্তি—সিস্টার, মিঃ সান্যালকে এক কাপ কোকো বা কফি অন্তত করে এনে দাও।

সিস্টার রিটা আদেশপালনের জন্য তখনই চলে গেলেন।

কফি-পানের পর চ্যাটার্জী ও সিস্টারকে কক্ষ হতে কিছুক্ষণের জন্য বিদায় দিয়ে ফাদার জোন্স সান্যালকে বলছিলেন, আপনি এসে পৌঁছেছেন, আর আমার কোন চিন্তা নেই মিঃ সান্যাল। ঈশ্বর-প্রেরিত আপনি। আপনার পত্র পাঠ করেই আমি বুঝেছিলাম আপনার হৃদয় আছে। সজ্জন আপনি। মৃত্যু আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে, তবু আমার মনে শান্তি ছিল না! জীবনপাত করে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরের সাধনায় যে মিশনটি গড়ে তুলেছি, আমার অসুস্থতায় বার্ধক্যে ও অর্থাভাবে আজ তা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেত যদি না আপনার স্নেহদৃষ্টি অকস্মাৎ এর উপর বর্ষিত হত। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। পরমপিতা যীশু নিশ্চয়ই আপনাকে আপনার মহত্ত্ব ও সৎকার্যের জন্য পুরস্কৃত করবেন।

আপনি আমার সত্যকারের পরিচয় তো জানেন না ফাদার। আমার নিজস্ব এমন কোনও মহত্ত্ব বা গুণ নেই যার জন্য আমার সামান্য প্রশংসাও প্রাপ্য। শুধু আপনি আশীর্বাদ করুন যেন বাকী জীবনটা আপনার আরব্ধ মহতী প্রচেষ্টাকে আমার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

ভগবান যীশুই আপনার ন্যায় মহানুভবকে আশীর্বাদ দেবেন। আমি কে? সামান্য সেবক মাত্র তাঁর।

আপনি এখন আর বেশী কথা বলবেন না ফাদার জোন্স। অসুস্থ ক্লান্ত আপনি।

মৃদু অনুরোধ করে সান্যাল।

আমার আর খুব বেশি দেরি নেই। যা বলাবার এখুনি আমাকে বলতে হবে মিঃ সান্যাল। শুধু আপনার এখানে এসে পৌঁছবার অপেক্ষাতেই বেঁচে ছিলাম। এখন যদি আপনাকে সব কথা না বলি আর সময় পাব না। এ আশ্রমে যেসব ছেলেমেয়েরা আছে সবই অসহায় অনাথ, নাম-গোত্র-পরিচয়-বংশ-মর্যাদাহীন। ত্রিসংসারে এদের কেউ নেই। আপনার বলতে কেউ নেই। আমার অবর্তমানে আপনি এদের ভার নিন।

আমার মত অতি সামান্য একজন লোকের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যভার নেওয়া —তাছাড়া আমি এখানে এসেছি মিশনের একজন হয়ে থাকবার জন্যই, মিশনের কর্তৃত্বভার নিতে তো নয় ফাদার!

তা জানি। তবু এই অনুরোধটুকু আপনাকে নিজমুখে জানাবার জন্যই যে প্রাণ ধরে আছি এখনও আমি মিঃ সান্যাল!

কিন্তু—

বাইরে থেকে কেউ একটি কপর্দকও আজকাল আর সাহায্য করেন না। আমার সঞ্চিত অর্থ যা ছিল সব শেষ হয়ে গিয়েছে। মিশনের ক্ষেতের ফসল, হ্যান্ডলুম কাপড় ও অন্যান্য হাতে তৈরী শিল্পবস্তু বিক্রি করে কায়ক্লেশে গত কয়েক মাস ধরে কোনমতে মিশন চলছে। যুদ্ধের বাজারে প্রত্যেক জিনিসই অগ্নিমূল্য—ঐ সামান্য আয়ে আর এখন চলছেই না। আপনাকে এ ভার নিতেই হবে মিঃ সান্যাল।

কিন্তু আমি কি পারব? অবশ্য আমি আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও একে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করব।

আমি তা জানি। আপনি ঈশ্বর যীশু-প্রেরিত।

বার বার ও-কথা বলে আর আমায় লজ্জা দেবেন না ফাদার। অতি সাধারণ সামান্য লোক আমি। শুধু তাই নয়, আমার মত পাপী এ জগতে খুবই কম আছে—

পাপী আপনি মিঃ সান্যাল! পাপ আপনাকে স্পর্শও করতে পারে না। যে অগ্নি আপনার অন্তরে আছে কোন পাপই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তাছাড়া পাপী এ সংসারে কে নয় বলুন? নিষ্পাপ পবিত্র কে?

না—না, আপনি জানেন না ফাদার, আমি—আমার সত্যকারের পরিচয়!

মানুষের পরিচয় মানুষ। অন্য কোন পরিচয় তার থাকতে পারে না! কাপড়ে খানিকটা ধুলো-বালি লাগলেই কাপড়টা একেবার নষ্ট, অব্যবহার্য হয়ে যায় না। তার সে মালিন্য ক্ষণস্থায়ী—সাবান দিয়ে ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। যাক্ সে কথা—ঐ ড্রয়ারের মধ্যে আমার উইল ও মিশনের যাবতীয় ইতিহাস একটা ফাইলের মধ্যে লেখা আছে, কাল দিনের বেলা কোন এক সময়ে অবসরমত পড়ে নেবেন। ওতেই আমার বক্তব্য পাবেন। বলতে বলতে ক্লান্ত ফাদার জোন্স একটু থামলেন।

অনেকক্ষণ কথা বলে সত্যিই পরিশ্রান্ত বোধ করছিলেন ফাদার জোন্স।

দুটি চক্ষু মুদ্রিত করে কিয়ৎকাল স্তব্ধ হয়ে রইলেন ফাদার।

কক্ষের মধ্যে একটা শান্ত স্তব্ধতা, কক্ষের বাতাসে মৃদু গোলাপ ও ধূপের স্নিগ্ধ

ভাসমান সৌরভ। ত্রি-কোণাকার টেবিলের উপরে টাইমপিসটা একঘেয়ে টিকটিক শব্দ জাগিয়ে চলেছে মন্থর ক্লান্ত সুরে।

মনের মধ্যে সহসা যেন অদ্ভুত একটা ভয় এসে জুড়ে বসেছে।

কালো কালো অসংখ্য বাহু যেন ধারালো নখর বিস্তার করে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করতে চায়। ফিস ফিস চাপাকণ্ঠে কিসের সতর্ক বাণী যেন উচ্চারিত হচ্ছে।

কে? কারা?

সভয়ে সান্যাল ঘরের চতুষ্পার্শ্বে ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকায়।

কই—কেউ তো কোথাও নেই!

টুং টুং! টুং টুং!...

টাইমপিস রাত্রি পাঁচটার সংকেত-ধ্বনি জানাতে শুরু করল।

ফাদার জোন্স চক্ষু মেলে তাকালেন, মিঃ সান্যাল, পূবের জানলাটা একটু খুলে দেবেন দয়া করে?

সান্যাল তাড়াতাড়ি উঠে পূবের জানলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা দু পাশে টেনে দিয়ে ছিটকানি খুলে জানলার কবাট দুটো খুলে দিল।

তরল শিশির-ভেজা রাত্রিশেষের অন্ধকার থির থির করে যেন কাঁপছে সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে। এক ঝলক রাত্রিশেষের ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে এসে যেন শীতল একটা মৃদু ঝাপটা দিয়ে গেল।

রাত্রিশেষের সন্ধিক্ষণে স্বল্প আলো-ছায়ায় কিসের যেন অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত।

সান্যাল ফিরে এল ফাদার জোন্সের শয্যাপার্শ্বে, মৃদুকণ্ঠে ডাকল, ফাদার জোন্স!

নিমীলিত দুটি চক্ষু ফাদার জোন্সের, কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সান্যাল আবার ডাকল, ফাদার জোন্স?

কোন সাড়া নেই। চক্ষুর পাতা দুটি তেমনি বোজা। সন্দিগ্ধচিত্তে সান্যাল আরও একটু এগিয়ে শয্যায় শায়িত ফাদার জোন্সের দিকে ঝুঁকে পড়ল—কোন সাড়া নেই।

নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে না।

এবারে হাতের নাড়ী পরীক্ষা করতেই সান্যালের আর বুঝতে বাকী রইল না—সব শেষ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যু ইতিমধ্যে এসে তার শেষ কাজটুকু করে গিয়েছে।

ক্ষণকাল স্তম্ভিত শ্রদ্ধায় ফাদার জোন্সের মৃত শান্ত মুদ্রিতনেত্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে সান্যাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর এগিয়ে গিয়ে যেমন ঘরের দরজা খুলে সিস্টারকে ডাকতে যাবে দরজার গোড়াতেই দেখলে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে সিস্টার, হাতের মুঠোর মধ্যে এক গোছা সদ্য প্রস্ফুটিত শ্বেত-গোলাপ।

ফাদার এইমাত্র মারা গেলেন। কোনমতে কথা কটি সান্যাল উচ্চারণ করলে।

চকিতে সিস্টার সান্যালের মুখের দিকে তাকালেন।

সংবাদটা আকস্মিক না হলেও কেমন যেন বিমূঢ় করে দিয়েছে সিস্টারকে। সিস্টার মাথা নীচু করলেন এবং নিঃশব্দে অবনত মস্তকে কক্ষমধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

সান্যাল স্তব্ধ হয়ে দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইল।

তরল অন্ধকারের বুকে ধীরে ধীরে ভোরের আলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে আসছে। তিমির রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ের অত্যাসন্ন আভাস।

টানা বারান্দা-পথে ধীরে ধীরে সান্যাল অগ্রসর হয় শূন্যমনে। সমস্ত মনটাই সহসা যেন শূন্য রিক্ত হয়ে গিয়েছে। নিরালম্ব শূন্যতা যেন ওকে গ্রাস করতে উদ্যত।

বহুকণ্ঠের অস্পষ্ট কলগুঞ্জন কানে এল, থমকে দাঁড়ায় সান্যাল।

সামনেই অর্ধমুক্ত একটা দ্বারপথে গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসছে—বহু বালক-বালিকা ও কিশোরীর কণ্ঠ।

মিশনের বালক-বালিকারা সব জেগে উঠেছে। তাদের প্রার্থনার সময় সমাগত।

কতকটা কৌতূহলভরেই সান্যাল দ্বারপথে গিয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল। নানাবয়েসী ছেলেমেয়ে সকলেই শয্যাত্যাগ করে যে যার পোশাক পরতে ব্যস্ত।

প্রকাণ্ড হলঘরের মত ঘরটি—প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন নানাবয়েসী বালক-বালিকা।

সহসা এক কোণে হলঘরে নজর পড়তেই সান্যাল দেখলে, বছর নয়-দশেক একটি মেয়ে শয্যার ওপর বসে দু হাতে চোখ ঢেকে কাঁদছে।

সকলেই শয্যা ত্যাগ করেছে, কেবল এই বালিকাটিই তখনও শয্যা ত্যাগ করেনি। শয্যার উপরে বসে মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছে।

এগিয়ে যায় সান্যাল ক্রন্দনরতা শয্যাপরি উপবিষ্টা বালিকার দিকে।

সহসা এমন সময় ঘরের দু-একজনের অপরিচিত সান্যালের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই কৌতূহলভরে সান্যালের দিকে এগিয়ে এল।

বালিকাটি অত্যন্ত কৃশ। গায়ের রং ঘনশ্যাম। একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল স্কন্ধে বক্ষে ও পৃষ্ঠোপরি ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

গায়ে একটি হাতকাটা রঙিন খদ্দরের পেনি।

সান্যাল এগিয়ে এসে ক্রন্দনরতা বালিকার পৃষ্ঠে হাত রাখল, স্নিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করলে, কাঁদছ কেন খুকী? কি হয়েছে?

একটি বারো-তেরো বছরের কিশোরী এগিয়ে এল, বললে, ঘুম থেকে উঠে সিস্টারকে দেখেনি কিনা, তাই কাঁদছে। ভারী কাঁদুনে ও।

আর একজন বললে, নতুন এসেছে কিনা মিশনে, তাই কেবলই কাঁদে।

ছিঃ, কাঁদে না! কি হয়েছে তোমার বল তো?

আবার সান্যাল বালিকাটিকে প্রশ্ন করলে।

বালিকাটি মুখ থেকে হাত সরাল, হাতের পাতা দিয়ে অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি মুছে নিল। বোধ হয় একটু লজ্জা পেয়েছে, বললে, না, আমি কাঁদিনি তো!

না, কাঁদবে কেন? তোমার নাম কি খুকী?

টুকুন। বালিকা জবাব দিল।

টুকুন? সুন্দর নাম! সান্যাল মৃদু হেসে বলে।

পূর্বের সেই কিশোরীটি এবারে বললে, জামা পরে তৈরী হয়ে নাও টুকুন, প্রার্থনার সময় হয়েছে।

এখন বুঝি তোমরা সব প্রার্থনা করতে যাবে? সান্যাল কিশোরীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ।

চোদ্দ-পনেরো বৎসরের একটি কিশোর এমন সময় এগিয়ে এসে সান্যালকে প্রশ্ন করে, আপনি কে?

আমি?

সান্যাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের মুখের দিকে।

উনি মিঃ সান্যাল। আজ হতে উনিই এই মিশনের ভার নিলেন।

সহসা সিস্টারের কণ্ঠস্বরে সকলে ফিরে তাকাল পিছনদিকে।

কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে সিস্টার দাঁড়িয়ে।

পরিধানে শুভ্র গাউন, গলায় ও হাতে কালো রিবনের শোকচিহ্ন।

খোলা জানলাপথে প্রথম ভোরের সূর্যালোক এসে প্রবেশ করেছে।

অত্যন্ত দুঃখের একটা সংবাদ তোমাদের দিচ্ছি, কিছুক্ষণ আগে ফাদার জোন্স পরলোকগত হয়েছেন। এস সকলে প্রার্থনা-মন্দিরে তাঁর স্বর্গত আত্মার শান্তির জন্য আমরা পরমপিতার চরণে মিলিত প্রার্থনা নিবেদন করব।

করুণ বেদনায় ভরা সিস্টারের কথাগুলি যেন সকলকেই বিষণ্ণ করে দিল কিছুক্ষণের জন্য।

সান্যাল অবাক হয়ে গিয়েছিল একজন ইউরোপীয় মহিলার কণ্ঠে পরিষ্কার সুন্দর উচ্চারণে বাংলা কথা শুনে।

॥ ১৩ ॥

আরো দশ দিন অতিবহিত হয়ে গিয়েছে। সান্যাল একটু একটু করে মিশনের যাবতীয় কার্যভার নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে।

স্বর্গত ফাদার জোন্সের শেষের কথাগুলিই তাকে যেন বলে দিয়েছে, জীবনের পথে নতুন আলোর সন্ধান এনে দিয়েছে। অন্তরের মধ্যে একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে চলার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু মনকে এখনো সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেনি সান্যাল।

দীর্ঘদিনের আচার, নীতি, সংস্কার আজকের এই নবজীবনের যাত্রাপথে যেন অদৃশ্য বন্ধন সৃষ্টি করে চলেছে। পবিত্র এই মিশনের মধ্যে মনে হচ্ছে যেন এটা তার অনধিকার প্রবেশ। নেই—কোন অধিকার নেই তার এই পবিত্র তীর্থভূমিতে। দীর্ঘদিন-সঞ্চিত পাপ ও গ্লানি নিশিদিন যেন তাকে পীড়ন করছে।

নিঃশব্দে একাকী সান্যাল উদ্যানের মধ্যে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির শেষ আলোটুকুও প্রায় নিভে এল। সন্ধ্যার আসন্ন ছায়া নেমে আসছে ধীরে ধীরে আকাশ ও মাটির বুকে।

নেমে আসছে শীত-রাত্রির হিমেল কালো অন্ধকার।

বালক-বালিকারা খেলাধূলা শেষ করে পাঠগৃহে গিয়েছে। এবারে শুরু হবে তাদের অধ্যয়ন।

সহসা অতি নিকটে পশ্চাতে মৃদু পদশব্দ শুনে সান্যাল ফিরে তাকাল, সিস্টার রিটা।

আমাকে আপনি ডেকেছিলেন মিঃ সান্যাল?

হ্যাঁ সিস্টার, কয়েকটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে এখানেও বলতে পারি—

আপত্তি কি, বলুন?

তবে চলুন ঐ পাথরের বেঞ্চটার ওপরে গিয়ে বসা যাক্।

চলুন—

দুজনে এসে সামান্য ব্যবধানে কালো পাথরের তৈরী বেঞ্চটার ওপরে উপবেশন করে।

আসন্ন শীত-সন্ধ্যার ম্লান আলোয় চারিদিক বিষণ্ন করুণ মনে হয়।

ফাদার জোন্সের ডাইরীই বলুন বা উইলই বলুন, পড়ে দেখে আজ কদিন ধরেই ভাবছিলাম, আপনার সঙ্গে একটা আলোচনা করা আমার একান্ত প্রয়োজন সিস্টার। সামান্য কয়েকখানা পত্রালাপের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অজানা ও অপরিচিত আমাকে তিনি যে এতখানি বিশ্বাস ও স্নেহ কি করে দিলেন, আজও পর্যন্ত সেটা আমার কাছে যেন মস্ত বড় একটা প্রহেলিকাই থেকে গিয়েছে।

ফাদার জোন্স ভুল করতে পারেন না মিঃ সান্যাল। তিনি আপনার সম্পর্কে যে ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, উচিত বিবেচনাই করে গিয়েছেন, এতে আর যারই হোক আমার মনে কোথাও এতটুকু দ্বিধা বা সংশয়ই নেই। তাঁর উইলই বলুন বা ডাইরীই বলুন, কি তার মধ্যে লেখা আছে জানি না এবং জানবার কোন স্পৃহাও নেই, মৌখিক যে নির্দেশ তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছেন, এ মিশন ও তার সমুদয় দায়িত্বভার আপনার উপর দিয়ে আমায় তিনি বলে গিয়েছেন, সর্বভাবে এর পরিচালনার ও বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আপনাকে সাহায্য করতে।

আমার মত সামান্য ও অতি সাধারণ একজন লোকের পক্ষে সত্যিই এ গুরুভার যদিও তাঁর আদেশ ও আশীর্বাদ শিরোধার্য করেই আমি নিয়েছি। তবে আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, ফাদার জোন্সের অসুস্থকালীন সময়ে মিশন যেভাবে চলছিল তেমনই চলুক। রেভারেন্ড চ্যাটার্জী বহিঃপরিচালনার দিকটা যেমন দেখছিলেন তেমনি দেখুন, আর আপনি আভ্যন্তরিক পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব নিন। আমি শুধু আপনাদের পাশে থাকব। সাধ্যমত অর্থসাহায্য করব, গায়ের শ্রম দিয়েও সাহায্য আমার যথাসাধ্য করব। এর বেশি আমাকে দায়িত্ব দেবেন না।

এ কথা কেন বলছেন মিঃ সান্যাল? আপনার কোন অসুবিধা—

না না, সেরকম কোন অসুবিধাই আমার দিক থেকে নেই—এটা সম্পূর্ণ একটা আমার ব্যক্তিগত নির্দেশ আমার মনের দিক থেকে—

আপনার কথা ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না মিঃ সান্যাল!

একদিন আপনাকে সব বলব। আর কেউ না জানুক আমি তো জানি, ফাদার যে দায়িত্ব একান্ত বিশ্বাস ও স্নেহে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সে স্নেহ বা বিশ্বাসের

কোন যোগ্যতাই আমার নেই সিস্টার। আমি চেয়েছিলাম আমার যা অর্থ আছে সমস্ত ফাদারের হাতে তুলে দিয়ে মিশনের সেবায় আমার বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে যাব, তার চাইতে বেশি কিছু নয়। কিন্তু—একটা দীর্ঘশ্বাস সান্যালের বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে এল।

অধ্যয়নের ক্লাসের ঘণ্টাধ্বনি বাজতে শুরু করল—ঢং ঢং।

ক্লাস বসবে, এবারে আমি যাই। সিস্টার রিটা উঠে দাঁড়লেন।

আসুন।

সিস্টার রিটা সন্ধ্যার ছায়াঘন অন্ধকারে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ ১৪ ॥

পিঠের ক্ষতটা ক্রমে চিকিৎসায় শুকিয়ে গেল বটে, কিন্তু শরীরটা চট্টরাজের সারছিল না। বৃদ্ধ বয়সে ইদানীং স্বাস্থ্য চট্টরাজের ভাল যাচ্ছিল না। ঐ আঘাতে শরীরটা যেন দ্রুত ভেঙে পড়তে লাগল।

চিকিৎসকের দল সুচিতাকে পরামর্শ দিলেন চট্টরাজকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য কোথায়ও কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়ে বায়ু-পরিবর্তন করে আসতে।

সুচিতা বললে, তাই চল মামা। কিছুদিন কোথায়ও গিয়ে ঘুরে আসি।

চট্টরাজ বাধা তুললেন, তা হয় না মা, তোর পড়ার ক্ষতি হবে।

তা হোক, পরীক্ষা না হয় এক বৎসর পিছিয়েই দেব। তোমার শরীরটা যদি বায়ু-পরিবর্তনে সারে—

ওরা যতই বলুক মা, আমিও তো একজন ডাক্তার, দেহের এ ভাঙন আর ভরাট হবার নয়।

অমন কথা বলো না মামা। সুচিতার চক্ষু দুটি অশ্রুতে আকীর্ণ হয়ে ওঠে, বলে, এ সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বল তো?

পাগলী! ঐ দেখ অমনি চোখে জল এসে গেল! মামা কি তোর চিরদিন বেঁচে থাকবে রে? যা দেখি বাইরে গিয়ে খানিকটা ঘুরে আয় তো। এক মাস এই যে আমার সঙ্গে ঘরের মধ্যে বন্ধ আছিস, আয়নাতে একবার দেখিস, কি চেহারা হয়েছে!

মামার যেমন কথা! কোথায় আমার শরীর খারাপ হয়েছে?

না, বেশ আছিস! এখন যা দেখি, বাইরে থেকে খানিকটা ঘুরে আয় তো খোলা হাওয়ায়, না হয় সিনেমায় যা।

সে হবে'খন। আমার জন্যে তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা বাজল। সুচিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, যাই তোমার সুপটা নিয়ে আসি, তোমার সুপ খাবার সময় এখন।

সুচিতা কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ভাগিনেয়ীর গমনপথের দিকে চেয়ে থাকেন চট্টরাজ।

আপনি সেরাত্রে আমার প্রতি যে কৃপা প্রদর্শন করেছেন, একজন খুনী পলাতককে

যে অনুকম্পা দিয়েছেন তার তুলনা নেই। ধন্যবাদ জানিয়ে আপনার মহত্ত্বকে খাটো করব না। চিরদিন আমি ডাকাত খুনী ও শয়তান ছিলাম না দেবী, আমারই দুর্ভাগ্যে আমার জীবন-মন্থনে যে গরল উঠেছিল, সেই গরলই আজ আমার রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে ছড়িয়ে গিয়ে আমাকে শয়তান, খুনী, নৃশংস করে তুলেছে।

মানুষের সমাজে মানুষের পাশেই আমি ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মানুষই আমাকে দিলে না সমাজে ঘর বাঁধতে। শয়তানী ও লোভের আগুনে আমার মনুষ্যত্বের সমাধি রচনা করে তারা আমায় সমাজ হতে বাইরে টেনে এনে ফেললে। মানুষ হল ভূত! মনুষ্যত্ব হল নির্বাসিত! স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম স্বার্থের আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হল। যাক সে সব অতীতের কথা, আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস একান্ত সে আমারই। আমার কলঙ্ক, আমার ব্যর্থতা, আমার পতন সে একান্ত আমারই নির্মম নিয়তির অনুশাসন।

আশা করি এতদিনে আপনার মামা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

আমার প্রার্থনার আজ আর কোন মূল্য নেই, প্রার্থনা জানাই সেই মঙ্গলময়ের চরণে, তিনি অচিরে সুস্থ হয়ে উঠুন।

বার বার তৃতীয়বার সুচিতা ডাঃ সান্যালের কাছ থেকে আজকের ডাকে পাওয়া পত্রখানা পড়ছিল।

ডাঃ সান্যাল তাকে পত্রখানা লিখেছেন।

কম বিস্মিত হয়নি সুচিতা ডাঃ সান্যালের নিকট হতে ঐ পত্রখানা পেয়ে।

দীর্ঘ প্রায় বারো পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র এবং চমৎকার ইংরেজীতে লেখা। ঝরঝরে পরিষ্কার হস্তাক্ষর মুক্তার সারির মত। পত্রের বাক্যবিন্যাস ও রচনার কৌশল যাই হোক, সমগ্র পত্রখানির মধ্যে এমন একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি আছে যা দ্বিতীয় রাত্রে ডাঃ সান্যালের অকস্মাৎ দর্শনের মত সুচিতার মনকে যেন প্রবল একটা দোলা দিয়েছে।

সে রাত্রের পর সুচিতা ডাঃ সান্যালের চিন্তা বহু চেষ্টা করেও মন থেকে একেবারে সরিয়ে দিতে বা মুছে ফেলতে পারেনি।

অন্তরের পূর্বের সমস্ত রাগ বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে ছাপিয়ে যেন একটা অনুভূতি ধূপের সুরভির মত অন্তরকে সংশয়-সুরভিত করে রেখেছে। যদিচ এর কোন যুক্তি বা সমর্থন মনের কোথাও খুঁজে পায়নি সুচিতা আজ পর্যন্ত, তথাপি একেবারে নিঃসংশয়ে এ থেকে মুক্তিও বুঝি খুঁজে পায়নি। এও সে বুঝতে পারে না, যে তার পরম প্রিয়জনের জীবন-হানি করতে তীক্ষ্ণ ছোরা হেনেছিল, তাকে কেমন করেই বা সে ক্ষমা করতে পারলে!

ক্ষমা? তা বৈ কি! সত্যই কি সে সেই ভয়ঙ্কর দস্যু খুনীকে ক্ষমা করেছে, না এও তার মনের সংশয়-বিভ্রম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সুচিতা আবার পত্রের অন্য অংশে মনঃসংযোগ করে।

কেন যে আপনাকে এই পত্র লিখছি দেবী তা নিজেই আমি জানি না। হয়তো এ পত্র পেয়ে আপনি পড়বেনও না, ঘৃণায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে রাস্তায় ফেলে দেবেন। তবু আজ জীবনের অন্য এক প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে—বর্তমানের শুচিস্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশের

মধ্যে অকস্মাৎ এসে পড়ে মনে হচ্ছে, এই যদি জীবনের আমার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, তবে কেন বিধাতা আমায় নরকের পথে ঠেলে দিয়েছিলেন!

ভাববেন হয়তো শয়তানের এ শ্মশান-বৈরাগ্য! তা নয়, বিশ্বাস করুন, সত্যই দীর্ঘদিন ধরে নরক ঘেঁটে ঘেঁটে সহসা এক আলোর দেশে এসে পা ফেলেছি। এত আলো যে চোখ ঝলসে যাচ্ছে। মুক্তি আমার মিলবে কিনা জানি না, তবে বাকী জীবনটা মুক্তির সন্ধানেই কাটাব—; দেখি ভাগ্যের শেষ পৃষ্ঠাগুলিতে কি লেখা আছে!

আজকের এই আনন্দের দিনে সর্বপ্রথম যাদের নাম আমার মনে পড়ল, তাদের পাশে কেমন করে যে আপনার নামটিও লেখা আছে দেখতে পেলাম, এখনও বুঝতে পারছি না! কিরীটীবাবু ও সুব্রতবাবু—তাঁদের প্রথমে না জানিয়ে সর্বাগ্রে কেন যে আপনাকেই জানাতে বসেছি এখনও দুর্বোধ্য ঠেকছে! হয়তো এমনও হতে পারে, শঙ্কা ও ক্লান্তিকে জয় করবার মত মনের বল এখনো আমি পাইনি। সাধনাসাপেক্ষ। তাঁদেরও জানাব নইলে সবটাই যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তবে কবে এখনো তা বলতে পারছি না। জানাব এটা ঠিক এবং স্থিরনিশ্চিত। তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শক্তির রেষারেষি, কিন্তু আপনার সঙ্গে যা কিছু সেটা অপরিমিত ঘৃণা, সত্যি বলেছি কিনা বলুন?

সুচিতা আর পড়তে পারে না। চিঠির লেখাগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসে। চিঠিটা ভাঁজ করে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে খেলা জানলার সামনে এসে দাঁড়াল সুচিতা।

সুদীর্ঘ কটা বছরের জীবনে ঠিক মনের মধ্যে এতাদৃশ রেখাপাত আর বুঝি কেউ করতে পারেনি। সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনধারা আপন খেয়াল-খুশিতে বয়ে চলেছিল। আবর্ত বা তরঙ্গ-বিক্ষোভ যা কিছু জেগেছে, জলের দাগ জলেই মিলিয়ে গিয়েছে, কোন রেখাই ফেলেনি।

কিন্তু কিছুদিন হতে সুচিতা যেন ভিতরে ভিতরে সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠেছে। একটা ভয়, একটা ভীরু আশঙ্কা যেন সর্বক্ষণ তার মনের মধ্যে আবর্ত রচনা করে চলেছে। মনের এই ভাবকে বিশ্লেষণ করবার তার ক্ষমতা তো নেই-ই, সাহসও নেই।

যে ছায়া তার সমস্ত মন জুড়ে পড়েছে, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও সে এড়িয়ে যেতে পারছে না। জানে ও ভাল করেই সে ছায়া কার!

মসৃণ মনোদর্পণে প্রতিফলিত ছায়া বিশ্লেষণের প্রয়োজন রাখে না।

অবিসংবাদিত সত্য যা তা রূঢ় ও কঠিন।

মিশনে নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে নিদ্রাহীন রাত্রিজাগরণে কাটে সান্যালেরও।

বিলাত হতে অধ্যয়ন শেষ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আগে পর্যন্ত জীবনটা বাঁধা ছিল এক স্বপ্নের আশা ও আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু দেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা-পরিস্থিতি সমস্ত জীবনের ধারাটাকে সহসা যেন ভিন্ন দুর্গম এক পথে প্রবাহিত করে দিল।

আবর্তের পর আবর্ত রচনা করে খরবেগে বয়ে চলল। দু পাশের তটকে ভেঙে-চুরে তছনছ করে সে এক উদ্দাম খরবেগ। দেহের শোণিতে এল এক প্রতিহিংসার নেশা।

ছলে বলে কৌশলে প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থতা পালন করে টেনে নিয়ে চলেছিল তাকে কোন দুর্জ্ঞেয় অন্ধকারে।

পিছনপানে ফিরে তাকাবার অবকাশও ছিল না।

বিবেকের মৃত্যু আগেই ঘটেছিল, শুধু শব নিয়ে চলেছিল এতকাল একটা হিংস্র টানাটানি। মাঝে মাঝে দুর্দামতা পড়ত ঝিমিয়ে, মরফিয়ার চাবুক হেনে তাকে জাগাবার কি ব্যর্থ প্রয়াস!

আজ মানুষের হত্যার রক্তে কলঙ্কিত এ দুটি হাত!

দু হাতে ডাঃ সান্যাল মুখ ঢাকে।

মুক্তি নেই—মুক্তি নেই। পাপের নাগপাশ আজ রচনা করছে মৃত্যুবেষ্টনী।

বহুদিনের সঞ্চিত পাপের বিষ আজ সংক্রামক হয়ে সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়েছে বিষাক্ত ক্ষতের মত। তীব্র জ্বালা। অসহনীয় জ্বালা।

এই তীর্থভূমিতে আজ সে অনধিকার প্রবেশ করেছে।

এদের এই বিশ্বাস, ভালবাসা—এর ওপর কোন অধিকারই তার নেই।

চোর সে! খুনী সে! রক্তাক্ত তার হাত! দুষ্কৃতির পঙ্কে সর্বাঙ্গে তার পঙ্কিল! অস্পৃশ্য সে!

সিস্টার রিটা—পাশাপাশিই জেগে ওঠে আর একখানি মুখ, ডাঃ চট্টরাজের ভাগিনেয়ী সুচিতা দেবী। স্বর্গের দেবী।

ধু-ধু জীবনমরুর মধ্যে কেন এ অকস্মাৎ ওয়েসিস দেখা দিল!

যাযাবর বেদুইনের মত জীবনের দীর্ঘ পথ, যে পথে মরুপ্রান্তরে দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে স্বেচ্ছায় কাটিয়ে এল, কেন এ অবসাদ তার মনে আজ!

সত্যিই কি এ অবসাদ, না পলায়নবৃত্তি! না আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত হয়ে ক্ষণ-আত্মচেতনা!

সমস্ত মনের মধ্যে ঘুমের মত একটা জড়তা, ক্লান্ত অবসাদ। বুকের মধ্যে অবর্ণনীয় একটা দুঃসহ জ্বালা।

এতদিন তো সে সমাজের মধ্যে থেকে মুখোশ পরে কাটিয়েছে—আর শুধু অন্য একটা মুখোশ এঁটেছে মুখের উপরে। চোরের মুখোশ খুলে এঁটেছে সাধুর মুখোশ।

এতদিন কোন পীড়াই তো অনুভব করেনি, তবে আজ এ অসহ্য পীড়া কেন? কেন এ বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা নিরন্তর তাকে উন্মাদ করে তুলছে? কেন? কেন?

মিশনে সকলেই যে যার শয্যার ওপরে সুখনিদ্রাভূত।

নিরালা নিঃসাড় হিমেল রাত্রি।

একটা ঢোলা পায়জামা পরিধানে, গায়ে একটা গেরুয়া বর্ণের খদ্দরের ঝোলাহাতা পাঞ্জাবি, পায়ে ঘাসের চপ্পল। নিঃশব্দে নিঃসঙ্গে প্রশস্ত আঙ্গিনা অতিক্রম করে ডাঃ সান্যাল উপাসনা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

আশ্চর্য! থমকে দাঁড়াল ডাঃ সান্যাল উপাসনা ঘরের ঈষৎ উন্মুক্ত ভেজানো দরজার সামনে।

দুই কবাটের মধ্যবর্তী সামান্য ফাঁক দিয়ে আসছে ক্ষীণ আলোর আভাস।

এত রাত্রে উপাসনা ঘরে আলো!

একান্ত কৌতূহলে ঈষৎ উন্মুক্ত দরজার কবাট দুটো আরও ফাঁক করে উপাসনা কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখলে ডাঃ সান্যাল। উঁচু বেদীর উপরে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির নীচে মোমবাতির আধারে দু পাশে দুটি মোমবাতি জ্বলছে।

মোমবাতির নরম স্নিগ্ধ আলোয় বেদীর ঠিক সম্মুখেই বেঞ্চের ওপরে স্থির হয়ে বসে আছেন সিস্টার রিটা না? হ্যাঁ, তিনিই তো!

উপবিষ্ট ধ্যানগম্ভীর সিস্টারের সাদা গাউনের পশ্চাৎভাগটি দেখা যাচ্ছে মাত্র।

এত রাত্রে সিস্টার রিটা একাকিনী উপাসনা মন্দিরে!

আরও একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেই ডাঃ সান্যাল বুঝতে পারলে ডেস্কের উপরে একখানা বই রেখে গভীর মনোযোগসহকারে সিস্টার পাঠরতা।

বাহ্যজ্ঞানরহিত, ধ্যানগম্ভীর সিস্টার রিটা!

নিঃশব্দে দরজা খুলে ডাঃ সান্যাল কক্ষে প্রবেশ করলে। সিস্টার টেরও পেলেন না।

আরও একটু এগিয়ে গেল ডাঃ সান্যাল, তথাপি সিস্টার টের পেলেন না, অধ্যয়নের মধ্যে যেন ডুবে আছেন! আরো একটু এগিয়ে গেল ডাঃ সান্যাল, এতক্ষণে সিস্টারের অধ্যয়ন-নিরত মুখখানি দেখতে পেল।

মোমবাতির স্নিগ্ধ নরম আলো সিস্টারের শান্ত সুন্দর মুখখানির উপর এসে যেন স্বর্গীয় একটি আভা বিস্তার করেছে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সিস্টারের মুখের দিকে ডাঃ সান্যাল।

তারপর অনেকক্ষণ পরে নিঃশব্দে সামনের বেঞ্চের উপর উপবেশন করল।

ধীরে ধীরে দৃষ্টি ঘুরে গেল যীশুর মূর্তির দিকে।

ক্রুশবিদ্ধ যীশু। মানুষের পাপের বোঝা তুমি বহন করেছ হে মহাযোগী! শিরে ধারণ করেছ কণ্টক-মুকুট!

হস্তপদে লৌহশলাকার নিয়েছ বন্ধন। মানুষের অপরাধ, হে মহামানব, সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছ। আঘাতের বিনিময়ে তুমি দিয়েছ ক্ষমা।

মাথাটা নুয়ে আসে আপনা হতেই ডঃ সান্যালের, ন্যস্ত হল সামনের টেবিলের উপরে।

দু চক্ষুর মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। তীব্র জ্বালা। একবিন্দু অশ্রু কোথাও নেই। দু ফোঁটা অশ্রুও যদি ঝরে পড়ত, বুঝি শান্তি মিলত।

কতক্ষণ যে কেটে গিয়েছে স্তব্ধ ঐ সমাধির মধ্যে খেয়াল ছিল না ডাক্তারের, সহসা সিস্টার রিটার মৃদু সস্নেহ আহ্বানে চমকিত হয়ে মুখ তুলল ডাক্তার।

মিঃ সান্যাল!

ডাক্তারের দুই চক্ষুর দিকে তাকিয়ে সিস্টার যেন চমকে ওঠেন। রক্তবর্ণ দুটি চক্ষু।

শুধু রক্তবর্ণই নয়, যেন তীব্র আগুনের দুটি গোলক অগ্নিবর্ষণ করছে।

কি হয়েছে মিঃ সান্যাল? আপনি কি অসুস্থ?

কে? সিস্টার? না তো, ধন্যবাদ। আমি—আমি বেশ সুস্থই আছি।

কিন্তু এ কি, এই ভয়ঙ্কর শীতে আপনি সামান্য একটা সুতির জামামাত্র গায়ে দিয়ে এসেছেন! হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগবে—

ডাঃ সান্যালের একেবারে ওষ্ঠপ্রান্তে এসে যায় বুঝি কথাগুলো—ঠাণ্ডা লাগবে! সমস্ত শরীরে দিবারাত্র যে আগুন জ্বলছে বাইরের ঠাণ্ডা তার কাছে হার মানবে। কিন্তু কিছুই বললে না।

ডাঃ সান্যাল হাসল মাত্র।

আপনারও তো গায়ে কোন গরম বস্ত্র দেখছি না সিস্টার!

জীবনে প্রয়োজনের তো অন্ত নেই মিঃ সান্যাল। এবং তাকে যত বাড়াবেন ততই বেড়ে যাবে। যতটা বর্জন করা যায় ততই যে মঙ্গল। তাছাড়া আপনাদের হিন্দু বিধবা নারীদের যা দেখেছি, আত্মচেতনাকে বিলোপ করবার যে দুর্জয় একনিষ্ঠ সাধনা দেখেছি—

বাধা দিল ডাঃ সান্যাল, যদিও আমি হিন্দু ও বাঙালী, তথাপি হিন্দু বিধবাদের দেখবার তেমন সুযোগ বা সুবিধা বিশেষ কোন দিনই হয়নি, কিন্তু আপনি তো হিন্দু নারী নন! ইউরোপীয় মহিলা—

ভুল সেটা আপনার মিঃ সান্যাল। সত্যিকারের যারা নারী, যে দেশের যে সমাজেরই হোক না কেন, আত্মোপলব্ধি বা আত্মচেতনার পথ তাদের পৃথক নয়। রাস্তা সর্বত্রই এক। রাত্রি অনেক হয়েছে, এবার শোবেন চলুন।

চলুন। উপাসনা মন্দির হতে দুজনে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এল।

॥ ১৫ ॥

ডিহিরি-অন-শোনে চট্টরাজের বন্ধুর এক বাড়ি ছিল।

শেষ পর্যন্ত স্থির হল মাসখানেক সেখানেই ডাঃ চট্টরাজ গিয়ে থাকবেন। সঙ্গে যাবে সুচিতা আর পুরাতন ভৃত্য কমবাইন্ড-হ্যান্ড বৃন্দাবন।

সুচিতা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা শুরু করে দিল।

মামা বললেন, এটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না সুচি। পড়া না হয় সেখানেও চলতে পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস—

পড়াশুনা আমার ভাল হয়নি মামা। কিছুদিন থেকে ভাবছিলাম, আর একটা বছর পরেই পরীক্ষা দেব। ভগবান সুযোগ মিলিয়ে দিলেন।

দুষ্টুমি বুদ্ধি কি তোর কোনকালেই যাবে না সুচি! চট্টরাজ হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন।

জান তো মামা, স্বভাব যায় না মলে! চিরটাকাল দুষ্টুমি করে এখন শান্তশিষ্টটি বললেই কি আর সত্যিকারের সুবোধ শান্ত বালিকাটি হয়ে যাব! তুমি কিছু ভেবো না মামা, পরের বৎসর পরীক্ষা দিয়ে, দেখো নির্ঘাৎ ফার্স্ট ক্লাস নেব। All well that ends well!

এর পর আর চট্টরাজের কথা বলা চলল না।

ভাগ্নীটিকে তো তিনি ভাল করেই চেনেন, গোঁ যখন একবার ধরেছে, এর আর নড়ন-চড়ন হবে না।

দিন দুই পরে মামা-ভাগ্নী সত্যিসত্যিই একদিন এসে তুফান এক্সপ্রেসে চেপে বসলেন।

॥ ১৬॥

ক্রমে ক্রমে ডাঃ সান্যাল মিশনের মধ্য দিয়ে নতুন এক সমাজের সঙ্গে, নতুন এক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে লাগল।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সামর্থ্য তো ছিলই, আরও ছিল অর্থসঙ্গতি। সর্বোপরি মিশনের মত একটি সুপ্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তৃত্বের যোগাযোগ।

ইচ্ছে না থাকলেও আশপাশ হতে দশজন যেচে এসে আলাপ করে যেতে লাগল ডাঃ সান্যালের সঙ্গে এবং ক্রমে কাছাকাছি শহরগুলিতে তো বটেই, এমন কি মোগলসরাই, কাশী পর্যন্ত মিঃ সান্যালের নাম ছড়িয়ে পড়ল। এমন সাধু অমায়িক ও ধার্মিক লোক নাকি বড় একটা হয় না। দ্বিতীয় ফাদার জোন্স।

শক্তি বা দক্ষতা এমনিই ছাই দিয়ে চেপে রাখলেও, চিরদিন ছাইচাপা আগুনের মত থাকে না, একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়েই।

শহরের মিউনিসিপ্যালিটি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, স্কুলবোর্ড, হাসপাতাল, সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক ব্যাপারেই মিঃ সান্যালকে উপদেষ্টা ও কর্মী হিসাবে কাছে টেনে নিল সকলে।

পরিবেশ ও চতুর্দিক হতে নানাবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে একসময় কখন যে মিঃ সান্যালের মনের মধ্যে ক্রিয়া শুরু করেছে, তা সে টেরও পায়নি।

মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম ছিল না। মনের বা দেহের দিক দিয়ে এমন একটু অবসর-মুহূর্ত আসত না, যে সময়টা অন্তত সান্যাল আত্মচিন্তায় কাটাতে পারে।

দিবারাত্র দীর্ঘকাল ধরে একটা শয়তানীর নেশার মধ্য দিয়ে ছুটাছুটি করে মনটা একেবারে শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের মনের মধ্যে যে সহজাত ভালবাসা ও স্নেহের আদান-প্রদানের বৃত্তিটা, পরিচর্যার অভাবে সেটা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। তাই বোধ হয় প্রতিটি মুহূর্তে একটা নেশা বা উত্তেজনা না হলে, অবসন্ন বেদনাক্লিষ্ট হয়ে উঠত সান্যালের দেহ ও মন।

মরুভূমির মধ্যে প্রথম বারিসঞ্চন করলে টুকুন।

এই মিশনে পা দেবার সঙ্গেসঙ্গেই টুকুনের সেই অশ্রুআবিল বিশীর্ণ স্নেহভিক্ষু মুখখানি সান্যালের মধ্যে একটা দোলা জাগিয়েছিল।

মিশনের মধ্যে সবার চাইতে বয়সে ছোট, সবার চাইতে অসহায়।

প্রথম প্রথম অবসর-মুহূর্তটুকু যাপনের জন্যই সান্যাল টুকুনকে কাছে টেনে নিয়েছিল এবং ক্রমে আকর্ষণ হয়ে উঠল বন্ধন। বন্ধন দিল প্রীতি, প্রীতি দিল শান্তি। মিশনের নিয়ম নেই, তথাপি সান্যাল সকলের মত করিয়ে টুকুনকে একেবারে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে স্থান দিল।

অন্তরের একটা দিক যেমন সান্যালের বাইরের কর্মজগৎকে নিয়ে জড়িয়ে থেকে ব্যস্ত থাকত, অন্য একটা দিক তেমনি টুকুনকে নিয়ে ভরে থাকত।

জীবনের যে অন্ধকারটা তাকে গ্রাস করতে, ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, টুকুন যেন সেখানে নিয়ে এল হাতে করে ভীরু একটি প্রদীপ-শিখা।

টুকুনেরও সান্যালের ঘনিষ্ঠ সহচর্যে এসে অন্তরের মধ্যে যেন একটা দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল। দু হাতে সে সান্যালকে আপনার করে জড়িয়ে ধরল।

পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করে স্নেহ মৈত্রী ও ভালবাসার অপূর্ব একটি সম্পর্ক ও বন্ধন যেন গড়ে তুললে।

মাসপাঁচেক এখানে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

সান্যালের মনটা এখন অনেকটা শান্ত।

পার্শ্ববর্তী শহরের স্কুলবোর্ডের একটা মিটিং শেষ করে রাত্রি প্রায় এগারোটায় নিজেই টাঙ্গা চালিয়ে সান্যাল ফিরে এল।

পথে আসতে আসতে টুকুনের জন্য মনটা চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

ঘুমোবার আগে টুকুনের শয্যার শিয়রে বসে মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে গল্প না করলে টুকুনের ঘুম হয় না। ফিরতে এত রাত হয়ে গেল, টুকুন হয়তো ঘুমোয়নি।

মিশিরজীকে ডেকে টাঙ্গাটা তার হাতে ছেড়ে দিয়ে সোজা সান্যাল নিজের কক্ষে চলে এল। ফাদার জোন্সের ঘরটি যদিও সান্যালের প্রাপ্য, তথাপি সান্যাল সে ঘরটি অধিকার করেনি। পাশের ঘরটি বেছে নিয়েছে, যেটায় ফাদার জোন্সের নিজস্ব লাইব্রেরী ছিল। ভেজানো দরজাটা ঠেলে পর্দা তুলে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই শয্যার উপরে নিদ্রিত টুকুনের শিয়রে একটি চেয়ারের ওপর অধ্যয়নরত ও উপবিষ্ট সিস্টার রিটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

সিস্টার রিটা পদশব্দে বইখানি মুড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

এ কি, আপনি!

হ্যাঁ। একা ও এ ঘরে থাকবে—তাছাড়া আপনি কাজে গেছেন, কখন ফিরবেন —তাই বসেছিলাম।

ছি ছি, কি অন্যায়। আপনাকে কতক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে! মহাতবকে ঘরে একটু বসতে বললেই পারতেন—

তাতে কি হয়েছে! বুড়ো মানুষ, সারাদিনের কাজকর্মের পরে ক্লান্ত, মিথ্যে তাকে আর বিরক্ত করা—

আপনিও কি কম ক্লান্ত থাকেন, বলুন তো! দেখি তো, সারাটা দিন যেভাবে এতগুলো ছেলেমেয়েকে নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হয়! যাক্ টুকুন ঘুমিয়েছে?

হ্যাঁ। আপনার এই বইখানা নিতে পারি? পড়ছিলাম। চমৎকার বইটা।

নিশ্চয়ই। কি বই ওটা?

শ'র ইনটেলিজেন্ট ওম্যানস গাইড্ টু সোস্যালিজম। আচ্ছা আসি আমি তাহলে।

হ্যাঁ, আসুন।

সিস্টার রিটা বের হয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়ান, ভাল কথা, আপনার একটা চিঠি আজকের ডাকে এসেছিল, ওই টেবিলের উপরে রেখেছি।

আমার চিঠি!

হ্যাঁ।

সিস্টার রিটা কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

চিঠি! আশ্চর্য! কার চিঠি? কে আবার চিঠি লিখল তাকে? কেউ তাব ঠিকানা জানে না এখানকার। তবে? এগিয়ে গেল সান্যাল টেবিলটার কাছে। বাতিদানের ঠিক নীচেই পেপার-ওয়েটটা দিয়ে চাপা দেওয়া ব্লু-রংয়ের একটা খাম।

বিস্মিত সান্যাল হাত বাড়িয়ে খামটা তুলে নিল।

খামটা বেশ পুরু। উপরে পরিষ্কার ইংরাজীতে নামঠিকানা লেখা। নামটা পুরো নয়, কেবল মিঃ সান্যাল আর নীচে তার মিশনের নামঠিকানা।

কে লিখল চিঠি?

সহসা এমন সময় টুকুনের ডাকে চমকে ফিরে তাকায় সান্যাল, বাবা!

॥ ১৭ ॥

কে? এ কি দুষ্টু, তুমি ঘুমোওনি?

চিঠিটা পকেটে রেখে শয্যার দিকে এগিয়ে এল সান্যাল।

শয্যার উপরে শায়িত অবস্থাতেই একমুখ হাসি নিয়ে দুষ্টুমিভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে টুকুন। চোখে ঘুমের কোন চিহ্নমাত্রও নেই।

ওরে দুষ্টু, তুমি ঘুমোয়ওনি তাহলে! জেগেছিলে ঘুমের ভান করে এতক্ষণ!

বা রে, তুমি গল্প না বললে আমার বুঝি ঘুম আসে কখনও!

গায়ের জামাটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে রেখে শয্যার উপরে এসে বসল সান্যাল। গভীর স্নেহে টুকুনের কোঁকড়ানো রেশমের মত নরম চুলে একখানা হাত রেখে সান্যাল ডাকলে, টুকুন!

কেন বাবামণি?

আচ্ছা মা, এক দিনও কি তোর ঘুমোবার সময় পাশে না থাকলে তোর ঘুম হবে না!

গল্প না শুনে বুঝি কেউ ঘুমোতে পারে?

পারে না বুঝি! সকৌতুকে প্রশ্ন করে সান্যাল।

পারেই না তো! পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে রাজার ছেলে রাজার মেয়েকে খুঁজতে না বের হলে, ঘুমের মাসী-পিসি কি কারো চোখে ঘুম দেয়! তাছাড়া কালকের সেই যে মস্ত বড় অজগর সাপটা—রাজার ছেলেকে খেতে আসছিল গল্পটা, তো শেষ করনি—

গল্পটা বুঝি শেষ হয়নি?

বাবামণির কিছু মনে থাকে না! অভিমান-ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে টুকুন।

আমি তো জানি গল্পটা কালকের, কালই শেষ হয়ে গিয়েছিল—অজগর সাপটা রাজার ছেলেকে খেয়ে ফেলল। রাজপুত্রের মাথাটি অজগর খেলো, আমার কথাটি ফুরুল।

হুঁ, অজগরের সাধ্যি কি রাজার ছেলেকে খায়—তলোয়ারের ঘায়ে দু-টুকরো করে অমনি কেটে ফেলবে না!

তাই তো, এ কথাটি তো একবারও ভাবিনি আমি। বেশ, তবে শোন, কিন্তু চোখটি তোমাকে বুজতে হবে টুকুন-সোনা। চোখ বুজে তবে গল্প শুনতে হবে।

হাসতে হাসতে বলে ডাঃ সান্যাল।

এই দেখ, চোখ বুজেছি, বল!

তারপর সেই যে মস্ত বড় অজগর সাপ, মাথায় যার লক্ষ রাজার ধন মাণিক —ডাঃ সান্যাল তার গতরাত্রের অর্ধসমাপ্ত রূপকথার কাহিনী আবার বলতে শুরু করে। অত বড় যে বন, ঘন জঙ্গল, ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে, জনমনিষ্যি নেই, কেবল বড় বড বাঘ ভাল্লুক, বুনো জন্তুর আনাগোনা, অজগরের মাথায় সেই মাণিকের জ্যোতিতে চারিদিক যেন দিনের আলোর মত ঝলমল করে উঠল। অন্ধকার বনে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

বাবামণি?

ও কি! তুমি এখনও ঘুমোওনি? টুকুনের মুখের দিকে তাকায় ডাঃ সান্যাল।

কই, তুমি তো কিছু খেলে না বাবামণি! যাও তুমি খেয়ে নাও, ঐ দেখ টেবিলের ওপরে ঠাকুর তোমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছে।

না না, এত রাত্রে আর খাব না। তুমি চোখ বুজে শোন।

বারে, না খেলে বুঝি কারও শরীর ভাল থাকে!

পরক্ষণেই অন্য এক প্রশ্ন করে টুকুন, আচ্ছা বাবামণি, তুমি আমার নাম মঞ্জরী রেখেছ কেন? মঞ্জরী মানে কি?

মঞ্জরী মানে নবপল্লব। জীবন-বৃন্তে তুমি যে আমার নবপল্লব মা মণি!

পল্লব মানে তো পাতা, আর নব মানে?

নতুন। এবারে গল্প শোন মা, রাত অনেক হল।

হ্যাঁ বল—

অজগর রাজপুত্রকে দেখে এগিয়ে আসছে মস্ত বড় হাঁ করে,—আবার গল্প বলা শুরু হয়, এই বুঝি গিলে ফেললে, কিন্তু রাজার ছেলের একটা সামান্য অজগর সাপকে দেখে ডরালে কি চলে? সেও তক্ষুনি তার কোমরে ঝোলানো তলোয়ারটা টেনে নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। সাপটাও এগিয়ে আসছে, রাজপুত্রও অটল অচল দাঁড়িয়ে। এমন সময় দৈববাণী হল—রাজপুত্র, ঐ সাপকে এক কোপে দু-টুকরো করে কেটে ওর রক্তে যদি কপালে তিলক কাটতে পার, তবেই তুমি তোমার হৃত পিতৃরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করতে পারবে। যে দৈত্যের দল তোমার পিতার রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের রাজা এই অজগর —শুনছ টুকুন!

চেয়ে দেখে ডাঃ সান্যাল, টুকুন ঘুমিয়ে পড়েছে।

উপাধান থেকে মাথাটা একটু গড়িয়ে পড়েছে, আবার উপাধানের উপরে ঠিক করে দেয়।

টুকুন—মঞ্জরী সত্যিই তার এই নবজীনের নবপল্লব!

জীবনে অনিবার্য ধ্বংসের গ্রাস হতে ওই তো তাকে বাঁচিয়েছে!

বুকভরা হাহাকার যেন ওর যাদুস্পর্শে একটু একটু করে মিলিয়ে গিয়েছে।

নিঃসীম অন্ধকারে বয়ে এনেছে ও যেন আলোর স্নিগ্ধ-বর্তিকা।

টুকুন ঘুমিয়ে পড়ল এবং অনেকক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে পায়চারি করবার পর ডাঃ সান্যাল এসে ঘরের একটা জানালা খুলে দিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল। বাইরের ঘুমন্ত প্রকৃতি ক্ষীণ জ্যোৎস্নার একটা ওড়না গায়ে দিয়ে ধ্যানে বসেছে। অদ্ভুত একটা শান্ত সমাধিস্থ পরিবেশ।

সহসা আবার মনে পড়ে গেল আজকের ডাকে প্রাপ্ত চিঠিখানার কথা।

হঠাৎ তখন টুকুন ডেকে ওঠায় তাড়াতাড়িতে খামটা খোলাও হয়নি।

কৌতূহলটা উৎসমুখেই টুকুনের আকস্মিক ডাকে চাপা পড়ে গিয়েছিল, চিঠিটা আবার পকেট হতে বের করল সান্যাল।

টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে এনে বসল।

সামান্য একটু দ্বিধা করে খামের মুখটা ছিঁড়ে চিঠিটা খুলে ফেললে। পুরু চিঠির কাগজে লেখা দুই পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে হঠাৎ কেন যেন মনে হল আপনার চিঠিখানার জবাব দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। একটা কথা হয়তো আপনার মনে হতে পারে, এতকাল পরে হঠাৎ কর্তব্য-জ্ঞানটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলই বা কেন? কর্তব্যের তাগিদটা গোড়া হতেই ছিল, তবে সেটার মধ্যে খুব বেশি জোর ছিল না।

আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকে এই দীর্ঘ পাঁচ মাসের ব্যবধানে, যখন নিজের মনের মুখোমুখি ব্যাপারটা চিন্তা করছি, আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি নিজের অদ্ভুত একটা অচিন্তনীয় পরিবর্তন দেখে।

মিথ্যা বা অতিশয়োক্তি নয়। বিশ্বাস করতে পারবেন কিনা জানি না, সেদিনকার রাত্রের দ্বিতীয় সাক্ষাতের ঘটনার পর হতেই, কেন জানি না আপনার প্রতি আর আমার একটুকুও বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই।

ঘৃণা যে নয় তাও যেমন জানি, তেমনি এটা যে আসলে কি তাও বুঝে উঠতে এখনও যেন পারছি না।

মামাবাবু এখন অনেকটা সুস্থ। তবে তাঁর পূর্বের জীবনীশক্তি ও কার্যক্ষমতা আর যে ফিরে তিনি পাবেন না, এও সত্য।

গত পাঁচ মাস ধরে আমরা অর্থাৎ আমি ও মামা ডিহিরি-অন-শোনে এসে মামার স্বাস্থ্যান্বেষণে ডেরা বেঁধে আছি এবং মামার জায়গাটা এত বেশি পছন্দ হয়ে গেছে যে তাঁর ইচ্ছা বাকী জীবনটা এইখানেই তিনি কাটান।

যদিও এখনও কিছুই পাকাপাকি স্থির হয়নি।

এখানে একজনও ভাল ডাক্তার আশেপাশে বিশ-পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যেও নেই!

মামার এক সহপাঠী বন্ধু আছেন কাশীতে, ডাক্তার, আর নিকটে তাঁর চেয়েও আছেন আপনি।

সামনের জুলাইতেই আমি চলে যাব কলকাতায়, মামা তখন একাই থাকবেন বৃন্দাবনের অধীনে।

যতদূর জানি এটা আপনার অজ্ঞাতবাস, কিন্তু সেটার যে পরিচয় বর্তমানে লোকে আপনার জানে, সেটা আসল কিনা না জানা পর্যন্ত, ডাক্তার হিসাবে ভবিষ্যতে কখনো আপনার প্রয়োজন হলে, আপনাকে পাওয়া যাবে কিনা জানি না।

নিশ্চয়ই কথাগুলো আমার আপনার কাছে অত্যন্ত বিচিত্র ঠেকছে।

সত্যিই দুর্জেয় মানুষের মন। নইলে এইভাবে আপনাকে কখনও যে পত্র দেবো, এও তো আমার কাছে স্বপ্নাতীতই ছিল।

মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানেন? আমি বোধ হয় দুর্বল হয়ে গিয়েছি। বলতে

সঙ্কোচ নেই, নইলে যে একদিন আমার সর্বাপেক্ষ প্রিয় আপনার জনের প্রাণ নিতে উদ্যত হয়েছিল, সেই নরঘাতকের প্রতি আমার এ অহেতুক দুর্বলতা কেন? নীতির চোখে এ অমার্জনীয় কি নয়?

অনুশোচনার মধ্যে দিয়ে যদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহলে সেও তো আপনার কম হয়নি, অন্তত সে কথাটা আর কেউ না জানুক, আমি কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলাম আপনার পত্রখানা পেয়েই।

তবু ভাবি যার এত শিক্ষা, এত বড় মন, তার মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে কি করে!

আপনার সত্যকারের ইতিহাস আমি শুনেছি। আশ্চর্য হবেন না, সত্যিই শুনেছি। একান্ত কৌতূহলভরে একদিন সোজা কিরীটীবাবুদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করি এবং বিশেষ করে আপনার সম্পর্কে সব জানতে আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনিই আপনার আদ্যন্ত পূর্বাপর ইতিহাস আমাকে বলেন।

নিজের হাতে পিতৃশত্রুদের কৃতকর্মের দণ্ডবিধান করতে গিয়ে পাপ আপনাকে গ্রাস করেছে।

সেইদিন হতেই বুঝেছিলাম, যে অন্যায় আপনার স্বর্গত পিতার প্রতি তাঁর বন্ধুরা করেছিল এবং যার শাস্তির ভার নিতে গিয়ে আপনার হাতে নিজে হলেন আপনি পতিত এবং পাপ আপনাকে গ্রাস করল পরে, সে অন্যায় আপনার পক্ষে কত বড় মর্মান্তিক হয়েছিল তা শুনেছি। কুমার দিগেন্দ্রনারায়ণের বিশ্বাসঘাতকতার কথাও কিরীটীবাবুর মুখেই আমি শুনি। আপনি জানেন না, কিরীটীবাবু আপনাকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। তাঁর সে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অন্তর্হিত হল সেইদিনই প্রথম, যেদিন মানুষের রক্তে আপনি আপনার হাত কলঙ্কিত করলেন। এ আপনি কেন করলেন ডাঃ সান্যাল? মানুষ হয়ে মানুষকে আপনি হত্যা করলেন কি করে?

আপনি হত্যাকারী। নরঘাতক। ঈশ্বরের বিধানকে মানুষ হয়ে আপনি দম্ভভরেই বলুন বা ভ্রমেই বলুন, এভাবে চ্যালেঞ্জ করে নিজের হাতে যদি তুলে না নিতেন এমনি করে, বোধ হয় তবে আজ অভিশপ্ত এ জীবনভার আপনাকে বয়ে বেড়াতে হত না। মানুষ হয়েও মানুষের সমাজ হতে, মানুষের স্নেহ ভালবাসা হতে এভাবে আপনাকে বহিষ্কৃতির লাঞ্ছনা নিয়ে গৃহহারা সমাজহারা হয়ে পরিত্যক্ত হতে হত না। মনে করবেন না অবশ্য আপনাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি, সারমন শোনাচ্ছি বা আপনাকে চিঠি লিখতে বসবার মনের দিক দিয়ে এও একটা যুক্তি আমার!

আপনাকে আমি আজ আর ঘৃণা করি না, অথচ এত ঘৃণ্য আপনি যে আপনাকে ঘৃণা করাই কর্তব্য। এই কথাটা যখনই মনে হয়েছে, তখনই কেমন যেন একটা অনুকম্পা বোধ করেছি আপনার প্রতি এবং সেটা অন্যায় হলেও সত্য, এ কথা অস্বীকার করতে পারছি না বলেই শেষ পর্যন্ত এ কথাটা আপনাকে আমি জানালাম।

আর একটা কথা। যদিও অনধিকার চর্চা, তবু জানতে ইচ্ছা, বর্তমান জীবন আপনার কি এবং কোন, পথে চলেছে?

একটা নক্ষত্র গ্রহমণ্ডলী হতে চ্যুত হয়ে মাটির বুকে এসে পুড়ে ছাই হয়েই গেল, না এখনও সে জ্বলছে? আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি

সুচিতা

একবার দুবার তিনবার চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়ল সান্যাল।

তারপর কি ভেবে চিঠির কাগজ একটা টেনে নিয়ে লিখলে :

সুচরিতাসু,

মৃত নক্ষত্রের ইতিহাস কি বিবৃতির অপেক্ষা রাখে? এইটুকুই শুধু জানাতে পারি, বোধ হয় কালো ভ্রমরের মৃত্যুই ঘটেছে। নমস্কারান্তে

এস. সান্যাল

॥ ১৮ ॥

মাত্র দুটি ছত্রে পত্রখানা লিখে শেষ করে খামের মধ্যে ভরে নাম-ঠিকানা লিখে সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

আবার এসে একবার ঘুমন্ত টুকুনের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াল। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে টুকুন। এ কি মায়ার নিগড়! আষ্টেপৃষ্ঠে আজ বেঁধে ফেলেছে। শুধু কি বেঁধেই ফেলেছে, সমস্ত বুকখানা কি গভীর তৃপ্তিতেই না ভরে দিয়েছে! অমৃতের মধু-রসে যেন সমস্ত আত্মাকেই আজ পূর্ণ করে দিয়েছে।

আবার মনে পড়ে, সুচিতা চিঠি লিখেছে!

সুচিতা!

নিতান্ত খেয়ালের বশেই যে চিঠিখানা সেদিন সে দীর্ঘ পাঁচ মাস আগে লিখে ডাকে ফেলে, কতদিন ভেবেছে, কেন সে অমন করে সুচিতাকে চিঠি লিখতে গেল? একান্ত অভাবিত ভাবে সেই পত্রের জবাব যে এতকাল পরে আসবে, এ শুধু বিস্ময়ই নয়, অত্যাশ্চর্যও!

ঠুং করে একটা শব্দ হল।

সান্যাল চেয়ে দেখলে দেওয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটের উপরে রক্ষিত ঘড়িটায় রাত্রি সাড়ে চারটে বাজল। রাত্রি শেষ হয়ে এল।

আজ রাত্রে আর ঘুম হবে না। চোখে ঘুম নেইও।

গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে সান্যাল উপাসনা-মন্দিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

প্রত্যহ পৌনে পাঁচটায় সান্যাল টুকুনকে সঙ্গে নিয়ে উপাসনা-মন্দিরে যায় উপাসনা করতে।

এখনও যদিও মিনিট পনেরো বাকী, টুকুনকে ঘুম থেকে ওঠাতে সান্যালের মন চায় না। থাক, ঘুমোক ও। কাল অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছে।

নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সান্যাল ঘর হতে বের হয়ে এল।

ঠিক ভোর পাঁচটায় এব্রাহাম উপাসনা-মন্দিরের দরজার তালা খুলে দিয়ে যায়। ডুপ্লিকেট চাবি এতদিন একটা ফাদার জোন্সের কাছেই থাকত, তাঁর মৃত্যুর পর চাবিটা সিস্টার রিটার কাছেই থাকে এবং সেটা ডাঃ সান্যালের ইচ্ছাক্রমেই।

শেষরাত্রির আবছা আলোছায়ায় আঙ্গিনা অতিক্রম করে সান্যাল মন্দিরের অনতিদূরে বাগানের মধ্যে ছোট ঘরগুলিতে যেখানে এব্রাহাম থাকে, সেই দিকেই অগ্রসর হল, কিন্তু বেশী দূর যেতে হল না।

এব্রাহাম গুনগুন্ করে একটা ইংরাজী সুর গাইতে গাইতে চাবিহাতে এদিকেই আসছিল।

এব্রাহাম! ডাঃ সান্যাল ডাকল।

Yes. Sir! এব্রাহাম প্রত্যুত্তর দেয়।

এব্রাহাম এগিয়ে এল, আমার কি একটু উঠতে আজ দেরি হয়ে গেছে স্যার?

এব্রাহাম নিজেই সন্দিগ্ধচিত্তে প্রশ্নটা করে।

না এব্রাহাম, আমিই আজ একটু তাড়াতাড়ি এসেছি। চল, উপাসনা-ঘরের চাবিটা খুলে দেবে চল।

আসন্ন ভোরের আবছা আলোছায়ায় উদ্যানপথ অতিক্রম করে আগে আগে ডাঃ সান্যাল ও পশ্চাতে এব্রাহাম এগিয়ে চলে। গ্রীষ্মের রাত্রির শেষ প্রহর, কিন্তু সকালবেলার রৌদ্র না ওঠা পর্যন্ত ঝিরঝিরে হাওয়ায় দেহ ও মন অত্যন্ত স্নিগ্ধ বোধ হয়।

উপাসনা-মন্দিরের দরজায় এসে তালাটা খুলে দিয়ে এব্রাহাম চলে গেল।

ডাঃ সান্যাল উপাসনা-ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরটা অন্ধকার। উপাসনা-বেদীর মোমবাতিটা জ্বেলে দিয়ে ঘরের জানালাগুলো খুলে দেয়। চারিদিক আরও পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

আবছা একটা আলো খোলা জানালাপথে কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করে।

এবারে বেদীর সামনে এগিয়ে গিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে সামনের একটি বেঞ্চের উপর বসল ডাঃ সান্যাল।

আপনা হতেই সারারাত্রির জাগরণে ক্লান্ত চোখের পাতা দুটি যেন নেমে এল। মুদ্রিত হল।

সেন্ট ম্যাথুর গসপেলের কয়েকটা লাইন যেন চোখের উপর ভেসে আসছে স্পষ্ট। অত্যন্ত স্পষ্ট।

The blinds receive their sight, and the lames walk, the lepers are cleansed, and the deafs hear the deads are raised up, and the poors have the gospel preached to them.

সহসা একটা মৃদু কোমল স্পর্শে সচকিত সান্যাল পশ্চাতের দিকে ফিরে তাকায়। টুকুন! ইতিমধ্যে কখন একসময় সে ঘুম ভেঙে উঠে সোজা সান্যালের খোঁজে উপাসনা-ঘরে চলে এসেছে।

বাবামণি, তুমি আমাকে ঘুম থেকে না তুলে একা চলে এসেছ কেন?

এস মা। তুমি কাল অনেক রাত্রে ঘুমিয়েছ, তাই তোমাকে তুলিনি।

পাশে টেনে নিলেন সান্যাল গভীর স্নেহে টুকুনকে।

॥ ১৯ ॥

সুচিতা জানত চিঠির জবাব সে পাবেই।

তবে এত শীঘ্র যে চিঠির জবাব আসবে এটাই সে যেন ভাবতে পারিনি।

দীর্ঘ না হলেও যে প্রতীক্ষায় সে ছিল সেটা অত্যন্ত তীব্র। চিঠিটা খুলে কিন্তু কেমন যেন হতাশই হতে হয় সুচিতাকে।

অত্যন্ত ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত পত্র।

মাত্র দুই লাইন।

তবে দুটি মাত্র লাইন হলেও চিঠিখানা যেন ঐ সামান্যতেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

একটা বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ডাঃ সান্যাল এখনও মিশনেই আছে। তবে তার চাইতে বেশি কিছুই লেখেননি।

কালো ভ্রমর মৃত। ছোট্ট এই সংবাদটি যেন শীতের পর বসন্তের স্নিগ্ধ পরশ বয়ে নিয়ে এসেছে।

খোলা জানালাপথে সুচিতা বাইরের দিকে তাকায়। সকালের রৌদ্রে সম্মুখের দিগন্তপ্রসারী রুক্ষ ইউ-পির প্রান্তর যেন নিজেকে আবরণহীন মুক্তির মধ্যে মেলে ধরেছে আপনাকে।

কোথাও কোন গ্লানি নেই, নেই অবসাদের ক্লিষ্ট ছায়া।

মনের মধ্যেও কেমন যেন একটা অব্যক্ত আনন্দানুভূতি অনুভব করে সুচিতা।

একটা অপূর্ব পুলক-শিহরণ।

বেদনা ও আনন্দের কান্না-হাসিতে যেন সমস্ত অন্তরটা সহসা আজকের এই সকালে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কোন খেদ নেই। কোন গ্লানি নেই।

চিঠিখানা সযতনে ড্রয়ারের মধ্যে ভরে রেখে লঘু চঞ্চল পদে সুচিতা কক্ষ হতে বের হয়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে যেন আবদ্ধ থাকতে এই মুহূর্তে মন চাইছে না।

বিশ্বচরাচরের যত অর্গলবদ্ধ দ্বার, যেন সহসা আজ কার যাদুস্পর্শে খুলে গিয়েছে। অবারিত সূর্যালোকের আনন্দ-স্পর্শ দিগ হতে দিগন্তরে গিয়েছে যেন পরিব্যাপ্ত।

পঙ্কিলতা আবিলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেন সব আজ ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

॥ ২০ ॥

দিন আসে দিন যায়। রাত্রি আসে রাত্রি যায়। এমনি করে দিনে দিনে সপ্তাহ, মাস ও বর্ষ অতিবাহিত হয়ে যায়।

দীর্ঘ ছটি বৎসর এমনি করেই একদিন কেটে গেল।

ছটি বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানে পরিবর্তনও কিছু হয়ে গেল।

ডাঃ সান্যালের মিঃ সান্যাল নামটা তার জীবনের অজ্ঞাতবাসে, দীর্ঘ ছটি বৎসরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাঃ সান্যালেই

রূপান্তরিত হয়েছে। দীর্ঘ পরিশ্রমে যে চিকিৎসা-বিদ্যাটা ডাঃ সান্যাল অর্জন করেছিল, সেটা তার জীবন-বেদের সঙ্গে এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল যে, ছদ্মরূপে আবার সেটা না গ্রহণ করা ছাড়া তারও বোধ হয় আর গত্যন্তর ছিল না।

অ্যালোপ্যাথি নয়, হোমিওপ্যাথির মুখোশ নিয়ে ডাঃ সান্যাল তার চিকিৎসার আসরে, অন্যান্য বহুবিধ কর্মের সঙ্গে জাঁকিয়ে বসে, ক্রমে বৎসরখানেকের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে তার কষ্ট হয়নি।

লম্বা কালো সাদা দাড়ি, মাথার চুলেও পাক ধরেছে, তবে শরীরের অটুট সুন্দর স্বাস্থ্য এখনও অসাধারণ দৈহিক পরিচয় দেয়।

সর্বোপরি দীর্ঘদিনের সংযম ও মানসিক তপশ্চর্যা বোধ হয় এনে দিয়েছে চোখে-মুখে, সমস্ত চেহারায় একটা অপূর্ব প্রশান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতি।

পালিত-কন্যা মঞ্জরী এখন অষ্টাদশী।

যৌবনের যাদুস্পর্শে রূপ ও সৌন্দর্য যেন সে বৃন্তে প্রস্ফুটিত মাধবী ফুলটির মতই বিকশিত হয়ে উঠেছে।

॥ ২১ ॥

ডাঃ সান্যালকে ভোলেনি মাত্র দুজন। কিরীটী আর সুব্রত।

তারা বিশ্বাস করে না পুলিসের কর্তাদের মত যে সহসা কালো ভ্রমর এমনি করে বিস্মৃতির অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।

মধ্যে মধ্যে এখনও কালো ভ্রমর সম্পর্কে দুজনার মধ্যে অনেক কথাই হয়।

সুব্রত বলে, তুই কি সত্যিই মনে করিস কিরীটী, কালো ভ্রমর কোন দূর দেশে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে আছে?

না, একেবারেই না। বিশেষ করে সেটা তখন যুদ্ধের সময়। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐ সময় কারও পক্ষে ভারতবর্ষ হতে কোন সাগরপারের ভিনদেশে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করাটা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অবিশ্বাস্যও।

তবে? সে মরে গিয়েছে, তাও তুই নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিস না?

তা তো করিই না।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারি না, তার মত প্রকৃতির লোক খুন চুরি জখম না করে এতকাল নিশ্চেষ্ট সাধু বনেই বা বসে আছে কেমন করে? না সত্যিসত্যিই লোকটা সাধু বনে গেল?

বিচিত্র নয়, বিশেষ করে ডাঃ সান্যালের মত লোকের পক্ষে। ক্রাইমের সঙ্গে তার জন্মগত কোন যোগাযোগই তো ছিল না। নেহাত ভাগ্যবিপর্যয়ে জড়িয়ে পড়েছিল লোকটা, পাপের সঙ্গে বললেও অত্যুক্তি হবে না। এবং সে অবস্থাতেও নিজের সেই পাপকে, পাপের দংশনকে ভুলবার জন্য নিয়মিত 'মরফিয়া' ইনজেকশন নিতে হত। যা কিছু বলেছে করেছে, সবই তার একটা temporary mental insanity (ক্ষণিক মনোবিকৃতি) হতে উদ্ভূত। মানসিক সেই অবস্থাটুকু বাদ দিয়ে কালো ভ্রমরকে বিচার করতে গেলেই তুমি ঠকবে সুব্রত।

আশ্চর্য তোমার সহানুভূতি কিরীটী জঘন্য ঐ নরঘাতক দস্যুটির প্রতি!

এ কথাটা ভুল। এটা তার প্রতি আমার সহানুভূতি নয় সুব্রত, যা সত্য তাকে স্বীকৃতি দিচ্ছি মাত্র। ভুলে যাও কেন, তার জন্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সর্বোপরি কালচার ও জন্মগত সংস্কার! দস্যু বা নরঘাতক সে কোন দিনই ছিল না। পাপের রক্ত তার শরীরে প্রবাহিত হয়নি পিতৃপুরুষের রক্ত হতে। যা কিছু সে করেছে সবই ক্ষণিক নেশা, প্রতিহিংসার উন্মাদনার ঝোঁকে—

বল কি! দীনতারণ চৌধুরীর মত একজন নিরীহ ভদ্রলোককে বিনা কারণে হত্যা, ডাঃ চট্টরাজের মত একজন লোককে হত্যার প্রচেষ্টা—

মানুষের চরিত্র স্টাডি করা সম্পর্কে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যদি আমার মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যুর আগে তোমার আজকের এ প্রশ্নের জবাব সে-ই দিয়ে যাবে, আমাকে আর দিতে হবে না।

সে তুই যাই বলিস কিরীটী, তাকে কোনদিন যদি মুঠোর মধ্যে আমি পাই, ফাঁসিকাষ্ঠে যাতে সে ঝোলে সে ব্যবস্থা আমি করবই।

কিরীটী হেসে ফেলে সুব্রতর কথায়, সে কি আমিই ছেড়ে দেব রে! অন্যায়কে বিবেকের বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করা মানেই ক্ষমা নয়!

॥ ২২ ॥

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে ঝড়ের সংকেত কালো হয়ে দেখা দিল আকাশের এক প্রান্তে, সহসা যেন অতর্কিতেই। বেলা দ্বিপ্রহর হলেও সেই শেষরাত্রি থেকে যে বৃষ্টি নেমেছে, তার যেন আর বিরাম বিশ্রাম নেই। ঝম্‌ঝম্‌ করে ঝরছে তো ঝরছেই। মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য ধারাবর্ষণ বন্ধ হলেও আবার হয় শুরু। চারিদিকে একটা থমথমে গুমোট কালো ছায়া যেন সবকিছুকে গ্রাস করছে। রাস্তাঘাট জলেকাদায় একেবারে প্যাচ-প্যাচ করছে।

শহরের প্রান্তবর্তী অপ্রশস্ত কাঁচা সড়ক। কাদা ও জলে দুর্গম হয়ে উঠেছে। সড়কের দুপাশে চাষের ক্ষেত থৈ থৈ করছে যেন জলে।

দূরবর্তী শহরে একটি সঙ্কটাপন্ন রোগী দেখে ডাঃ সান্যাল টাঙ্গায় করে মিশনে ফিরছিল। টাঙ্গা চালাচ্ছিল মিশিরজী।

পথের এক জায়গায় এসে দেখা গেল একটা মোটরগাড়ি কর্দমাক্ত সড়কে চাকা বসে গিয়ে অচল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ির পাশে এবং পশ্চাতে তিনজন লোক। একজনের গায়ে বর্ষাতি, ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, বাকী দুজন এই দেশীয় লোক, গাড়িটাকে কর্দমগহ্বর হতে ঠেলে আবার সচল করবার জন্য প্রাণপণে ঠেলাঠেলি করছে।

সড়কে এমন স্থান নেই যে ডাঃ সান্যালের গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। কাজেই একান্ত বাধ্য হয়েই মিশিরজীকে টাঙ্গা থামাতে হল।

ডাঃ সান্যাল মিশিরজীকে সম্বোধন করে বলে, চল তো মিশিরজী, আমরাও একটু হাত লাগিয়ে দিলে বোধ হয় ওদের সাহায্য হবে।

দুজনেই টাঙ্গা হতে নেমে পড়ে।

বৃষ্টিও থেমে এসেছে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য।

ডাঃ সান্যাল বর্ষাতি গায়ে ভদ্রলোকটির পাশে এসে দাঁড়াল, আমরা দুজন আছি, আপনাদের সাহায্য করতে পারি কি?

সাহায্য! অত্যন্ত ধন্যবাদ। বর্ষাতি পরিহিত ভদ্রলোক ডাঃ সান্যালের দিকে ফিরে তাকালেন। মুহূর্তে যেন ডাক্তারের সমস্ত শরীরের স্নায়ু-উপস্নায়ু দিয়ে শির্ শির্ করে একটা তরঙ্গ-প্রবাহ বয়ে গেল।

দীর্ঘকাল পরে হলেও স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো এখনও অমলিন।

বিদ্যুৎ-চমকের মতই স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো যেন অন্ধকারে সহসা ঝলমলিয়ে ওঠে।

কিন্তু অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি ডাঃ সান্যাল নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে মৃদু হাস্যতরল কণ্ঠে বলে, ওভাবে হাজার ঠেলাঠেলি করলেও গাড়ির চাকা যেভাবে কাদার মধ্যে বসে গিয়েছে একটুও নড়বে না। বলতে বলতে নিজের গা হতে-জামা খুলে মিশিরজীর হাতে দিয়ে ডাক্তার সকলকে লক্ষ্য করে বলে, আমি দুহাতে গাড়ির চাকা তুলে ধরছি, আপনারা সকলে মিলে ঠেলে গাড়িটা একটু এগিয়ে দিন।

সকলে বিস্ময়ে ডাঃ সান্যালের দিকে না তাকিয়ে পারে না।

ঐ পক্ককেশ ও পক্কশ্মশ্রু বৃদ্ধ কি বলছেন! উনি গাড়ির চাকা তুলে ধরবেন! লোকটা পাগল নয় তো? বৃদ্ধ মিশিরজীও কতকটা যেন বোবা-বিহ্বলতায় তার প্রভুর মুখের দিকে তাকায়।

কোন দিকেই কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই ডাঃ সান্যালের। গাড়ির পশ্চাতের বামদিককার চাকাটার প্রায় একের-চার-অংশ গভীর কর্দমের গ্রাসে কবলিত। সার্টের আস্তিন চটপট গুটিয়ে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে চাকার রিম দু হাতের বলিষ্ঠ মুষ্টি দিয়ে চেপে ধরে ওদের দিকে দ্বিতীয়বার আর না তাকিয়েই কতকটা আদেশের সুরেই যেন নির্দেশ দেয়, নিন আপনারা সকলে আমার 'রেডি' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি সামনের দিকে ঠেলবেন।

বর্ষাতি গায়ে ভদ্রলোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন ডাঃ সান্যালের দিকে তাকিয়ে। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্মৃতির পটে কয়েকটা অস্পষ্ট আখর।

বলিষ্ঠ পুরোবাহু প্রত্যেকটি পেশী, শিরা, উপশিরা যেন স্প্রিংয়ের মতই স্বয়ংসক্রিয় হয়ে উঠবে এখুনি। নিঃশ্বাস রোধ করে দেহের সমস্ত শক্তি মেরুদণ্ড ও পুরোবাহুর পেশীর মধ্যে মুহূর্তে কেন্দ্রীভূত করে ধীরে ধীরে আকর্ষণ দেয় ডাঃ সান্যাল দৃঢ় মুষ্টিধৃত গাড়ির কর্দমে নিমজ্জমান চক্রে।

ধীরে অতি ধীরে সমগ্র শক্তি ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণের মধ্য দিয়ে যেন সুপ্তোত্থিত সিংহ জেগে ওঠে।

কবে কোন্ পুরাকালে, গল্পকথা কিনা কেউ জানে না, মহাবীর কর্ণের রথচক্র অন্তিম সময়ে ক্ষুধিতা মেদিনী গ্রাস করেছিল। দুর্দৈব! আর আজ অন্যের মেদিনী কবলিত রথচক্র উদ্ধার করতে গিয়ে ডাঃ সান্যালের ভাগ্যাকাশে যে অবশ্যম্ভাবী দুর্দৈব ঘনীভূত হয়ে আসছে, সে কথা আর কেউ না জানুক একজন সেটা কেন না-জানি মনে মনে অনুভব করছিল।

সহসা একটা চাপা নির্দেশ শোনা গেল, রেডি!

আশ্চর্য! অতীব আশ্চর্য! কর্দম-কবলিত গাড়ির চাকা গ্রাসমুক্ত হয়ে ভূমি হতে উত্তোলিত হয়েছে প্রায় বিগতখানেক।

সকলে একত্রে ঠেলে গাড়িকে কর্দমের গ্রাস হতে মুক্ত করা হল।

ডাক্তার তখন কর্দমাক্ত ও স্বেদসিক্ত হস্ত-দুটি পকেট হতে রুমাল বের করে মুছতে মুছতে হাঁপাচ্ছিল।

বর্ষাতি গায়ে ভদ্রলোকটি পাশে এসে দাঁড়াল, সত্যি একটা মিরাকেল দেখালেন আপনি!

বলতে বলতে সহসা ডাঃ সান্যালের পুরোবাহুর উপরে চোখের দৃষ্টি অজ্ঞাতে পড়তেই বক্তা যেন ভীষণভাবে চমকে ওঠেন। আশ্চর্য! আশ্চর্য!

ডাঃ সান্যাল কিন্তু ভদ্রলোকের দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময়টুকু লক্ষ্য করলে না, জামার আস্তিন নামিয়ে নিতেই তখন ব্যস্ত।

না না, এর মধ্যে মিরাকেল আর কি থাকতে পারে! ইচ্ছা করলে আপনিও পারতেন!

অতিশয়োক্তি করলেই সেটা কিছু সত্য হয়ে যায় না। এককালে আমিও নিয়মিত বারবেল মুগুর করেছি, কিন্তু এ আলাদা জিনিস। এ ঈশ্বরদত্ত শক্তি!

ঝম্‌ঝম্‌ করে আবার বৃষ্টি শুরু হল এই সময়। ডাঃ সান্যাল তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ভিজে গেলেন যে, যান যান—গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিন!

ডাঃ সান্যালও টাঙ্গার দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু আপনার পরিচয়টা?

বিশেষ কিছুই নয়, সামান্য লোক, মিশনে থাকি।

পুরো একটি দিনও অতিবাহিত হল না। পরের দিন রাত্রি এগারোটায়।

দারোয়ান এসে ডাঃ সান্যালের ঘরে তাকে সংবাদ দিল, একজন ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। বিশেষ জরুরী। বলে তাঁর একখানা কার্ডও এগিয়ে দিল ডাঃ সান্যালের হাতে।

ডাঃ সান্যাল নিজের শয়নঘরের মধ্যে বসে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় একখানা বই পড়ছিল। বেদান্তের। মঞ্জরী বড় হবার পর বছর দুই হবে ডাঃ সান্যাল তার নিজের কক্ষের মধ্যে একটা পার্টিশন করে একাংশে নিজে শুত, অন্যাংশে মঞ্জরীর শোবার ও থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মঞ্জরীর শরীরটা খারাপ থাকায় রাত্রি নটাতেই সে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দারোয়ানের হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে একবার মাত্র কার্ডের লেখাটার উপরে দৃষ্টিপাত করেই বললে, যাও ভদ্রলোককে ভিজিটার্স রুমে বসতে দাও। বল গিয়ে এখুনি আসছি।

বিচিত্র একটা হাসি ডাঃ সান্যালের ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে ওঠে।

দারোয়ান আদেশপালনে চলে গেল।

অদ্য শেষ রজনী।

দীর্ঘ ছয়-বৎসরের অজ্ঞাতবাসের শেষরাত্রি আজ। এই মুহূর্তটির অপেক্ষা ডাঃ সান্যাল যেন এতদিন করছিল।

সমস্ত সঞ্চিত গ্লানির আজ মুক্তি।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি ঝরছে। জলকণাবাহী ক্ষেপা হাওয়া এলোমেলোভাবে বন্ধ কাচের শার্সির ফাঁকে শিস দিয়ে চলেছে।

শাওন-ঝরা রাত্রি। মিশনের সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

কেউ কোথাও জেগে নেই।

গায়ে একটা চাদর টেনে নিয়ে দরজা খুলে নিঃশব্দে ডাঃ সান্যাল কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

॥ ২৩ ॥

মিশনের বাড়ির বহিরাংশে ভিজিটার্স রুম।

লম্বা টানা বারান্দা অতিক্রম করে ডাঃ সান্যাল ভিজিটার্স রুমের ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে।

কক্ষের মধ্যে চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে ডাক্তার বলে, নমস্কার। বসুন বসুন সুব্রতবাবু, বসুন। আমি জানতাম আপনার আবির্ভাব শীঘ্রই এখানে ঘটবে, কিন্তু এত শীঘ্র বুঝিনি। আপনি যে আমাকে সন্দেহ করেছিলেন সে কাল দুপুরে গাড়ির চাকা তুলবার পরই টের পেয়েছিলাম। বলতে বলতে ডাঃ সান্যালও পাশেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করে।

আশ্চর্য, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন তাহলে ডাঃ সান্যাল!

লজ্জা দেবেন না আর। ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমি কালো ভ্রমর ডাঃ সান্যাল—এটা কিন্তু আপনার কাছে অন্তত আমি আশা করিনি সুব্রতবাবু। কিন্তু আমি কি ভাবছিলাম জানেন কাল দুপুর থেকে?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুব্রত কালো ভ্রমরের মুখের দিকে।

স্নিগ্ধ প্রশান্ত হাসি সমগ্র মুখখানা বোপে।

কি অপূর্ব ও আশ্চর্য যোগাযোগ দেখুন! একেই বোধহয় বলে নির্মম নিয়তি! কোথায় আপনি কলকাতায় থাকেন, আর আমি দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে ইউ-পির এক অখ্যাতনামা উপশহরে অজ্ঞাতবাসে বসে আছি, তবু দেখা হয়ে গেল দুজনায়। একেই বোধ হয় রসিকজনেরা বলে থাকবেন জীবন-কাব্য।

ঠিক তা নয় ডাঃ সান্যাল।

বলেন কি?

হ্যাঁ। একমাস আগে বেনারসের একটা মিউনিসিপ্যাল কনফারেন্সে একটা গ্রুপ ফটোর মধ্যে আপনার বর্তমান চেহারা দেখেই কিরীটী আমায় ফটোটা দেখিয়ে বলে ওঠে—

বাধা দিয়ে ডাঃ সান্যাল বলে ওঠে, তাই বলুন, এতখানি স্মৃতিশক্তি আর কার সম্ভব হতে পারে! তাহলে কিরীটী রায়ই! সেলাম জানাই বন্ধুকে আমার। তবু বলব, দুর্দৈব। নচেৎ যে ফটো কোথাও কখনও আমার এতকাল তুলতে কাউকে দিইনি, হঠাৎ মাসখানেক আগে এবারে বেনারস কনফারেন্সে সে ভুলটাই বা করলাম কেন? একেই

বলে নিয়তি। মেদিনী রথচক্র গ্রাস করল আপনার, দেখুন অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল আমার! সে যাক, কিরীটীবাবু ফটো দেখে কি বলেছিলেন—জানতে বড় কৌতূহল হচ্ছে।

দেখেই আমাকে সে বলেছিল, সুব্রত, এতদিন বাদে তোমার বৃহন্নলা ছদ্মবেশী সব্যসাচীর বুঝি দর্শন পেলাম! আমি তো শুনে অবাক! ফটোটা দেখে কিছুই ভাল বুঝলাম না। সংবাদপত্রের প্রিন্ট একেই ঝাপসা!

একেই বলে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তারপর?

বললে, বেনারসে যাও, আর এই মিঃ সান্যালের খোঁজ কর। কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারিনি, আপনি আপনার সত্যকারের পদবীটা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখেছিলেন!

কালো ভ্রমর হেসে ফেলে বলে, আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতেন, ছদ্মবেশ ধারণের পর ছদ্মনাম না ব্যবহার করাটা ঢের বেশী বুদ্ধিমানের কাজ।

এরপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

বাইরে ঝরছে বৃষ্টি অঝোরধারায়। বর্ষা-রজনী যেন নৃত্যমুখরা।

দুজনাই নিঃশব্দে মুখোমুখি বসে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে শুধু একটানা বৃষ্টির ঝরঝরানি।

সুব্রতই আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে, একান্ত দুঃখের সঙ্গেই জানাতে বাধ্য হচ্ছি ডাঃ সান্যাল, পুলিস কর্তৃপক্ষের স্পেশাল পাওয়ার আমার উপরে তো আছেই, বেনারসের পুলিস সুপার সত্যশিব পাণ্ডেও গেটের বাইরে সশস্ত্র হয়ে জীপগাড়িতে অপেক্ষা করছেন—

প্রস্তুত হয়েই রীতিমত আপনি তাহলে এত রাত্রে এসেছেন!

হ্যাঁ এবং কোন গোলমাল আমরা করতে চাই না। আপনার বর্তমান সোস্যাল পজিশন ও স্ট্যাটাসকে আমরা নষ্ট করে মিথ্যে একটা—

বুঝেছি, ধন্যবাদ তার জন্যও। আমিও এক প্রকার প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। তবুও আমার একটা শেষ অনুরোধ, যদি অবশ্য রাখেন—

নিশ্চয়ই, বলুন!

মঞ্জরী আমার মেয়ে, তার কাছ হতে আমাকে শেষ বিদায়টা নিতে যদি সময় দেন। অবশ্য আপনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে পারেন, তবে দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।

না না, তার জন্য কি, সে ঠিক আছে, কিন্তু আপনার মেয়ে—

মৃদু করুণ হাসি ফুটে ওঠে কালো ভ্রমরের ওষ্ঠপ্রান্তে, হ্যাঁ, আমার মেয়ে টুকুন —মঞ্জরী। আমার দীর্ঘ এই ছয় বৎসরের সঞ্চয় সাধনালব্ধ ধন।

বেশ, আমি এখানে অপেক্ষা করছি, আপনি যান। কিন্তু আধঘণ্টার বেশি সময়—

ধন্যবাদ, তাতেই চলবে।

ডাঃ সান্যাল ধীর প্রশান্ত পদে কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ডাঃ সান্যালের ডাকে ঘুম ভেঙে শয্যার উপরে উঠে বসল মঞ্জরী, বাবামণি!

হ্যাঁ মা।

তারপর একটু থেমে বলে, টুকুন মা, তোমার মনে আছে মা, একদিন তোমাকে বলেছিলাম, অতীত জীবনের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিস আমার সন্ধানে আজও ফিরছে—

ব্যাকুল আগ্রহে সহসা দু হাত দিয়ে মঞ্জরী ডাঃ সান্যালকে জড়িয়ে ধরে ডাকে, বাবা!

সস্নেহে কন্যার পৃষ্ঠে হাত বুলোতে বুলোতে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ডাঃ সান্যাল বলে, পুলিস আমাকে নিয়ে যাবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে মা—

না না, তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না!

লক্ষ্মী মা আমার—

না বাবা না, পুলিশের হাতে ধরা তোমাকে আমি কিছুতেই দিতে দেব না—না।

অজস্র ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে মঞ্জরীর দুই চক্ষুর কোল বেয়ে।

সময় আর বেশি নেই মা। যেতে দে—আমাকে যেতে দে। ওঁরা অপেক্ষা করছেন। তুই চোখের জল ফেললে আমার জীবনের শেষ ও প্রধান কর্তব্যটুকু কেমন করে পালন করব মাগো!

না না, চল বাবা চল, রাতারাতি দুজনে আমরা পালিয়ে যাই বাগানের দরজা দিয়ে। তাদের হাতে আমি তোমাকে প্রাণ গেলেও ধরা দিতে দেব না।

তা কি হয় মা! পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে আমাকে করতেই হবে!

বিশ্বাস করি না বাবা, তোমার মত লোক কোন পাপ করতে পারে। আর যত বড়ই পাপ তুমি করে থাক না কেন অতীতে, সে আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আজ তুমি সমস্ত পাপের উপরে—অগ্নিশুদ্ধ নিষ্পাপ তুমি।

না মা না—ওরে তুই আমার সন্তান না হলেও ঔরসজাত সন্তানের অধিক। তোর বাপের মত সত্যিই এ দুনিয়ায় কম হতভাগ্য আছে—

তা হোক, তবু—তবু তোমাকে আমি ধরা দিতে দেব না। এ পরাজয় তোমাকে আমি স্বীকার করে নিতে দেব না, দেব না!

পরাজয় নয়? কি বলছিস মা তুই?

পরাজয় নয়, তোমার সমস্ত মনুষ্যত্বের সমস্ত শৌর্যের পরিচয়ের পরাজয়!

সত্যিই কি তবে এ পরাজয়?

হ্যাঁ, পরাজয়ই তো। তাছাড়া মঞ্জরীর একটা ব্যবস্থা তো এখনও হয়নি।

পিতৃমাতৃহারা যে শিশুকে একদিন অপত্যস্নেহে বুকে তুলে নিয়ে এত বড়টা করে তুলেছে, তার স্থিতির ব্যবস্থা কতটুকু সে করেছে?

নিজে এইভাবে ধরা দেবার পর মঞ্জরী একদিন যখন সব জানতে পারবে, সে বেদনাকে সে সহ্য করবে কেমন করে?

না, সর্বাগ্রে মঞ্জরীর একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা, তারপর অন্য কথা।

স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব সে মাথা পেতে একদিন গ্রহণ করেছে. সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ করবার সকল ভার যে তারই।

ঠিক, ধরা দেওয়া চলবে না।

বাবামণি?

হ্যাঁ মা, ঠিক বলেছিস তুই—চটপট গুছিয়ে নে, এখনি আমরা পালাব।

কিন্তু বাবা, ওরা যে—

ভয় নেই মা, ভয় নেই। তুই আমাকে জানিস না, কিন্তু যারা আমাকে ধরতে এসেছে, ওরা আমাকে জানে। আমি নিজে না ধরা দিলে যে আমাকে ধরা যায় না, এ আজ ওদের অবিদিত নেই। কিন্তু মা hurry up—quick!

সুপ্ত সিংহ যেন সহসা জেগে ওঠে। সুপ্তিমগ্ন শক্তি সহসা যেন অঙ্কুশের আঘাতে গা-ঝাড়া দিয়ে গর্জন করে ওঠে।

ছোট্ট একটা সুটকেসের মধ্যে আবশ্যকীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র ও লোহার সিন্দুকটা খুলে নগদ টাকাকড়ি যতটা সম্ভব সুটকেসের মধ্যে ভরে, মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে ডাঃ সান্যাল বললে, আয় মা!

মঞ্জরীর একটা হাত ধরে আঙ্গিনা অতিক্রম করে পশ্চাতের দ্বারপথে উদ্যানের মধ্যে দুজনে এসে দাঁড়াল।

একে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, তার উপর মেঘে মেঘে সমগ্র আকাশটা একেবারে কালো কালি দিয়ে যেন লেপে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঝরছে প্রবল বৃষ্টি। উন্মত্ত ক্ষ্যাপা হাওয়া হু-হু করে বইছে, বৃষ্টিধারার সঙ্গে বুঝি পাল্লা দিয়ে শিকলছেঁড়া একটা ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত।

মধ্যে মধ্যে মেঘের প্রচণ্ড গর্জন ও চকিত বিজলীর আলোর হঠাৎ চকমকানি।

এই দুর্যোগের রাত্রে কেউ কি ঘর হতে বের হয়, না সেটাই সম্ভব?

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা যার ভাগ্যে ঘর পুড়িয়ে দিয়েছেন, এই ঘন দুর্যোগভরা রজনীতে তার বাইরে এসে দাঁড়ানো ভিন্ন পথই বা কই?

সেই প্রবল ধারাবর্ষণের মধ্যে দুজনে ভিজতে ভিজতে দ্রুতপদে এসে মিশনবাটির বহিরাংশে আস্তাবলের মধ্যে ঢুকল। একপাশে একটা চালাঘরে টাঙ্গা টানবার জন্য নতুন যে ঘোড়াটা ক্রয় করা হয়েছিল, অন্ধকারে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে মেঝেতে ঠক্‌ঠক্ করে পা ঠুকছিল। এখনও এ ঘোড়াটাকে কাজে লাগানো হয়নি, কারণ টাঙ্গার বন্ধন কিছুতেই সে মানছিল না। পুরনো বৃদ্ধ ঘোড়াটাই পূর্বের মত টাঙ্গা টানছিল।

ডাঃ সান্যাল দু-এক দিন ঘোড়াটার পিঠে চেপে অনেকটা দৌড় করিয়ে এসেছিল।

উপাসনা মন্দিরের পাশের দরজাটা দিয়ে ডাঃ সান্যাল ঘোড়াটাকে নিয়ে ও মঞ্জরীকে অনুসরণ করতে বলে বের হয়ে এল।

এককালে সুদক্ষ অশ্বারোহী ছিল ডাঃ সান্যাল। মঞ্জরীকে প্রথমে ঘোড়ার পিঠে তুলে, পাশে নিজে লাফ দিয়ে বসল। ঘোড়া ছুটে চলল অন্ধকার বৃষ্টিঝরা রাত্রে দুর্গম পথ ধরে।

॥ ২৪ ॥

আধ ঘণ্টা ছেড়ে দীর্ঘ প্রায় এক ঘণ্টা হতে চলল, ডাঃ সান্যাল তার প্রতিশ্রুতিমত ফিরল না, সুব্রত মনে মনে কেমন যেন অধৈর্য তো হয়ই, সন্দিহানও হয়ে ওঠে। আর অপেক্ষা না করে নিজেই ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে।

লম্বা টানা বারান্দা। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। জোরে জোরে বৃষ্টির ছাট এসে সমস্ত বারান্দাটা যেন জলে একেবারে থৈ-থৈ করছে।

হতভম্ব বিমূঢ় সুব্রত অন্ধকার জলে-ভেজা বারান্দায় বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে।

শেষরাত্রের দিকে একটা লোকাল ট্রেন গয়ার দিকে যায়। সেই ট্রেনেই ডাঃ সান্যাল ও মঞ্জরী একটা সেকেন্ড ক্লাস খালি কামরায় উঠে বসে।

ট্রেন ছেড়ে দিল। চলন্ত ট্রেনের জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে একটা আয়না ও বহুকাল পরে সেফটিক রেজারটা নিয়ে বসল ডাঃ সান্যাল।

আবার ছদ্মবেশের প্রয়োজন।

॥ ২৫ ॥

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে আবার ডাঃ সান্যাল একদিন মঞ্জরীকে নিয়ে কলকাতায় তার পূর্বপরিচিত মেহেবুবের চিৎপুরস্থিত রয়্যাল ইন্ডিয়ান হোটেলে এসে উঠল।

ফিরে আসলেন কর্তা তাহলে?

হ্যাঁ মেহেবুব, তবে তোমাদের এখানে আমি থাকতে পারব না। কোন ভদ্রপাড়ায় আমাকে ছোটখাটো একটা বাড়ি দেখে দাও।

কেন কর্তা, বাড়ি নিয়ে কি হবে, এখানেই তো থাকতে পারেন!

না।

মেহেবুব কি যেন ভাবলে কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলে বললে, তা হলে এক কাজ করুন কর্তা, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে রামমোহন সাহা লেনে আমার একটা দোতলা বাড়ি আছে, ইচ্ছা করলে—, কিন্তু বাড়িটার দরজা—

বাড়িটার দরজা কি?

একটা বাড়ির গেট পার হয়ে তবে দরজা—পিছনদিকে কিনা।

সে তো আরও ভাল। চল বাড়িটা কালই একবার দেখব।

বেশ।

বাড়িটা একটা বাড়ির পিছনের দিকে হলেও বেশ প্রশস্ত। দক্ষিণ-পশ্চিম খোলা। দোতলায় চারখানা ঘর, নীচের তলাতেও খানচারেক ঘর।

ডাঃ সান্যালের ভারি পছন্দ হয়ে গেল। বাড়ির পজিসনই বাড়িটা পছন্দ হওয়ার ডাঃ সান্যালের একমাত্র কারণ নয়, আমহার্স্ট স্ট্রীটে সুব্রতদের বাড়িটাও ঐ বাড়ি থেকে একেবারে খুব কাছে বললেই চলে, সেটাই হল মুখ্য কারণ।

থাকতে হলে এত কাছাকাছি থাকাই ভাল।

গলির মধ্যে কাছাকাছি গ্যারেজও পাওয়া গেল।

এবং এবারে আর ডাঃ সান্যাল নাম নয়, শশীপদ সান্যাল নাম নিয়ে—নেমপ্লেটে লেখা হল শ্রীশশীপদ সান্যাল, জমিদার।

একটা গাড়িও কেনা হল। একজন ভৃত্য, একজন ড্রাইভার ও রামুকে তার দেশ থেকে আবার চিঠি লিখে নিয়ে আসা হল।

শশীপদ সান্যালের নতুনভাবে জীবন শুরু হল আটান্ন বৎসর বয়সে।

মঞ্জরী মিশনে থাকতেই ডাঃ সান্যালের কাছে প্রাইভেটে পড়ে গত বৎসর ম্যাট্রিক পাস করেছিল, তাকে তার বিশেষ পীড়াপীড়িতে ডাঃ সান্যাল মধ্য-কলকাতার এক কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন।

মঞ্জরীরও নতুন জীবন শুরু হল।

·

মিশন হতে পালাবার পর নতুন পরিবেশে কলকাতায় রামমোহন সাহা লেনে দীর্ঘ আটটি মাস অতিবাহিত হয়ে গেল নিরুপদ্রবে এবং নির্বিবাদেই।

মঞ্জরী নিয়মিত কলেজে যাতায়াত করে। সমস্তটা দিন ডাঃ সান্যাল তার দোতলার নির্জন ঘরে বসে বই পড়ে, সংবাদপত্র পড়ে কাটায়, সন্ধ্যার পর অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে এলে গাড়িতে চেপে বেড়াতে বের হন—কোনদিন নির্জন গঙ্গার কূলে, কোনদিন গড়ের মাঠে, কোনদিন কার্জন পার্কে। পাড়ার লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবার সুযোগ নিজেও যেমন কোনদিন নেয়নি তাদেরও দেয়নি। পাড়ার লোকেরা জানে একজন অর্থশালী জমিদার পাড়ায় এসে বাড়িভাড়া করে রয়েছে এবং লোকটার প্রকৃতি অত্যন্ত দাম্ভিক ও আদপেই মিশুকে নয়।

মধ্যে মধ্যে ডাঃ সান্যালের মিশনের কথা মনে হত এবং এখনও নিয়মিত সে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে রামুর নামে অন্য এক ঠিকানা থেকে মিশনে সিস্টার রিটাকে পাঠিয়ে দেয়। ফাদার জোন্সের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা তাকে রাখতেই হবে।

সিস্টারকে ডাঃ সান্যাল জানিয়েছে একটা চিঠির মারফৎ, বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপারে কিছুদিনের জন্য তাকে মঞ্জরীকে নিয়ে দূরে যেতে হয়েছে, পরে বিস্তারিত জানাবে।

সিস্টার রিটা তার পত্রের আজ পর্যন্ত কোন জবাব দেননি।

॥ ২৬ ॥

কলেজের সহপাঠিনী মন্দিরার সঙ্গে মঞ্জরীর একটু ঘনিষ্ঠতা হয়।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে মন্দিরা। বাপ সতীনাথ এককালে কলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে নামকরা না হলেও প্রতিষ্ঠাপন্ন একজন চিকিৎসক ছিলেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের সময় একটা দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় মন্দিরার বয়স ছিল আট বৎসর ও তার একমাত্র দাদা ভাই আশীষের বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর।

সতীনাথের স্ত্রী, ওদের মা সরোজিনী বহুকষ্টে ছেলেমেয়ে দুটিকে মানুষ করেন।

গত বৎসরে আশীষ অর্থশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রী নিয়েছে এবং যদিও বারবার সে সবগুলি পরীক্ষাতেই প্রায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে জলপানি নিয়ে পাস করে এম. এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, কোন চাকরির সে চেষ্টাও যেমন করেনি ইচ্ছাও তেমনি নেই। গোটাচারেক টিউশনি করে, আর দিনরাত্রির বেশীর ভাগ সময় তার বাইরে বাইরেই কেটে যায়।

মন্দিরা কিন্তু তার দাদার ঠিক বিপরীত স্বভাবের। পড়াশুনা ছাড়া যেটুকু সময় পায় বাড়িতেই মার পাশে পাশে থাকে।

আশীষ সম্পর্কে তার মা কিছু না জানলেও বোন মন্দিরা অনেক কিছুই জানে। এবং মা কেবল এইটুকু জানেন, আশীষ তার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। সেই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হচ্ছে সাম্যবাদ।

আশীষের চেহারার মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল, যেটা সকলকেই প্রথম দর্শনেই প্রায় আকর্ষণ করত। রোগা পাতলা চেহারা, টকটকে গোরার মত গায়ের রং, লম্বায় পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির মত হবে, মুখের গঠনটা একটু লম্বাটে ধরনের, উদ্ধত খড়্গের মত ধারালো নাসা, টানা টানা দুটি চক্ষু, কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমে পুরু লেন্সের চশমা। ছোট কপাল, চওড়া দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া তৈলহীন রুক্ষ মাথার চুল, পরিধানে সর্বদাই ধোপদুরস্ত মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা লংক্লথের সাদা পাঞ্জাবি ও তার উপরে জহর কোট, পায়ে স্যান্ডেল।

সর্বদাই কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব।

বোন মন্দিরার চেহারা ভাইয়ের ঠিক অনুরূপ হলেও অন্যমনস্ক উদাস ভাবটি নেই। একটু যেন বেশী সাংসারিক। বোনটি তার ভাইকে দেবতার মতই ভক্তি করে এবং সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

মন্দিরাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে করতেই আশীষের সঙ্গে মঞ্জরীর আলাপ হয়। আলাপটা ক্রমে যেন ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গত মাসতিনেক ধরে।

মঞ্জরীর চোখে আশীষ এনেছে আদর্শের মোহস্বপ্ন।

ডাঃ সান্যাল ও মঞ্জরী, পিতা-পুত্রীর মধ্যে স্নেহ ও প্রেমের যে ফল্গুধারা এতকাল পরস্পরকে পরস্পরের কাছে ঘনিষ্ঠ ও অন্ধ করে রেখেছিল, সেখানে এসে সহসা দাঁড়িয়েছে আশীষ। পিতা ও পুত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এতদিন কোন সঙ্কোচ ভয় বা গোপনের কিছু ছিল না, গত এক মাস ধরে ডাঃ সান্যাল কিন্তু লক্ষ্য করছে, মঞ্জরী ও তার সম্পর্কের মধ্যে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

কিসের এ জিজ্ঞাসার চিহ্ন?

প্রায় আজকাল মঞ্জরীর গৃহে ফিরতে বিলম্ব হয়।

পূর্বে কলেজ হতে ফিরে মঞ্জরী ডাঃ সান্যালের সঙ্গেই সান্ধ্যভ্রমণে বের হত, এখন আর সেটা হয়ে ওঠে না, কারণ ডাঃ সান্যাল সান্ধ্যভ্রমণে বের হবার পর মঞ্জরী গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

জিজ্ঞাসা করায় বলে, মন্দিরা তার বান্ধবী, তার ওখানেই সে যায়, দুজনায় মিলে পড়াশুনা ও গল্প করে।

প্রথম প্রথম ডাঃ সান্যাল ভেবেছিল বাধা দেবে—নিষেধ করে দেবে, পরে আবার কি ভেবে বলতে গিয়েও বলতে পারেনি।

কিসের একটা সঙ্কোচ যেন এসে কণ্ঠস্বরকে রোধ করে দিয়েছে।

তাছাড়া ডাঃ সান্যাল লক্ষ্য করেছে, মঞ্জরীর ব্যবহার ও কথাবার্তায়ও যেন একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন অনুভব করা যায়, অথচ স্পষ্ট বোঝা যায় না।

ডাঃ সান্যাল মনে মনে নিজেকে তৈরী করতে থাকে, যুক্তিতর্ক দিয়ে একটা

মীমাংসায় উপস্থিত হবার জন্য কল্পনায় নিজেকে মঞ্জরীর মুখোমুখি দাঁড় করায়। শুধু সেই নয়, জীবনের এই অংশটা তার অবিসংবাদিতভাবে মঞ্জরীকে নিয়েই যে গড়ে উঠেছে—একমাত্র আশার স্বপ্ন বা অবলম্বন মঞ্জরীই।

মঞ্জরী তার, একান্তভাবে যে তারই। মঞ্জরীকে ছেড়ে ডাঃ সান্যাল একদিনও বাঁচবে না। বাঁচতে পারে না।

বন্ধ্যা নিষ্ফল জীবনের প্রেম ভালবাসা আজ একটিমাত্র কামনায় নিজেকে কেন্দ্রীভূত করেছে। বাৎসল্য—বুভুক্ষিত কামনা আজ মঞ্জরীকে একান্তভাবে আপন কুক্ষিমধ্যে নিজস্ব করেই যেন দুটি হাতে আঁকড়ে থাকতে চায়।

সেই মঞ্জরী যেন দূরে সরে যাচ্ছে! কেন? কিসের আকর্ষণে?

অনুসন্ধিৎসু মন গোপনে সতর্ক পদসঞ্চারে ফিরতে লাগল ডাঃ সান্যালের।

অন্ধকারে হঠাৎ যেন আলো দেখতে পেল ডাঃ সান্যাল সেদিন সন্ধ্যায়।

নিত্যকারের মত কার্জন পার্কে না গিয়ে ডাঃ সান্যাল সেদিন সাহেবপাড়ায় একটা সিনেমায় সন্ধ্যার শোতে একটা রাশিয়ান ছবি দেখতে ঢুকল।

দ্বিতলের ব্যালকনিতে একটা সীটে গিয়ে বসল ডাঃ সান্যাল।

প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার। শো শুরু হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

সহসা কাদের চাপা কথাবার্তায় ডাঃ সান্যালের শ্রবণেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে।

আমরা চাই সকলের সমান অধিকার। কেবলমাত্র ক্ষমতার হস্তান্তর নয় বা শাসক সম্প্রদায়ের অদলবদলে নয়—দেখ, আমাদের আশা বা স্বপ্ন ঐ রাশিয়ানদের জীবনের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু এ কি সম্ভব আশীষবাবু! যে শাসন ও শোষণ দীর্ঘকাল ধরে এদেশে চলে আসছে—

হ্যাঁ, তারই তো সংস্কার বা দ্রুত আমূল পরিবর্তনই আমরা চাই। ওরা বলে আমাদের কমিউনিস্ট। আসল অর্থ কি জান, সোস্যালিজম্—আজকে এই দীর্ঘদিনের ঘুণ-ধরা সমাজব্যবস্থার একটা উন্নততর দ্রুত পরিবর্তন!

ডাঃ সান্যালের চিনতে কষ্ট হয়নি মঞ্জরীর চাপা কণ্ঠস্বরকে।

পর্দার বুকে প্রতিফলিত ছবি তখন আর তাকে আকৃষ্ট করছে না, সমস্ত মন সমস্ত শ্রবণশক্তি তার সম্মুখে অন্ধকারে উপবিষ্ট দুটি দর্শককে কেন্দ্র করে যেন তোলপাড় হয়ে চলেছে!

কে ঐ যুবক আশীষ, মঞ্জরীর সঙ্গে?

এইজন্যই তাহলে মঞ্জরীর পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে ডাঃ সান্যাল ইদানীং!

একটা রাগ-বিদ্বেষ না নিরুপায় হতাশা, কি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ডাঃ সান্যাল।

আশীষ মঞ্জরী! মঞ্জরী আশীষ! দুটি নাম বার বার যেন সমস্ত মনকে আলোড়িত করে চলে।

ইণ্টারভ্যাল হল। প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বলে উঠল।

আলোয় প্রথম দেখতে পেল ডাঃ সান্যাল মঞ্জরী আর একটি অপরিচিত যুবক ঠিক তার সামনেই পাশাপাশি একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

ইন্টারভ্যালে আলো জ্বলে উঠলেও তারা পরস্পরের আলোচনায় মশগুল হয়ে আছে। আশেপাশে কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ পর্যন্ত নেই।

প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে উপবিষ্ট এতগুলো যে নর-নারী, এদের সবার হতে স্বতন্ত্র, সবার হতে পৃথক।

॥ ২৭ ॥

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উঠে দাঁড়াল ডাঃ সান্যাল।

ইন্টারভ্যালের পরে শো শুরু হবারও তর সইল না, নিদারুণ একটা অস্বোয়াস্তি, বিরাট একটা শূন্যতা যেন ডাঃ সান্যালকে অস্থির করে তোলে।

বেরিয়ে এল ডাঃ সান্যাল একেবারে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে।

সিনেমার গেটের সামনেই গাড়িটা পার্ক করা ছিল, ড্রাইভার রতনলাল গাড়ির ফ্রন্ট সীটে বসেছিল প্রভুর অনুপস্থিতিতে। গাড়িতে উঠে বসে ডাঃ সান্যাল শুধু বলে, বাড়ি!

গাড়ি চলতে শুরু করে। মাঝামাঝি আসতেই ডাঃ সান্যাল আবার বলে, গঙ্গার ধারে স্ট্র্যান্ড রোডে চল রতললাল।

রতনলাল বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল প্রভুর দিকে।

হ্যাঁ, স্ট্র্যান্ড রোড চল!

রতনলাল গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। হাইকোর্টের কাছাকাছি এসে গাড়ি থামিয়ে ডাঃ সান্যাল গাড়ি হতে নেমে পড়ল।

এইখানেই অপেক্ষা কর রতনলাল।

ডাঃ সান্যাল পদব্রজেই সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত এমন কিছুই হয়নি, অথচ রাস্তাটা একেবারে নির্জন এর মধ্যেই যেন হয়ে গিয়েছে।

প্রায় নিস্তব্ধ চওড়া রাস্তাটার দু পাশে ইলেকট্রিক বাতিগুলো কেবল একচক্ষুর জ্যোতি বিকীরণ করছে দপ দপ্ করে।

জোড়া ট্রাম লাইনের উপরে আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে মসৃণ ইস্পাত।

ক্বচিৎ কখনো এক-আধটা প্রাইভেট গাড়ি বা ট্যাক্সি কেবল সাঁ সাঁ করে ছুটে চলে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দ গতিতে।

এগিয়ে চলে অন্যমনস্কের মত ডাঃ সান্যাল নির্জন ফুটপাথটা ধরে।

গঙ্গার উপরে হাওড়ার আলোকমালা নৈশগগনে যেন ফুলের মালার মতই দুলছে। একটা সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাস্তুলের লাল-নীল আলোগুলো অন্ধকার আকাশপটে যেন দুটি ফুল।

ঝিরঝির্ করে বয়ে আসছে গঙ্গাবক্ষ হতে শুশীতল বায়ুপ্রবাহ্।

ফুটপাথ ছেড়ে ঢালু পাড় বেয়ে ডাঃ সান্যাল কিনারে এসে একেবারে দাঁড়াল।

জোয়ার এসেছে, গঙ্গার স্ফীত জলধারা ছল-ছলাৎ শব্দে ঢেউ তুলে তুলে মাটিকে স্পর্শ করে চলেছে। মঞ্জরী আর আশীষ!

তবে কার জন্য সেই দুর্যোগের রাত্রে পুলিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এল সে?

কোথায় আজ সে দাঁড়িয়ে আছে? মাটির বুকে ঘুণ ধরেছে অলক্ষ্যে, হতভাগ্য নিরুপায় সে টেরও পায়নি?

মঞ্জরী চলে যাবে!

মরুভূমির মধ্যে একটি মাত্র পুষ্পকলি, তা নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা ছিড়ে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছে—ছিনিয়ে সে নেবেই।

প্রৌঢ় অথর্ব শক্তিহীন আজ সে—দেউলিয়া। যৌবনের ঐ উদ্দামতাকে রোধ করবার মত ক্ষমতা আজ তার কোথায়?

কিন্তু এ কি? ভীরুর মত অশ্রুবিলাস কেন তার? কেন নিরুপায় হা-হুতাশ?

সে কালো ভ্রমর!

মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুর কোষে কোষে আবার যেন অগ্নিস্পর্শ লাগে। তীব্র দাহ শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়ে তরল অগ্নিপ্রবাহের মতই যেন খরবেগে বয়ে যাচ্ছে। অস্থির দুর্দম একটা শক্তি যেন বহিঃপ্রকাশের জন্য মুক্তির বেদনায় আকুলিবিকুলি করছে। নিষ্ফল আক্রোশে মাথা খুঁড়ে মরছে।

কালো ভ্রমর!

রক্তলোভী দস্যু কালো ভ্রমর যেন সহসা এতকাল পরে দীর্ঘ বন্দীত্বের বেদনায় প্রবল এক ঝাপটায় আড়মোড়া ভেঙে সুপ্ত সিংহের মত জেগে উঠল।

বাড়িতে ফিরে এসে বহুদিন পরে আজ আবার সিরিঞ্জ বের করে হাফগ্রেন মরফিয়া নিজের শরীরে ইনজেক্ট করে দিল ডাঃ সান্যাল।

তারপর বহুদিনকার অব্যবহৃত হাওয়াইন গীটারটা আলমারি হতে বের করে, ধুলো ঝেড়ে নিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে খোলা জানলার সামনে একটা চেয়ার টেনে এনে বসল ডাঃ সান্যাল।

টিং...টিং...টুং...

মধুর শব্দতরঙ্গ অন্ধকার কক্ষমধ্যে সুরের নির্ঝর জাগাল।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় মঞ্জরীকে আশীষ ট্যাক্সি করে বাড়ির গলিমুখে নামিয়ে দিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরতে এত রাত কোনও দিন হয়নি মঞ্জরীর। নিদারুণ ভয়ে বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। বাবা নিশ্চয়ই তার অপেক্ষায় এখনও জেগে আছেন। রাত্রে দুজনে একত্র আহার করা বহুদিনের অভ্যাস।

আশীষকে এত করে অনুরোধ করলে মঞ্জরী, তবু সে তার কথায় কর্ণপাত করলে না, সিনেমা ভাঙার পর লেকে টেনে নিয়ে গেল।

দুরু দুরু বক্ষে অন্ধকার গলিপথটা অতিক্রম করে নিজেদের বাড়ির দরজার সামনে এস দাঁড়াল মঞ্জরী।

সহসা এমন সময় কানে ভেসে এল তারযন্ত্রের সুমধুর সঙ্গীতের সুরালাপ।

কি অপূর্ব! কি মিষ্টি! মন্ত্রমুগ্ধের মতই মঞ্জরী আপনা হতেই যেন দাঁড়িয়ে যায়।

কোথা থেকে আসছে এমন মধুর তারযন্ত্রের সুরালাপ?

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা ওর নিজেরই মনে নেই, হঠাৎ খেয়াল হল রামুর ডাকে,

এ কি দিদিমণি! তুমি ভূতের মত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কেন? আমি একটু বাইরে গিয়েছিলাম দরজায় তালা দিয়ে...

লক্ষ্য করে মঞ্জরী এতক্ষণে, সদর দরজায় তালা ঝুলছে।—কোথায় ছিলে রামুদা?

গলির মাথাতেই তো ছিলাম। কই, তোমাকে তো আমি দেখতে পাইনি! কতক্ষণ এসেছ?

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, দরজাটা এখন খোল।

রামু দরজাটা খুলে সরে দাঁড়াল।

মঞ্জরী ভিতরে প্রবেশ করল। প্রত্যহ রাত্রি এই সময়টা ডাঃ সান্যালের নির্দেশমত এখানে আসবার প্রথম দিন হতেই রামু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আত্মগোপন করে চারিদিকে নজর রাখে।

দোতলায় উঠতে উঠতে মঞ্জরী প্রশ্ন করে, বাবা খেয়েছে রামুদা?

না। শুনছ না ঘরে বসে গীটার বাজাচ্ছেন!

গীটার বাজাচ্ছেন বাবা?

হ্যাঁ, বাবু তো বাজানই বরাবর। এবারে এসে এতদিন বাজাতে শুনিনি।

বাবা গীটার বাজাচ্ছেন! বিস্মিত মঞ্জরী সিঁড়ি অতিক্রম করে উঠতে উঠতে বলে, টেবিলে খাবারদাবার দাও রামুদা, আমি বাবাকে ডেকে আনি গিয়ে কাপড়টা ছেড়ে।

নিজের ঘরে প্রবেশ করে কোনমতে কলেজের শাড়িটা বদল করে মঞ্জরী হাত ধুয়ে পিতার বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

ঈষৎ ধাক্কা দিতেই ভেজানো দরজাটা খুলে গেল। অন্ধকার ঘর।

অন্ধকারের মধ্যে সুরের তরঙ্গ যেন উপচে পড়ছে।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সুরের মায়ায় মঞ্জরী যেন নিজেই আটকা পড়ে যায়—নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ডাকা আর হয় না বাবাকে।

আরও কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাজনা থামায়, একটানা অনেকক্ষণ বাজাবার পর। যন্ত্রটা একপাশে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালতেই অত্যুজ্জ্বল আলোয় কক্ষের মধ্যে দণ্ডায়মান মঞ্জরীকে দেখে সবিস্ময়ে ডাক্তার বলে ওঠে, এ কি, টুকুন!

এত সুন্দর গীটার বাজাও তুমি বাবা! কই, এতদিন কখনও তো বাজাওনি বাবামণি!

কখন ফিরলে টুকুন?

এই তো ফিরছি। একটু যেন ইতস্তত করে মঞ্জরী বলে।

এত রাত হল যে মা?

একটু দরকার ছিল বাবা।

হুঁ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। বিশ্রী একটা স্তব্ধতা—অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

মঞ্জরীর কেমন যেন অসহ্য লাগে, ধীরকণ্ঠে বলে, খেতে চল বাবামণি।

হ্যাঁ চল, আর শোন—

কি বাবামণি?

কালই আমরা এখান হতে চলে যাব টুকুন।

ডাক্তারের কথাগুলি যেন অতর্কিতে মঞ্জরী সর্বদেহে ও মনে একটা বৈদ্যুতিক

তরঙ্গাঘাত হানে। নিজের অজ্ঞাতেই ও ঘুরে দাঁড়ায় ও অর্ধস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করে, চলে যাব? কোথায়?

আপাতত লক্ষ্ণৌতে, তারপর—

কিন্তু বাবা, আমার পড়াশুনা, কলেজ?

ম্যাট্রিকের মত এবারেও তুমি প্রাইভেটেই পরীক্ষা দেবে।

কিন্তু বাবা, হঠাৎ আমরা কলকাতা ছেড়েই বা কেন চলে যাব?

প্রয়োজন হয়েছে বলেই যাব।

প্রয়োজন! হঠাৎ কি এমন প্রয়োজন হল বাবা? তুমি—

চল মা খেতে যাই। অনেক রাত হয়েছে। যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে বলেই বলছি, নচেৎ এখন কলকাতার বাসা না ভাঙলেও চলত।

কতকটা দৃঢ়স্বরেই যেন নিজের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে মঞ্জরীকে আর দ্বিতীয়বার প্রশ্নের বা প্রশ্নোত্তরের কোন সুযোগমাত্রও না দিয়ে খোলা দরজার দিকে গেল ডাঃ সান্যাল।

দুজনে এসে ডাইনিং টেবিলের সামনে বসল।

রামু আহার্য পরিবেশন করতে শুরু করে।

নিঃশব্দে আহার-পর্বটা যেন কতকটা গোঁজামিল দিয়েই শেষ হয়ে যায়।

অন্যান্য দিন এই সময়টা কত হাসি-গল্পে, আলাপ-কৌতুকে যেন ফুরাতেই চায় না। আজ কিন্তু অতি দ্রুত শেষ হয়ে গেল। কেউ কারও সঙ্গে কথাও বললে না।

মঞ্জরী ভাবছিল কালই চলে যেতে হবে! মাত্র রাত্রির এই কটি ঘণ্টা, আর দিনের বেলায় আগামীকাল—যে কয় ঘণ্টা সময় হাতে পাওয়া যায়!

আহার শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে ন্যাপকিনে হাত ও মুখ মুছতে মুছতে ডঃ সান্যাল রামুকে সম্বোধন করে বললে, কাল সাড়ে বারোটায় তুফান এক্সপ্রেসে আমরা লক্ষ্ণৌ যাব রামু। সকালে যতটা পারিস জিনিসপত্র গুছিয়ে দশটায় সিটি বুকিং অফিসে গিয়ে টিকিট কেটে সিট রিজার্ভ করে আসবি।

কথা কয়টি যেন একটানা এক নিঃশ্বাসে বলে শেষ করে ডাঃ সান্যাল ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রামু মঞ্জরীর মুখের দিতে তাকাল, ব্যাপার কি দিদি? হঠাৎ কালই বাবু লক্ষ্ণৌ চলেছেন?

জানি না রামুদা।

রামু সবিস্ময়ে তাকায় মঞ্জরীর দিকে। থমথম করছে সমস্ত মুখখানা, যেন নব আষাঢ়ের মেঘ।

মঞ্জরীও নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

রামুও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ ২৮ ॥

নিজের শয়নকক্ষে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্জরী ভাবছিল, এমন কি প্রয়োজন সহসা হল যার জন্য হঠাৎ কালই তুফান এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ যেতে হবে তাদের!

পিতার এরূপ অকারণ গাম্ভীর্যও মঞ্জরী কখনও দেখেনি। আজ সকালে কলেজে যাওয়ার আগে পর্যন্তও কিছুই ঠিক ছিল না, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এমন কি ঘটল যার জন্য তাদের অকস্মাৎ লক্ষ্ণৌ যাত্রার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল! চকিতে মানসপটে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে যায়, পুলিস নয় তো?

পুলিস?

পিতার অতীত জীবনের কয়েকটা পৃষ্ঠায় কি যেন একটা রহস্য গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

একটা আতঙ্ক! পিতার সদাশঙ্কিত পদবিক্ষেপ, সদা-জাগ্রত দুটি চক্ষুর ভীরু দৃষ্টি সর্বদা যেন কি একটা আশঙ্কায় প্রতীক্ষারত!

কিসের আশঙ্কা? কিসের এ সংশয়? কিসেরই বা প্রতীক্ষা?

কতদিন ভেবেছে মঞ্জরী, পিতাকে ঐ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, কিন্তু পারেনি। একটা অহেতুক কুণ্ঠা যেন কেবল পশ্চাৎ দিক হতে ওকে টেনে রেখেছে।

তার মনের জিজ্ঞাসার পথরোধ ঘটিয়েছে।

পিতার অতীত জীবনে কি এমন থাকতে পারে, কি সে পাপ, কি সে অন্যায়, যার জন্য পুলিসের লোকরা তাঁকে এমনি করে স্থান হতে স্থানান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! নিশ্চয়ই আছে কোন গ্লানি বা কলঙ্ক, যা আজও তাঁর বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়ে আছে সর্বদাই ভয়াবহ এক দুঃস্বপ্নের মত!

দশ বৎসর আগেকার অতীত জীবনের কথা মঞ্জরীরও। দুঃখ ও বেদনায় ভরা মা-বাপকে হারিয়ে সে এল মিশনে সিস্টার রিটার আশ্রয়ে। বাপ-মার নিজেরটুকুও আজ তার মনে নেই। বাবামণিই তাকে সহসা একদিন পরম স্নেহভরে দুহাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল—সাতটা বৎসর সেই স্নেহের অমিয়ধারাতেই তার সমস্ত সত্তা নিষিক্ত। বাবামণিই তার পরিচয়। বাবামণিই তার সব কিছু। কিন্তু আজ সেই বাবামণিকে ওর যেন ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট মনে হয়।

বাবামণিকে ঘিরেই তার আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন সব কিছু গড়ে উঠেছিল এতদিন। সহসা এল সেই ঝড়-বৃষ্টির রাত। মিশন ছেড়ে পালিয়ে এল দুজনে। নতুন করে ঘর বাঁধা হল এসে কলকাতা শহরে। মাত্র একটা বৎসর না যেতে যেতেই আবার দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে।

কিন্তু আশীষ?

আশীষ আজ তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। একদিকে পিতা, একদিকে আশীষ: দুদিকেই প্রবল আকর্ষণ।

কালই দুপুরে তাকে লক্ষ্ণৌ যেতে হবে, অথচ আশীষের কাছে বিদায় নেবার সময় হবে না।

আশীষকে না জানিয়েই সে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে! কাল সন্ধ্যায় ওয়াই. এম. সি. এ.-তে তার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে!

আশীষ এসে তার অপেক্ষায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। আকুল প্রতীক্ষায় বাব বার আশীষ রাস্তার দিকে তাকাবে।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে রাইটিং প্যাডটা নিয়ে বসল মঞ্জরী।

লিখলে ঃ

আশীষ,

হঠাৎ বাবার সঙ্গে কাল তুফান এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। কবে ফিরব, শীঘ্র ফিরব কিনা কিছুই এখনও স্থির নেই। লক্ষ্ণৌ পৌঁছে চিঠি দেব। যাওয়াটা এমন আকস্মিক হল যে, নিজেও জানতে পারিনি বলে সংবাদটা দিতে পারিনি আগে। পরে পত্রে বিস্তারিত জানাব।

চিঠিটা শেষ করে একটা খামে ভরে নাম ঠিকানা লিখে টেবিলের উপরে রেখে দিল মঞ্জরী। কাল সকালে যে কোন এক ফাঁকে রামুদাকে দিয়ে চিঠিটাকে ডাকে ফেলে দিতে হবে। আলোটা নিভিয়ে মঞ্জরী শয্যায় শুয়ে পড়ল।

মাথাটা যেন লোহার মত ভারী হয়ে উঠেছে। ঘুম আসবে না।

শয্যার উপরে চোখ বুজে পড়ে থাকলেও ডাঃ সান্যালেরও বিনিদ্র রজনী কাটছিল। সমস্ত ব্যাপারটার এমন একটা সহজ মীমাংসা শেষ পর্যন্ত হয়ে যাবে এ যেন চিন্তারও অগোচর ছিল।

আপাতত দুজনেই লক্ষ্ণৌ যাবে। রামু এখানেই থাকবে। কলকাতার বাসাটা ছাড়া হবে না। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই চলবে।

টুকুনকেও জানতে দেওয়া হবে না, তাকে সে সন্দেহ করেছে এবং একমাত্র তারই জন্য সহসা এই স্থান ও দেশ পরিবর্তন।

অভিশপ্ত জীবনের শেষ আলোর বিন্দু ঐ মঞ্জরী—টুকুন!

তাকে হারাতে এভাবে পারে না সান্যাল। দীর্ঘকাল ধরে যে আশা-বৃক্ষের মূলে সে জলসিঞ্চন করেছে, পত্রপল্লব পুষ্পে আজ সে মুকুলিত হয়ে উঠেছে, সমস্ত বুকভরা স্নেহ ও আশঙ্কা দিয়ে এত যত্নে যাকে সে আগলে এসেছে, তাকে অন্যে এসে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে! না না, প্রাণ থাকতে সে তা হতে দেবে না।

বৃদ্ধ হয়েছে কালো ভ্রমর সত্য, কিন্তু আজও সে মরে যায়নি।

তার দু বাহুতে এখনও যে সে অমিত শক্তি ধরে।

রাগে ও উত্তেজনায় সমগ্র শরীর যেন কাঁপছে। রক্তের মধ্যে যেন আক্রোশের একটা দুর্বার অগ্নিস্রোত খরবেগে বয়ে চলেছে।

দানবীয় একটা জিঘাংসায় শরীরের পেশীগুলি যেন সক্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু কার উপরে এই আক্রোশ?

টুকুনের উপরে কি? না আশীষের উপরে? না, তাও তো কই নয়!

তবে কি তার নিজের দুর্ভাগ্যের উপরেই?

হয়তো—হয়তো তাই।

যে দুর্ভাগ্য তাকে সারাটা জীবন ধরে শত বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে টেনেহিঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে নিয়ে চলেছে আজও, এ কি সেই নির্মম নিয়তির উপরেই?

নিয়তি—নির্মম নিয়তি। জীবনের সমস্ত সুখ আশা ও কল্পনার ভস্ম সমাপ্তি করেও তাকে মুক্তি দেবে না!

নিষ্ঠুর নিয়তি!

হয়তো—হয়তো বা তাই, নচেৎ জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কেন—কেন এ অভিশাপ? কেন এ চরম লাঞ্ছনা?

মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে তপ্ত লাভার স্রোত যেন বয়ে চলেছে।

না, কাল হয়তো সময় পাওয়া যাবে না।

যদি আশীষ তার চিঠি না পায়? যদি পথের মধ্যেই চিঠিখানা তার খোয়া যায়? উঠে বসল মঞ্জরী অন্ধকার ঘরে শয্যার উপরে।

রাত কটা হল? হাতঘড়িটা টেবিলের উপরে, এগিয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালাল মঞ্জরী।

রাত্রি সাড়ে বারোটা।

তা হোক, যত রাতই হোক, তাকে যেতেই হবে। হ্যাঁ, আজ রাত্রে এখুনি তাকে আশীষের ওখানে যেতে হবে।

চিঠিতে নয়, মুখেই সে বিদায় নিয়ে আসবে।

তাছাড়া এতক্ষণ তার মনে ছিল না, আশীষের একটা প্যাকেট তার কাছে জিম্মা আছে, জানে না অবশ্য মঞ্জরী প্যাকেটের মধ্যে কি আছে, এবং জানবার জন্য তার কোন কৌতূহলও নেই।

কিছুদিন আগে হঠাৎ আশীষদের বাড়ি পুলিস সার্চ করে, তারই আগের দিন সন্ধ্যায় ময়দানে গিয়ে আলোয়ানের তলা থেকে বের করে প্যাকেটটা ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, এই প্যাকেটটা তোমার কাছে আমি রাখতে চাই মঞ্জু!

কোন প্রশ্নাদি না করে মঞ্জরী নিঃশব্দে প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়েছিল।

কই, জিজ্ঞাসা তো করলে না মঞ্জু, প্যাকেটের মধ্যে কি আছে? প্রশ্ন করেছিল আশীষ।

কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই। তুমি যখন বললে না কি আছে, বুঝতে পেরেছি আমার জানবার প্রয়োজন নেই।

আশ্চর্য মেয়ে তুমি মঞ্জু, সহজাত নারীর কৌতূহলটা পর্যন্ত তোমার নেই!

মঞ্জরী আশীষের কথার কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে হেসেছিল। অন্ধকারে সে নিঃশব্দ হাসি যদিচ আশীষের দৃষ্টিতে পড়েনি।

আশীষ বলেছিল, তোমার এই প্রকৃতিটা জানি বলেই এটা একমাত্র তোমার হাতেই তুলে দিতে ভরসা পেয়েছি—চল ফেরা যাক।

মঞ্জরীর মনে পড়ে, সেই প্যাকেটটা যাবার আগে আশীষের হাতে তুলে দিয়ে যেতে হবে। অতি দ্রুত মঞ্জরী বেশ পরিবর্তন করে নিল। পায়ে এঁটে নিল ক্রেপসোলের চম্পলটা। গায়ে জড়িয়ে নিল একটা সাদা চাদর। বাক্স হতে আশীষের দেওয়া প্যাকেটটা বের করে আলো নিভিয়ে ঘর হতে বের হয়ে এল।

দালানেই একটা পেরেকের সঙ্গে ঝোলানো থাকে বাড়ির ও গ্যারেজের চাবি।

মঞ্জরী ডাঃ সান্যালের কাছে ড্রাইভিং শিক্ষা করেছিল, গ্যারেজ হতে গাড়িটা নিয়ে যাওয়াই সে স্থির করে। বিশেষ করে এত রাত্রে অতদূরে আশীষের গৃহে যেতে হলে কোনপ্রকার যানবাহনই মিলবে না।

নির্দিষ্ট জায়গা হতে চাবিটা নিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল মঞ্জরী অন্ধকারেই হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে। খিল ঘুলে সদরের বাইরে এল।

আগে হতেই মতলব করেছিল, সদরে তালা-চাবি লাগিয়ে যাবে।

গ্যারেজ হতে গাড়ি বার করে বড় রাস্তায় পড়ে গাড়িতে স্পীড দিল মঞ্জরী।

নিস্তব্ধ রাত্রির জনহীন শূন্য রাস্তা। একদম ফাঁকা। হাওয়ার গতিতে গাড়ি ছুটে চলল।

মঞ্জরীর মনের মধ্যেও চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে।

॥ ২৯ ॥

ঠিক বড় রাস্তা নয়, আবার রাস্তাটা অপ্রশস্ত নয়।

আশীষদের বাড়ির সামনে এসে গাড়ি হতে নামল মঞ্জরী। দোতলা বাড়ি। বাড়ির নীচেকার একটা ঘরেই আশীষ থাকে মঞ্জরী জানত।

আশ্চর্য এত রাত্রে আশীষের ঘরে আলো জ্বলছে? তবে কি আশীষ এখনও জেগে আছে?

বুকের মধ্যে যেন ঝড় বয়ে চলেছে। পা দুটো যেন লোহার মতই ভারী মনে হয়। টেনে টেনে এগিয়ে চলে মঞ্জরী।

জানালার নীচের কবাট দুটো বন্ধ—উপরের দুটো খোলা।

ঘরে যে আলো জ্বলছে তা পথের উপর থেকেই দেখা যায়।

সভয়ে মঞ্জরী রাস্তার এ-মাথা হতে ও-মাথা পর্যন্ত একবার খুব অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলে।

শূন্য। খাঁ খাঁ করছে রাস্তাটা এদিক হতে ওদিক যতদূর নজর চলে।

ঝিম্‌ঝিম্ করছে যেন মধ্যরাত্রির জমাট হিমস্তব্ধতা। কেউ কোথাও নেই। শুধু রাস্তার দু-পাশে দূরে দূরে গ্যাসবাতিগুলো যেন চক্ষু মেলে গভীর রাতের অভিসারিণীকে পর্যবেক্ষণ করছে।

কপালের উপরে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে ভীরু সঙ্কুচিতা মঞ্জরী জানালাটার নীচে গিয়ে দাঁড়াল। ডাকলো মৃদুকণ্ঠে, আশীষবাবু—আশীষ?

একবার দুবার তিনবারের বার ডাকতেই খুট করে নীচের জানালাটার কবাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল, দেখা গেল আশীষের কোমর পর্যন্ত দেহের উপরিভাগ।

মাথার চুল এলোমেলো, গায়ে গেঞ্জি একটা মাত্র।

কে?

আমি মঞ্জরী, দরজাটা খোল।

মঞ্জু! সবিস্ময়ে প্রশ্নটা অর্ধোচ্চারিত হয়েই যেন আটকে গেল আশীষের কণ্ঠে।

হ্যাঁ আমি, তাড়াতাড়ি দরজাটা খোল।

বিহ্বল হতচকিত আশীষ দরজাটা খুলে দিতেই মঞ্জরী দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে টেনে টেনে শ্বাস নিতে থাকে।

উত্তেজনায় এখনও সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

চল ঘরে তোমার—

দুজনে এসে আশীষের কক্ষে প্রবেশ করল।

আশীষ যেন কেমন বোবা বনে গিয়েছে। মঞ্জরী এত রাত্রে তার ঘরে!

চোখে-মুখে একটা সুস্পষ্ট উত্তেজনা।

মঞ্জু, এত রাত্রে? কোনমতে প্রশ্নটা করে আশীষ।

হ্যাঁ, উপায় ছিল না এই মাঝরাত্রেই আসা ছাড়া। কাল দুপুরে আমরা লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছি। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো যেন বলে ফেলে মঞ্জরী।

কাল লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছ? হঠাৎ?

হঠৎই। রাত্রে বাড়িতে ফিরে গিয়েই শুনলাম। বাবা লক্ষ্ণৌ যাওয়া একেবারে স্থির করে ফেলেছেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আশীষ।

বাইরে নিঝুম রাত্রি স্তব্ধতার অতলতলে যেন ডুবে গিয়েছে।

তারপর একসময় আশীষই আবার প্রশ্ন করে, কবে ফিরবে?

জানি না।

আবার দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এই তোমার সেই প্যাকেটটা যা আমার কাছে ছিল, নিয়ে এলাম!

প্যাকেটটা এগিয়ে দিল মঞ্জরী।

হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল আশীষ।

ঠিক এই সময়ে বাইরে সাইকেলের ঘণ্টি শোনা গেল—ক্রিং ক্রিং!

চমকে এগিয়ে গেল আশীষ জানালার কাছে, বাইরে দৃষ্টিপাত করেই বললে, সুকান্ত! এত রাত্রে? কি ব্যাপার?

জরুরী মেসেজ নিয়ে এসেছি আশীষদা। দরজাটা খুলুন।

দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আশীষ দরজাটা খুলে দিতেই কুড়ি-বাইশ বছরের একটি যুবক কক্ষে এসে প্রবেশ করল, ভূপতিদা আমাকে পাঠালেন। আজ শেষরাত্রেই নাকি আমাদের দক্ষিণেশ্বরের সমিতির বাড়ি পুলিসে সার্চ করতে আসছে, ঘণ্টা দুই আগে গীতা খবর পাঠিয়েছে।

গীতাকে মঞ্জরীও চেনে। সাউথ ক্যালকাটার ডি. সি.-র মেয়ে গীতা।

ভূপতিদা আপনাকে এক্ষুনি একবার যেতে বলেছেন!

উদ্বেগ ও আশঙ্কা যেন সুকান্তর কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য, এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা দেয় না আশীষের ব্যবহারে!

একান্ত শান্ত নির্বিকার কণ্ঠে আশীষ বলে, তোমাকে এত রাত্রে আমার কাছে না পাঠিয়ে ভূপতির নিজেরই সব ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তুমি ফিরে যাও কান্ত। বাগানের দক্ষিণ কোণে বকুলগাছতলায় আর্মস ও অ্যামুনিসানগুলো একটা বাক্সের মধ্যে পোঁতা

আছে, সেগুলো কোন নিরাপদ জায়গায় সর্বাগ্রে সরিয়ে ফেলতে বলগে—আমি আসছি।

সুকান্ত চলে গেল আদেশ নিয়ে।

আশীষ গায়ে জামাটা দিতে দিতে মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, তুমি কিসে এখানে এসেছ মঞ্জু?

গাড়ি নিয়ে এসেছি।

বেশ, তুমি বাড়ি ফিরে যাও। যাওয়ার আগে বোধ হয় তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। বলতে বলতে আশীষ জুতোর স্ট্র্যাপটা এঁটে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

ড্রয়ার থেকে চাবিটা বের করে বাক্স খুলে কয়েকটা নোট পকেটে পুরে নিল।

ঘরের এক কোণে কতকগুলো পুরাতন জুতোর বাক্স পড়েছিল, সেগুলোর একটার মধ্যে থেকে একটা পিস্তল বের করে কোমরে গুঁজে নিল।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত্রি পৌনে দুটো।

নিম্নস্বরে আশীষ যেন কতকটা স্বগতোক্তিই করলে, আমি জানি এ কার কাজ! ভূপতিকে বার বার তখন মানা করেছিলাম নিরঞ্জনকে দলে না নিতে, আমার কথা সে শুনল না!

চমকে ওঠে মঞ্জরী।

নিরঞ্জন চৌধুরী—দেবকুমারের মতই প্রশান্ত সুন্দর চেহারা!

হাসি ছাড়া যার মুখে কথা নেই, অমন সুন্দর গান গায়, অমন চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতে পারে—শেষ পর্যন্ত সে-ই কিনা এই কাজ করতে পারে!

মঞ্জরীর মনের চিন্তাটা কথায় প্রকাশ হয়ে পড়ে, কি বলছ তুমি, নিরঞ্জনবাবু—

খুব আশ্চর্য হচ্ছ, না? আমি কিন্তু আদপেই আশ্চর্য হইনি মঞ্জরী।

কেন? প্রশ্নটা যেন আপনা হতেই মঞ্জরীর কণ্ঠ হতে নির্গত হয়ে আসে।

যদি কোনদিন সময় পাও, ভারতবর্ষের গত পৌনে দুই শত বৎসরের জাতির সংগ্রামের ইতিহাসের পাতাগুলো ওল্টালেই তোমার ও প্রশ্নের জবাব পাবে মঞ্জু। যাক চল—

ঘরের এক কোণে আশীষের সাইকেলটা দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো ছিল। সাইকেলটা নিতে নিতে আশীষ বলে, নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে না জানি, তবু একবার দক্ষিণেশ্বরের সমিতিতে যাবার আগে শ্যামবাজারে তার বাড়িতে খোঁজ করে যেতে হবে।

সাইকেল হাতে প্রথমে আশীষ, পশ্চাতে মঞ্জরী রাস্তায় এসে নামল।

তুমি দক্ষিণেশ্বরের সাইকেলেই চেপে যাবে নাকি? মঞ্জরী প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। আচ্ছা চলি—

দাঁড়াও।

মঞ্জরীর কথায়, আশীষ সাইকেলের প্যাডেলের উপরে পা দিয়ে আরোহী হচ্ছিল, পা-টা নামাল, কি?

চল তোমাকে আমি গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসি—

প্রয়োজন হবে না। তুমি যাও।

না।

মঞ্জরীর কণ্ঠস্বরের সুস্পষ্ট দৃঢ়তা যেন আশীষকে বিস্মিত করে।

না কি?

আমিও তোমার সঙ্গে যাব সমিতিতে।

তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

না, ক্ষেপে এখনও যাইনি। আমি যাব।

ভয় নেই মঞ্জু, আশীষের হাতে যতক্ষণ পিস্তল আছে, কারও সাধ্য নেই তাকে জীবন্ত ধরে। তাছাড়া তুমি তো জান, ধরা দেওয়ার নীতি আমার নয়। মুক্ত থাকতে যদি পারি, আজকের প্রতিষ্ঠান ভেঙে গেলেও আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারব এরকম প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ধরা পড়লে সে সম্ভাবনার মূলেই কোপ পড়বে।

তাই যদি হয়, তবে কেন আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে চলেছ?

আমাকে যেতেই হবে। অনেক জরুরী প্ল্যান ও জিনিসপত্র আছে, শেষ চেষ্টা একবার করে দেখব, সেগুলো ওদের হাত থেকে বাঁচানো যায় কিনা।

মা হয় সেগুলো গেলই।

শুধুই তাই নয় মঞ্জরী, ভূপতি রাধেশ শৈবাল ও সুকান্ত এদেরও তো আমরা হারাতে পারি না। যেমন করেই হোক, এদের আমাদের বাঁচাতেই হবে। আমাকে যেতেই হবে।

আশীষ আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে প্যাডেলের উপরে ভর দিয়ে সাইকেলে উঠে বসে সাইকেল চালিয়ে দিল।

ক্রমচলমান সাইকেলের উপরে আশীষের দেহটা রাস্তার আলোছায়ায় দূরে দূরে মিলিয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে মঞ্জরী চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল।

গ্যারেজে পৌঁছে গাড়িটা গ্যারেজে তুলে মঞ্জরী গলিপথে বাড়িতে গিয়ে দরজার তালা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল।

সোজা নিজের শয়নকক্ষে এসে শয্যার উপরে এসে বসল।

অন্ধকার ঘর। বাইরে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আশীষের কথাই বার বার মনে পড়ছে মঞ্জরীর। দক্ষিণেশ্বরে যাবার পথে আশীষ শ্যামবাজারে নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে যাবে। আশীষকে মঞ্জরী খুব ভালই চেনে, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মত শান্ত নির্বিকার, বাইরে থেকে বুঝবারও উপায় নেই। অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে রক্তচক্ষু সে যখন মেলবে, অগ্নিস্রাবী রোষ তার মুহূর্তে পুড়িয়ে ঝলসে সব শেষ করে দেবে আগ্নেয়গিরির রোষবহ্নির মতই। সে সময় সেই অনিবার্য ধ্বংসোন্মাদনাকে রোধ করে কারও সাধ্য নেই।

নিরঞ্জনকে আশীষ ক্ষমা করবে না। এই সময় আশীষের সঙ্গে নিরঞ্জনের সাক্ষাতের মানেটা মঞ্জরীর নিকট দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ।

এত বড় অন্যায়কে আশীষ কোনমতেই মুখ বুঝে সহ্য করবে না।

ঘরের মধ্যে যেন অসহ্য গুমোট বোধ হয়।

বাইরের সমস্ত বায়ু-চলাচল যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আকাশের এক প্রান্তে খানিকটা মেঘও স্তূপ বেঁধে উঠেছে। রাত্রি শেষ হতে আর কত দেরি!

॥ ৩০ ॥

শ্যামপুকুর স্ট্রীটে একটা ব্লাইন্ড লেনের মধ্যে শেষপ্রান্তের গেটওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়িটাই রায়বাহাদুর সুশান্ত মল্লিকের। রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্রই নিরঞ্জন মল্লিক।

বাইরে থেকে গলিপথে দাঁড়িয়ে বুঝবার উপায়ও নেই বাড়িটা কত বড়।

প্রায় চৌদ্দ কাঠা জমির উপর প্রকাণ্ড বাড়ি, পশ্চাতের দিকে যেন ডানা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে ঘুপটি মেরে আত্মগোপন করে।

সাইকেলটা গেটের এক পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে দারোয়ান হুকুম সিংকে ডাকল আশীষ।

গেটের এক্‌েবারে লাগোয়াই দরোয়ানের ঘর।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। দুবার ডাকতেই হুকুম সিং চোখ মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল, কৌন হো?

হুকুম, গেট থোরা খোল। আমি আশীষবাবু।

আশীষ এ বাড়িতে বিশেষ পরিচিত এবং আশীষের এ বাড়িতে যাওয়া-আসার কোন ধরা-বাঁধা টাইমও নেই। দারোয়ান জানে, আশীষবাবু দাদাবাবুর বিশেষ বন্ধু। হুকুম ফটক খুলে দিল।

সাইকেলটা দারোয়ানের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে কাঁকর-বিছানো পথ ধরে আশীষ অগ্রসর হল।

আশীষ জানে নিরঞ্জন নীচেরই একটা ঘরে বরাবর শোয়। দক্ষিণ দিকের ঘরটা। নির্দিষ্ট ঘরে খোলা জানলাটার নীচে এসে দাঁড়াল আশীষ, লাফিয়ে জানালার ফ্রেমটা ধরে ব্যালেন্সের সাহায্যে গরাদহীন জানালাটা টপকে ভিতরে প্রবেশ করল। এ কক্ষের প্রতিটি খুঁটিনাটি আশীষের পরিচিত। সুইচ টিপে আলোটা প্রথমেই জ্বেলে দিল।

না, নিরঞ্জন তাহলে ঘরেই আছে! পালঙ্কের উপরে ধবধবে শয্যায় সূক্ষ্ম নেটের মশারির তলে গাঢ় নিদ্রাভিভূত নিরঞ্জন।

মশারি তুলে ঘুমন্ত নিরঞ্জনের গায়ে ঠেলা দিয়ে আশীষ ডাকল, নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!

কে?

ঘুমজড়িত চোখ মেলে তাকাল নিরঞ্জন।

আমি আশীষ। ওঠ।

আশীষ! এত রাত্রে! কি ব্যাপার?

চটপট। এখুনি আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বের হতে হবে।

কোথায়?

ব্যস্ত কি, চল না—দেখবে'খন। নাও ওঠ।

বোকার মতই ফ্যালফ্যাল করে তাকায় নিরঞ্জন আশীষের শান্ত নির্বিকার মুখের দিকে। মাথার মধ্যে ঘুমের নিষ্ক্রিয়তা যেন এখনও আছে। সমস্ত দেহজুড়ে ঘুমের অবসন্নতা।

আলনা থেকে একটা সার্ট টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে জুতোটা পায়ে গলাতে গলাতে নিরঞ্জন আবার প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার বল তো আশীষ? এত রাত্রে কোথায় যাবে?

চলই না। জায়গায় গেলে সব জানতে পারবে। দেরি করো না, বিশেষ জরুরী।

দুজনে বাইরে দরজা খুলে বের হয়ে এল।

বাইরে বারান্দায় পা দিয়েই আশীষ প্রশ্ন করে, তোমার গাড়ি গ্যারেজেই তো?

হ্যাঁ।

চল, গাড়িটা বের কর।

নিরঞ্জন কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতই আশীষের আদেশগুলো পালন করে যায়।

গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে আনতেই আশীষ নিরঞ্জনকে পাশে বসতে বলে নিজেই ড্রাইভিং সীটে গিয়ে উঠে বসল।

আশীষের সাইকেলটা গাড়ির ব্যাকে তুলে নেওয়া হল।

আশীষ গাড়ি চালিয়ে গলিপথ অতিক্রম করে প্রথমে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে এসে পড়ল, তারপর সোজা এগিয়ে নয়ারাস্তা ধরল।

নিরঞ্জন নির্বাক।

গাড়ি শ্যামবাজারের চৌমাথা পার হয়ে, টালা ব্রীজ পার হয়ে বি. টি. রোডে পড়ে হাওয়ার বেগে ছুটে চলল। এতক্ষণে নিরঞ্জন আবার কথা বলবার অবকাশ পায়, কোথায় চলেছ বল তো?

বুঝতে পারছ না! অদ্ভুত ঠাণ্ডা যেন আশীষের কণ্ঠস্বর।

না। বোকার মতই প্রত্যুত্তর দেয় নিরঞ্জন।

আশ্চর্য! বোঝা উচিত ছিল এতক্ষণে তোমার নিরঞ্জন। নিরঞ্জনের কথার জবাব দিলেও, আশীষের খরদৃষ্টি কিন্তু সামনের প্রসারিত জনহীন রাস্তাটার উপরে ন্যস্ত।

নিরঞ্জনের দৃষ্টি গাড়ির স্পিডোমিটারের কম্পমান কাঁটাটার উপরে গিয়ে পড়ে।

আলোকিত স্পিডোমিটারের ডায়ালের কাঁটাটা থরথর করে ৫০-৫৫র মধ্যে কাঁপছে।

সর্বনাশ! এত জোরে গাড়ি চালাচ্ছে কেন আশীষ?

কাঁটা আবার উঠছে—৬০। তাও বুঝি ছাড়িয়ে যাবে।

পাগল হল নাকি আশীষ! এ করছে কি ও! তাড়াতাড়ি উত্তেজনায় আশীষের স্টিয়ারিংয়ের উপর ন্যস্ত সুদৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ বাম হাতটা চেপে ধরে নিরঞ্জন ব্যাকুলকণ্ঠে বলে ওঠে, কি করছ কি! অত জোরে চালাচ্ছ কেন, অ্যাকসিডেন্ট হবে যে!

ভয় করছে নাকি? তোমার গাড়ি তো নূতন—তাছাড়া তুমি তো জান অ্যাকসিডেন্ট আমার হাতে হয় না!

আশীষের কণ্ঠস্বরে তিলমাত্রও উত্তেজনার আভাস নেই, একান্ত নিরাসক্ত ও শান্ত। আশীষের এরূপ পরিচয় ইতিপূর্বে নিরঞ্জনের কখনও চোখে পড়েনি।

কী এক গভীর উত্তেজনায় আশীষ যেন ঊর্ধ্বমুখী অগ্নিশিখার মতই জ্বলছে।

আশীষ, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

খুব জোরে গাড়িটা মোড় ফিরতে গিয়ে খানিকটা স্কিড করে গেল। মেটাল নির্মিত রাস্তার উপরে রবারের দ্রুত ঘর্ষণে একটা ঘ্যাস্-স শব্দ জেগে উঠল।

স্টিয়ারিংটাকে সোজা করতে করতে আশীষ বললে, ক্ষেপে যাবার কথা বটে! কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছ বোধ হয় আমাদের গন্তব্যস্থলটা!

দক্ষিণেশ্বর?

হ্যাঁ, দক্ষিণেশ্বরের সমিতিতে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, আর ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে পুলিস আসছে আমাদের সমিতি রেইড করতে।

রেইড করতে! কি বলছ আশীষ?

আমারও তো সেই প্রশ্নই তোমাকে নিরঞ্জন। হঠাৎ তারা রেইড করতে বা আসছে কেন?

হঠাৎ মস্তিস্কে যেন একটা তীব্র আঘাত পেয়েছে নিরঞ্জন।

সমস্ত দেহটা যেন অকস্মাৎ তার বরফের মতই জমাট বেধে গিয়েছে।

গাড়ি গন্তব্যস্থানে এসে গিয়েছিল।

পুরাতন একখানা বাগানবাড়ি, খোলা গেটের মধ্য দিয়ে আশীষ গাড়ি নিয়ে সোজা এসে ভিতরে প্রবেশ করল।

খানিকটা এগিয়ে গিয়েই বাড়ির সদর দরজা।

দরজাটা হা-হা করছে খোলা, সদর দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে সুকান্ত।

গাড়িটা আসতে দেখে সুকান্ত এগিয়ে আসে একটু।

গাড়ি থামিয়ে নিজে গাড়ি থেকে নেমে পাশেই উপবিষ্ট নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে আশীষ যেন হুকুমজারীই করে, নেমে এস নিরঞ্জন।

কে? আশীষদা?

হ্যাঁ। এস নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন কিন্তু গাড়ি থেকে নামে না। সে যেমন বসেছিল তেমনই বসে থাকে। নিরঞ্জনের কণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছে। কপালের উপরে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বজ্র-নির্ঘোষে যেন আশীষের কণ্ঠে আবার আদেশ ধ্বনিত হয়, নিরঞ্জন, নেমে এস!

সুকান্তও ইতিমধ্যে আশীষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিরঞ্জন!

আশীষ এবারে হাত বাড়িয়ে নিরঞ্জনের একখানা হাত চেপে ধরে বাইরের দিকে আকর্ষণ করে, এস, নেমে এস!

নিরঞ্জন নেমে এল।

পাশাপাশি আশীষ ও নিরঞ্জন, পশ্চাতে সুকান্ত। সকলে এসে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

নীচের তলাটা অন্ধকার, কিন্তু পথ চলতে ওদের কষ্ট হয় না।

সিঁড়ি বেয়ে সকলে উপরে উঠে এল। লম্বা টানা বারান্দাটা অতিক্রম করে শেষ-প্রান্তের ঘরের খোলা দরজাপথে সকলে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

ঘরটা বেশ প্রশস্ত। দেওয়ালের গা ঘেঁষে গোটাচারেক পুরাতন বার্নিশচটা আলমারি, পুস্তকে ঠাসা। সমিতির লাইব্রেরী-ঘর। মধ্যস্থলে একটা চতুষ্কোণ বৃহৎ আকারের টেবিল। টেবিলটার চারপাশে দুটো বেঞ্চ পাতা ও খান-দুই ভাঙা চেয়ার। বেঞ্চের উপর বসেছিল সমিতির সেক্রেটারী ভূপতি ও রাধেশ এবং একটা চেয়ারের উপরে বসে শৈবাল। আশীষকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে একসঙ্গেই প্রায় সকলে উঠে দাঁড়ায়।

প্রত্যেকের মুখেই যেন একটা চিন্তার কালো ছায়া নেমেছে।

ভূপতিই প্রথমে কথা বললে, এই যে আশীষদা, তুমি এসে গেছ! নিরঞ্জনও এসেছে দেখছি!

হ্যাঁ। বকুলগাছের তলায় যেগুলো ছিল, সরানো হয়েছে ভূপতি?

তুলে আনা হয়েছে, পাশের ঘরে আছে— তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আশীষদা।

সুকান্ত?

আশীষের ডাকে সুকান্ত সামনে এসে দাঁড়াল। দলের মধ্যে সুকান্তরই সর্বাপেক্ষা বয়স কম। কুড়ি-একুশের বেশি নয়।

সুকান্তর পাতলা দোহারা চেহারা। গায়ের বর্ণ শ্যাম। মাথায় কোঁকড়া চুল। উপরের ওষ্ঠের ওপর সরু গোঁফের কালো রেখা। ভাসা-ভাসা দুটি স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি। টিকল নাসা। নাকের উপরে এঁটে বসে আছে কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা।

সুকান্ত কবি। প্রেসিডেন্সিতে থার্ড ইয়ারের ছাত্র।

দক্ষিণেশ্বরেই মামার বাসায় থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জরি করে।

হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে সুকান্তর দিকে চোখ তুলে আশীষ বলে, কবি, এখুনি জিনিসগুলো তোমাকে নিয়ে তোমাদের বাড়ির পিছনে যে ডোবাটা আছে তার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে ফেলতে হবে। যাও—Quick!

সুকান্ত আদেশপালনে অগ্রসর হতেই আশীষ আবার বললে, হ্যাঁ, শুধু মেশিনগানটা ও দুটো রিভলভার রেখে যাবে। আর—

সুকান্ত আশীষের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

আর you need not come back! পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাসাতেই থাকবে।

সুকান্ত মাথা নীচু করে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল।

ভূপতি? আশীষ ভূপতিকে এবারে ডাকল।

বল।

পাহারা দিচ্ছে কে রে?

যতীন, বিনয় আর প্রিয়তোষ।

ঠিক আছে। বলতে বলতে আশীষ নিরঞ্জনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, নিরঞ্জন, তুমি যে কূটনৈতিক চালটি চেলেছ, আমি সেটা সফল হতে দেব না। আমাদের এতগুলো লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুমি এইভাবে নষ্ট করে দেবে, এও আমি হতে দেব না। কিন্তু কেন তুমি এ কাজ করলে নিরঞ্জন? কেন করলে?

আমাকে তুমি ক্ষমা কর আশীষ।

ক্ষমা? সমস্ত দেশের কাছে তুমি অপরাধী। আমি একা তোমাকে ক্ষমা করবার কে? তবু একটা কথা তোমার জানা প্রয়োজন, বেশী দিন আর তোমাদের এ মনোবৃত্তির কায়েমী স্বত্ব বজায় থাকবে না। বোঝাপড়ার যে দিনটা এগিয়ে এসেছে, তোমরা আর তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। অবশ্যম্ভাবীকে কেউ কোন দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, তোমরাও পারবে না। নতুন করে আজ আবার সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে গড়ে তুলবার প্রয়োজনকে কারও সাধ্য নেই আজ আর ঠেকিয়ে রাখে। মানুষের সহজ জীবনের দাবি ও বাঁচবার অধিকারকে যে বঞ্চনার মধ্যে এতকাল ধরে নিষ্পেষিত করা হয়েছে, তাকে

আজ মুক্তি দিতেই হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠানটিই এর সবটুকু নয়, মাটির মধ্যে এর মূল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আজ। অতএব বুঝতেই পারছ, তোমরা ও তোমাদের পুলিসবাহিনী ছোট্ট এই সমিতিটাকে গলা টিপে হত্যা করলেও এর মৃত্যু নেই!

সহসা এমন সময় যতীন এসে হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করল, ভূপতি!

কি খবর যতীন? ওরা এসে পড়েছে বুঝি? ভূপতির হয়ে আশীষই যতীনকে প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ।

আসতে দাও।

কিন্তু—

ভয় নেই, ধরা আমরা কেউ দেব না। যুদ্ধ করে ওদের হটিয়ে না দিতে পারি—প্রাণ দিতে তো পারব! ভূপতি, be ready, quick!

কমানডারের আদেশ বিঘোষিত হল।

বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী

॥ ৩১ ॥

তাহলে তুই বলতে চাস কিরীটী, গত বৎসরখানেক ধরে বিহারের ফাদার জোন্সের মিশন থেকে সেরাত্রে আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসে সে আমাদের নাকের ডগাতেই বাসা বেঁধে আছে!

হ্যাঁ বন্ধু এবং কালো ভ্রমর বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। নইলে এত বড় দুঃসাহস আর কারোরই হত না। কিরীটী জবাব দেয়।

সন্ধ্যার দিকে কিরীটীর টালিগঞ্জের বাড়িতে বসে কিরীটী ও সুব্রতর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল।

অবশ্য এ সংবাদটা তোরই আগে পাওয়া উচিত ছিল সুব্রত, তুই যদি সোজা পথটা ছেড়ে ঘোরাপথে ঘুরে না বেড়াতিস, এ সংবাদটা তোর কাছে এতদিন গোপন থাকত না।

ঘোরাপথে মানে?

ডাঃ সান্যাল যত বড়ই দোষী ও শয়তান হোক না কেন, এমন কতকগুলো বিশেষত্ব তার চরিত্রে আছে, যা আমার মত লোককেও বরাবর মুগ্ধ করেছে, একথা তো তুই আমার মুখেও বহুবার শুনেছিস। বহুবার বলেছি, কালো ভ্রমর—ডাঃ সান্যাল সাধারণ শ্রেণীর criminal নয়। দোষগুণ নিয়েই মানুষ। এ পর্যন্ত কালো ভ্রমরের যাবতীয় কুকার্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, circumstances-ই এ পথে তাকে টেনে নিয়ে এসেছে। অবশ্য পরবর্তী ঘটনাগুলোর মধ্যে সান্যালের মানসিক একটা বিপ্লব, স্বেচ্ছাচারিতা ও অসংযমের পরিচয় পাই—যা তাকে মানুষের পরিচয়ের একেবারে নিম্নস্তরে টেনে এনে নামিয়েছিল—ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, সমাজদ্রোহী করে ফেলেছে। এবং সে কারণে সমাজ ও মানুষের কৃষ্টিকে বাঁচাতে হলে তাকে বর্জন করতেই হবে। তথাপি টালিগঞ্জের সেই হানাবাড়ি থেকে তার পলায়ন ও বিহারের মিশনে গিয়ে বছর ছয়েক

প্রায় যে জীবন সে যাপন করেছে, সেদিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে একথাও বলা চলতে পারে, কালো ভ্রমরের মৃত্যু সেই সময়েই ঘটেছে। তারপর দেখ, সেখানে হতে সে পালিয়ে এল, ওই পলায়নের পিছনেও একটা যুক্তি তার ছিল। যে মেয়েটিকে সে আপন সন্তানের মত লালন-পালন করেছিল, তারই অদৃশ্য বন্ধন তাকে আবার দূরে ঠেলে দিল। দ্বিতীয় অজ্ঞাতবাসের মধ্যেও যে তার কোন কুকার্যের পরিচয় আমরা পাইনি সে কথাও তেমনি সত্য নয় কি!

সে তুই যতই বল্ কিরীটী, যতক্ষণ না কালো ভ্রমরের সমস্ত কৃতকার্যের উপযুক্ত শাস্তি সে পাচ্ছে, বিবেকের কাছে যেন কিছুতেই আমি নিষ্কৃতি পাচ্ছি না। যাক্ সে কথা, তুই যে একটু আগে বলছিলি, ঘোরাপথে আমি ঘুরছি, কেন ও কথা বললি?

ঘোরাপথে নয়! কালো ভ্রমরের গত ছয়-সাত বৎসরের ইতিহাসটা একটু ভাল করে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবি, মিশন হতে পালালেও মিশনের সঙ্গে সে সমস্ত সংযোগ একেবারে ছিন্ন করতে পারে নি। তার মত লোক ফাদার জোন্সের মৃত্যুশয্যায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তাকে সে পালন করবেই। রেভারেণ্ড চ্যাটার্জীর কাছে সংবাদ নিয়ে জেনেছি, এখনও সে নিয়মিত মিশনে অর্থসাহায্য করে।

সত্যি!

হ্যাঁ। সেই পথেই তো সংবাদটা পেলাম। তারপর কালো ভ্রমরকে খুঁজে নিতে আমার দেরি হয়নি।

কিন্তু মিশনে সিস্টার রিটার কাছে বার বার জিজ্ঞাসা করেও তো কোন সংবাদ আমি পাইনি!

কিরীটী মৃদু হেসে জবাব দিল, তার কারণ আবার বলব ভুলপথে তুই গিয়েছিলি!

বলিস কি?

হ্যাঁ, চোখ থাকলে বুঝতে পারতিস, মেয়েমানুষ সিস্টার রিটার দুর্বলতাটা কোথায় এবং ডাঃ সান্যালের মত একজন লোকের সম্পর্কে সিস্টার রিটার ঐ ধরনের দুর্বলতা জন্মানো অসম্ভব তো নয়ই, বরং খুব বেশী স্বাভাবিকই ছিল।

॥ ৩২ ॥

সত্যিই সুব্রত ভুল করেছিল।

যখন সে জানতে পারল, সে-রাত্রে ডাঃ সান্যাল আবার তাকে ফাঁকি দিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে, মিশনের সকলকেই সে জেরা করতে কসুর করেনি।

মিশনের সকলেই যথাসাধ্য প্রত্যেকে যে যার মন্তব্য ডাঃ সান্যাল সম্পর্কে সুব্রতকে জানাতে দ্বিধাবোধ করেনি।

একমাত্র ডাঃ সান্যাল সম্পর্কে একটি মতামতও প্রকাশ করেননি সিস্টার রিটা। তিনি কেবল মৃদু হেসে বলেছিলেন, দেখুন মিঃ রায়, আমি ভারতীয় নই—ইংরাজের রক্ত আমার শরীরে, অন্যায়কে পাপকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি। ডাঃ সান্যাল সম্পর্কে আপনারা যাই বলুন না কেন, আপনাদের বিচারে ও দৃষ্টিকোণে তাঁর যে রূপই ফুটে

উঠুক না কেন, দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে যাঁকে আমি দেখেছি ও চিনেছি, তাঁকে চিনবার ও জানবার অবকাশই আমার হয়েছে। আমার চোখে তিনি শুধু মানুষই নন—অতি মানুষ। আশা করি এরপর আর আপনি আমাকে ও সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন করবেন না।

উক্ত ঘটনার পর সুব্রত আরও দুবার পত্র লিখেছিল সিস্টার রিটাকে, কিন্তু কোন জবাবই পায়নি। সুব্রতর মুখে কালো ভ্রমর সম্পর্কে শেষ সংবাদ পাওয়ার পর কিরীটীর মনে যে প্রশ্ন বার বার আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সেটা যেন একটা মীমাংসার পথ খুঁজে পায়—সুব্রতর মুখে মাত্র দিন পনেরো আগে হঠাৎ কথায় কথায় তার সিস্টার রিটাকে পত্রাঘাত ও সেই সম্পর্কে সিস্টারের পত্রের কোনও জবাব পর্যন্ত না দেওয়ার সংবাদটা পেয়ে!

কিরীটী আর কালবিলম্ব না করে দিন দুই পরেই মিশনের উদ্দেশে যাত্রা করে।

এবং দৈবই বলতে হবে, ট্রেনেই আর একটি মূল্যবান সংবাদ সে পেয়ে যায় সুচিতার কাছে—চট্টরাজের ভাগিনেয়ী সুচিতা ঘোষাল।

সুচিতাও ঐ ট্রেনেই পাটনা যাচ্ছিল তার কর্মস্থলে। এম. এস-সি পাস করবার পর সুচিতা পাটনার কোন গার্লস স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছিল গত দুই বৎসর ধরে। ডাঃ চট্টরাজ আর ডিহরি-অন-শোন থেকে ফিরে যাননি, সেখানে ছোটখাটো একটা বাড়ি করে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছেন। সুচিতা ছুটিতে মামার ওখানে যায় এবং সমস্ত ছুটিটাই মামার কাছে কাটিয়ে আসে। স্কুলের কয়েকটা ব্যাপারে সুচিতা কলকাতায় গিয়েছিল, ফিরছিল পাটনায় কাজ সেরে একটি ট্রেনে।

সুচিতাকে দীর্ঘকাল পরে দেখলেও কিরীটীর চিনতে কষ্ট হয়নি।

আলাপ-আলোচনার মধ্যে একসময় কালো ভ্রমরের কথা ওঠে এবং কথায় কথায় কৌশলে কিরীটী সুচিতার কাছ থেকেই জানতে পারে পরবর্তীকালে কালো ভ্রমরের সঙ্গে সুচিতার পত্র-বিনিময়ের কথাটা, যদিও সুচিতা শেষ পর্যন্ত কিন্তু কালো ভ্রমরের মিশনবাসের কথাটা অনুল্লেখই রেখে যায়।

কিরীটী বুঝতে পেরেও কোন কথা বলে না।

মিশনে পৌঁছে প্রথমেই কিরীটী রেভারেন্ড চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করে এবং রেভারেন্ড চ্যাটার্জীর কথাবার্তায় কিরীটী বিশেষ মর্মাহত না হয়ে পারে না। অবশ্য চ্যাটার্জীর আক্রোশের কারণটা বুঝতে কষ্ট পেতে হয় না কিরীটীর। মিশনের কাজে আত্মোৎসর্গ করলেই যে মিশনের নীতিকে মানুষ সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারে না, রেভারেন্ড চ্যাটার্জীর মত উদাহরণের দেশে বা সমাজে অভাব নেই। প্রথম হতেই রেভারেন্ড চ্যাটার্জী মিশনের সহকারিত্ব করে এসেছেন, সেক্ষেত্রে স্বর্গত ফাদার জোন্স যখন অজ্ঞাতকুলশীল ডাঃ সান্যালকে ডেকে তার হাতে, রেভারেন্ড চ্যাটার্জীকে বাদ দিয়ে, সব কর্তৃত্ব তুলে দিয়ে গেলেন, রেভারেন্ড চ্যাটার্জির মনে সেক্ষেত্রে একটা হিংসার উদ্রেক হওয়া বিচিত্র নয়, এবং হয়েছিলও তাই। কার্যত সেই কারণেই রেভারেন্ড চ্যাটার্জী কোনদিনই ডাঃ সান্যালকে মনেপ্রাণে গ্রহণ তো করতে পারেননি, ভাল চোখেও দেখতে পারেননি। ডাঃ সান্যাল যতই দিনের পর দিন তাঁর মধুর ও অমায়িক ব্যবহারে নিজেকে মিশনে ও আশেপাশের জনগণ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, ততই রেভারেন্ড

চ্যাটার্জী হিংসায় মনে মনে জ্বলেছেন। এবং শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের সত্যকারের পরিচয়টা ব্যক্ত হলেও, একমাত্র সিস্টার রিটার জন্য ও মিশনের শুভাশুভের কথা ভেবে বিশেষ আর কোন উচ্চবাচ্যই করেননি।

ও বিষয়ে আরও গোলমাল না করবার বিশেষ কারণটা ছিল। সেটা ডাঃ সান্যাল চলে গেলেও, নিয়মিত মিশনকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছিলেন এবং যেটার অভাবে মিশনের একান্ত দুরবস্থা হত—বেঁচে থাকা আজও সম্ভব হত না।

সুব্রত সিস্টার রিটার নিকট কালো ভ্রমর (ডাঃ সান্যাল) সম্পর্কে যেটুকু বলেছিল সেটা কিছুটা একতরফা।

কিন্তু কিরীটীর মুখে (কালো ভ্রমর—ডাঃ সান্যাল সম্পর্কে) ধারণাটা যে ভুল নয়, এ কথাটা নিঃসংশয়ে যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, সিস্টার রিটার মনের মধ্যে যেন মুক্তির আনন্দ-হিল্লোল বইয়ে দিল।

সংশয়ের যে অদৃশ্য কাঁটাটা মনের মধ্যে ইদানীং দিবারাত্র বিঁধছিল, কিরীটীর কথায় সেটাও অপসারিত হল সিস্টারের হৃদয় থেকে।

রিটা মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি জানতাম মিঃ রায়, মিঃ সান্যাল যাই করুন না কেন তাঁর অতীত জীবনে, শয়তান তিনি নন। মনের মধ্যে ও সান্ত্বনাটুকু আমার না থাকলে ফাদার জোন্সের মিশনের জন্য তাঁর অর্থসাহায্য কোনমতেই আমি গ্রহণ করতে পারতাম না। দেখুন মিঃ রায়, মানুষ মাত্রেই ভুল করতে পারে, কারণ মানুষ মানুষই, কিন্তু কবে কে কি ভুল করেছে, সেটা দিয়েই গোটা মানুষটকে বিচার করতে গেলে আরও মারাত্মক ভুল করা হয়। ফাদার প্রত্যেকের সম্পর্কেই বারবারই এই কথাটাই বলতেন।

একটু থেমে নিজের ভাবাবেগটা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করে নিয়ে সিস্টার রিটা আবার বললেন, একটা কথা আজ পর্যন্ত কাউকেই আমি কোনদিন বলিনি—আপনাকে বলছি, মিঃ সান্যাল যখন মিশনে অর্থসাহায্য করে এখানে থাকবার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে পাঠালেন, ফাদার আমাকে একদিন রাত্রে বলেছিলেন, সিস্টার, সান্যালের চিঠি পড়ে একটা জিনিস দিনের আলোর মতই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, যে পাপ তিনি অতীতে করেছেন, তার অগ্নিশুদ্ধি মনের অনুশোচনার মধ্যে শুরুও হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে এমন এক গোপনীয় তত্ত্ব যদি মিঃ সান্যাল সম্পর্কে প্রকাশ হয়ে পড়েও, জেনো সেটাই তার সব তো নয়ই এবং তাকে সে অতিক্রম করবার শক্তিও সঞ্চয় করেছে।

সিস্টার রিটার কথা শুনে কিরীটী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

রামুর মারফতে যে ডাঃ সান্যালের অর্থসাহায্য মিশনে নিয়মিত আসে, সে কথাটাও কিরীটী সিস্টার রিটার নিকট হতেই জানতে পারে এবং খামের ঠিকানা হতেই সে অনুমান করে ডাঃ সান্যাল বর্তমানে কলকাতাতেই আত্মগোপন করে আছে কোথাও।

কলকাতায় ফিরে এসে রামুর ঠিকানা খুঁজে বের করতে কিরীটীর খুব বেশী কঠিন হয়নি। কারণ পরবর্তী মাসের প্রথম তারিখটা ছিল আসন্ন। রামু নিয়মিত আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট অফিসে রেজিস্টারি করে টাকা পাঠাতে এসেছিল মিশনে। রামুকে অনুসরণ করে মাত্র আগের দিনই কিরীটী কালো ভ্রমরের আমহার্স্ট স্ট্রীটের ঠিকানা খুঁজে পায়।

সেই কথাই কিরীটী সুব্রতকে ও শচীন গুপ্তকে সন্ধ্যার সময় বলছিল।

কালো ভ্রমর সম্পর্কে আমার সমাজের কাছে যে দায়িত্বটুকু ছিল, তার ইতি আমি এইখানেই করলাম। মনের কাছেও আর আমি অপরাধী থাকলাম না।

কিরীটীর শেষের কথায় সুব্রত বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

শচীন গুপ্ত বললে, আপনার এ কথার অর্থ কি মিঃ রায়?

খুব প্রাঞ্জল, শচীনবাবু। কালো ভ্রমরকে আমি ঘৃণা করি, কিন্তু ডাঃ সান্যালকে আজও আমি শ্রদ্ধা করি। আইনের কথা থাক, এক্ষেত্রে আইনের কথা তুলে তর্ক করতে যাওয়া বা যুক্তির অবতারণা করতে যাওয়াও ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে আমাদের পরস্পরের যে একটা অচ্ছেদ্য অদৃশ্য যোগাযোগ গড়ে উঠেছে, আইনের দোহাই দিয়ে ডাক্তারকে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে নিজের আত্মাকে তো অপমান আমি করতে পারি না। শুধু অপমানই বা কেন বলি, ওর চাইতে বঞ্চনাই বা কি হতে পারে!

এটা কিন্তু সত্যই তোর একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিরীটী!

তা হয়তো হবে। তবে কি জানিস, মনের কাছে তো অগোচর কিছুই থাকে না ভাই।

একটু থেমে আবার কিরীটী বলে, ডাঃ সান্যালকে (কালো ভ্রমর) তোমরা সমাজদ্রোহী, ডাকাত ও নরহন্তা বলেই জেনেছ, সেই কারণেই তার প্রতি তোমাদের একটা স্বাভাবিক অবিমিশ্র ঘৃণাই মনের মধ্যে লালন করছ। লোকটাকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাবার জন্য তোমরা ও তোমাদের আইন হাত বাড়িয়ে বসে আছে, কিন্তু ভুলে যাও কেন ফাঁসির দড়ি ও কারাপ্রাচীরের অন্তরালে একজনকে ঝুলিয়ে দিতে পারলে বা আটকে রাখলেই পাপীর দণ্ডবিধানটা সম্পূর্ণ হয় না। তাছাড়া যে কালো ভ্রমরকে আজ তোমরা খুঁজে বেড়াচ্ছ—আজকের সেই কালো ভ্রমর তো অতীতের নরঘাতী দস্যু কালো ভ্রমর নয়। তার জীবনের গত ছয়-সাত বৎসরের ইতিহাস এবং ঐ দীর্ঘদিনের প্রতিটি দিন ও রাত্রির যে অগ্নিশুদ্ধির সংবাদ, সেটুকু তোমার এবং তোমাদের আইন ভুললেও আমি তো ভুলতে পারব না!

তাই বলে তুই বলতে চাস কিরীটী, যে পাপ ও নরহত্যা সে করেছে, তার কোন শাস্তিই সে পাবে না?

শাস্তি! হ্যাঁ পাবে এবং পেয়েছেও। তা যদি সে না পেত, অন্তত আজ অরুণ করকে জীবিত থাকতে হত না। যাক, সেসব অবান্তর কথা। আমার কথাও শেষ হয়েছে, এবার তোরা তোদের করণীয় যা কর ভাই।

কিন্তু—

কিরীটী বাধা দিল, বৃথা এখানে বসে কথা-কাটাকাটি করলে আর কোনই লাভ হবে না সুব্রত। আমার মত এ জগতে আরও দু-একজন আছেন যাঁরা হয়তো আমারই মত কালো ভ্রমরকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে দেখতে চান না।

এরপর সুব্রত বলবার আর কোন কথাই খুঁজে পায় না।

নিরুপায় শচীন গুপ্তকে নিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াল।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়।

কিরীটীর সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর ও তার মিশন ত্যাগের পর হতেই একটা অজানিত আশঙ্কা রিটাকে বিচলিত করতে থাকে।

কিরীটীর সঙ্গে সিস্টার রিটার ডাঃ সান্যাল সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত, সেটা কোন পথ নিতে পারে সেটুকু বুঝতে বা অনুমান করতে তাঁর মত বুদ্ধিমতীর খুব কষ্ট পেতে হয় না। এত বড় একটা প্রাণের দাম আইনের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে ফাঁসির দড়ি বা কারাগারের বায়ুলেশহীন কক্ষে শেষ হয়ে যাবে, এ যেন কোনমতেই সিস্টার রিটা সহ্য করতে পারছিলেন না। বৃথাই তাহলে তিনি যৌবনে ধর্মযাজিকার ব্রত নিয়েছেন।

কিন্তু উপায়ই বা কি? কেমন করেই বা সামান্য একজন নারী হয়ে তিনি ডাঃ সান্যালকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন?

দুটো দিন দুটো রাত্রি সর্বক্ষণ কেবল চিন্তা করেই কাটালেন সিস্টার রিটা।

অবশেষে উত্তেজনার বশে ডাঃ সান্যালের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কলকাতায় রওনা হলেন।

সিস্টার রিটা ডাঃ সান্যালের ঠিকানা জানতেন।

সেদিন প্রত্যুষে।

ডাঃ সান্যাল আসন্ন যাত্রার জন্য রামুর সাহায্যে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে ব্যস্ত।

মঞ্জরীও পিতা ও রামুকে গোছানোর ব্যাপারে সাহায্য করছে।

এমন সময় সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

দেখ তো, এসময়ে কে আবার এল! ডাঃ সান্যাল বলে।

রামু নীচে চলে গেল এবং অল্পক্ষণ বাদেই ফিরে এসে বললে, একজন মেমসাহেব আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান বাবু।

মেমসাহেব! সে কি রে?

হ্যাঁ, বললেন বলতে যে মিশন থেকে আসছেন।

মিশন থেকে আসছেন! কে চল তো দেখি!

নীচে এসে দোরগোড়ায় সিস্টার রিটাকে দেখে ডাঃ সান্যালের বিস্ময়ের যেন আর অবধি থাকে না।

প্রথমটায় কোন কথাই ডাঃ সান্যালের কণ্ঠ হতে বের হয় না।

সিস্টার রিটা! এখানে? সিস্টার, আমি—আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!

না মিঃ সান্যাল, সত্যই আমি রিটা।

আসুন, আসুন—উপরে আসুন, কি সৌভাগ্য!

ভিতরে প্রবেশ করতে করতে সিস্টার বললেন, বিশেষ জরুরী এবং গোপনীয় কথা আছে আপনার সঙ্গে ডাঃ সান্যাল।

সিস্টার রিটাকে নিয়ে ডাঃ সান্যাল নিজের কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

মঞ্জরী সিস্টারকে দেখে আনন্দে ছুটে এসে সিস্টারকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে।
মঞ্জু! মঞ্জু! ভালো তো? My pretty child!
হ্যাঁ, সিস্টার।
তুমি একটু পাশের ঘরে যাও মা। সিস্টারের সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।
মঞ্জরী তার নিজের ঘরে চলে গেল।
বসুন সিস্টার।
সিস্টার একটা চেয়ার টেনে উপবেশন করলেন।
উত্তেজনার ঝোঁকে এই দীর্ঘ পথ চলে এসে হঠাৎ এখন সিস্টার নিজেকে কেমন যেন বিব্রত বোধ করেন। ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, কি ভাবে কথাটা কোনখান হতে শুরু করবেন।

তাঁর মত একজন নিঃসম্পর্কীয়া নারীর পক্ষে কয়েক বৎসরের পরিচিত একজন পুরুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এতদূরে ছুটে আসাটা যে কতদূর দৃষ্টিকটু হতে পারে, এ যেন ইতিপূর্বে একবারও সিস্টারের খেয়াল হয়নি।

সিস্টার, কি যেন বলবেন বলছিলেন! ডাঃ সান্যালই প্রশ্ন করেন।
হ্যাঁ, কিরীটীবাবু দিন পাঁচেক আগে আমার ওখানে গিয়েছিলেন।
কে, কিরীটী রায়?
হ্যাঁ।
সহসা ডাঃ সান্যাল কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। একটা চিন্তার কালো ছায়াও মুখের উপরে নেমে আসে, কিন্তু বেশীক্ষণ সেটা স্থায়ী হয় না। অপরূপ নির্মল হাস্যে মুখখানি যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আমি জানতাম, সুব্রতবাবু যখন একবার আমার সন্ধান পেয়েছেন কিরীটীর চোখে আমি আর বেশীদিন অদৃশ্য থাকব না, তবু এক বৎসর সময় দেরি একটু বলব বৈকি! শেষের কথাগুলো কতকটা আত্মগতভাবে বলে সহসা সিস্টারের দিকে ফিরে তাকিয়ে ডাক্তার বলে, আমার সমস্ত ইতিহাস এখন জেনেছেন তো সিস্টার! যাক্, ইচ্ছা ছিল ওখান হতে চলে আসবার আগে নিজের মুখেই আমার সমস্ত ইতিহাস আপনাকে আমি বলে আসব, কিন্তু তাড়াতাড়িতে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখানে এসে কতবার ভেবেছি চিঠি লিখে আপনাকে সব জানাব, ফাদার জোন্সের কাছে যে অপরাধ করেছি নিজের আসল আত্মপরিচয়টুকু লুকিয়ে রেখে, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনার কাছে করব। কিন্তু মানুষের আত্মার যে সহজাত অহমিকা, সংস্কারজনিত ভয় এবং যে পরিচয়ে একদিন আপনাদের সকলের শ্রদ্ধা পেয়েছি, নিজ হাতে সেই শ্রদ্ধাটুকুর গলা টিপে মারবার যে দুর্বলতা, কিছুতেই তাকে শেষ পর্যন্ত জয় করে উঠতে পারিনি। সত্যি এখন ভেবে আশ্চর্য লাগে, মানুষ কত দুর্বল, কত অসহায়!

আমি সবটা না জানলেও অনুমান করেছিলাম ওই রকমই একটা কিছু আপনার সম্পর্কে। তাছাড়া ফাদার জোন্সও অনুমান করেছিলেন এবং আমাকে একদিন আপনার সেখানে পৌঁছবার পূর্বে কথায় কথায় বলেছিলেনও।

সত্যি আশ্চর্য! আশ্চর্য, তবু আপনারা আমাকে ঘৃণা করেননি, ত্যাগ করেননি!
কেন ঘৃণা করব? যীশু বলেছেন পাপকেই ঘৃণা করতে, পাপীকে নয়। তাছাড়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো কম হয়নি।

প্রায়শ্চিত্ত! না না—কিছু করিনি। নরহত্যার রক্তে যে হাত কলঙ্কিত—না না, প্রায়শ্চিত্ত আমার হয়নি। আমি ভুলতে পারি না, ভুলতে পারি না কি আমি ছিলাম, কি আমি করেছি। পশুর চেয়েও অধম। ঘৃণ্য কীটের চাইতেও ঘৃণ্য—পরিত্যাজ্য আমি।

দু হাতে ডাঃ সান্যাল মুখ ঢাকে।

ধরা দিতাম সেইদিন, ধরা আমি সেইদিন দিতাম মিশনে। মনের মধ্যে এই দীর্ঘ সাত বছর ধরে যে আগুন জ্বলছে, এ নিভবে না। অসহ্য জ্বালায় দিবারাত্র ছটফট করে বেড়িয়েছি। কিন্তু পারলাম না, শেষ পর্যন্ত পারলাম না। মঞ্জু—টুকুন আমার সমস্ত সঙ্কল্পের পথরোধ করে দাঁড়াল। মঞ্জুকে ছেড়ে থাকতে পারব না, শুধু এই চিন্তাতেই—আত্মার সঙ্গে এ যে আমার কত বড় বন্ধন সিস্টার, কাউকেই আমি সেটা বুঝিয়ে বলতে পারব না। একদিকে আমার জীবনভোর দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত, অন্যদিকে টুকুন। একমাত্র মৃত্যু—মৃত্যু ছাড়া ওকে কেউ আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। দেব না।

তা জানি বলেই আপনাকে আমি সাবধান করে দিতে আসছি ডাঃ সান্যাল। আপনার ধরা দেওয়া চলতে পারে না।

সিস্টার! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ডাক্তার সিস্টার রিটার দিকে।

অন্যায় জেনেও যুক্তিহীন যে ইচ্ছাটাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাঃ সান্যাল আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিল এবং একমাত্র নিজের অন্তর ব্যতীত দ্বিতীয় কারও কাছ হতেই যার সমর্থনের এতটুকু ক্ষীণতম আশাও তার ছিল না, সিস্টার রিটার শেষের কথায় তারই আভাস পেয়ে ডাক্তার শুধু বিস্মিত নয়, যেন মূক হয়ে যায়।

হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি ডাঃ সান্যাল, আপনাকে যত শীঘ্র সম্ভব পালাতে হবে।

আপনি—আপনি সিস্টার রিটা এ কথা বলছেন!

বলছি তার কারণ, আজ অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত সত্যকে যদি আইনের যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে হয়, তাহলে নীতিই হবে বড় সত্য, অন্তরের চরম সত্য হবে মিথ্যা!

ডাঃ সান্যাল ও সিস্টার রিটার মধ্যে যখন কথাবার্তা চলছে, মঞ্জরী নিজের ঘরে একাকী বসে আশীষের কথাই ভাবছে। ঝড়ের মত কৃষ্ণা, আশীষের বোন এসে ঘরে ঢুকল, মঞ্জু!

কে, কৃষ্ণা? কি ব্যাপার?

শুনেছিস বোধ হয়, দাদা—

কি? দাদার কি হয়েছে?

ভোররাত্রে পুলিস দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়ি ঘেরাও করে এবং ওরা ধরা দেবে না—উভয়পক্ষে তখন হতে open firing চলছে। দাদা একেবারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, প্রাণ দেবে তবু ধরা দেবে না এবং বাড়ি থেকে নড়বেও না। দাদা আর ভূপতি ছাড়া আর কেউ নেই সেখানে, সুড়ঙ্গপথ ধরে সকলেই পালিয়ে এসেছে। তুই—তুই দেখ ভাই, দাদাকে যদি ফেরাতে পারিস!

আমি!

হ্যাঁ, একমাত্র তুই হয়তো পারবি—শীঘ্র চল ভাই, আর বেশী দেরি করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। ওদের হাতে যা অ্যামুনিশন ছিল তাও প্রায় ফুরিয়ে এল।

মুহূর্তে মঞ্জরী তার সঙ্কল্প স্থির করে নেয়, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, একটু অপেক্ষা কর্ ভাই, আমি এখুনি তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

মঞ্জরী টেবিলের সামনে গিয়ে চিঠির কাগজের প্যাডটা টেনে নিয়ে অত্যন্ত দ্রুত এবং সংক্ষেপে ডাঃ সান্যালের নামে একটা চিঠি লিখে বিদায় নিয়ে তখুনি বান্ধবীর সঙ্গে বের হয়ে গেল। কেউ জানতে পারল না।

এদিকে ডাঃ সান্যাল পাশের ঘরে এসে মঞ্জরীকে না দেখতে পেয়ে মঞ্জরীকে যেমন ডাকতে যাবে, সহসা নজরে পড়ে তার নামের চিঠিখানা—তাকে লেখা।

চিঠিটা তুলে নিয়ে অধীর আগ্রহে কম্পিত হস্তে চিঠিখানা খুলে তখুনি পড়তে শুরু করে ডাঃ সান্যাল। সর্বনাশ, এ কি করেছে টুকুন! ডাঃ সান্যালের পায়ের তলা হতে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। এ কি করলে টুকুন! না জানি সে কি ভয়ানক বিপদের মধ্যে ছুটে গিয়েছে!

টুকুন তাকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে গেল! তার বুকভরা স্নেহের কোন দামই দিল না, সামান্য দুদিনের পরিচয়ে আশীষের জন্য সে তার এতদিনকার স্নেহের ভালবাসার সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিয়ে অক্লেশে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিতে ছুটে গেল!

কাকে সে দু হাত দিয়ে তাহলে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল?

কাকে বুকে করে সে মিশন থেকেই বা পালিয়ে এল?

কার ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে দীর্ঘদিনের পাপ ও দুষ্কৃতিকে পর্যন্ত ভুলতে চেয়েছিল? কাকে তাহলে সে এত আদরে এত স্নেহে বুকে ধরে মানুষ করলে?

হায় রে, বালুচরে প্রাসাদ রচনা! একটি মাত্র ঢেউয়ের আঘাতেই গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল!

শূন্য—চারিদিক শূন্য। নিরলম্ব শূন্যতা ব্যঙ্গ করছে তাকে। কি নির্মম নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ!

দীর্ঘ সাতটি বৎসরের প্রত্যেকটি দিন-রাত্রির অসংখ্য স্মৃতি তিল তিল করে যা স্নেহে ভালবাসায় গড়ে উঠেছে, কে জানত এক লহমায় তার চরম মীমাংসা এমনি করেই হয়ে যেতে পারে! যাকে ছেড়ে কারাবাসের দিনগুলোকে ভাবতে ভয় হয়েছে, ফাঁসির রজ্জুকে আতঙ্কে এড়িয়ে যাবার এই আপ্রাণ চেষ্টা, যার জন্য এত আয়োজন, একবারও সে যাবার আগে ফিরে তাকিয়ে গেল না! একটি মুখের কথায় শেষ বিদায়টুকু পর্যন্ত নিয়ে গেল না!

আশীষ আশীষ! কে আশীষ? কোথায় সে ছিল এতদিন? পিতা ও কন্যার দীর্ঘ সাত বৎসরের দিন ও রাত্রিগুলির মধ্যে কোথা হতে এল ঐ আশীষ?

দুর্নিবার আক্রোশে যেন শিরা-উপশিরার মধ্যে তীব্র আগুনের স্রোত বইতে থাকে। ইচ্ছা করে সেই শয়তানটাকে, যে তার স্নেহের ধনকে বুক থেকে এমনি করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, ছুটে গিয়ে তার গলাটা টিপে ধরে হত্যা করে তাকে!

কিন্তু তখুনি আবার মনে হয়, হত্যা করবে কাকে? আশীষকে?

আশীষকে ভালবাসে টুকুন। আর আশীষ! আশীষও হয়ত ভালবাসে টুকুনকে।

ডাঃ সান্যালের খেয়ালই ছিল না সিস্টার রিটাকে পাশের কক্ষে রেখে এ ঘরে টুকুনের খোঁজে এসেছিল। হঠাৎ সিস্টার রিটার ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকায় ডাঃ সান্যাল।

ডাঃ সান্যাল?

সিস্টার ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন চমকে ওঠেন।

রক্তশূন্য ফ্যাকাশে সমস্ত মুখখানা। কি এক সর্বস্ব হারানোর মর্মন্তুদ বেদনা ফুটে উঠেছে সমগ্র মুখের উপর ডাক্তারের। চোখের দৃষ্টিতে এক অসহায় করুণ বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কি হয়েছে ডাঃ সান্যাল?

টুকুন—টুকুন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে সিস্টার!

শেষের দিকে ছোট্ট শিশুর মতই যেন অসহ্য কান্নায় ওষ্ঠ দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে ডাক্তারের।

ছেড়ে চলে গেছে! কোথায়?

আমার চাইতেও যাকে বেশী ভালবাসে! আমি—আমি এখন কি করি সিস্টার?

ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে সব খুলে বলুন ডাঃ সান্যাল!

সে একটি ছেলেকে ভালবাসে, তার নাম আশীষ। দক্ষিণেশ্বরের এক বাগান-বাড়িতে পুলিস তাদের ঘেরাও করেছে, open-firing চলছে, তার মধ্যে টুকুন ছুটে গেছে। বলতে বলতে হঠাৎ যেন জেগে ওঠে ডাঃ সান্যাল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক, আমিও যাব! আমি যাই!

কোথায়? কোথায় যাবেন ডাক্তার?

দক্ষিণেশ্বরে। তাদের বাঁচাতে হবে। হ্যাঁ, যেমন করে যে উপায়ে হোক তাদের বাঁচাতেই হবে—বলতে বলতে ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে গ্যারেজের চাবিটা নিয়ে একপ্রকার ঝড়ের মতই যেন বের হয়ে গেল ডাঃ সান্যাল।

হতভম্ব নির্বাক সিস্টার একা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

॥ ৩৪ ॥

ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালায় ডাঃ সান্যাল।

টুকুন—টুকুনকে বাঁচাতে হবে!

দক্ষিণেশ্বরে এসে যখন ডাক্তার পৌঁছল, রাস্তার মোড়েই সে অনেক পুলিসকে দেখতে পেলে।

গাড়ি ব্রেক করে দাঁড় করিয়ে ডাক্তার একজন পুলিসকে জিজ্ঞাসা করলে, এখানে কোথায় কোন বাগানবাড়িতে Police-raid হচ্ছে বলতে পার?

ঠিক এই সময় কোথা হতে কয়েকটা পর পর রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল —দুম! দুম্!

কেন, সেখানে আপনার গিয়ে কি হবে?

প্রয়োজন আছে।

সেদিকে যাওয়া নিষেধ।

মুহূর্তে ডাক্তারের মাথায় একটা সঙ্কল্প জেগে উঠে, একটুকুও দ্বিধা না করে বলে, আমি সি. আই. ডি.র লোক।

এবার আর পুলিস বাধা দিল না, সম্ভ্রমের সঙ্গেই বলে, বেশী দূর নয় স্যার। সামনে ডাইনে ঐ সরু রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেলেই বাঁহাতি যে বাগানবাড়িটা—

তড়িৎপদে গাড়িতে উঠে ডাক্তার গাড়িতে স্টার্ট দেয় আবার।

ইঞ্জিন গর-র গর্জন করে ওঠে।

সরু রাস্তাটা বেশ খানিকটা ঘোরা এবং পুলিস পাহারার জন্য একপ্রকার নির্জন বললেও চলে। জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

ঘন ঘন রাইফেলের আওয়াজ আরও এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

কিন্তু একটা কথা আবার ডাক্তারের সহসা মনে পড়ে, সোজা বাগানবাড়িতে গেলেই পুলিস তাকে সেখানে ঢুকতে দেবে না।

উপায়?

গাড়ির ইঞ্জিনটা থামিয়ে দেয় ডাক্তার।

রাস্তার উপরেই একটা জলের কল, তার সামনেই দোতলা পুরাতন একটা পাকা বাড়ি।

রাস্তার দু পাশে আরও অনেক বাড়িই আছে। কোন বাড়িরই কোন জানালা-দরজা খোলা নেই—সব বন্ধ। পুলিসের ভয়ে চারিদিক একেবারে যেন কবরখানার মতই নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

গাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে না। ডাক্তার গাড়ি থেকে নামল, রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে জনহীনশূন্য রাস্তাটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একবার দেখে নিল, একটি প্রাণীও কোথাও নেই।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে শুধু মুহুর্মুহু রাইফেলের গর্জন।

হঠাৎ কলের ধারে দোতলা বাড়িটার নীচেকার একটা ঘরের বন্ধ জানালাটা ঈষৎ খুলে গেল এবং চকিতে দেখা গেল একটি মুখ।

চেয়ে থাকে ডাক্তার ঈষৎ উন্মুক্ত জানালার দুই কবাটের ফাঁকে মুখখানার দিকে।

সোনার চুড়ি পরা সুন্দর একখানা হাত বের হয়ে এল কবাটের ফাঁকে। হাতছানি দিচ্ছে হাতটি।

হাতছানি দিচ্ছে না! হ্যাঁ, তাই তো!

বিস্মিত ডাক্তার নিজের অজ্ঞাতেই পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় দোতলা বাড়িটার দিকে। একেবারে জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়।

জানালার কবাট দুটো এবারে আরও বেশী একটু খুলে গেল— স্পষ্ট দেখা গেল একটি তরুণীর মুখ। তরুণী ডাক্তারের অপরিচিতা নয়, মঞ্জরীর বান্ধবী কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা!

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এখানে কেন?

মঞ্জু কোথায়?

পুলিশের গাড়ি এপথে অনবরত যাতায়াত করছে, আর একটু সামনের দিকে এগোলে একটা সরু blind lane আছে, সেখানে আগে গাড়িটা রেখে আসুন, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।

কৃষ্ণার নির্দেশমত গলির মধ্যে গাড়িটা গোপন করে রেখে এসে দোতলা বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করল ডাক্তার।

একতলার একটা ঘরে নিয়ে এল কৃষ্ণা ডাঃ সান্যালকে।

জানালাপথে আপনাকে দেখতে পেয়ে আপনাকে ডেকেছি, এখনি পুলিস দেখতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যেত!

মঞ্জু—মঞ্জু কোথায় কৃষ্ণা?

বাগানবাড়িতে।

আমি সেখানে যাব।

আপনি যাবেন!

হ্যাঁ, আমি যাব।

কিন্তু সেখানে গিয়ে আপনি কি করবেন? মঞ্জু দাদাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছে এই কিছুক্ষণ হল!

গিয়েছে? কোন পথে? কেমন করে?

সেখানে যাবার জন্য একটা চোরা-পথ আছে।

চোরা-পথ আছে! কোথায়? কোথায়?

এই বাড়ির তলা দিয়ে সুড়ঙ্গপথ।

॥ ৩৫ ॥

বাগানবাড়িতে ঐসময়।

ভূপতি মৃত, একা আশীষ মেসিনগানে গুলিবর্ষণ করে চলেছে। পাশেই হাত-পা বদ্ধাবস্থায় গুলিতে আহত নিরঞ্জন।

ট্যারা-রা টট্ টট্!...

অ্যামুনিশন এখনও যা আছে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চালানো যাবে, কিন্তু তার পর?

তার পরের কথা আজ পর্যন্ত কোন দিনই ভাবেনি আশীষ, আজও ভাবে না। ঠিক ঐ ধরনের সম্মুখযুদ্ধে একটা উন্মাদনা ও আত্মতৃপ্তি আছে, তারই নেশায় আশীষকে কতকটা যেন আচ্ছন্নও করে রেখেছে। ভূপতি মৃত।

অপর পক্ষ বোধ হয়ে আবার শক্তি-সঞ্চয়ে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, খুব অল্প সময়ের জন্য রাইফেলের গুলিবর্ষণ থেমেছে।

আশীষ মেসিনগানটার ব্যারেলে হাতটা রেখে স্বেদসিক্ত কপালের স্বেদবিন্দুগুলো বাঁ হাতের তর্জনীর সাহায্যে মুছে নেয়।

পশ্চাতে দ্রুত পদশব্দ। চমকে ফিরে তাকায় আশীষ, পশ্চাতে একটা শব্দে মনে হয় যেন কারও পদশব্দ।

ঘরের মধ্যে ঝড়ের মতই এসে প্রবেশ করল মঞ্জরী।

মঞ্জরী! আশীষ মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকাল।

মঞ্জরী সোজা এসে আশীষের সামনে দাঁড়িয়ে তার ডান হাতটা চেপে ধরল, হ্যাঁ, আমি।

কিন্তু তুমি এ বিপদের মধ্যে কেন এলে মঞ্জরী? আর এলেই বা কি করে?

পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়, মাত্র ঘণ্টা দেড়েক আগে অন্য সকলকে আশীষ একপ্রকার জোর করেই গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ ধরে পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাদের কাছ হতেই নিশ্চয়ই মঞ্জুরী সংবাদটা পেয়েছে।

ফিরে চল আশীষ।

ফিরে যাব?

হ্যাঁ, তুমিই তো কতদিন আমাকে বলেছ, ধরা দিয়ে অকারণে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে ইচ্ছুক নও!

কিন্তু এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম—এও তো সেই একই কথা।

সহসা এমন সময় অপর পক্ষ হতে আবার রাইফেল গর্জে উঠল।

মেসিনগানের ট্রিগারে হাত দিয়ে গুলি চালাতে চালাতে অসহিষ্ণু কণ্ঠে আশীষ বলে ওঠে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না মঞ্জু, পালাও! হঠাৎ কখন কোন পথে এসে গুলি লাগবে কেউ বলতে পারে না! যাও যাও!

না, তোমাকে না নিয়ে আমি ফিরে যাবো না।

মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর যেন ইস্পাতের মতই কঠিন হয়ে ওঠে এবং চকিতে সে ভূপতির মৃতদেহের হাত হতে লোডেড রিভলভারটা ছিনিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

মঞ্জরী—মঞ্জু! তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

মঞ্জরী আশীষের কথার কোন জবাব না দিয়ে দৃঢ় সংযত পদবিক্ষেপে জানালার দিকে রিভলবার হাতে এগিয়ে যায়।

মঞ্জরী শোন,—শোন। কেন তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুব মধ্যে এলে?

তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মধ্যে থাকতে পার দেশের ছেলে হয়ে, দেশের মেয়ে হয়ে আমি পারি না!

শোন মঞ্জু, অবুঝ হয়ো না। আমার মৃত্যুর প্রয়োজন আছে, অন্তত নিরঞ্জনের মত লোকের জন্যও। চিরদিন ওদের হত্যা করেই শাস্তি দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু আমি প্রাণ দিয়ে ওকে বুঝিয়ে যাবার চেষ্টা করে যাব ও কি করেছে! চিরজীবন ধরে ও অনুতাপ করবার সময় পাবে।

তা হয় না আশীষ, ও জাতের শিক্ষা তাতে করে হবে না!

তৃতীয় কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে ফিরে তাকায় আশীষ। ডাঃ সান্যাল দরজার উপরে দাঁড়িয়ে।

মঞ্জরী পিতাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে, বাবা!

আপনি! আপনি এখানে?

হ্যাঁ আমি, দেশের প্রয়োজনেই তোমাকে আজ বাঁচতে হবে আশীষ। তোমার অসমাপ্ত কাজ আমার হাতে তুলে দিয়ে যাও।

না—না, তা হতে পারে না। আপনি কেন আমার হয়ে জীবন দেবেন? আশীষ তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানায়।

তার কারণ মৃত্যুরই যদি আজ প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে অতীতের জীর্ণেরই মৃত্যু হোক—অনাগত ও নবীনের নয়। তোমার অন্তরের মুকুলিত কল্পনা তো আজও ফুটে ওঠবার অবকাশ পায়নি। তার সমস্ত সম্ভাবনাকে কেন আমরা নষ্ট হতে দেব!

অপর পক্ষ হতে তখন মুহুর্মুহু রাইফেলের গুলিবর্ষণ চলেছে।

ডাঃ সান্যাল দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে এসে একপ্রকার যেন আশীষের হাত হতে

মেসিনগানটা ছিনিয়ে নেয়—যাও, তোমার মরা চলতে পারে না। মঞ্জরীকে আজ হতে তোমারই হাতে তুলে দিলাম আশীষ। ওর সমস্ত ভার তোমার। ওকে তুমি দেখো।

মঞ্জরী ছুটে এসে দু'হাতে পিতাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে, বাবামণি!

ছি মা, চোখের জল ফেলতে নেই শুভ মুহূর্তে।

তুমি—তুমিও চলে এস বাবামণি!

না মা, আশীষের শেষ কাজ আমাকে করতে হবে। যাও, আর দেরি করো না তোমরা—যাও।

এ মিনতি নয়, অনুরোধ নয়, কঠিন প্রত্যাদেশ যেন।

ডাঃ সান্যাল তখন মেসিনগানটা আরও এগিয়ে জানালার কাছে নিয়ে জানালার কবাট দুটো সহসা ধাক্কা মেরে খুলে দিয়ে মেসিনগানের গুলিবর্ষণ শুরু করেছে।

ট্যারা-রা টট—টট্।...

আশীষ বারেক মাত্র পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে রোরুদ্যমানা মঞ্জরীকে দুহাতে আগলে নিয়ে খোলা দরজা-পথে সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে।

যত সময় যায়, অ্যামুনিশন ফুরিয়ে আসে।

জীবনের সমস্ত পাপ অন্যায় গ্লানি অনুশোচনা আজ যেন যাদুমন্ত্রেই ডাঃ সান্যালের হৃদয় হতে অন্তর্হিত হয়েছে। কোন খেদই আর নেই।

পশ্চাতের যা কিছু পশ্চাতেই পড়ে থাক।

অমানিশার অন্ধকারের দিগন্তে আজ নতুন ঊষার সম্ভাবনা জেগেছে।

মঞ্জরীর আজ আশ্রয় মিলেছে।

কর্তব্যের সমাপ্তি।

সহসা একটা গুলি এসে বামদিককার বক্ষপঞ্জর ভেদ করল।

লাল রক্তে গায়ের জামাটা ভিজে গেল।

দ্বিগুণ উৎসাহে ডাক্তার মেসিনগানটা চেপে ধরে।

দ্বিগুণ উৎসাহে গুলি চালানা করে।

আর একটা গুলি এসে বিদ্ধ হল এবারে দক্ষিণ বাহুমূলে। ঝিমিয়ে আসছে এদিকে সমস্ত দেহ। এ কি ক্লান্তি! এ কি নিষ্ঠুর অবসন্নতা! বাহুর অমিত বিক্রম শিথিল হয়ে আসছে! নিস্তেজ হয়ে আসছে সমস্ত শক্তি! কেন? কেন? কেন?

আলো নিভে যায় ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে।

এ কি ঘনায়মান অন্ধকার! সম্মুখে ঊর্ধ্বে নিম্নে পশ্চাতে পার্শ্বে এ কি দুর্ভেদ্য ঘন কালো অন্ধকার!

পৃথিবীর বায়ু কি নিঃশেষ হয়ে গেল?

আলো! আলো! আরও আলো!

Light!! Light! More Light!

আলো! আলো!

—শেষ—